বাংলায় মুসলিম জাগরণের তিন দিশারী : মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর রহমান : ঐতিহ্য চেতনা, ইতিহাস সাধনা ও সমাজ সেবা- একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে পি.এইচ-ডি. ডিগ্রীর জন্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী
সহযোগী অধ্যাপক

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম
বি.এ. (অনার্স), এম.এ., এল-এল.বি., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এম.ফিল. ও পি-এইচ.ডি. আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় (ভারত)

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

জুন, ২০০৭ ঈসায়ী

GIFT

বাংলায় মুসলিম জাগরণের তিন দিশারী : মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর রহমান : ঐতিহ্য চেতনা, ইতিহাস সাধনা ও সমাজ সেবা- একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে পি.এইচ-ডি. ডিগ্রীর জন্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী
সহযোগী অধ্যাপক

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম
বি.এ. (অনার্স), এম.এ., এল-এল.বি., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এম.ফিল. ও পি-এইচ.ডি. আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় (ভারত)

425623
Dhaka University Library
425623

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০ ।

জুন, ২০০৭ ঈসায়ী

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

<u>ঘোষণা পত্র</u>

আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ-ডি. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত "বাংলায় মুসলিম জাগরণের তিন দিশারী : মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর রহমান : ঐতিহ্য চেতনা, ইতিহাস সাধনা ও সমাজ সেবা– একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভখানা আমার নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এ অভিসন্দর্ভখানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোথাও পি.এইচ-ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য অথবা অন্য কোন সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দাখিল করিনি এবং আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

১৭.৬.২০০৭

মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী
পি.এইচ-ডি. গবেষক
ও
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

415633

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৬৬১৯০০-৭৩/৬৩৩০

Department of Islamic History & Culture
University of Dhaka
Dhaka-1000
Phone : 9661900-73/6330
E-mail : ishist_du@yahoo.com

নং.................................

তারিখ ২০.৮.২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রত্যয়ন পত্র

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও পি.এইচ-ডি. গবেষক জনাব মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজীর "বাংলায় মুসলিম জাগরণের তিন দিশারী : মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর রহমান : ঐতিহ্য চেতনা, ইতিহাস সাধনা ও সমাজ সেবা– একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি উক্ত গবেষকের একক গবেষণাকর্ম। অভিসন্দর্ভখানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ-ডি. ডিগ্রীর জন্য দাখিল করার অনুমতি প্রদান করছি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি সুপারিশ জ্ঞাপন করছি।

Mohammad Ibrahim
২০.৮.২০০৭
ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০
ও
তত্ত্বাবধায়ক।

তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

4:5623

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'বাংলায় মুসলিম জাগরণের তিন দিশারীঃ মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর রহমান : ঐতিহ্য চেতনা, ইতিহাস সাধনা ও সমাজ সেবা– একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ' শীর্ষক মৌলিক অভিসন্দর্ভখানা রচনার কাজ সুসম্পন্ন করতে পেরে মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোতিা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম। সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ নির্দেশনা ও আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এ কঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করা এত সহজ হতো না। তাই আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সম্মানিত সদস্য ড. কে. এম. মোহসীন স্যারও এ বিষয়ে আমাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাছাড়া আমার নিজস্ব বিভাগ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ)–এর আমার প্রিয় সহকর্মীবৃন্দও আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. কাজী দীন মোহাম্মদ, অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক ড. শাহজাহান মিয়া ও অধ্যাপক ড. নূরুর রহমান খানের কাছ থেকে মাওলানা আকরম খাঁ ও মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পর্কে এবং উর্দু ও ফার্সী বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ও ঢাকা তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজের অধ্যক্ষ হাকিম হাফেজ আজীজুল ইসলামের কাছ থেকে হাকিম হাবিবুর রহমান সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য ও দিক নির্দেশনা পেয়েছি। আমি তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

এ গবেষণাকর্মের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ঢাকা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর

Dhaka University Institutional Repository

লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ লাইব্রেরী, মুসলিম সাহিত্য সংসদ লাইব্রেরী (সিলেট)-সহ অন্যান্য আরও কতিপয় লাইব্রেরী ব্যবহার করেছি। তাছাড়া দেশের বাইরে ভারতের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতেও এতদ্‌সংক্রান্ত কিছু কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। উক্তসব লাইব্রেরীর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ আমাকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর কর্মকর্তা জনাব মোঃ আমান উল্লাহ্ এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব কবীর আহমেদসহ অত্র বিভাগের অন্যান্য কর্মচারীদের, যাদের কাছ থেকে সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা পেয়েছি। জনাব মোঃ জহির রায়হান অভিসন্দর্ভ কম্পোজসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজে নিখুঁতভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন বিধায় আমি তাঁকেও আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

বিশেষভাবে স্মরণ করছি তাঁদের কথা, যাদের দোয়া ও অনুপ্রেরণা আমাকে একাডেমিক কর্মকান্ডসহ অন্যান্য ব্যস্ততা সত্ত্বেও এ গবেষণাকর্ম সুসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ যুগিয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা-আম্মা, প্রিয়তমা স্ত্রী আরিফা রহমান এবং দু'ছেলে মোঃ নাজমুস সাকিব মিয়াজী ও মোঃ সাব্বির আহমদ মিয়াজী। আমার আব্বা আলহাজ্ব মাওলানা হোসেন আহাম্মদ মিয়াজী আজ বেঁচে নেই। তিনি জীবিত থাকলে আমার এ সফলতায় সবচেয়ে বেশী খুশি হতেন। এ মূহুর্তে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং অভিসন্দর্ভখানা তাঁর নামে উৎসর্গ করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় || মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী

১৯ জুন, ২০০৭ ঈসায়ী

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ

বর্তমান অভিসন্দর্ভখানা মূলতঃ দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায় বিন্যাসের আলোকে এর সার-সংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হল ঃ

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা। এখানে মুসলিম বাংলার পতনোত্তর যুগে মুসলিম জাতিসত্তার অপমৃত্যুর রেখাচিত্র ও হিন্দু জাগরণের পটভূমি আলোচনা করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হারিয়ে মুসলিমগণ বিভিন্ন দিক থেকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, ক্রমান্বয়ে তারা পতনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অবর্তমানে সঠিক দিক নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত ছিল। পক্ষান্তরে যেসব মুসলিম মনীষী পতনের বিভিন্ন কারণসমূহ আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন এবং উত্তরণের কথাও বলেছেন, তাঁরা সামাজিকভাবে কিছুটা সচেতন হয়ে উঠেছেন বটে, কিন্তু পতনশীল সমাজের উন্নতি বিধানকল্পে সুনির্দিষ্ট কোন কর্মসূচী দিতে তাঁরা তখনও সক্ষম হননি। কারণ সমাজের ত্রিশংকু অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য যেরূপ ত্রিমুখী সাঁড়াশি আক্রমণের প্রয়োজন ছিল, মুসলিম নেতৃবৃন্দ তখনও সেরূপ শক্তির অধিকারী হতে পারেননি। ফলে মুসলিম জাগরণ বিলম্বিত হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের গতি ছিল ভিন্ন মুখী এবং অবস্থা ছিল অন্য রকম। এ দেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শুরু থেকেই তাঁরা ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করতে শুরু করে এবং অত্যন্ত উৎসাহের সাথে ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করে। ফলে তাঁরা ইংরেজ সরকারের পূর্ণ আস্থা অর্জন করে, পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করে এবং ইংরেজী শিক্ষা করার সুবাদে চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলিমদের তুলনায় অনেক বেশী সুবিধা পায়। তারা পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয় এবং সমকালীন ইউরোপীয় চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে হিন্দু সমাজে ক্রমান্বয়ে নতুন ভাবধারার বিকাশ ঘটতে

Dhaka University Institutional Repository

থাকে এবং তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, যা হিন্দু সমাজের অগ্রগতিকে অনেকটা ত্বরান্বিত করে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বাংলায় মুসলিম জাগরণ। এ ক্ষেত্রে বৈশ্বিক ও সর্বভারতীয় পটভূমিতে বাংলায় মুসলিম জাগরণ বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বাংলায় মুসলিম জাগরণ বিলম্বিত হওয়ার কারণ, ক্রমান্বয়ে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (রঃ) ও শাহ্ আবদুল আযীয (রঃ)-এর জিহাদ আন্দোলনের সূত্র ধরে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রঃ) ও তাঁর শীষ্যবর্গের সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়া, বাংলায় উক্ত জিহাদ আন্দোলনের প্রভাব, উনিশ শতকে বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে হাজী শরীয়তুল্লাহ্ শহীদ তিতুমীর ও মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ)-এর অবদান ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপট, ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্র ধরে পরবর্তীতে ইংরেজদের সাথে আপোসকামী ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল 'Enlightened' বা 'আলোকপ্রাপ্ত' কতিপয় শহুরে মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় দেরীতে হলেও মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ, এ ক্ষেত্রে নওয়াব আবদুল লতীফ, সৈয়দ আমীর আলী, স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রমুখের দৃশ্যপটে আগমন ও নেতৃত্ব প্রদান , ভারতে দেওবন্দ ও আলীগড় আন্দোলন এবং বাংলায় মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্, ইসমাঈল হোসেন সিরাজীসহ তাঁদের অনুসারীদের জাগরণমূলক কর্মকান্ড, ধর্মীয় বিধি-বিধান সংক্রান্ত 'নসিহত নামা' বিষয়ক বই-পত্র প্রকাশ, বাংলার মুসলিম সমাজে কতিপয় সাহিত্যিকের আবির্ভাব ও তাঁদের সাহিত্য কর্ম, কতিপয় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আত্ম প্রকাশ, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা চিহ্নিত করা হয়েছে ।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ মাওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮ খ্রীঃ)। এতে তাঁর জন্ম-পরিচয়, প্রাথমিক জীবন ও শিক্ষা-দীক্ষা, সমসায়িক পরিবেশ-পরিস্থিতি

ও বাস্তবতা, তাঁর সাংবাদিকতা, রাজনৈতিক কর্মকান্ড, ভাষা আন্দোলন ও শিক্ষা সংস্কারে তাঁর অবদান ইত্যাদিসহ সম্পূরক সমাজসেবা বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি তাঁর সম্পূরক সমাজ সেবা সংক্রান্ত আলোচনাতে সমাজকর্ম ও সমাজ সংস্কারকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উক্তসব আলোচনাতে বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ মাওলানা আকরম খাঁর ঐতিহ্য চেতনা এবং ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনা। এ অধ্যায়ে প্রথমতঃ মাওলানা আকরম খাঁ বিরচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহে প্রতিফলিত তাঁর ঐতিহ্য চেতনার স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তাঁর ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনার দিকটি সবিস্তারে স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের একটি তালিকাও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে। উক্তসব আলোচনায় মূলতঃ তাঁকে একজন উঁচুমানের ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০ খ্রীঃ)। এতে তাঁর জন্ম পরিচয়, প্রাথমিক জীবন ও শিক্ষা-দীক্ষা, সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বাস্তবতা, তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, সাংবাদিকতা, ইসলাম প্রচার, বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, বিশেষ করে আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিক ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা ইত্যাদিসহ তাঁর সম্পূরক সমাজ সেবা বিষয়ক আলোচনা স্থান করে নিয়েছে। তাঁর সম্পূরক সমাজ সেবা সংক্রান্ত আলোচনাতে সমাজকর্ম ও সমাজ সংস্কারকে পাশাপাশি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উক্ত সব আলোচনাতে বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ মাওলানা ইসলামাবাদীর ঐতিহ্য চেতনা এবং ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনা। এ অধ্যায়ে প্রথমতঃ মাওলানা ইসলামাবাদী বিরচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহে প্রতিফলিত তাঁর ঐতিহ্য চেতনার স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়তঃ তাঁর ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনার দিকটি সবিস্তারে স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের একটি তালিকাও সন্নিবেশিত হয়েছে। উক্তসব আলোচনায় মূলতঃ তাঁকে একজন উঁচুমানের ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় ঃ হাকিম হাবিবুর রহমান (১৮৮১-১৯৪৭ খ্রীঃ)। পূর্ববর্তী তৃতীয় এবং পঞ্চম অধ্যায়ের মত এ অধ্যায়টিকেও প্রায় একইভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে দু'টো ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। এর একটি হচ্ছে– তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কর্মকান্ডের ভেতর বাংলা সাহিত্য ও সাংবাদিকতার পরিবর্তে উর্দু সাহিত্য চর্চা ও উর্দু সাংবাদিকতার দিকটি আলোচনায় স্থান পেয়েছে। কারণ তিনি ছিলেন উর্দু ভাষাভাষী এবং উর্দুকে তিনি 'Lingua Franca' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত: তিনি তিব্বে ইউনানী তথা হেকিমী বিদ্যায় ব্যাপক পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং সরকার কর্তৃক 'শেফাউল মূলক' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি 'তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইউনানী শাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতি-অগ্রগতি সাধন করেন এবং সমাজ সেবায় আত্ম নিয়োগ করেন।

অষ্টম অধ্যায় : হাকিম হাবিবুর রহমানের ঐতিহ্য চেতনা এবং ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনা। এ অধ্যায়ে প্রথমতঃ হাকিম হাবিবুর রহমান বিরচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহে প্রতিফলিত তাঁর ঐতিহ্য চেতনার স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তাঁর ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনার দিকটি সবিস্তারে স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের একটি তালিকাও সন্নিবেশিত হয়েছে। উক্তসব আলোচনায় মূলতঃ তাঁকে একজন ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

নবম অধ্যায়ঃ নির্বাচিত তিন মনীষীর চিন্তা-চেতনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ। এটিই মূলত: সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর

Dhaka University Institutional Repository

রহমানের চিন্তা-চেতনা ও সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। ফলে প্রত্যেকের চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ডের মিল ও গরমিল তথা পার্থক্য আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর উক্তসব আলোচনার প্রেক্ষিতে তাঁদের তিনজনের চিন্তা-চেতনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ তথা পারস্পরিক সম্পর্ক, যোগাযোগ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ঐক্য, সাধনার ক্ষেত্রে মিল ও ভিন্নতা ইত্যাদির সমন্বয়মূলক মূল্যায়ন এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

দশম অধ্যায়ঃ উপসংহার। এটিই মূলতঃ বর্তমান গবেষণাকর্মের সর্বশেষ অধ্যায়। এখানে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের ওপর আলোচনা স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– ১৭৫৭ সাল হতে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এ একশ বছর মুসলিম সমাজে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুপস্থিতি, সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বাস্তবতা সম্পর্কে মুসলিমদের ধারণার অস্পষ্টতা ও তাঁদের অতীতমুখী চিন্তা-ভাবনা, ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি মুসলিমদের তাৎক্ষণিকভাবে মনোযোগের অভাব, জিহাদ আন্দোলন এবং ওয়াহাবী আন্দোলনের সাথে এর পার্থক্য, ক্রমান্বয়ে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে দেওবন্দ আন্দোলন ও আলীগড় আন্দোলনের প্রভাব, বাংলায় মুসলিম জাগরণের সাথে ইউরোপীয় রেনেসাঁর তুলনা, মাওলানা আকরম খাঁ ও মাওলানা ইসলামাবাদীর বাংলাভাষা প্রীতি এবং হাকিম হাবিবুর রহমানের উর্দুপ্রীতির কারণ প্রভৃতিসহ আরও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিক।

যেসব বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, চিঠি-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ, ডায়েরী, আত্মজীবনী প্রভৃতি থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য নেয়া হয়েছে, সে সবের তালিকা গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)-তে সন্নিবেশিত হয়েছে। 'পরিশিষ্ট' অংশে পরপর তিনটি দিক স্থান পেয়েছে। এগুলো হচ্ছে যথাক্রমে মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর রহমানের বংশ লতিকা। তাছাড়া অত্র অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে যেসব গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও দলিলপত্র থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে, তথ্যসূত্রে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নম্বর
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	এক-দুই
	সার-সংক্ষেপ	I-V
প্রথম অধ্যায় :	ভূমিকা	১-৩৫
	ক) মুসলিম বাংলার পতনোত্তর যুগে মুসলিম জাতিসত্তার অপমৃত্যুর রেখাচিত্র	১-২০
	খ) বাংলায় হিন্দু জাগরণের পটভূমি	২১-৩৫
দ্বিতীয় অধ্যায় :	বাংলায় মুসলিম জাগরণ : বৈশ্বিক ও সর্বভারতীয় পটভূমি	৩৬-৮৯
তৃতীয় অধ্যায় :	মাওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮খ্রী:)	৯০-১৫৬
	ক) জন্ম পরিচয় ও শিক্ষাদীক্ষা	৯০-৯৫
	খ) কর্মজীবন :	৯৫-১৫৬
	১. সাংবাদিকতা	৯৫-১০৭
	২. রাজনীতি	১০৭-১৩২
	৩. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা	১৩২-১৩৫
	৪. মাওলানা আকরম খাঁর সম্পূরক সমাজ সেবা	১৩৬-১৫৬
চতুর্থ অধ্যায় :	মাওলানা আকরম খাঁর ঐতিহ্য চেতনা এবং ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনা	১৫৭-২২৮
	ক) মাওলানা আকরম খাঁ বিরচিত সাহিত্য কর্মে প্রতিফলিত ঐতিহ্য চেতনার স্বরূপ	১৫৭-১৭২
	খ) মাওলানা আকরম খাঁর ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনা	১৭৩-২২৮

Dhaka University Institutional Repository

		পৃষ্ঠা নম্বর
পঞ্চম অধ্যায় :	মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০ খ্রীঃ)	২২৯-২৮৯
	ক) জন্ম পরিচয় ও শিক্ষাদীক্ষা	২২৯-২৩৪
	খ) কর্মজীবন	২৩৪-২৮৯
	১. সাংবাদিকতা প্রসঙ্গ	২৩৪-২৪৬
	২. ইসলাম প্রচারে মাওলানা ইসলামাবাদী	২৪৬-২৪৯
	৩. রাজনীতি	২৪৯-২৬১
	৪. মাওলানা ইসলামাবাদীর সম্পূরক সমাজ সেবা	২৬২-২৮৯
ষষ্ঠ অধ্যায় :	মাওলানা ইসলামাবাদীর ঐতিহ্য চেতনা এবং ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনা	২৯০-৩৫৫
	ক) মাওলানা ইসলামাবাদীর ঐতিহ্য চেতনা	২৯০-৩০৩
	খ) মাওলানা ইসলামাবাদীর ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনা	৩০৪-৩৫৫
সপ্তম অধ্যায় :	হাকিম হাবিবুর রহমান (১৮৮১-১৯৪৭ খ্রীঃ)	৩৫৬-৩৮৭
	ক) জন্ম পরিচয় ও শিক্ষাদীক্ষা	৩৫৬-৩৫৮
	খ) কর্মজীবন	৩৫৮-৩৮৭
	১. চিকিৎসা সেবা	৩৫৮-৩৫৯
	২. উর্দুপ্রীতি ও উর্দু চর্চা	৩৫৯-৩৬০
	৩. উর্দু সাংবাদিকতা	৩৬০-৩৬২
	৪. রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও চিন্তা চেতনা	৩৬২-৩৬৮
	৫. হাকিম হাবিবুর রহমানের সম্পূরক সমাজ সেবা	৩৬৯-৩৮৭

Dhaka University Institutional Repository

		পৃষ্ঠা নম্বর
অষ্টম অধ্যায়:	হাকিম হাবিবুর রহমানের ঐতিহ্য চেতনা এবং ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনা	৩৮৮-৪২৯
	ক) হাকিম হাবিবুর রহমানের ঐতিহ্য চেতনা	৩৮৮-৩৯৮
	খ) হাকিম হাবিবুর রহমানের ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনা	৩৯৯-৪২৯
নবম অধ্যায় :	নির্বাচিত তিন মনীষীর চিন্তাচেতনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ	৪৩০-৪৬০
দশম অধ্যায় :	উপসংহার	৪৬১-৪৮৭
	পরিশিষ্ট : ১. মাওলানা আকরম খাঁর বংশ লতিকা	৪৮৮
	পরিশিষ্ট : ২. মাওলানা ইসলামাবাদীর বংশ লতিকা	৪৮৯
	পরিশিষ্ট : ৩. হাকিম হাবিবুর রহমানের বংশ লতিকা	৪৯০
	গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)	৪৯১-৫২১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

(ক) মুসলিম বাংলার পতনোত্তর যুগে মুসলিম জাতিসত্তার অপমৃত্যুর রেখাচিত্র

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থা। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন : "আজ (বিদায় হজ্জের দিন) আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন বিধান (ইসলাম)-কে পরিপূর্ণতা দান করলাম, আমার সকল নিয়ামত তোমাদের উপর অর্পন করলাম এবং ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করে এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকলাম।"[১] আল্ কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহ্র নিকট একমাত্র পছন্দনীয় ও মনোনীত জীবন বিধান।"[২] অন্যদিকে ইসলামের যাঁরা অনুসারী, তাঁরাই হচ্ছেন মুসলিম। মুসলিম নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র অনুগত বান্দা। মহান আল্লাহ্ যুগে যুগে অসংখ্য পয়গম্বর বা নবী-রাসূল[৩] এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন পথহারা বান্দাদের সঠিক পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। তাঁরা আল্লাহ্ প্রদত্ত দ্বীন (ইসলাম)-এর দিকে মানুষকে সার্বক্ষনিক আহবান জানাতেন। নবুওয়্যত ও রিসালতের এ ক্রমধারার পরিসমাপ্তি ঘটে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ্ তাঁর উপর মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন অবতীর্ণ করেন এবং তাঁর মাধ্যমেই ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইসলামের পরিপূর্ণতা দান করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি (আল্লাহ্ পাক) বলেনঃ "তিনিই সেই আল্লাহ্, যিনি তাঁর প্রিয়তম রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-কে পাঠিয়েছেন আল্‌হুদা (আল্ কুরআন) ও দ্বীনে হক্ব (আল্ ইসলাম)সহ; অন্যান্য সকল দ্বীন (জীবনাদর্শ)-এর উপর ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে, যদিও মুশ্‌রিকদের তা অপছন্দনীয়।"[৪] মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের

---

[১] আল্ কুরআন, ৫ : ৩।
[২] আল্ কুরআন, ৩ : ১৯।
[৩] এক বর্ণনা অনুসারে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর।
[৪] আল্ কুরআন, ৬১ : ৯।

Dhaka University Institutional Repository

শেষ দিকে এবং তাঁর ইন্তেকালের পর পর ইসলামের কালজয়ী ও সার্বজনীন আদর্শ আরব বিশ্ব ছাড়িয়ে পৃথিবীর অন্যান্য বহু স্থানে প্রচার-প্রসার হতে লাগল। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম ছিলনা।

বাংলায় মুসলিম জাগরণ এক অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামী ধারা। এটা কোন বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ঘটনা নয়। ইসলামের ইতিহাস পাঠে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ হতে দ্বাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশত বছর এ দেশে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিমদের নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের এক সুদীর্ঘ অধ্যায়। ইসলাম প্রচারক আলিম, পীর-দরবেশ, সূফী ও মুজাহিদগণের অব্যাহত চেষ্টা-সাধনা, ত্যাগ ও কুরবানীর মধ্য দিয়ে এ সময় বাংলায় ইসলামের প্রতি নৈতিক সমর্থনের ভিত্তি গড়ে উঠে। উক্ত ভিত্তির উপর ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম মুসলিম শাসন। ত্রয়োদশ শতকের সূচনা হতে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশত বছর মুসলিম শাসন যুগ। এটি ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, মুসলিমদের নৈতিক জীবনের পুনর্গঠন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ এবং ঈমান ও অধিকার সংরক্ষণ তথা মুসলিম জাগরণের এক উজ্জ্বল ও বিস্তীর্ণ অধ্যায়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার পরাজয়ের পর হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় দু'শত বছর এদেশে মুসলিমদের আযাদী তথা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম যুগ। ১৭৫৭ সাল হতে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে মুসলিমদের ঐ গণ-সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিলেন আপোসহীন ও বিপ্লবী আলিম সমাজ। ১৮৭০ সাল হতে ১৯০৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এদেশের মুসলিমদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সূচীত হয় নবজাগরণ। জাতীয় রাজনীতির ধারণা বিকাশ এবং পাশ্চাত্য-শিক্ষিত 'আলোক প্রাপ্ত' আপোসকামী মুসলিম অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক বাংলার মুসলিমদের নেতৃত্ব গ্রহণও এ সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ১৯০৬ সালে এ অভিজাত শ্রেণীর নেতৃত্বেই মুসলিমদের জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। ১৯০৬ সাল হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মুসলিমদের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ

Dhaka University Institutional Repository

এবং পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও তাঁরাই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর তাঁদের নেতৃত্বেই এদেশের প্রশাসন, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে 'Secular' বা ধর্মনিরপেক্ষ ধারা জোরদার হয়। অন্যদিকে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ও বিকাশ, মুসলিমদের নৈতিক উন্নয়ন তথা ইসলামী নবজাগরণের পৃথক ধারা গড়ে উঠে বিপ্লবী আলিম সমাজ ও পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের একাংশের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ হতে দ্বাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত ইসলামের প্রাথমিক প্রচার যুগ এবং ত্রয়োদশ শতকের শুরু হতে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলিম শাসন যুগে বাংলায় মুসলিম জাগরণের নেতৃত্বে ছিলেন ইসলাম প্রচারক আলিম, পীর-দরবেশ, সুফী ও মুজাহিদগণ। ইসলামের প্রভাবসীমা বিস্তার, মুসলিম সমাজ গঠন, রাষ্ট্র বিস্তার, রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি বিধান, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলামী শরীয়তের নীতি বাস্তবায়নে পরামর্শ ও প্রেরণা দান এবং 'Pressure Group' হিসেবে দায়িত্ব পালনে তাঁরা ছিলেন অগ্রণী। সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তার, দুঃস্থ ও বিপন্ন, বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষকে আশ্রয় ও সাহায্য দান এবং তাদের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা ছিল সুচিহ্নিত ও সুস্পষ্ট। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, অভাব-বঞ্চনা এবং চাওয়া-পাওয়ার সাথে সম্যক পরিচয়ের কারণে তাঁরা ছিলেন মূলতঃ শাসক ও জনতার মধ্যে কার্যকর যোগসূত্র।

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ছোট ছোট হিন্দু রাজা ও জমিদারদের এলাকায় তাদের অত্যাচার হতে মুসলিম ও অন্যান্য প্রজাদের রক্ষাকল্পে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন শাহ্ মখদূম রূপোস ও বাবা আদম শহীদ মক্কীর মত বিখ্যাত ইসলাম প্রচারকগণ। মুজাহিদ দরবেশ জাফর খাঁ গাজী ও শাহ্ শফিউদ্দীন হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সাতগাঁও অঞ্চল মুসলিম শাসনের অধীনে এনেছিলেন। হযরত শাহ্ জালাল (রঃ) ও তাঁর সাথীগণ অত্যাচারী হিন্দু রাজা গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে সিকান্দার শাহের মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিতভাবে যুদ্ধ

করে সিলেট অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। রুক্নুদ্দীন বারবক শাহের আমলে বিখ্যাত দরবেশ সিপাহ্সালার ইসমাইল গাযী উড়িষ্যার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মান্দারন জয় করেন। তিনিই কামরূপের রাজাকে বাংলার সুলতানের আনুগত্য করতে বাধ্য করেন। দরবেশ সিপাহ্সালার খান জাহান আলী (রঃ) ইসলামের প্রভাবসীমা বিস্তার করেছেন যশোর ও খুলনা এলাকায়। ইলিয়াস শাহী প্রশাসনে হিন্দুদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের আসন্ন পরিণাম সম্পর্কে সিকান্দার শাহ্কে সতর্ক করেছেন প্রখ্যাত আলিম ও সুফী শেখ আলাউল হক। এ ব্যাপারে গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ্কে সাবধান করে চিঠি লিখেছেন মাওলানা মুজাফ্ফর শাম্স্ বলখী। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আলিম ও সুফীদের সতর্কবাণীর নির্মম বাস্তবতা প্রমানিত হয় ভাতুরিয়ার জমিদার গণেশের আচরণে। ইলিয়াস শাহী বংশের তিন জন শিখন্ডী সুলতানকে একের পর এক হত্যা করে গণেশ বাংলায় সাড়ে পাঁচ শ বছরের মুসলিম শাসনের মাঝখানে চার বছরের স্বল্পস্থায়ী হিন্দু শাসন কায়েম করেন। তিনি 'মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার সংকল্প করলেন' এবং 'রাজ্য থেকে ইসলামের মূলোচ্ছেদ করাই হয়ে দাঁড়াল তাঁর লক্ষ্য'। বাংলার বৃহত্তম 'আদিনা মসজিদ'-কে কাচারী ঘরে রূপান্তর রাজা গণেশের রাজত্বকালের অন্যতম 'সেরা' কীর্তি। রাজা গণেশের সামনে মাথা নত করতে রাজি না হওয়ায় শিরোচ্ছেদ করা হয় প্রখ্যাত আলিম শেখ বদরুল ইসলামের। একই দিনে একদল আলিমকে একই সাথে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয় রাজা গণেশের নির্দেশে। বাংলার মুসলিমদের এই ভয়াবহ সংকটকালে রাজা গণেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন সংগ্রামী আলিম সমাজ। সে সময় মুসলিম সমাজে ঐক্য, শৃঙ্খলা ও মনোবল প্রতিষ্ঠা, দেশের ভিতর ও বাইরে মুসলিমদের সামাজিক নেতা আলিম ও দরবেশদের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে রাজা গণেশের বিরুদ্ধে অভিযানে অনুপ্রাণিত করে যুগশ্রেষ্ঠ বুজর্গ ও আলিম হযরত নূর কুত্বুল আলম (রঃ) মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজকে এক মহাসংকট হতে রক্ষা করেন।

এদিকে বাদশাহ্ আকবরের 'দীন-ই-ইলাহী'-র বিরুদ্ধে তীব্র গণ আন্দোলন গড়ে তোলেন শায়খ আহ্মদ সেরহিন্দী মুজাদ্দিদ্-ই আল্ফ-ই-সানী (রঃ) (১৫৬৪-

Dhaka University Institutional Repository

১৬২৪ সাল)। তাঁর আন্দোলনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা বাংলাসহ উপমহাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন এবং শির্ক, বিদ্‌আত ও কুসংস্কার দূর করে মুসলিমদের ঈমান-আকিদা পরিশুদ্ধকরণ, চিন্তার পুনর্গঠন ও মুসলিম জাগরণের পক্ষে কাজ করেন। বাদশাহ্ আকবরের বিরুদ্ধে জৌনপুরের কাজির ফতোয়া এ সময় বাংলার পাঠান মুসলিম বার ভূঁইয়াদের আযাদী রক্ষার সংগ্রামে বিপুল শক্তি যোগায়। বাদশাহ্ আকবরের মৃত্যুর পর যেসব মুসলিম শাসক মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফ-ই-সানীর (রঃ) হাতে বায়আত হন এবং ইসলামী শরীয়াহ্ বিরোধী কর্মকান্ডে আর কখনও অংশগ্রহণ না করার শপথ করেন, ঢাকার মুঘল সুবাহ্‌দার ইসলাম খান তাঁদের অন্যতম। ইসলাম খানের সুবাদারী আমলেই (১৬০৮-১৩ সাল) বাংলায় মুঘল শাসন দৃঢ়ভিত্তি লাভ করে। মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফ-ই-সানীর (রঃ) আদর্শিক ভাবধারায় পুষ্ট দরবেশ বাদশাহ্ আওরঙযিব আলমগীরের শাসনামলে বাংলার মুসলিমগণ 'প্রথমবারের মত যথার্থ ইসলামী শাসনের সাথে পরিচিত হয়েছিল এবং ইসলামী শাসনের সুফল ভোগ করেছিল'।[৫]

ত্রয়োদশ শতকের শুরু হতে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশত বছর বাংলায় মুসলিম শাসন যুগ। তের শতকের শুরুতে ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ার খল্‌জী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে এদেশে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। তখন থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সিরাজ উদ্‌দৌলার পতন পর্যন্ত বহু মুসলিম সুলতান, সুবাহ্‌দার, নবাব ও নাযিম প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে বাংলা শাসন করেন। মাঝখানে রাজা গণেশ মাত্র চার বছর (১৪১৪-১৮) স্বাধীনভাবে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাজা টোডরমল (১৫৮০-৮২) এবং রাজা মানসিংহও (১৫৮৯-৯৬) বাংলা শাসন করেছিলেন; কিন্তু তাঁরা ছিলেন বাদশাহ্ আকবরের প্রতিনিধি-নাযিম। প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর ব্যাপী যে মুসলিমগণ শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট নবাব সিরাজের

---

৫ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, 'বাংলায় মুসলিম নবজাগরণ', আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, অধ্যাপক আবদুল গফুর সম্পাদিত, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, ২০০১, পৃঃ ২৩৩-৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

পরাজয়ের মাধ্যমে তাঁরা শাসিত শ্রেণীতে পরিণত হলেন। অবশ্য নবাব মীর কাসিমের সময় পর্যন্ত মুসলিমগণ নামে মাত্র স্বাধীন শাসক শ্রেণী হিসেবে টিকে থাকলেও ১৭৬৪ খ্রীঃ বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট নবাব মীর কাসিমের চূড়ান্ত পরাজয়ের ফলে বাংলার মুসলিমগণ প্রায় দুইশত বছরের জন্য শাসিত শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং ইংরেজদের নিকট পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়।

রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর পর কতকগুলি দিক দিয়ে বাংলার মুসলিম সমাজে প্রত্যক্ষ আঘাত আসে। পলাশী-যুদ্ধের অব্যবহিত পরে দেশীয় সামরিক বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ও ক্ষমতা বিপুল পরিমাণে হ্রাস পায়। লর্ড ক্লাইভ সামরিক ক্ষমতা কোম্পানীর নিয়ন্ত্রনে নিয়ে নেন। সামরিক বাহিনীর উচ্চ পদগুলি ইংরেজ অফিসার নিয়োগের মাধ্যমে পূর্ণ করেন। ইংরেজদের তাবেদার 'পুতুল নবাব' মীর জাফরের অধীনে সীমিত সংখ্যক সৈন্য রাখা হয়। পরে অপ্রয়োজনীয় মনে করে ইংরেজ সরকার তা-ও সরিয়ে নেয়।[৬]

১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের পর রাজস্ব বিভাগেও কোম্পানীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৭২ সালে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস্ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন এবং 'Governor General' উপাধি গ্রহণ করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব বৃত্তিভোগী হয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতাচ্যুত হন। নবাবের ভাতা প্রথমে ছিল ৫৩ লক্ষ টাকা, পরে পরিমাণ কমে ৩২ লক্ষ টাকা এবং আরও পরে ১৬ লক্ষ টাকা হয়। নবাবের বৃত্তির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী, আশ্রিতজন এবং অনুগ্রহভাজনের সংখ্যাও হ্রাস পায়। বিচার বিভাগে কিছুকাল মুসলিমদের প্রাধান্য ছিল বটে কিন্তু ক্রমান্বয়ে সেখানেও ইংরেজগণ হস্তক্ষেপ করে এবং উচ্চ পদগুলি গ্রাস করে। প্রথমে সদর দেওয়ানী আদালত (১৭৭২) এবং পরে সদর নিযামত আদালত (১৭৯০) কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। সদর দেওয়ানী আদালতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিলেন স্বয়ং গভর্নর জেনারেল। জেলা

---

[৬] Abul Khair Nazmul Karim, The Modern Muslim Political Elite in Bengal, (Unpublished Doctoral Thesis), University of London, 1964, P. 101.

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ানী আদালতে বিচারের ভার ছিল জেলা-কালেক্টরের উপর। ফৌজদারী আদালতে মুসলিম আইন বলবৎ ছিল বিধায় সেখানে মুসলিমদের প্রভাব আরও কিছুদিন অব্যাহত ছিল। ১৭৯৩ সালে 'কর্নওয়ালিস কোড' অনুসারে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগকে পৃথক করে জেলা-জজ ও জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করে মুসলিম আধিপত্যের অবসান ঘটানো হয়।[৭] দেশের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথমে রাজস্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। কারণ সরকারের আয়ের প্রধান উৎসই ছিল ভূমি-রাজস্ব। রাজা, মহারাজা, জমিদার, জায়গীরদার, আয়মাদার, মদদ্-ই-মা'আশ, ইজারাদার প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের মালিকানায় ভূমির ভোগস্বত্ব ছিল। রাজা, মহারাজা বংশ পরম্পরায় ভূমির মালিকানা পেতেন। জায়গীরদার নগদ টাকার পরিবর্তে নিষ্কর অথবা সামান্য করের বিনিময়ে জায়গীর পেতেন। রাজা, মহারাজা ও জায়গীরদার নিজ নিজ এলাকায় জমিদার নিয়োগ করে রাজস্ব আদায় করতেন। জমিদারের অধীনে দেওয়ান, গোমস্তা প্রভৃতি কর্মচারী থাকতেন। খাস্ ভূমির মালিক ছিলেন স্বয়ং সরকার। প্রথমে লর্ড হেস্টিংস ও পরে লর্ড কর্ণওয়ালিস ভূমি ব্যবস্থার এসব জটিল পদ্ধতি তুলে দিয়ে একটি সুষ্ঠু ও সমন্বিত পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা করেন। একসালা, পাঁচসালা, দশসালা এবং পরিশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) পদ্ধতি প্রবর্তণের মাধ্যমে ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ভূমি ও ভূমিস্থ প্রজার মালিক হন। তিনি সরকারকে নিয়মিত বাৎসরিক নির্ধারিত কর প্রদান করে বংশ পরম্পরায় জমিদারী ভোগ করার অধিকার পান। এর সাথে 'সূর্যাস্ত আইন' নামক একটি আইন চালু করা হয়। এই আইন মোতাবেক, নির্দিষ্ট সময়ে জমিদারীর খাজনা রাজকোষে পৌঁছে দিতে না পারলে উক্ত জমিদারী নিলাম হয়ে যেত। বিত্তশালীরা জমিদারী নিলামে কিনে নিতেন। সরকারের উপর্যুপরি এসব ব্যবস্থার ফলে বনেদী জমিদারী গুলি বিধ্বস্ত হয়।[৮]

---

৭ Roy Choudhury, Majumdar and Datta, An Advanced History of India, Calcutta, 1953, P. 788.

৮ ডঃ ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ৩৭-৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রায়শঃ বলা হয় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেই মুসলিম জমিদারদের পতন ঘটে। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেন :

"ইজারাচুক্তি (১৭৭২-৯৩) ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) প্রভৃতির ফলে মুসলমান জমিদাররা রাতারাতি পথে বসেন। মুসলমান জমিদারদের অধিকাংশ জমিদারী খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সুপারিশে কোম্পানী সরকার খাস করে নেয় এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেয়। ফলে মুসলমান জমিদারদের নায়েব গোমস্তা এবং দেব, মিত্র, বসাক, সিংহ, শেঠ, মল্লিক, শীল এমনকি তিলি আর সাহারা হঠাৎ জমিদারে রূপান্তরিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। অনুস্বত্বের অধিকারী নতুন জমিদাররা জমির উপর লাভ করে পূর্নস্বত্ব মালিকানা। বাংলার কৃষক, যাদের ৭৫ ভাগই ছিল মুসলমান, জমির স্বত্ব হারিয়ে জমিদারদের মর্জির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।"[৯]

তাঁর এ বক্তব্য আংশিক সত্য। কারণ এক্ষেত্রে মুসলিমদের পাশাপাশি হিন্দুগণও ক্ষতিগ্রস্ত হন। এ প্রসঙ্গে সালাহ্উদ্দীন আহমদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশের মুসলমান জমিদাররা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁদের জমিদারী হিন্দুদের হাতে চলে গিয়েছিল-এ ধরনের ঢালাও মন্তব্য খুব সম্ভব হান্টার সাহেবই প্রথম করেন। যদিও একথা সত্য যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বহু পুরনো জমিদারী হিন্দু বেনে, মহাজন ও ব্যবসায়ী এবং রাজস্ব বিভাগের নিম্ন কর্মচারীদের হাতে চলে গিয়েছিল, তা সত্ত্বেও মনে রাখা প্রয়োজন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাংলার অধিকাংশ জমিদার ছিলেন হিন্দু এবং বিহারের অধিকাংশ জমিদার ছিলেন মুসলমান। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তীকাল পর্যন্ত এই অবস্থাই বিদ্যমান ছিল"।[১০]

অন্যত্র তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এবং পরবর্তীকালের ইংরেজ সরকারের ভূমি-রাজস্ব নীতির ফলে বাংলার

---

৯ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৬-৩৭।

১০ সালাহ উদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ, কবি মতিউর রহমান চতুর্থ স্মারক বক্তৃতামালা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ৩৪-৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম জমিদাররা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, আসলে ব্যাপারটা তা নয়। নবাব মুর্শিদকুলী খানের আমল থেকে অর্থাৎ প্রাক্‌ব্রিটিশ আমল থেকেই বাংলার অধিকাংশ ভূ-স্বামী ছিলেন হিন্দু। সুতরাং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার মুসলিম ভূ-স্বামীরা সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন-এ প্রশ্ন উঠে না। তবে হিন্দুদের তুলনায় বাংলার মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি যে দুর্বল ছিলো, এটা অস্বীকার করা যায় না।[১১] N.K. Sinha, Abdul Karim এবং B.B. Misra-এর বিবরণ হতেও প্রতীয়মান হয় যে, নবাব মুর্শিদকুলী খানের আমলে বাংলার জমিদারদের তিন-চতুর্থাংশ এবং অধিকাংশ তালুকদার হিন্দু ছিলেন। নবাব বহু বাঙালী হিন্দুকে সরকারী পদে নিয়োগ দান করেন। মুসলিম শাসনামলে রাজস্ব বিভাগের চাকুরী প্রায় একচেটিয়াভাবে হিন্দুদের হাতে ছিল। ইংরেজ আমলের প্রথম দিক পর্যন্ত এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল।[১২] সুতরাং বলা যায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণীর রাজা, মহারাজা, জমিদার, জায়গীরদার ক্ষতিগ্রস্থ হন। তবে নতুন যাঁরা জমিদারী প্রাপ্ত হন, তাঁদের অধিকাংশ হিন্দু হওয়াতে সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দুদের ক্ষতি তাঁরা পুষিয়ে নিতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে মুসলিমদের হাতে যে ক'টা জমিদারী ছিল, তাও হাতছাড়া হয় এবং দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তা হিন্দুদের হস্তগত হয়।[১৩] বিপন চন্দ্র বিষয়টি দেখেছেন এভাবে-

> "... land fell into the hands of the new commercial groups who were almost wholly Hindu. The commercial groups were overwhelmingly Hindu even under Muslim rulers, the new feature was the nature of colonial rule and colonial policies which enabled men of commerce to control land".[১৪]

---

[১১] প্রফেসর সালাহ্ উদ্দীন আহমদ, আমাদের রেনেসাঁ ভাবনা, অধ্যাপক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক বক্তৃতা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ৩ জুন, ২০০১, পৃ ঃ ৫।

[১২] N.K. Sinha, The Economic History of Bengal, Vol.1, Calcutta, 1961, P.4; Abdul Karim, Murshid Quli Khan and His Times, Dacca, 1963, P. 218; B.B. Misra, The Indian Middle Classes, Oxford, 1961, P. 187.

[১৩] A. K. Nazmul Karim, op.cit., PP. 41-42.

[১৪] Bipan Chandra, Communalism in Modern India, Vani Educational Book, Delhi, 1984, P. 64; উদ্বৃত : ড. ইমরান হোসেন, বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম (১৯০৫-১৯৪৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৩, পৃ ঃ ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ সরকারের ভূমি সংস্কার নীতি ছাড়াও মুসলিমদের জমিদারী হারানোর পেছনে অন্যান্য কারণও বিদ্যমান ছিল । ড. সিরাজুল ইসলাম মুসলিম জমিদারদের পতনের জন্য জমিদারদের অযোগ্যতা, দায়িত্বে অবহেলা প্রদর্শন, বিলাসিতা, নায়েবের কারসাজি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কারণও দায়ী বলে মনে করেন ।[১৫] এ কালের মুসলিম ভূস্বামীদের মধ্যে ব্যাপক চারিত্রিক অধঃপতন শুরু হয় । হিন্দু কর্মচারী ও মহাজনরা সরকারী নীতির সুযোগ নিয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুর্খ, দাম্ভিক, অলস ও ঋণগ্রস্ত জমিদারদের জমিদারী আত্মসাৎ করে । বলা বাহুল্য, এ চক্রটি স্বজাতি হিন্দু জমিদারদের জমিদারী আত্মসাতের ক্ষেত্রেও সমান তৎপর ছিল ।[১৬]

কোন কোন ঐতিহাসিক ইংরেজ শাসনামলে বাংলার মুসলিমদের আর্থিক দুর্গতির জন্য লাখেরাজ বা নিস্কর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণকেও কিছুটা দায়ী করেন । মুসলিম শাসনামলে সমাজের উচ্চ বংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আধ্যাত্মিক নেতা ও জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তি এসব লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগ করতেন । খোন্দকার ফজলে রাব্বী এরূপ ভোগ-দখলকৃত ২৭ প্রকার ভূ-সম্পত্তির নাম উল্লেখ করেছেন । যেমন- জায়গীর, আল্ তম্ঘা, মদদ-ই-মা'আশ, আয়মা, মসকান, নজুরত, খান্কাহ্ ফকিরান, নজরি দরগাহ্, নজরি ইমামাইন, জমিন-ই-মসজিদ, নজরি হজরত, খরচি মুসাফিরান, মেরামতি মসজিদ, মা-আফি, পীরান, খয়রাতি, খারিজ জমা, মিনহাই, ব্রহ্মোত্তর, মেহতেরান, মালেক ও মালেকানা, দেবোত্তর, শিবোত্তর, সুরজপর্বত, ইনাম ও মানকর । এগুলোর মধ্যে ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, শিবোত্তর, মেহতেরান ও সুরজপর্বত- এই পাঁচটি হিন্দুরা, জায়গীর, আল্ তম্ঘা, খারিজ জমা, মিনহাই, মালেকানা, ইনাম ও মানকর-এই সাতটি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় এবং বাকী পনেরটি মুসলিমগণ ভোগ করত ।[১৭] বীরভূম জেলায় ১৮২৩ সালে মোট ৩০,৭৮১ বিঘা নিস্কর ভূমি ছিল । এর মধ্যে ২২,০০০ বিঘা মুসলিমদের এবং ৮,০০০ বিঘা হিন্দুদের দখলে

---

[১৫] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Dr. Sirajul Islam, The Permanent Settlement in Bengal : A Study of Its Operation, 1790-1819, Bangla Academy, Dacca, 1974, PP. 128-141.

[১৬] ড. ইমরান হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৮ ।

[১৭] Khondker Fuzli Rubbee, The Origin of the Musalmans of Bengal, Calcutta, 1895, PP. 69-70; ডঃ ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

ছিল; বাকীটা অন্যান্যদের দখলে ছিল। উক্ত জেলায় হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৩০ : ১। সুতরাং জনসংখ্যার দিক থেকে নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও লাখেরাজদারদের মধ্যে মুসলিম প্রাধান্য ছিল, একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। ১৮২৮ সালের পরবর্তী ১৮ বছর ধরে লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ প্রক্রিয়া চলে। এ প্রক্রিয়ায় আইমাদার-লাখেরাজদারদের 'title deeds' পরীক্ষার যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তাতে অধিকাংশ মুসলিম বৈধ সনদ দেখাতে ব্যর্থ হয়। কারণ পূর্বের শাসক শ্রেণী তাঁদের স্বজাতি হওয়াতে তাঁরা এ ধরনের দলিল-পত্র রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। তদুপরি কোর্ট-কাচারীতে মুসলিম কর্মচারীর পরিমাণ কম থাকাতে সেখানেও তাঁরা অসুবিধার মধ্যে ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু কর্মচারীদের কারসাজির ফলেও মুসলিমগণ ভূমিচ্যুত হন। ফলে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার দরিদ্র অথবা ধ্বংস হয়ে যায়। এজন্য নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন প্রবর্তনকে হান্টার মুসলিমদের জন্য 'মরনাঘাত' বলে উল্লেখ করেছেন।[১৮]

আদালতে ফার্সী ভাষা চালু থাকায় অনেক মুসলিম বিচার বিভাগে চাকুরীতে নিযুক্ত হতেন। প্রথম দিকে ইংরেজ সরকার মাদ্রাসার সার্টিফিকেট ব্যতীত চাকুরীতে বহাল না করার নির্দেশ দিয়ে বিচার বিভাগের এই চাকুরীগুলিতে মুসলিমদের একচেটিয়া দখল বলবৎ রেখেছিলেন। কিন্তু লর্ড বেন্টিংক ১৮৩৭ সালে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজীকে রাজভাষা করেন। অথচ মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। পরবর্তীকালে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা হলেও মুসলিম ছাত্ররা ঐ ভাষা শিক্ষার জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি। ফলে বিচার বিভাগে তাদের চাকুরীর সুযোগ নষ্ট হয়। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ আইন করেন যে, যাঁদের ইংরেজীতে ডিগ্রী আছে, তাঁরাই সরকারী চাকুরীতে অগ্রাধিকার পাবেন। ধারাটি নিম্নরূপ ঃ

> "... that in every possible case a preference shall be given to those who have been educated in institutions thus established (Zilla Schools and Central Colleges) and

---

[১৮] W.W. Hunter, The Indian Musalmans, London, 1871, P. 167.

Dhaka University Institutional Repository

especially to those who distinguished themselves therein of a more than ordinary degree of merit and attainments."[১৯]

এ সময় হিন্দুগণ ইংরেজী শিক্ষায় বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। ফলে অফিস-আদালতে তাঁদেরই চাকুরী হতে লাগল এবং মুসলিমদের চাকুরীতে নিয়োগ প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। অন্যদিকে ১৮৩৫ সালে গৃহীত আইন অনুসারে, কেবল ইংরেজী বিদ্যালয়গুলিই সরকারী সাহায্য পাওয়ার জন্য বিবেচিত হয়। ধারাটি নিম্নরূপ ঃ

"His Lordship in Council is of the opinion that great of the British Government ought to be promotion of European Literature and Science amongst the natives of India, and all the funds appropriated for purposes of education would be best employed on English education alone." [২০]

ফলে মুসলিমদের প্রায় সবগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই বন্ধ হয়ে গেল। এতে অনেক মুসলিম শিক্ষক চাকুরী হারান এবং অন্য কোন পেশার অবর্তমানে চরম দারিদ্রের মধ্যে পতিত হন। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষানীতির লক্ষ্য সম্পর্কে মেকলে প্রদত্ত বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুল্তে হবে যারা সমাজে শাসক ও শাসিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। তারা রক্তমাংসের গড়নে ও দেহের রং-এ ভারতীয় হবে বটে, কিন্তু রুচি, মতামত ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবে খাঁটি ইংরেজ।[২১] ইংরেজরা মুসলিমদের শিক্ষার জন্য নির্ধারিত হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের ওয়াক্ফ সম্পত্তি আত্মসাৎ করে। উক্ত বিশাল সম্পত্তির আয় থেকে ১৮৩৬ সালে ইংরেজী শিক্ষার জন্য হুগলী কলেজ খোলা হয়। ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজে কোন মুসলিম ছাত্র ভর্তির সুযোগ না থাকলেও হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের ওয়াক্ফ সম্পত্তির টাকায় প্রতিষ্ঠিত হুগলী কলেজে (ইংরেজী কলেজ) হিন্দুদের পড়ার সুযোগ থাকে অবারিত। চট্টগ্রামের মীর ইয়াহ্ইয়া মুসলিমদের শিক্ষার সুবিধার্থে যে বিপুল সম্পদ-সম্পত্তি রেখে যান, কোম্পানী সরকার সে সম্পদ হতে ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ছাত্র শিক্ষকদের প্রায় সকলেই ছিল

---

[১৯] Quoted from Azizur Rahman Mallick's British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1858), Dacca, 1961, P. 324.

[২০] Ibid, P. 222

[২১] মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু। নতুন গজিয়ে ওঠা হিন্দু জমিদার ও বিত্তশালী শ্রেণী মুসলিম প্রধান এলাকার পরিবর্তে নিজেদের হিন্দু প্রধান এলাকায় স্কুল-কলেজ স্থাপন করেন। নোয়াখালীর প্রতাপচন্দ্র কিংবা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার-সবার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অভিন্ন। খ্রীষ্টান মিশনারী ও অবস্থাপন্ন হিন্দুদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত 'দেশীয় ভাষা শিক্ষার স্কুল বা বাংলা পাঠশালাগুলো'তে সংস্কৃত প্রধান বাংলা শিক্ষা দেয়া হত। পাঠ্য-পুস্তকের অধিকাংশ লেখা ছিল হিন্দু দেব-দেবীদের পৌরাণিক কাহিনীতে ভরপুর। ছাত্রদের জন্য শ্রেণীকক্ষে স্বরস্বতী বন্দনা শিক্ষা করা ছিল বাধ্যতামূলক। ইংরেজদের শিক্ষানীতি সম্পর্কে হান্টার যে অভিমত ব্যক্ত করেন তাতে প্রতীয়মান হয় যে, ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা হিন্দুদেরকে শতাব্দীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে তাদের নিষ্ক্রিয় জনসাধারণকে মহৎ জাতিগত প্রেরণায় উজ্জীবিত করে তুলতে পারলেও তা মুসলিমদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী, তাঁদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং তাঁদের ধর্মের কাছে ঘৃণার্হ। ইংরেজ প্রবর্তিত জনশিক্ষা ব্যবস্থা যেমন তাঁদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি, তেমনি তাঁদের নিজস্ব ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য যে আর্থিক সাহায্য এতকাল তাঁরা পেয়ে আসছিলেন, সেটাও ইংরেজগণ বিনষ্ট করেছে।[২২]

বস্তুতঃপক্ষে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রাষ্ট্রক্ষমতাচ্যুতি, ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলিম জমিদারীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস, ১৮২৮ সালের বাজেয়াপ্ত আইনের ফলে নিস্কর ভূমির রায়তিস্বত্ত্ব লোপ এবং ১৮৩৭ সালে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজীকে রাজভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান-পরপর এ চারটি বড় ধরনের আঘাতে পূর্ববর্তী মুসলিম শাসক শ্রেণী (বর্তমান শাসিত শ্রেণী) নিঃস্ব রিক্ত নিরক্ষর নিষ্ক্রিয় নির্জীব জাতিতে পরিণত হয়। ইংরেজদের প্রশাসনিক আইন ও শিক্ষানীতির ফলেই মূলতঃ এরূপটি হয়েছে। ফলে অভিজাত শ্রেণীটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কৃষক, শ্রমিক ও বিত্তহীন জনসাধারণ এসব আইনের অন্তর্ভূক্ত ছিলনা। তবে বণিক কোম্পানীর শোষণনীতি থেকে তারাও রেহাই পায়নি। ইংরেজ বণিকদের প্রবর্তিত ব্যবসায় নীতির ফল হিসেবে ১৭৭০ সালের (বাংলা ১১৭৬ সন) মহাদুর্ভিক্ষে বাংলা ও বিহারের প্রায় এককোটি পঞ্চাশ লাখ মানুষ প্রাণ

---

[২২] W.W. Hunter, The Indian Musalmans, op.cit., P. 171; মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

হারায়। ইংরেজ বণিকদের একচেটিয়া শোষণের বর্বরসুলভ মনোবৃত্তির অনিবার্য পরিণতি এই দুর্ভিক্ষ বাংলার ইতিহাসে এরূপ একটি নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছে, যা মানব সমাজের সমস্ত অস্তিত্বকাল ব্যাপী ব্যবসায় নীতির এই ক্রুর উদ্ভাবনী শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে; আর পবিত্রতম অলংঘনীয় মানবাধিকারসমূহের উপর কত ব্যাপক, কত গভীর ও কত নিষ্ঠুরভাবে অর্থ লালসার উৎকট অনাচার হতে পারে, এ নতুন অধ্যায়টি তারও একটি কালজয়ী নিদর্শন হয়ে থাকবে। ইতিহাসে এ ঘটনা 'ছিয়াত্তরের মম্বন্তর' নামে পরিচিত।[২৩] এতদ্ব্যতীত কোম্পানী এদেশের কুটির শিল্প ধ্বংস করেছিল বিদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য। কোম্পানীর বাণিজ্য নীতির ফলে তাঁতি সর্বস্বান্ত হয়। নীল চাষে বাধ্য করার ফলে কৃষকের সর্বনাশ ঘটে। এর উপরে রোগ ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে তারা একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়। অশিক্ষা ও দারিদ্র্য তাদের ঘোর অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয়। এটি ছিল হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত সিপাহীদের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ, তবে তাদের মদদ যুগিয়েছিলেন ইংরেজদের কৃপাদৃষ্টিবঞ্চিত কতিপয় ভারতীয় সামন্তপতি। সিপাহী বিপ্লবের অগ্নিশিখা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইংরেজরা কঠোর হস্তে তা দমন করেছিল। এতে চার কোটি টাকা ইংরেজরা রাজকোষ হতে ব্যয় করেছিল। মুসলিমদের রাজ্য হারানোর ক্ষোভই সিপাহী বিপ্লবের প্রধান কারণ বলে ইংরেজ সরকার মনে করল। তাই মুসলিমদের প্রতি তাদের মনোভাব আরও কঠোর হয়। পরিণতিতে মুসলিমগণ অধঃপতনের আরও একধাপ নীচে নেমে যান। হান্টারের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, একশ বছর আগে কোন মুসলিম ভদ্র পরিবার দরিদ্র ছিল একথা যেমন ভাবা যেতনা, ঠিক তেমনি বর্তমানে কোন ভদ্র মুসলিম পরিবার ধনী আছে একথা ভাবারও কোন সুযোগ নেই।

---

[২৩] মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৫৭ সাল হতে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এ একশ বছর মুসলিমগণ ছিল মূলতঃ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তথা কান্ডারী শূন্য। সংকট ও চ্যালেঞ্জের ক্রান্তিলগ্নে মুসলিম নেতৃত্বের এ চরম ব্যর্থতাই উনিশ শতকে মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতার মূল কারণ। মুসলিমদের মনোভাব ছিল অতীতমুখী। মুসলিমদের এই অবাস্তব মনোভাব সম্পর্কে সেকালের একজন মুসলিম বুদ্ধিজীবী আবদুল করিম একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাঁর ভাষায় : "An ancient and conquering race cannot easily divest itself of the traditions of its nobler days."[২৪] বস্তুতঃ এ ধরনের চিন্তা-চেতনা মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতির পক্ষে মোটেই সহায়ক ছিলনা। সালাহ্উদ্দীন আহমদের বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, আঠারো শতকে মুসলিম রাজশক্তির অবক্ষয় ও পতন গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যে মুসলিম নেতৃত্ব পরিলক্ষিত হয় সেটাকে অতীতের রেশ বলে ধরে নেয়া যায়। সেই নেতৃত্ব ছিলো মুসলিম রাজশক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেই রাজশক্তি যখন ভেঙে পড়লো তখন ঐ রাজশক্তির উপর নির্ভরশীল আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোতেও ভাঙন দেখা দিলো। উনিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত নতুন ইংরেজ শাসকরা নিজেদের স্বার্থে এদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্বন করে ঐ পুরনো ব্যবস্থাকে কৃত্রিমভাবে টিকিয়ে রেখেছিলো। এর ফলে মুসলিমদের মধ্যে নিজেদের অবস্থানের নিরাপত্তা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা জন্মায় এবং তারা আত্ম-গৌরব নিয়ে বিভোর হয়ে থাকে। এই নেতিবাচক মনোভাব গোটা মুসলিম সমাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছিলো।

অন্যদিকে হিন্দুরা বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বুঝতে পেরেছিলো হাওয়া কোন্ দিকে বইতে শুরু করেছিলো। সে অনুযায়ী তারা তাদের মনোভাব ও কর্মপন্থাকে সংশোধন করে অনেক লাভবান হয়েছিলো। নতুন যুগের নতুন চিন্তাধারা এবং কর্মকান্ডের ফলে যে সুদূরপ্রসারী ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল সে সম্বন্ধে

---

[২৪] Abdul Karim, Muhammadan Education in Bengal, Calcutta, 1900, P.6.

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণতঃ মুসলিমরা কোনো ধারণাই করতে পারেনি। তারা অতীত গৌরবের স্বপ্ন নিয়ে বিভোর থেকেছে; সমকালীন পরিস্থিতির রূঢ় বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারেনি।[২৫] ব্রাডলী-বার্টের বর্ণনা মতে, এ সময় মুসলিম সমাজ 'অবনতি ও অবক্ষয়ের গভীরতম স্তরে' পৌঁছেছিল।[২৬] হান্টারের মতে, বাংলার মুসলিমদের অবণতির কারণগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

ক) রাজ্য হারিয়ে মুসলিমগণ সকল ধরনের রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়েছে; এর নেপথ্যে বৃটিশ সরকারের নীতি কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে।

খ) শাসক শ্রেণী হিসেবে নিস্ফল অহংকার ও অতীতমুখী চিন্তা-চেতনার ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে তারা খাপ খাওয়াতে পারেনি।

গ) বৃটিশ সরকার ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজীকে রাজভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও মুসলিমগণ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহী ছিল না, বরং এর প্রতি প্রথম দিকে বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিল। ফলে তাঁরা সরকারী চাকুরীসহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত ছিল।

ঘ) প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে বাঙালী মুসলিমগণ বাঙালী হিন্দুদের কাছে পরাজিত হয়েছে। কারণ হিন্দুগণ যত সহজে ও যত দ্রুত পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুধাবনে সক্ষম হয়েছিল, মুসলিমগণ তত সহজে তা বুঝতে সক্ষম হয়নি।

ঙ) বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত জনশিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষার কোন স্থান ছিলনা। ফলে মুসলিমগণ ইসলামী মূল্যবোধ ও চিন্তা-চেতনা বহির্ভূত এ আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিল।[২৭] এছাড়া The Moslem Chronicle-এ জনৈক প্রবন্ধকার মুসলিমদের পতনের কারণ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে নিম্নোক্ত তিনটি কারণসহ হান্টারের ন্যায় প্রায় একই ধরণের কারণ উল্লেখ করেছেন ঃ

---

[২৫] আমাদের রেনেসাঁ ভাবনা, পৃ ঃ ৮।

[২৬] F.B. Bradely-Birt, Twelve Men of Bengal in the Nineteenth Century, Calcutta, 1910, P. 11.

[২৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে, W.W. Hunter, op. cit., Chapter 4.

Dhaka University Institutional Repository

১। সরকারী চাকুরীসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা হারিয়ে মুসলিমদের অনেকেই পেশা হিসেবে কৃষিকে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে এক্ষেত্রেও তারা উন্নতি করতে পারেনি।

২। অর্থকরী ব্যবসায় তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে সুদের ব্যবসায় হারাম বিধায় মহাজনী ভূমিকায়ও তাঁরা কখনও অবতীর্ণ হয়নি। ফলে অর্থনৈতিক দৈন্যদশায় পতিত হয়।

৩। বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতার জন্য তাঁরা গরীব হয়ে পড়ে।[২৮]

Syed Ameer Ali-এর বিবরণ হতে জানা যায় যে, ইংরেজ কোম্পানীর দিওয়ানী লাভের পরও কিছু সময় মুসলিমদের রাজনৈতিক মর্যাদা অক্ষুন্ন ছিল, তবে লর্ড কর্নওয়ালিসের রাজস্বনীতি ও লর্ড বেন্টিংক-এর শাসননীতির ফলে মুসলিম সম্প্রদায় চরম দারিদ্রের মধ্যে নিপতিত হয়েছিল। তদুপরি ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব ও আধুনিক শিক্ষার প্রতি অনীহার ফলে চাকুরীর ক্ষেত্রে তাঁরা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনি। অবশ্য কোনে কোনো ক্ষেত্রে আমলাদের ষড়যন্ত্র ও মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক ছিল।[২৯]

'হিন্দু-মোসলমান' (১৮৮৮) পুস্তকে শেখ আবদোস সোবহান বাংলার মুসলিম জমিদারদের পতনের কারণ হিসেবে তাঁদের বিলাসিতা, ভোগলিপ্সা, দায়িত্বহীনতা ও শিক্ষার প্রতি অমনোযোগিতার কথা বলেছেন। তিনি মুসলিম জমিদারদের উপদেশ দিয়ে বলেছেন :

> "এখনও কি বিলাস করিবার আমিরী করিবার দিবারাত্রি পড়িয়া পড়িয়া নিদ্রা যাইবার সময় আছে? ... মোরগ লড়ান কবুতর উড়ান ইত্যাদি কুক্রীড়া সকল ত্যাগ করুন। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে, বুঝিতে পারিবেন, আপনি এত ঋণী কেন। ... গাঁজা, আফিম, মদ, বেশ্যা যদি কিছু অভ্যাস করিয়া থাকেন, শীঘ্র শীঘ্র ত্যাগ করিয়া, বিষয়কার্য্যে মন দিউন, ... অশিক্ষিত মুর্খ মদ্যপায়ী, বিলাসী, লম্পট, মোসাহেব

---

[২৮] The Moslem Chronicle, 23 May 1896 (Supplementary).

[২৯] Syed Ameer Ali, Memorial of the National Mahomedan Association, Calcutta, 1882.

Dhaka University Institutional Repository

ইয়ার, পূর্ণ অসভ্য, পূর্ণ চাষা, খানসামা, খেদমতগার লাঠিয়াল ত্যাগ করুন। কু লোকের সংসর্গে আলাপে মস্তিষ্ক বিগড়াইয়া যায়। ... পরিশ্রম করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব বাঙ্গালা শিক্ষা করুন এবং পরিবারস্থ ছেলে-পিলেদিগকে জাতীয় বিদ্যা এবং রাজভাষার (ইংরাজির) সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা শিক্ষা দিউন।"[৩০]

নওশের আলী খান ইউসুফজায়ী 'বঙ্গীয় মুসলমান' (১৮৯০) গ্রন্থে বাংলার মুসলিম জমিদারদের অকর্মণ্যতা, ভোগ বিলাসিতা, আভিজাত্যগর্ব ও শিক্ষা বিমুখতার কথা উল্লেখ করে তাঁদের পতনের চিত্র অংকন করেছেন।[৩১] ইসলাম-প্রচারক-এ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের বর্তমান অবনতির কথা বলা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে উন্নতির উপায় সম্পর্কেও মতামত প্রদান করা হয়েছে। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ উল্লেখ করেছেন যে, বাঙালী মুসলিম রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাহিত্যিক সকল ক্ষেত্রেই পশ্চাদ্‌পদ। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভেদ, দূরত্ব এবং সহানুভূতিহীনতার জন্য সমাজের দুর্গতি বাড়ছে। সৈয়দ এমদাদ আলী আদর্শ নেতার অভাব, সমাজের মানুষের অজ্ঞানতা ও অশিক্ষা, ধর্মহীনতা, ভোগাসক্তি, অন্তর্বিবাদ ইত্যাদিকে মুসলিম সমাজের অধঃপতনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, সমাজের অবনতির গতিরোধ করার একমাত্র উপায় যোগ্য ও আদর্শবান নেতার নেতৃত্ব। প্রকৃত নেতার অভ্যুদয় ব্যতীত কোনও পতিত জাতির বা সমাজের উন্নতি হতে পারেনা । সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী 'বিলাপ' নামক কবিতায় বিশ্ব-মুসলিম সমাজের যে অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরেছেন, তা বাংলার মুসলিম সমাজ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তাঁর মতে, দারিদ্র্য, অনৈক্য ও অন্তর্কলহ, রিপু পূজা, মূর্খতা, ধর্মহীনতা, অকর্মণ্যতা, নেতৃত্বের অভাব, পরাধীনতা, নীতিহীনতা ও হীনমন্যতাবোধ সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে। এগুলি দূর করতে না পারলে সমাজের উন্নতি অসম্ভব।[৩২]

---

৩০ শেখ আবদোস সোবহান, হিন্দু-মোসলমান, ভিক্টরিয়া প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৮, পৃঃ ৭৮-৯৭; উদ্ধৃত : ডঃ ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ১৯-২০।

৩১ বঙ্গীয় মুসলমান, হিন্দু প্রেস, কলিকাতা, ১২৯৭/১৮৯০; ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০।

৩২ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য : ইসলাম-প্রচারক, জুলাই-আগষ্ট, ১৯০৩; মার্চ-এপ্রিল, ১৯০৩; জানুয়ালী-ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩; ড. ওয়অকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০-২১।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে যোগ্য নেতা ও ব্যক্তির অভাব অনুভব করে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন কবি কায়কোবাদ। 'মহাশ্মশান' (১৯০৪) কাব্য গ্রন্থখানা উৎসর্গ করবেন, এমন কোন যোগ্য ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব তাঁর নজরে পড়েনি বিধায় তিনি একই সাথে নিরাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হতেই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে উঠে। তিনি বলেন :

> "এই সুবিশাল বঙ্গভূমির যেদিকেই চক্ষু সঞ্চালন করি, সেইদিকে সেই একই দৃশ্য। ...সকলেই নিজকে নিজে লইয়া ব্যস্ত; কেহই পরের দিকে-পরের অশ্রুসিক্ত মলিন মুখের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহেনা, দেখিয়াও দেখেনা, সেই হা-হুতাশপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়াও শোনেনা। হায়, দেখিয়া আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়খানি নিরাশার তীব্র নিস্পেষণে শতধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু একটি লোকও আমার মনের মত মিলিল না। দুঃখ হইল, ঘৃণা জন্মিল; বাঙ্গালী জন্মে ধিক্কার দিয়া আমার এই ভগ্ন হৃদয় শান্তি লাভ করিল।"[৩৩]

শেখ ফজলল করিম পতিত সমাজের উন্নতির উপায় প্রসঙ্গে বলেছেন :

> "শিক্ষার অভাবে লোকের রুচি, সভ্যতা ও অবস্থা এত অধোগামী হইয়াছে যে, আমরা এই দেশের সিংহাসন হইতে নামিয়া এই দেশেই মজুরি খাটিতেছি। যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে অশিক্ষা, ধর্মহীনতা ও আদর্শের অভাবে আমাদের এই কুফল ফলিয়াছে। ... আমরা অকূল সমুদ্রের মধ্যে কর্ণধারহীন জীবন-তরীর অলক্ষ্য পরিচালনা করিতেছি। আমাদের অবলম্বন কিছুই নাই। আমরা চাই সহৃদয়তা সাহায্য উপদেশ, আমরা চাই প্রতিকারের ঔষধ। ... জাতীয় একতার অভাবে সামাজিক বীর্যে যে তিমিরাবরণ পড়িয়াছে তাহা আমাদের পাভু কলুষিত নেত্রের পক্ষে কম কুহেলিকাচ্ছন্ন নহে। আমরা যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া জাগিয়া উঠি-কর্মসাধনের পথের কঠোর বিপত্তিরাশি অতিক্রমের জন্য সচেষ্ট হই, তবে উন্নতি কত দূরে?"[৩৪]

নবনূর পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী তাঁর সম্পাদকীয় বক্তব্যে মুসলিমদের পশ্চাদ্পদতার বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং পতিত মুসলিম

---

৩৩ কায়কোবাদ, মহাশ্মশান, ১৯০৪, উৎসর্গ পত্র দ্রষ্টব্য।
৩৪ ইসলাম-প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল, ১৯০৩।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের উন্নয়নের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে সাহিত্যচর্চার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৩৫] কাজী ইমদাদুল হকের মতে, আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাই মুক্তির পথ।[৩৬]

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হারিয়ে মুসলিমগণ বিভিন্ন দিক থেকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, ক্রমান্বয়ে তারা পতনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অবর্তমানে সঠিক দিকনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত ছিল। পক্ষান্তরে যাঁরা পতনের বিভিন্ন কারণগুলো আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন এবং উত্তরণের কথাও বলেছেন, তাঁরা সামাজিকভাবে কিছুটা সচেতন হয়ে উঠেছেন বটে, কিন্তু পতনশীল সমাজের উন্নতি বিধানকল্পে সুনির্দিষ্ট কোন কর্মসূচী দিতে তাঁরা তখনও সক্ষম হননি। কারণ সমাজের ত্রিশংকু অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য যেরূপ ত্রিমুখী সাঁড়াশি আক্রমনের প্রয়োজন ছিল, মুসলিম নেতৃবৃন্দ তখনও সেরূপ শক্তির অধিকারী হতে পারেননি। ফলে মুসলিম জাগরণ বিলম্বিত হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের গতি ছিল ভিন্নমুখী এবং অবস্থা ছিল অন্য রকম। এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শুরু থেকেই তারা ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করতে শুরু করে এবং অত্যন্ত উৎসাহের সাথে ইংরেজী শিখতে শুরু করে। ফলে তারা ইংরেজ সরকারের পূর্ণ আস্থা অর্জন করে, পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করে এবং ইংরেজী শিক্ষা করার সুবাদে চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলিমদের তুলনায় অনেক বেশী সুবিধা পায়। তারা পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয় এবং সমকালীন ইউরোপীয় চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে হিন্দু সমাজে ক্রমান্বয়ে নূতন ভাবধারার বিকাশ ঘটতে থাকে এবং তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, যা হিন্দু সমাজের অগ্রগতিকে অনেকখানি ত্বরান্বিত করে। পরবর্তী আলোচনা হতে তা আরও সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

---

[৩৫] নবনূর বৈশাখ ১৩১০, সূচনা (সম্পাদকীয় বক্তব্য)।
[৩৬] নবনূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) বাংলায় হিন্দু জাগরণের পটভূমি

উনিশ শতকে বাংলার ইতিহাসের একটি গুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন বা হিন্দু জাগরণ, যা ধর্ম ও সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন এনেছিল। আধুনিক ইউরোপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঙালী হিন্দুরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো যে, তারা পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে মোটেও সক্ষম নয়। তাই সমসাময়িক পরিস্থিতিতে যতটুকু সম্ভব পরিবর্তন ও আধুনিকায়নের সপক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা তাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়লো।

বাংলায় হিন্দু জাগরণের প্রধান দু'টি পর্যায় ছিল- ১. ব্রাহ্ম আন্দোলন এবং ২. নব্য হিন্দু আন্দোলন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম আন্দোলন ছিল হিন্দু বহুত্ববাদের বিপরীতে একটি একেশ্বরবাদী চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে নব্য হিন্দু আন্দোলন ধর্মীয় বহুত্ববাদের বিপরীতে একটি সর্বেশ্বরবাদী চ্যালেঞ্জ, যা নতুন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা ও অন্তহীন বাক-বিতন্ডার পরিবর্তে ঐক্য ও পুনরুজ্জীবনের আহবান জানায়।

১. ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ সাল)। তাঁর ইচ্ছা ছিল হিন্দু ধর্মকে একটি একেশ্বরবাদী ধর্মে রূপান্তরিত করা। এ প্রসঙ্গে Priti Kumar Mitra বলেন :

> "His (Rammohan Roy) Commitment to monotheism had its origins probably in his early acquaintance with Islam through a Perso-Arabic education. His simultaneous instruction in the Sanscrit lore only made him discriminate the monotheistic element from everything else in Hindu theology and philosophy. His conviction was further strengthened through a more significant exposure to Christianity and Western thought mainly in the context of his employment (1805-14) under and friendship with John Digby, a district collector, who apparently trained him in the English language."[১]

---

[১] Priti Kumar Mitra, 'Religious Reform Movements of the Hindus', History of Bangladesh : 1704-1971, Edited by Sirajul Islam, Vol. Three, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1992, P. 301.

Dhaka University Institutional Repository

রাম মোহন রায় ১৮০৪ সালে 'তুহ্ফাৎ উল্ মুওয়াহ্হিদীন' (একত্ববাদীদের জন্য উপহার) নামক আরবী (ভূমিকা অংশ) ও ফার্সী (মূলগ্রন্থ) ভাষায় রচিত গ্রন্থে বিশুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক একেশ্বরবাদ সম্পর্কে তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ১৮১৫ হতে ১৮১৯ সালের মধ্যে তিনি বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দুস্থানী ভাষায় বেদান্ত বিষয়ক ৮ খানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এসব লেখার মধ্যদিয়ে রামমোহন হিন্দু বহুদেববাদের বিরুদ্ধে এক হুমকী হয়ে দেখা দেন। এসব লেখার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এই যে, বেদান্ত একটি বিশুদ্ধ ও একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রণালী শিক্ষা দেয় এবং এটিই হিন্দু শাস্ত্রসমূহের একমাত্র অভ্রান্ত অংশ। প্রচলিত ধর্ম মতের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের বিপক্ষে ধর্মনিষ্ঠদের প্রতিক্রিয়া ছিল তাৎক্ষণিক ও প্রচন্ড। রামমোহনের নব্যমত উচ্ছেদ করে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও উপাসনা পদ্ধতিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে একের পর এক লেখনীসহ এগিয়ে আসেন সাতজন নিষ্ঠাবান হিন্দু, যাঁদের বেশীর ভাগই ছিলেন শাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ। তাঁদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে রামমোহন প্রত্যেকের জন্য একখানি প্রত্যুত্তর প্রকাশ করলেন।[২]

অদ্বৈতবাদী ও বহুদেববাদী ব্রাহ্মণদের মতোই ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানদের কাছেও রামমোহনের একেশ্বরবাদ সমান বিসদৃশ লেগেছিল। Precepts of Jesus : The Guide to Peace and happiness (1820) [যীশুর অনুশাসনসমূহ : শান্তি ও সুখের পথনির্দেশক (১৮২০)] শীর্ষক গ্রন্থে বাইবেলের New Testament এর মূল্যায়ন করতে যেয়ে তিনি নৈতিক অনুশাসনগুলিকে 'Liable to doubts and disputes of free-thinkers'[৩] শীর্ষক শিরোনামে আলাদাভাবে উপস্থাপন করেন। এতে কলকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুরে অবস্থানরত ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীরা প্রচন্ড আঘাত পান এবং তাঁর আক্রমণ থেকে নিজেদের বদ্ধবিশ্বাস (dogma)-কে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেন। ফলে যে বিতন্ডা শুরু হয়, তা প্রায় চার বছর (১৮২০-২৪) চালু থাকে এবং সে সময়ে প্রিসেপ্ট-এর বিরুদ্ধে মিশনারীদের প্রতিক্রিয়ার জবাবে রামমোহন রায় প্রায় ছয়শ পৃষ্ঠা ব্যাপী তিনখানা 'Appeals to Christian Public' রচনা করেন।

---

২ Priti Kumar Mitra, Ibid, P. 302.
৩ The English Works of Raja Rammohan Roy, Allahabad, 1906, P. 484

Dhaka University Institutional Repository

১৮১৫ সালে তিনি 'আত্মীয় সভা' নামে এক আলোচনা-গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২১ সালে তিনি স্থাপন করেন 'Unitarian Committee', যা ভারতে একেশ্বরবাদ প্রচারে অবদান রেখেছিল। অতঃপর ১৮২৮ সালে তিনি স্থাপন করলেন 'ব্রাহ্ম সমাজ' বা 'ব্রাহ্মসভা', যা সকল ধর্মাবলম্বী একেশ্বরবাদীদের মিলন কেন্দ্র ও অসাম্প্রদায়িক উপাসনার মঞ্চ হয়ে উঠেছিল। এর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ১৮৩০ সালে রাধাকান্ত দেবের উদ্যোগে স্থাপিত হয় নিষ্ঠাবান হিন্দুদের 'ধর্মসভা'।

রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধুর ছেলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজে লেখাপড়া করেন এবং পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়নের ফলে সন্দেহ ও অতৃপ্তিতে ভোগতে থাকেন, যা পরিণামে রামমোহন সম্পাদিত 'ঈশোপনিষদ'-এর 'একটি উড়ন্ত ছেঁড়া পাতা' পাঠে দূর হয়। ফলে নিজের স্থাপিত তত্ত্ববোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তভিত্তিক একেশ্বরবাদ প্রচার করতে থাকেন এবং ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর তিনি ২০ জন সঙ্গীসহ রামমোহনের মতাদর্শ গ্রহণ করেন এবং রামমোহন প্রবর্তিত ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তিনি ক্রমান্বয়ে ঐ আন্দোলনকে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মের রূপদান করেন, যে ধর্মের একটি পৃথক নাম (ব্রাহ্মধর্ম), এক গুচ্ছ মূল বিশ্বাস (ব্রাহ্মধর্ম বীজ), একটি উপাসনা পদ্ধতি, একটি ধর্মগ্রন্থ (ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থ), নিজস্ব উৎসব ও অনুসারীদের একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ ক্রমান্বয়ে প্রসার লাভ করছিল।

কেশব চন্দ্র সেন ১৮৫৭ সালে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়ে অতিদ্রুত দেবেন্দ্র নাথের প্রধান সহকর্মী হয়ে উঠেন এবং 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি লাভ করেন। অসাধারণ বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেন তাঁর প্রাণবন্ত তারুণ্য ও গতিশীল ব্যক্তিত্বের দ্বারা ব্রাহ্ম, হিন্দু ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের জনসাধারনকে এবং একই সাথে বৃটিশ শাসকদেরও সমভাবে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এতদ্ব্যতীত তরুণদের আকৃষ্ট করার জন্য তিনি কয়েকটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, দু'টি সাময়িকী সম্পাদনা করেন এবং স্বীয় ধর্ম সংরক্ষণে খৃষ্টান মিশনারীদের সাথে বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দ মোহন বসু এবং গিরিশচন্দ্র সেনের মত

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষিত হিন্দু তরুণেরা দলে দলে কেশবের আন্দোলনে যোগ দেন। এসব উদ্যমী অনুচরকে নিয়ে তিনি উত্তরোত্তর সাফল্যের শিখরে আরোহন করতে সক্ষম হন।[৪]

কয়েক বছরের মধ্যে ব্রাহ্ম আন্দোলন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে সমগ্র বৃটিশ ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ও ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পায়। রমেশ চন্দ্র মজুমদারের দেয়া তথ্য হতে জানা যায় যে, ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ১৮৪৯ সালে ছিল ৫০০, যা ১৮৬৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০-এ উন্নীত হয়। অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা ১৮৫৮ সালে ছিল ১১টি, যা ১৮৭৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১২৪ টিতে দাঁড়ায়। এতদ্ব্যতীত ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় ব্রাহ্মদের একুশটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[৫]

উক্তসব কৃতিত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের মধ্যেও ব্রাহ্ম-আন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হল, যখন সমাজ সংস্কার ও ব্রাহ্মসমাজের গণতন্ত্রায়নের প্রশ্নে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র পরস্পর দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হলেন। কেশবচন্দ্র যুক্তি ও বিবেকের অনুশাসনকে শাস্ত্রের উপর স্থান দিলেন। পক্ষান্তরে দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রকেই কর্তৃত্বের উৎস হিসেবে বিবেচনা করতেন। প্রধানতঃ যুক্তির ভিত্তিতেই কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুসারীগণ জাতিভেদ ও পর্দাপ্রথা বিলোপ, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার প্রভৃতি সংস্কার চালু করার মনস্থ করলেন। তাঁরা আরো ভাবলেন, ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় পৌরহিত্যে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের অবসান হোক এবং সমাজে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি চালু হোক।[৬] তবে দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁর অনুসারীদের নিকট এগুলো গ্রহণযোগ্য ছিলনা। ফলে ব্রাহ্মসমাজে দ্বিধা বিভক্তি দেখা দিল। ১৮৬৬ সালের নভেম্বর মাসে কেশবচন্দ্র 'ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করলেন। অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন পুরনো সমাজ, যা 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে

---

[৪] সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), তৃতীয় খন্ড (সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ২৬৪।

[৫] রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ১৭২।

[৬] রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৩-৭৪; বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : Sivnath Sastri, History of the Brahmo Samaj (1911-12), 2nd ed., Calcutta, 1974, PP. 96-115.

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিত, তা একটি নিছক উপাসক গোষ্ঠীতে পর্যবসিত হল এবং তাদের কোনো সামাজিক, শিক্ষা ও ধর্ম প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রম অবশিষ্ট থাকলো না ।[৭]

প্রীতি কুমার মিত্রের বিবরণ হতে জানা যায় যে, ১৮৭২ সালের সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্টের পরিপ্রেক্ষিতে যখন আত্ম-পরিচয়ের মূল প্রশ্নটি সামনে এলো,তখন কেশব চন্দ্র ও তাঁর অনুসারীরা নিজেদেরকে অহিন্দু বলে ঘোষণা করলেন । এভাবে সাংস্কৃতিক ও জাতীয় মূলধারা থেকে তাঁরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিলেন । তাছাড়া অবতার, প্রত্যাদেশ ইত্যাদি কতিপয় বৈষ্ণবীয় বিশ্বাস ও আচরণ গ্রহণ করে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম একেশ্বরবাদ থেকেও যথেষ্ট দূরে সরে গিয়েছিলেন । ফলে তাঁর তরুণ অনুসারীদের মধ্যে অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পেতে লাগলো । এ প্রক্রিয়ার চরম পরিণতি দেখা গেল ১৮৭৮ সালে সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত কুচবিহার বিবাহের সময় । নিজ ধর্মের অনুশাসন এবং ১৮৭২-এর সিভিল ম্যারেজ আইন (যে আইন পাশ করানোর জন্য কেশব চন্দ্র সংগ্রাম করেছিলেন)-এ দু'টোই লংঘন করে কেশব তাঁর নাবালিকা কণ্যার বিয়ে দিলেন কুচবিহারের অপ্রাপ্ত বয়স্ক মহারাজার সাথে হিন্দু অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, যা ছিল ব্রাহ্ম বিবেচনায় পৌত্তলিকতার নামান্তর । এর চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার হলো- কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের আদেশ পেয়েছেন বলে দাবী করে তাঁর আদর্শচ্যুতিকে বৈধ করার প্রয়াস পেলেন । এর অবশ্যম্ভাবী পরিনতি হিসেবে তাঁর সম্প্রদায় আবারো দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল এবং বিদ্রোহীরা ১৮৭৮ সালের মে মাসে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করলেন । এ ঘটনার পর কেশব তাঁর ধর্মমতকে ঢেলে সাজিয়ে 'নব বিধান' নামে এক সমন্বিত ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করলেন, যার মধ্যে বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্ম থেকে নেয়া উপাদানসমূহের সাথে সক্রেটিস, কার্লাইল, এমার্সন প্রমুখ ব্যক্তিত্বের শিক্ষার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হয়েছিল । এই নতুন ধর্মমতকে যতই বিশ্বজনীন ও নানা সূত্রজাত মনে হোক না কেন, এখানেও রাজনৈতিক আনুগত্যের নীতি এবং খৃষ্টীয় বিশ্বজনীনতার নামে ভারতে বৃটিশ

---

[৭] অজিত কুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৬), ১৫০তম জন্ম বার্ষিকী সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ৩৭২-৭৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

শাসনের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের চেষ্টার প্রতিফলন ছিল।[৮] এ প্রসঙ্গে New Dispensation-এ বলা হয়েছে-

> "It is Christ who rules British India, and not the British government. England has sent out a tremendous moral force in the life and character of that mighty prophet, to conquer and hold this vast empire. None but Jesus ever deserved this bright, this precious diadem, India and Jesus shall have it."[৯]

২. বস্তুতঃপক্ষে কেশব চন্দ্র সেন উনিশ শতকে বাংলায় হিন্দু জাগরণের ইতিহাসে এক কালবিরুদ্ধতার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ফলে ১৮৮৪ সালে তাঁর অকালমৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর ধর্মমত ও অনুসারী দলটি ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ল। ব্রাহ্মধর্ম ছিল চিরায়ত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিদ্রোহ এবং এই চ্যালেঞ্জ তথা খৃষ্টান মিশনারীদের চ্যালেঞ্জ শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশে সনাতনী হিন্দুদের মধ্যে এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব ঘটায়। এ ঘটনা 'নব্য হিন্দু আন্দোলন' নামে পরিচিত। এটি কোন সরাসরি প্রতিক্রিয়া ছিল না, বরং কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারও এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। সাধারণ হিন্দু ছাড়াও দেবেন্দ্র নাথের নেতৃত্বাধীন আদি ব্রাহ্মরা এবং এমনকি 'হিন্দু ক্যাথলিক' ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও নব্যহিন্দু আন্দোলনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখেন। প্রকৃতপক্ষে আদি ব্রাহ্মরাই ষাটের দশকের শেষাংশে এবং সত্তরের দশকের প্রারম্ভে আন্দোলনটির সূচনা করেন। পরে হিন্দু সংস্কারক গোষ্ঠীগুলির অভ্যুদয় হয়।

রাজ নারায়ণ, দেবেন্দ্রনাথ ও নবগোপাল -এ তিনজন আদি ব্রাহ্মনেতা অনেকটা আত্ম-পরিচয়ের সংকটজাত রাজনৈতিক তাগিদেই নব্যহিন্দু আন্দোলন শুরু করেন। অচিরেই ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর মত যোগ্য হিন্দু

---

[৮] সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৫-৬৬।

[৯] New Dispensation, quoted in F. Max Muller, Rammohan to Ramakrishna (1884-99), Calcutta, 1952, P. 62; Also quoted in Sirajul Islam (ed.), History of Bangladesh, Vol. 3, op. cit., P. 308.

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটে, যারা এ আন্দোলনের নেতৃত্বদানে এগিয়ে আসেন। বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) তাঁর মাসিক বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১৮৭৩ সালের মার্চ মাসে 'রাজ নারায়ণ ভারতে শক্তিশালী ও নতুন তেজে উদ্দীপ্ত এক হিন্দুজাতির যে কল্পনা করেছিলেন', তার বিশেষ প্রশংসা করেন।[১০] হিন্দু ধর্মের রাজনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কিত রাজনারায়ণের অন্তর্দৃষ্টি বঙ্কিম গ্রহণ করেন এবং সাথে সাথে বঙ্গদর্শন-এর পাতায় যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতের অতীত পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। ধারাবাহিক নিবন্ধমালায় বঙ্কিম ও তাঁর সহযোগীরা যেসব হিন্দু রাজা মুসলিম আক্রমণকারীদের গতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাদের কাপুরুষত্বের কলঙ্ক মোচন করতে সচেষ্ট হন এবং প্রাচীন কালের হিন্দুদের গুণাবলী তথা চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের মহিমা কীর্তন করেন। পাশাপাশি তাঁরা প্রাচীন ভারতীয়দের বিভিন্ন ব্যর্থতার কথাও যথারীতি আলোচনা করেন।

উক্ত সব বিষয়ের মধ্যে একটা জাতীয়তাবাদী সুর বিদ্যমান ছিল এবং ১৮৭০-এর দশকে সংবাদপত্র, সভা-সমিতি ও নাটকের মাধ্যমে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের যে ঐকতান চলছিল তার সাথে তাল মিলিয়ে বঙ্কিমের হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা একটি স্বদেশ প্রেমের ধারায় অগ্রসর হতে থাকে। ১৮৭৫ সালে রচিত সংস্কৃত-বাংলা গান 'বন্দে মাতরম্' (মাতাকে বন্দনা করি) এর মাধ্যমে বঙ্কিম বাংলা মাকে 'সর্বশক্তির আধার' দুর্গাদেবী হিসেবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এ ধারণাটি ভূদেব মুখোপাধ্যায় একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা করেন। ভূদেব তাঁর 'পুষ্পাঞ্জলি'-তে মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে বর্ণনা করেন এক অনন্য দেবীরূপে, যিনি সতত তাঁর অসংখ্য সন্তানকে অন্নদান করে চলেছেন।[১১]

ভূদেব পুরাণের গুরুত্ব, সকল সৃষ্টির একত্ব, মানুষের দেবত্ব ও বিশ্বে পরিবর্তনের বৃত্তাকার বিন্যাসের প্রতি জোর দিয়ে নব্যহিন্দু ধর্মমতের ভিত্তি স্থাপন করলেন। পরে এ ধারণাগুলো সুসংসহত করে তিনি তাঁর সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২)

---

[১০] বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাসিক বঙ্গ দর্শন, মার্চ ১৮৭৩; সহ দ্রঃ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৮।

[১১] ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'পুষ্পাঞ্জলি', ভূদেব রচনাসম্ভার, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, ৩য় পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ ৩৮১।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থের নিবন্ধমালায় আরো সার্থকভাবে উপস্থাপন করেন। এখানে তিনি উপনীত হন এক বিশাল সর্বেশ্বরবাদে, যা ভবিষ্যতের ঐক্যবদ্ধ মানবজাতির জন্য ধর্ম সমন্বয়ের প্রাকৃতিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।[১২] ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পুষ্পাঞ্জলি' বঙ্কিম চন্দ্রের মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলে তিনি মন্তব্য করেন যে, হিন্দুদের যেসব কাহিনীকে ইউরোপীয়রা উপহাস করে থাকেন, 'পুষ্পাঞ্জলি' প্রণেতার সহৃদয় আলোচনার ফলে সেগুলি থেকে এমনসব সিদ্ধান্ত বেরিয়ে এসেছে, যা মহত্ত্বে ও ঔজ্জ্বল্যে ইউরোপীয় সাহিত্যের কোন কিছুর চেয়েই হীন নয়।[১৩]

হিন্দু উপাসনা পদ্ধতিতে প্রতিমার ব্যহার এবং ব্রাহ্মণদের বেদান্ত দর্শনের প্রতি রেভারেন্ড ডব্লিউ. ডব্লিউ. হেস্টির আক্রমণের জবাবে বঙ্কিম তাঁর কথিত 'Rational Hinduism' (যুক্তিসিদ্ধ হিন্দুবাদ)-এর এক নতুন রূপরেখা উপস্থাপন করেন, যার মূল বক্তব্য হচ্ছে- প্রকৃতি ও পুরুষের দ্বৈততা এবং প্রেমের মাধ্যমে তাদের মিলন। এক্ষেত্রে বঙ্কিম চন্দ্র বিশ্ব-আত্মার প্রতীক হিসেবে কৃষ্ণের উল্লেখ করে তাঁকে এক ঐতিহাসিক মহামানব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং 'হিন্দুদের মধ্যে বিজ্ঞতম ও মহত্তম' বলে সনাক্ত করেন, যিনি ইতিহাসের ঊষালগ্নে ভারতে এক রাজনৈতিক ও নৈতিক ঐক্যের সূত্রপাত করেছিলেন।[১৪] কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতার সপক্ষে জোরালো যুক্তি দেখিয়ে বঙ্কিম তাঁকে বুদ্ধদেব বা যীশু খ্রীষ্টের মতো অত্যুচ্চ ব্যক্তিত্বের হিন্দু প্রতিকল্প হিসেবে উপস্থাপন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি কৃষ্ণকে একাধারে শাক্য সিংহ, যীশু খৃষ্ট ও রাম চন্দ্র বলে অভিহিত করেন।[১৫]

প্রীতি কুমার মিত্রের বিবরণ হতে জানা যায় যে, সমকালীন রাজনীতি সঞ্চারিত নব্য হিন্দুবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বৈষ্ণব ধর্মের পুনরুজ্জীবনের যে আন্দোলন চলছিল, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক কৃষ্ণ চরিত্রের পূনর্মূল্যায়নের ফলে তা আরো গতিশীল হয়। এ নব্য বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১-৯৯ সাল)। তাঁর অসংখ্য অনুসারীদের

---

[১২] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৪, ১৫৮, ২৬৩।
[১৩] দেখা যেতে পারে, স্টেট্স্‌ম্যান পত্রিকায় বঙ্কিমের চিঠি, (২৮ অক্টোবর ১৮৮২), পুনর্মুদ্রিত, বঙ্কিম রচনাবলী, ৩য় খন্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃঃ ২১২।
[১৪] 'কৃষ্ণ চরিত্র', বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে শীর্ষস্থানীয় চারজন নেতা আন্দোলনকে আরও গতিশীল করে তোলেন। এঁরা হচ্ছেন- বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনী কুমার দত্ত, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।[১৬] এঁদের মধ্যে অশ্বিনী কুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) উনিশ শতকের শেষ দিকে নব্য বৈষ্ণববাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

অশ্বিনী কুমারের তিন গুরুর মধ্যে রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-৮৬) নব্য হিন্দুবাদের প্রধান গুরু হিসেবে আবির্ভূত হন। উনিশ শতকের হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন ও জাগরণের ইতিহাসে তিনি অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি একজন মহান অধ্যাত্মবাদী ছিলেন এবং পৃথিবীর ধর্মসমূহের আধ্যাত্মিক অভিন্নতার উপর জোর দিয়ে তিনি প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব-সংহতির জন্য কাজ করেছিলেন। আর্নল্ড টয়েনবীর বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর ধর্মমতগুলির মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্য সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ যে সাক্ষ্য দেন, তার সঙ্গে সম্রাট অশোক ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার নীতি মিলে এমন একটি মনোভাব ও চেতনার সৃষ্টি করে, যা গোটা মানবজাতির পক্ষে একসাথে একটি পরিবাররূপে বেড়ে উঠা সম্ভব করে তুলতে পারে।[১৭]

সহজবোধ্য রূপক ও লোক কাহিনী ব্যবহার করে এবং উপস্থাপনায় সাধারণভাবে পুরাণের লৌকিক স্বাদ মিশিয়ে রামকৃষ্ণ ধর্মে প্রাণবন্ততা, মাধুর্য ও সৌন্দর্য নিয়ে আসেন, যা ব্রাহ্ম ও মিশনারী ঐতিহ্যে অজানা ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) এক নব্য বেদান্তের উদ্ভব ঘটিয়ে নব্য হিন্দুবাদের বিবর্তন সম্পূর্ন করেন। রামকৃষ্ণের অদ্বৈত বেদান্ত বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মেটালেও তখন তাঁর দেশ যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল, সে সম্পর্কে তাঁর যেসব প্রশ্ন ছিল সেগুলির জবাব দিতে পারেনি। এই অসম্পূর্ণতার মোকাবেলার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ

---

[১৫] 'ধর্মতত্ত্ব', বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৯৪।

[১৬] Sumit Sarkar, The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908, New Delhi, 1973, P. 28.

[১৭] Swami Gahananda, Sri Ramakrishna and His Unique Message, 3rd ed., London, 1970, P. viii (Foreword)

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য উৎসের দ্বারস্থ হন। এসব উৎসের অন্যতম ছিল বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা। এখানে তিনি দুঃখ-ক্লিষ্ট মানবজাতির জন্য করুনার সন্ধান পান। তাই তিনি সানন্দে প্রস্তাব দেন ঃ "তাহলে আসুন আমরা ব্রাহ্মণদের বিস্ময়কর মেধার সাথে ঐ মহানগুরুর (অর্থাৎ বুদ্ধের) হৃদয়, উন্নত আত্মা এবং বিস্ময়কর মানবিক শক্তির সংযোগ সাধন করি"।[১৮] অবশ্য এ যৌগিক বেদান্ত ইসলাম থেকেও 'শক্তি' আহরণের প্রয়াস পায়। ১৮৯৮ সালে জনৈক মুসলিম গুণগ্রাহীর কাছে বিবেকানন্দ এই অভিমত ব্যক্ত করেন ঃ

> "Without the help of practical Islam, theories of Vedantism, however fine and wonderful they may be, are entirely valueless to the vast mass of mankind.... For our own motherland a junction of the two great systems, Hinduism and Islam- Vedanta brain and Islamic body – is the only hope." [১৯]

এভাবে দেখা যায় যে, বেদান্তের বিশ্বজনীনতা, বৌদ্ধধর্মের মানবতা এবং ইসলামের শক্তি (অন্য কথায় ব্রাহ্মণ্য মস্তিষ্ক, বৌদ্ধ অন্তঃকরন এবং ইসলামের শরীর) সমন্বয়েই তৈরি হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের সমন্বয়মূলক ধর্ম। তাছাড়া খৃষ্টধর্মের প্রভাবও এতে ছিল। মূলতঃ স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালে যে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন তা ছিল খৃষ্টীয় গীর্জারই একটি প্রাতিষ্ঠানিক অনুকরণ। বিবেকানন্দের পরিকল্পনায় 'জড়বাদী' পাশ্চাত্যের রয়েছে ভারতের কাছ থেকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথনির্দেশ নেয়ার প্রয়োজন, আর ভারতকেও অবশ্যই পাশ্চাত্যের কাছ থেকে শিখতে হবে বিজ্ঞান এবং সমাজ প্রগতির কৌশল। এতে প্রতীয়মান হয় - ভারত ও পাশ্চাত্যের দুটো ভিন্ন ধরনের পরস্পর সম্পূরক সংকটে বিবেকানন্দ উভয়ের ত্রাণকর্তা হিসেবে অবস্থান নিয়েছেন।

---

[১৮] উদ্বৃত : অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকরীপ্রসাদ বসু ও শংকর, বিশ্ব-বিবেক, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ৪৪৫; সহ দ্রঃ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৯।

[১৯] Quoted by Priti Kumar Mitra, op. cit., P. 322.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এবং সর্বভারতীয় পর্যায়ে তথাকথিত চরমপন্থী রাজনীতির উপর নব্য হিন্দু আন্দোলনের গভীর প্রভাব পড়েছিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ এবং ভগিনী নিবেদিতার মতো চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ মুখ্যতঃ বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে স্বদেশী যুগের রাজনীতি ও চিন্তাধারায় প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ধর্মের ক্ষেত্রে নতুন কোন অবদান রাখেননি বললেই চলে।[২০] বলা বাহুল্য যে, বিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা সাহিত্যের উপর নব্য হিন্দু আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব ছিল এবং বিশ্বকবি রবী ঠাকুরের বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্যমও কিছু সময়ের জন্য এ আন্দোলন হতে যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছিল।[২১]

গোটা উনিশ শতক ব্যাপী পরিচালিত হিন্দু সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের দু'জন প্রধান সংস্কারক ছিলেন রামমোহন রায় ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁদের মধ্যবর্তী সময়ে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার কঠোর সমালোচক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল 'ইয়ং বেঙ্গল' দল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্মসমাজও সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল। অন্যদিকে নব্য হিন্দু আন্দোলন সমাজ-সংস্কারের পরিবর্তে সামাজিক পুনরুজ্জীবনের ধারণা প্রবর্তন করে।

সমগ্র উনিশ শতক ধরে হিন্দু সমাজসংস্কার আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল নারীজাতির মুক্তি। রামমোহন রায় তাঁর বিভিন্ন লেখায় হিন্দু মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার, শিক্ষার অধিকার ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং নিজেদের বিয়ের ব্যাপারে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। তবে নারীমুক্তির সপক্ষে রামমোহন বাস্তবে যে আন্দোলনটি পরিচালনা করেছিলেন তা হলো সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন। এর ফলে সরকারীভাবে ১৮২৯ সালের ডিসেম্বরে একটি আইন (Regulation XVII of 1829) পাশের মাধ্যমে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা হল। কিন্তু নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ ধর্মসভা (স্থাপিত ১৮৩০

---

[২০] Priti Kumar Mitra, Ibid, P. 325

[২১] এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখা যেতে পারে : সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮১।

Dhaka University Institutional Repository

সাল)-এর মাধ্যমে উক্ত আইনের বিরুদ্ধে দুটি আবেদন পেশ করেন যথাক্রমে গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এর নিকট ও লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে (৭ জুলাই, ১৮৩২)। অবশ্য দুটো আবেদনই উপেক্ষিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়।

১৮৩০ সালের নভেম্বরে রামমোহন বৃটেনের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করলে ডিরোজিওপন্থী 'ইয়ংবেঙ্গল' দল যুক্তিবাদের আলোকে প্রচলিত হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করলো। তাঁরা স্ত্রী শিক্ষার সমর্থন করলো, বাল্য বিবাহের বিরোধিতা করলো এবং হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনার পর এর সপক্ষে তাঁদের নিজস্ব প্রক্রিয়া Bengal Spectator-এ ১৮৪২ সালের এপ্রিল ও জুলাই মাসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশ করে।[২২] ১৮৪৩ সালের জানুয়ারীতে প্রকাশিত আরেকটি নিবন্ধেও বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত হিন্দু বিধি নিষেধের সমালোচনা করা হয় এবং এর সপক্ষে বক্তব্য প্রদান করা হয়।[২৩] ডিরোজীয়ানদের পদাংক অনুসরণ করে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) ১৮৫০ সালের আগষ্ট মাসে মাসিক সর্বশুভকরী পত্রিকায় 'বাল্য বিবাহের দোষ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং বাল্য বিবাহকে বাংলায় বালিকা বিধবার সংখ্যাধিক্যের একটি কারণ হিসেবে নির্দেশ করে তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় হিন্দু বিধবাদের দুর্দশার বিবরণ প্রদান করেন।[২৪] তিনি হিন্দু বিধবা বিবাহের অনুকূলে জোরালো বক্তব্য প্রদান করেন এবং এর সপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপন করেন। যেমন ঃ

> "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে।"[২৫]

---

[২২] নিবন্ধ দুটি সংকলিত, বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ৩য় খন্ড, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ৭৭-৮০, ৯০-৯২।

[২৩] অমর দত্ত, ডিরোজিও ও ডিরোজীয়ান্স্, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ৮১।

[২৪] সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৪।

[২৫] পরাশর সংহিতা, ৪ : ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ স্বামী নিরুদ্দেশ হলে কিংবা মারা গেলে অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করলে অথবা পুরুষত্বহীন হলে কিংবা সমাজচ্যুত হলে - এই পাঁচ প্রকার বিপত্তিতে স্ত্রীদের অন্য পতি গ্রহণ বিধিসম্মত ।[২৬]

প্রভাবশালী ব্রাহ্ম সাময়িকী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্তও বিধবা বিবাহের সমর্থনে এগিয়ে এলেন এবং এর সপক্ষে এক জোরালো সম্পাদকীয় লিখলেন (মার্চ ১৮৫৫) । অতঃপর বিদ্যাসাগর হিন্দু বিধবা বিবাহের জন্য অনুরোধ জানিয়ে সরকারের নিকট ১৮৫৫ সালের ৪ অক্টোবর আবেদন পেশ করলে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সরকার ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে এর সপক্ষে আইন পাশ করেন । বিদ্যাসাগর আইনটির বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিজ উদ্যোগে ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর মহা উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে প্রথম বিধবা বিবাহ সুসম্পন্ন করেন । এভাবে ১১ বছরে (১৮৫৬-৬৭) তিনি কমপক্ষে ৬০টি বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করেন এবং ৮২,০০০ রূপীর অধিক অর্থ ব্যয় করে নিজেকে অধিক পরিমাণ ঋণে জর্জরিত করে ফেলেন ।[২৭]

বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত আবেদন দাখিলের কিছুদিন পর (২৭ ডিসেম্বর ১৮৫৫) বিদ্যাসাগর বহু বিবাহ[২৮] নিষিদ্ধ করে আইন পাশের প্রার্থনা জানিয়ে সরকারের কাছে আরেকটি আবেদন পেশ করেন । এর পর হাজার হাজার লোকের স্বাক্ষর সম্বলিত আরো ১২৮টি আবেদনে ঐ একই প্রার্থনা জানানো হয় । ১৮৫৭ সালের গোড়ার দিকে সরকার Legislative Council-এ উপস্থাপনের জন্য একটি খসড়া বিল তৈরি করে । এ সময় সিপাহী বিপ্লব শুরু হয়ে গেলে এ বিষয়ে আর কোন অগ্রগতি হয়নি । ষাটের দশকের মধ্যভাগে বিষয়টি পুনরায় উত্থাপিত হয় কিন্তু কোন ফল হয়নি । তবে বিদ্যাসাগরের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা-

---

২৬ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৫; বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭ ।

২৭ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, ২৮৬ ।

২৮ ঐ সময় কুলীন ব্রাহ্মণেরা চল্লিশ, পঞ্চাশ বা ততোধিক বিয়ে করতো, কিন্তু বাস করতো এক বা দুই স্ত্রীর সাথে । বাকিরা তাদের পিতামাতা ও ভাইদের সাথে থেকে বঞ্চনাময় জীবন যাপন করতো । আর তাদের ব্রাহ্মণ স্বামীরা মাঝে মাঝে শ্বশুর বাড়িতে আসতো স্রেফ টাকা-পয়সা আদায় করতে । পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮৬ (পাদটীকা নং-৫৯) ।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা ও লেখালেখির ফলে শতাব্দীর শেষ নাগাদ কুলীন বহুবিবাহ আর সমাজের মারাত্মক কোন সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান ছিল না ।

উনিশ শতকের শুরুতে সামান্য কয়েকজন বিত্তশালী হিন্দুর সহযোগিতায় খৃষ্টান মিশনারীরা বাংলায় নারী শিক্ষার ব্যাপারে প্রথম এগিয়ে আসেন এবং ১৮১৯ সালে Calcutta Female Juvenile Society স্থাপন করে বেশ কয়েকটি স্কুলে শত শত বালিকাকে শিক্ষা দিতে থাকেন । ১৮৪৯ সালে কতিপয় ডিরোজিয়ান, বিদ্যাসাগর ও কয়েকজন সনাতনী হিন্দুর সহযোগিতায় J.E. Drinkwater Bethune (1801-51) হিন্দু ফিমেল স্কুল স্থাপন করেন । স্কুলটি ১৮৫৬ সালে সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং বিদ্যাসাগর অবৈতনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । ১৮৬২ সালের এক প্রতিবেদন অনুসারে, স্কুলটির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ।[২৯] লেফটেন্যান্ট গভর্নর হ্যালিডে-এর আশ্বাসের ভিত্তিতে বিদ্যাসাগর Special Inspector of Schools-হিসেবে কলকাতার নিকটবর্তী চারটি জেলায় ১৮৫৭ সালের নভেম্বর হতে ১৮৫৮ সালের মে মাসের মধ্যে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন । কিন্তু ভারত সরকারের গড়িমসির কারণে তিনি ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েন এবং বিত্তবান নাগরিকদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে একটি তহবিল গঠন করেন । এতদ্‌সত্ত্বেও ১৮৬৬-৬৭ সালের এক প্রতিবেদন অনুসারে, ঐ বছর বালিকাদের জন্য ২৮১ টি স্কুল ছিল এবং সেগুলিতে ৫,৬৩১ জন ছাত্রী লেখাপড়া করতো ।[৩০] বিদ্যাসাগরের পর কেশব চন্দ্র সেন ও তাঁর অনুসারীরা সত্তরের দশকে স্ত্রী শিক্ষার নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন । তবে তাঁদের প্রচেষ্টা প্রধানতঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ।

প্রীতি কুমার মিত্রের বিবরণ হতে জানা যায় যে, ১৮৭০ সালে কেশব চন্দ্র মহিলাদের জন্য ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপন করেন এবং তার দু'বছর পর একটি শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন । এই স্কুলের ছাত্রীরা পরে গড়ে তোলেন একটি নারী মঙ্গল সমিতি, যা মেয়েদের সমস্যা ও প্রগতি নিয়ে আলোচনার ফোরাম হিসেবে

---

[২৯] বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ (৩ খন্ড একত্রে), কলকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ৪৫২-৫৩ ।
[৩০] বিনয় ঘোষ, সমাজচিত্র, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৫১৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

কাজ করতে থাকে। এরকম একটা সমিতি স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রেও সক্রিয় ছিল এবং তাঁরা ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, পাবনা ও রাজশাহীর মতো দূরবর্তী জেলাগুলোতে বসবাসকারী ব্রাহ্ম মহিলাদের জন্য ডাকযোগে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করতেন। স্ত্রীশিক্ষা ও সাধারণভাবে নারী সমাজের জ্ঞানবৃদ্ধির লক্ষ্যে কেশব চন্দ্রের স্ত্রী জগন্মোহিনী দেবী ১৮৭৭ সালে 'আর্য নারী সমাজ' স্থাপন করেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজভূক্ত মহিলাগণ 'বঙ্গ মহিলা সমাজ' গঠন করেন এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৮৬ সালে স্থাপন করেন 'সখী সমিতি'।[৩১]

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সমাজ সংস্কার বিষয়ে নব্য হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ব্রাহ্মদের তথা বিদ্যাসাগরের মত ধর্ম নিরপেক্ষ সংস্কারকদের হতে সম্পূর্ণ আলাদা। সমাজের সমস্যার প্রতি নব্য হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গী ছিল একদিকে জাতীয়তাবাদী এবং অপরদিকে সামগ্রিকতাবাদী। হিন্দুদের মধ্যে মতভেদ ও অন্তর্কলহ সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন পদক্ষেপের সাথে তাঁরা সহযোগিতা করতে রাজি ছিলেন না। তাঁরা সংস্কারের চেয়ে বেশী পছন্দ করতেন পুনরুজ্জীবন ও প্রবৃদ্ধির কার্যক্রম; অর্থাৎ নির্বাচিত ব্যাধির পৃথক পৃথক প্রতিবিধানের পরিবর্তে সাধারণভাবে জনগণের চেতনার জাগরণ।

---

৩১ প্রীতি কুমার মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯২।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলায় মুসলিম জাগরণ ঃ বৈশ্বিক ও সর্বভারতীয় পটভূমি

বাংলা তথা ভারতোপমহাদেশের মুসলিমদের চিন্তা জগতে যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, তা মূলতঃ শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের প্রথম দিকেই। একই সময়ে বিশ্ব রাজনীতি এবং চিন্তাধারায়ও দ্রুত পরিবর্তন সূচীত হয়। ১৯১১-১২ সালে বিশ্ব রাজনীতিতে যে প্রচণ্ড আলোড়নের সূচনা হয়েছিল, তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল ক্ষয়িষ্ণু তুর্কী সাম্রাজ্যের বিলোপ সাধন। তখনও বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায়নি। জার্মানী, রাশিয়া ও ইতালীর লক্ষ্য ছিল, যে বলে বৃটিশ সাম্রাজ্য বলীয়ান, সেই বল ধ্বংস করা এবং যেহেতু সে পথে অন্তরায় ছিল তুর্কী সাম্রাজ্য সেহেতু এর বিলোপ সাধন করা। আবার যেহেতু তুর্কী সাম্রাজ্য ইসলামের অস্তিত্বের একমাত্র প্রতীক 'খিলাফত' বক্ষে ধারণ করে আছে, সেহেতু বিশ্বের মুসলিম চেতনাতেও এক আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল। তুর্কী সুলতান মুসলিম বিশ্বের খলিফা, অন্যদিকে খিলাফত ইসলামের এক অবিচ্ছেদ্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং ইসলামকে ধ্বংস করাই যে ইঙ্গ-জার্মান-রুশ মতলব, মুসলিম বিশ্বে এ ধারণা উনিশ শতকের শেষদিক থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাইয়্যেদ জামালুদ্দীন আফগানী, মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু প্রমুখ মুসলিম পণ্ডিতবর্গের সমগ্র মুসলিম বিশ্বব্যাপী আন্দোলন এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ আন্দোলন 'Pan-Islamism' বা 'বিশ্ব ইসলামবাদ' নামে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, 'Pan-Islamism' বা 'বিশ্ব ইসলামবাদ' বলতে সাধারণভাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব একই খলিফার অধীনে ন্যস্ত থাকবে অর্থাৎ একক খিলাফত ব্যবস্থা কায়েম হবে– এ কথা মনে করা হলেও প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে বহু মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকতে পারে। কিন্তু সমগ্র মুসলিম বিশ্ব তথা জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মুসলিম একই সমাজভূক্ত থাকবে এবং তাদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

একটা অবিচ্ছেদ্য মৌলিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ অটুট থাকবে, এটাই 'Pan-Islamism'-এর মূল কথা।

তুর্কী সাম্রাজ্য তথা খিলাফত ধ্বংসের উপরোক্ত পাশ্চাত্য পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর বিরুদ্ধে যখন পৃথিবীর অন্যসব তথাকথিত মুসলিম দেশ নিষ্ক্রিয়, তখন বৃটিশ শাসন-শৃঙ্খলিত ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন। বাংলা-ভারতে শুরু হয়েছিল খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন। এ আন্দোলন বাংলার মুসলিম জনসাধারণকে প্রাণচঞ্চল করে তুলেছিল এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তবে এ প্রাণ চাঞ্চল্য ও সচেতনতাবোধ হঠাৎ করেই মুসলিমদের মধ্যে জাগ্রত হয়নি। অনেক সময়ের ব্যবধানে বহু ধাপ অতিক্রম করে ক্রমান্বয়ে তারা এ পর্যায়ে পৌঁছে। এতদ্‌বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

ফরাসী বিপ্লবের ফলে ইউরোপের চিন্তাজগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং যার ফলে নব নব আদর্শ ও ভাবধারা জন্ম লাভ করে, সেগুলির প্রভাব এদেশেও পরিলক্ষিত হয় উনিশ শতকের প্রথম দিকে প্রধানতঃ ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে। হিন্দুরা বাস্তবমুখী মনোভাব গ্রহণ করে উৎসাহের সঙ্গে ইংরেজি ভাষা শিখতে শুরু করেছিল, যার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা অভূতপূর্ব উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিল। এ দেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকেই তারা ইংরেজদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করতে শুরু করে এবং ইংরেজদের কৃপাদৃষ্টি ও নেক্‌নজর অর্জন করতে সক্ষম হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও সরকারী সাহায্যের অপেক্ষায় না থেকে কলকাতার নেতৃস্থানীয় হিন্দুরা কিছু সংখ্যক উদারমনা ইংরেজ কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় ১৮১৬-১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপন করে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সঙ্গে হিন্দুদের পরিচিত করা। বস্তুতঃ এই কলেজে ইংরেজির মাধ্যমে বেশ কিছুসংখ্যক হিন্দু যুবক সমকালীন ইউরোপীয় উদার নৈতিক ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে হিন্দু সমাজে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, যা হিন্দু সমাজের অগ্রগতিকে অনেকখানি ত্বরান্বিত করেছে। হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষার সাথে সাথে নিজেদের মাতৃভাষা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলারও চর্চা করতে থাকে সমানভাবে। কলকাতার হিন্দুদের এই নতুন শিক্ষা-আন্দোলন ক্রমান্বয়ে মফঃস্বল অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে।[১]

কিন্তু মুসলিমদের অবস্থা ছিল অন্যরকম। তারা ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের ন্যায় তাৎক্ষনিকভাবে মনোযোগ দিতে পারেনি। অবশ্য তাদের এ অমনোযোগিতার কারণ হিসেবে তাদের প্রতি এ অপবাদ আরোপ করা হয়ে থাকে যে, তারা ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল। এমনকি বাংলা ভাষার প্রতিও তারা ছিল উদাসীন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে- মুসলিমগণ কি সত্যি সত্যিই ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল? জবাবে বলা যায়- এমন ধারণা পোষণ করলে তাদের প্রতি নিঃসন্দেহে অবিচার করা হবে। কারণ মুসলিমগণ জন্মগতভাবে, জাতিগতভাবে এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোন হতেও অন্য যেকোন জাতি অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষানুরাগী ছিল। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো চুর্ণ-বিচুর্ণ হওয়ায় শিক্ষা ক্ষেত্রেও তারা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে। ইংরেজি শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তারা বীতশ্রদ্ধ ছিলনা। কিন্তু ইংরেজি স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করা ছিল অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ, যা ঐ মুহূর্তে তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া এ ব্যাপারে তারা সরকারের সামান্যতম সহানুভূতিও আকর্ষণ করতে পারেনি। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদের জন্য সরকারী ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজেও মুসলিমদের প্রবেশাধিকার ছিলনা।[২] মুসলিমদের প্রতি তাদের এ বিমাতাসুলভ আচরণই মূলতঃ এর জন্য দায়ী।

অন্যদিকে বাংলা ভাষার প্রতি মুসলিমদের উদাসীনতার মূল কারণ ছিল অন্যত্র। এ প্রসঙ্গে A.R. Mallick-এর বিবরণ হতে জানা যায় যে, উইলিয়াম ক্যারীর সভাপতিত্বে ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপিত হয়। এ কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে এদেশের লোকজনকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত

---

১ সালাহ উদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১, সহ দ্রঃ A. F. Salahuddin Ahmed, Social Ideas and Social Change in Bengal, 1818-1835, Leiden, 1965, PP. 187-90.

২ W.W. Hunter,The Indian Mussalmans, op. cit., PP. 152-53.

Dhaka University Institutional Repository

করা। এতে সংস্কৃতি-ব্যাকরণ জ্ঞানলব্ধ এমন বাংলাভাষা শিক্ষা দেয়া হত, যা মুসলিমদের বোধগম্য ছিল না। তাই এ কলেজে তখন কোন মুসলিম ছাত্র ভর্তি হয়নি। এতদ্ব্যতীত সরকার কর্তৃক স্থাপিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০ সাল)-এর ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য ছিল। উক্তসব প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষায় যেসব পাঠ্য পুস্তক ছিল, তার সবগুলোই ছিল হিন্দু ধর্ম সংক্রান্ত। যেমন-গুরু দক্ষিণা, অমর সিংহ, চাণক্য, সরস্বতী বন্দনা, দান লীলা, দধি লীলা প্রভৃতি।[৩] এতে প্রতীয়মান হয়, মুসলিমদের শিক্ষাঙ্গন হতে দূরে রাখার জন্য কীভাবে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতবহুল শব্দ ও হিন্দুয়ানীতে পরিণত করা হয়েছিল। আর এটাই ছিল বাংলা ভাষার প্রতি তাদের উদাসীনতার মূল কারণ। অন্য কথায় মুসলিমদের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রাখার লক্ষ্যে বৃটিশ শাসক, খৃষ্টান মিশনারী[৪] ও এদেশীয় হিন্দু দালালদের এ ছিল এক ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা, যা মুসলিম শক্তি ধ্বংস করার সুদূরপ্রসারী নীল নক্সা হিসেবে বিবেচিত।[৫] ফলে মুসলিমগণ মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় অনেক পেছনে পড়ে যায়। এ অবস্থায় W. Adam মুসলিমদের জন্য উর্দু ভাষার স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিমদের উপযোগী বাংলা পাঠ্য পুস্তক রচনার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করেন। কিন্তু তদানীন্তন সরকার এদিকে কোন দৃষ্টি দেয়নি।[৬]

উনিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে যখন ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে কলকাতার হিন্দু সমাজে এক নবজাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছিল, তখন কলকাতার শীর্ষস্থানীয় মুসলিমগণ নীরব থাকলেও গ্রামাঞ্চলের মুসলিমগণ বেশ সক্রিয় ছিল। সে সময় গ্রামাঞ্চলের মুসলিম জনসাধারণ স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত অভ্যুত্থানে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। যদিও এসব অভ্যুত্থানের

---

৩ A. R. Mallick, British Policy and the Muslims in Bengal, op.cit., P. 156.

৪ খৃষ্টান মিশনারী বিষয়ক বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে, মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, 'বৃটিশ বাংলায় খৃষ্টান মিশনারী' শীর্ষক প্রবন্ধ, ৩৪-তম বার্ষিক সম্মেলন-২০০৩ উপলক্ষে বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'স্মরণিকা', পৃঃ ৩৪-৩৫; সহ দ্রষ্টব্য ঃ Muhammad Mohar Ali, The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities (1833-1857), Chittagong, 1965.

৫ N. Chatterjee, Life of Mahatma Raja Rammohon Roy, P. 394.

৬ A. R. Mallick, op.cit., PP. 161-65.

Dhaka University Institutional Repository

মূল উৎস ছিল কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ, অচিরেই এগুলো ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করে। এ বিবর্তনের কারণ খুঁজতে গেলে সেকালের মুসলিম ধর্ম-চিন্তা সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে সালাহ্ উদ্দীন আহমদ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তখন এ উপমহাদেশের ধর্ম-চিন্তায় দুটি পরস্পর বিরোধী ধারা সক্রিয় ছিল। একটি ছিল ইসলামের বিশুদ্ধতা ও স্বতন্ত্র ঐতিহ্যকে সুসংবদ্ধ ও সুসংরক্ষণ করার ধারা। অপরটি ছিল আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের উপর ভিত্তি করে ইসলামের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের মূলসূত্র ও বাণীর সমন্বয়ের ধারা। দিল্লীর বিখ্যাত আলিম শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (রঃ) (১৭০৩-১৭৬৩) ইসলামের বিশুদ্ধবাদী ধারাকে সমকালীন প্রয়োজনের তাগিদে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন।[৭]

ইংরেজ পদানত বাংলার মুসলিম জাগরণ আন্দোলন সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয় শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (রঃ)-এর চিন্তাধারার দ্বারা। মুজাদ্দিদ-ই আল্‌ফ-ই-সানীর (রঃ) বিশিষ্ট খলিফা শাহ আদম বিন্নৌরীসহ (রঃ) বহু বিশিষ্ট আলিমের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এই মনীষীর কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে যে, ইসলামের মূল সত্য হতে বিচ্যুতিই মুসলিমদের বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ। তাই তিনি ইসলামী আদর্শ, ভাবধারা ও জীবন বিধানের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজকে পুনর্গঠনের পূর্নাঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম পর্যায়ের কাজ ছিল ইসলামী সমাজ গঠনের লক্ষ্যে মুসলিমদের চিন্তা-চেতনার সংশোধন ও পরিশুদ্ধি। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি মুসলিমদের জ্ঞান ও চিন্তার পুনর্গঠনের কাজে অগ্রসর হন। তিনি মুসলিমদের মাযহাবী বিরোধ মিটানোর প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দান করেন এবং ইজতিহাদকে 'ফরযে কিফায়া' বলে উল্লেখ করেন। তিনি ইজতিহাদের নিয়ম-নীতি এবং শর্তাবলীও রচনা করেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (রঃ) আল্ কুরআন ও আল্ হাদীস ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা, ইসলামী জীবন দর্শন, ইসলামের নৈতিকতা, সংস্কৃতি ইত্যাদি জনসাধারণের কাছে লিখিত আকারে পেশ করেন। মুসলিমদের পারিবারিক জীবন, সামাজিক রীতি-নীতি, বিচার ব্যবস্থা, কর ব্যবস্থা, দেশ শাসন, সামরিক সংগঠন প্রভৃতি দিক তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তৃতীয় পর্যায়ে সঠিক

---

৭ সালাহ্ উদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪।

ইসলামী চিন্তা ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ক্ষমতাসীন সরকারের পরিবর্তে একটি নতুন ও স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্দোলনের অংশ হিসেবে দীর্ঘমেয়াদী গণবিপ্লবের কর্মসূচিও তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় পেশ করেন। কিন্তু চিন্তার সংশোধন ও পরিশুদ্ধি এবং জ্ঞান ও চিন্তার পুনর্গঠন — এ দুই পর্যায়ে তাঁকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়। ফলে তৃতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজে তিনি অগ্রসর হতে পারেননি।[৮]

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দিহ্লাভী (রঃ)-এর বিপ্লবী চিন্তাধারাকে উপমহাদেশের আনাচে-কানাচে পরিচিত করে তোলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ্ আবদুল আযীয (রঃ) (১৭৪৬-১৮৩৪ খ্রীঃ)। ভারতীয় আলিমদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এ দেশকে নির্ভয়ে 'দারুল হরব' বা যুদ্ধরত এলাকা বা শত্রুশাসিত এলাকা বলে ফাত্ওয়া জারী করেন[৯] এবং জিহাদ করে এদেশকে 'দারুল ইসলাম' (ইসলাম শাসিত এলাকা)-এ পরিণত করার আহবান জানান। তাঁর এ বিপ্লবী ঘোষণা মুসলিমদের মনে জিহাদের এক দুর্দমনীয় প্রেরণার হিল্লোল প্রবাহিত করে। তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সংগঠন কায়েম করেন, যা ইতিহাসে 'তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়া' নামে পরিচিত। এর উদ্দেশ্য ছিল যেসব ইসলাম বিরুদ্ধ কুসংস্কার, চাল-চলন ও রীতি-নীতি সাধারণ মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রবেশ লাভ করেছে, সেগুলির মূলোৎপাটন করা ও খাঁটি ইসলামী শিক্ষাদর্শে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে তোলা। এ আন্দোলনের ফলেই বহু লোক ইসলামের সত্যিকার ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নানারূপ অনৈসলামিক ও কুসংস্কারমূলক অভ্যাস পরিত্যাগ করতে শিখে। কালক্রমে এ আন্দোলন স্বাভাবিকভাবে অত্যাচারী শিখ ও বৃটিশদের বিরুদ্ধে 'আজাদী আন্দোলন' বা 'জিহাদ আন্দোলন'-এ পরিণত হয়।[১০] বাংলার মুসলিম জাগরণে এ আন্দোলনের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক, গভীর ও সুদূরপ্রসারী। এ আন্দোলনকে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন

---

[৮] মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৫-৩৬; সহদ্রষ্টব্য : আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, জুন ২০০২, পৃঃ ২৪২-৪৩ এবং আবদুল মওদূদ, ওহাবী আন্দোলন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮০, পৃঃ ১২৩।

[৯] আব্বাস আলী খান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রঃ)। তাঁর প্রধান সহকর্মী ছিলেন শাহ্ ইসমাইল শহীদ (রঃ)।

সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রঃ) (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রীঃ) স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করলেন যে, বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য প্রায় চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধ্বংস হওয়ার পথে। অন্যদিকে ইংরেজগণ গোটা ভারতবর্ষের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করে থাকলেও পাঞ্জাবের একটি বিরাট অঞ্চলে শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। মুসলিমগণ শুধু রাষ্ট্রই হারায়নি, বরং ইসলামের মূলনীতি হতে অনেক দূরে সরে গেছে। উত্তরভারতে শরীয়াহ্ বিরুদ্ধ রীতি-নীতি মুসলিম সমাজে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, আল্লামা ইকবালের নিম্নোক্ত বক্তব্য হতেই তা সহজে উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলেন ঃ

> "নিশ্চয়ই আমরা হিন্দুআনীতে হিন্দুদের ছাড়িয়ে গেছি। আমরা দু'রকম জাতি ভেদের কবলে পড়েছি —— মযহাবী বিভেদ ও সামাজিক জাতিভেদ। আমরা এসব হিন্দুদের থেকে শিক্ষা করেছি, না হয় উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছি। এটিই হচ্ছে একটি নীরব উপায়, যার দ্বারা বিজিত জাতি বিজেতার উপর চরম প্রতিশোধ নেয়।"[১১]

মুসলিমদের জাতীয় জীবনের এমনি এক নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রঃ) তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মোচন করেন। তিনি দেখলেন তাঁর সম্মুখে মাত্র তিনটি পথই উন্মুক্ত রয়েছে। প্রথমতঃ হক্ব পরিত্যাগ করে বাতিলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। দ্বিতীয়তঃ হক্ব পরিত্যাগ না করে বরং এর সঙ্গে জড়িত থাকতে যেয়ে যেসব বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দুর্দশা আসবে, তা নীরবে সহ্য করা। তৃতীয়তঃ পুরুষোচিত সাহস ও শৌর্যবীর্য সহকারে বাতিলের মোকাবেলা করতঃ এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করার আপ্রাণ চেষ্টা করা —— যাতে করে হক্বের জন্য বিজয়-সাফল্য সূচিত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সাইয়েদ সাহেব এ তৃতীয় পথটিই বেছে নিলেন। এ পথে চলার সকল যোগ্যতা ও গুণাবলী তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।[১২]

---

[১০] আব্দুল মওদূদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৩-৩৪।
[১১] উদ্ধৃত : আবদুল মওদূদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৪।
[১২] আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র হজ্জ্ব সুসম্পন্ন করে তিনি সার্বিকভাবে জিহাদের প্রস্তুতি নিলেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যদি কোন মুসলিম অধ্যুষিত দেশ অমুসলিমদের অধীনে আসে, তাহলে সেদেশের প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর জিহাদ 'ফরযে আইন' হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্যান্য মুসলিম দেশের উপর জিহাদ হয়ে পড়ে 'ফরযে কিফায়া'। তাঁর মতে, জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা এবং মুসলিম সমাজে যেসব কুসংস্কার প্রচলিত আছে তা বিনষ্ট করা।[১৩]

জিহাদের ব্যাপক প্রস্তুতিকল্পে তিনি ভারতের প্রধান প্রধান শহর ও বাংলাতে কতিপয় বিশ্বস্ত খলিফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। পাটনাতে জিহাদের প্রধান কেন্দ্রস্থল স্থাপন করতঃ সেখানে তিনি চারজন প্রতিনিধি প্রেরন করেন। তাঁরা হলেন– মাওলানা বেলায়েত আলী, মুহাম্মদ হোসেন, এনায়েত আলী এবং ফরহাদ হোসেন। ভারতের সর্বত্র জিহাদের প্রচারণা ও প্রস্তুতি শেষ করে তিনি ১৮২৬ সালে নিজ জন্মভূমি রায়বেরেলী ত্যাগ করে বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করে সর্বশেষে নওশেরার নিকট উপস্থিত হন। সেখানে এক নৈশ যুদ্ধে মাত্র নয়শত মুজাহিদ বৃহৎ শিখ বাহিনীকে পরাজিত করেন। ফলে অসংখ্য সীমান্তবাসীসহ বহু স্থানীয় সরদার এবং বিশেষ করে ইউসুফজায়ীরা সাইয়েদ আহমদের সাথে যোগ দিল।

নওশেরায় শিখদের সাথে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর হতে বালাকোটের যুদ্ধ পর্যন্ত ছোট-বড় এগারটি বা ততোধিক যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী শত্রুদের মোকাবেলা করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজয় অর্জন করে। সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রঃ) চেয়েছিলেন মুসলিম অধ্যুষিত সীমান্তে তিনি একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করবেন। এ কারণেই তিনি সীমান্তকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সীমান্তের যেসব মুসলিমের সাহায্য-সহযোগিতার আশা হৃদয়ে পোষণ করে সাইয়েদ সাহেব তাঁর জিহাদের রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন, তাদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর সংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। এর প্রমাণ হল বালাকোটের বিপর্যয়। মুজাহিদ বাহিনী সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত থাকলেও বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। সাইয়েদ আহমদ, শাহ ইসমাইল ও

---

[১৩] আবু জাফর, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর অন্যান্য প্রধান সহকর্মীগণ বালাকোটের যুদ্ধে শেষপর্যন্ত ১৮৩১ সালের ৬ই মে জিহাদ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। [১৪]

বালাকোটের বিপর্যয় আকস্মিক নয়, অভাবনীয়ও নয়। বরং তা ছিল কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনার মতই পূর্ব-নির্দিষ্ট অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। মুজাহিদদের জিহাদ আন্দোলনের প্রায় পৌনে একশতক ব্যাপী কর্মতৎপরতার প্রথম বিপর্যয় ঘটে বালাকোটে। দ্বিতীয় বিপর্যয় ঘটে ১৮৫৭ সালের আজাদী সংগ্রামে। আর তার শেষ পরিণতি হয়েছিল ১৯১৯ সালের খিলাফত আন্দোলনে।[১৫]

সাইয়েদ আহমদ শহীদ যখন শত শত মাইল দূরে গিয়ে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সংকল্প ঘোষণা করেন তখন অনেকেই তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, দেশের অভ্যন্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে সুদূর সীমান্ত এলাকায় গিয়ে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণ কি? এ প্রসঙ্গে তাঁর জবাব ছিল এরকম- প্রথমত; ইংরেজরা এখানে মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু শিখেরা প্রত্যক্ষভাবে মুসলিমদের ধর্মকর্মে হস্তক্ষেপ করছে। দ্বিতীয়ত, এদেশে ইংরেজ আধিপত্য মজবুত করার পেছনে শিখদের সক্রিয় সহযোগিতা সর্বজনবিদিত। তৃতীয়ত, সীমান্তে মুসলিম আধিপত্য কায়েম হলে পরবর্তী পর্যায়ে সমগ্র উপমহাদেশকে সর্বপ্রকার শত্রুর কবলমুক্ত করা সহজ হবে। [১৬]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাইয়েদ আহমদ শহীদের জিহাদ আন্দোলনকে কেহ কেহ 'ওয়াহাবী আন্দোলন' হিসেবে আখ্যায়িত করলেও সত্যিকার অর্থে একে 'ওয়াহাবী আন্দোলন' নামে অভিহিত করা মোটেও ঠিক নয়। কারণ কথিত 'ওয়াহাবী আন্দোলন' এবং 'জিহাদ আন্দোলন' সম্পূর্ণ পৃথক দুটি আন্দোলন এবং এদের প্রেক্ষাপটও সম্পূর্ণ ভিন্ন। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজ্‌দী আরবে একটি সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তাঁর নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ এর নাম দিয়েছেন

---

[১৪] বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য : আবদুল মওদূদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৩-৪৮।
[১৫] পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৯।
[১৬] মওলানা জাফর থানেশ্বরী, আত্মজীবনী, উদ্ধৃত : মুহিউদ্দীন খান, 'জিহাদ আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা', আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃঃ ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

'Wahabism' বা 'Wahabi Movement' বা ওয়াহাবী আন্দোলন। কিন্তু জিহাদ আন্দোলনের সাথে একে একাকার করা সমীচীন হবেনা। কারণ জিহাদ আন্দোলনকারীরা কখনও নিজেদের 'ওয়াহাবী'দের সঙ্গে চিহ্নিত করেননি। তাছাড়া বাংলা-ভারতের মুসলিমদের জিহাদ আন্দোলনের সাথে আরবের ওয়াহাবী আন্দোলনের তেমন কোন সামঞ্জস্যও ছিলনা।[১৭]

সাইয়েদ আহমদ শহীদের জিহাদ আন্দোলনে বাংলা হতে কয়েক সহস্র মুজাহিদ ও বিপুল পরিমান অর্থ প্রেরিত হয়। বাংলার মুজাহিদদের অনেকেই বালাকোটের যুদ্ধে শাহাদাতবরন করেছেন এবং অনেকে গাজীর মর্যাদা লাভ করেছেন। গোলাম রসূল মেহের প্রদত্ত তালিকা অনুসারে, বালাকোটে সর্বমোট একশত পঁয়ত্রিশ জন মুজাহিদ শহীদ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন বাংলার অধিবাসী। তাঁরা হলেন আলীমুদ্দীন, ফয়েজউদ্দীন, লুৎফুল্লাহ্, শরফুদ্দীন ও মুজাফ্ফর হোসেন।[১৮] কিন্তু মুহিউদ্দীন খানের বিবরণ হতে জানা যায় যে, বালাকোট যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল দু'শতাধিক। তন্মধ্যে নেতৃস্থানীয় একশ একচল্লিশ জনের নাম যুদ্ধের রোজনামচা থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের তালিকায় বাংলার অন্ততঃ নয়জন মুজাহিদের নাম স্থান পেয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন- উপর্যুক্ত পাঁচজনসহ মুন্সী মুহাম্মদ আনসারী, মুন্সী ইব্রাহীম, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ এবং করিম বখ্শ।[১৯]

মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙালীসহ বাংলার যেসব মুজাহিদ গুরুতর আহত হয়ে গাজীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তাঁদের সংখ্যা চল্লিশ জনের মত বলা হয়। কিন্তু তাঁদের তালিকা অদ্যাবধি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। বালাকোটের ময়দানে সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও অন্যান্য শীর্ষনেতৃবৃন্দ শাহাদাতবরণ করলেও জিহাদ আন্দোলন স্তব্ধ বা স্তিমিত হয়ে যায়নি। আহত মুজাহিদগণ নেতৃবৃন্দের আকস্মিক শাহাদাতের শোক ভুলতে না পারলেও অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে পুনঃগঠিত হয়ে পশ্চিমাঞ্চলে

---

[১৭] বিস্তারিত দেখুনঃ R. C. Majumdar, History of Freedom Movement, III; উদ্ধৃত : আবদুল মওদূদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১।

[১৮] গোলাম রসূল মেহের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩২-৩৪।

[১৯] মুহি উদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১।

Dhaka University Institutional Repository

গভীর পার্বত্য এলাকায় সরে গিয়ে সিতানায় কেন্দ্রস্থাপন করে জিহাদ অব্যাহত রেখেছিলেন। বাংলার মুজাহিদ গাজীগণ মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙালীর নেতৃত্বে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইমামুদ্দীন বাঙালী নোয়াখালীর হাজীপুরে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখলেন। সুফী নূর মোহাম্মদ সীতাকুন্ড পাহাড়ের পাদদেশে নিজামপুরে আস্তানা স্থাপন করলেন। সুফী নূর মোহাম্মদের সংস্কার আন্দোলনের প্রধান উত্তরাধিকারী ছিলেন কলকাতার সুফী ফতেহ আলী। তাঁর খলিফা ফুরফুরার মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী এবং তাঁর খলিফাগণের মধ্যে শর্ষিণার মাওলানা নেছারউদ্দীন ও চব্বিশ পরগনার মাওলানা রুহুল আমীনের দ্বীনি খিদমত এদেশে সর্বজনবিদিত। মাওলানা আব্দুল হাকিম স্থান নির্বাচন করলেন চট্টগ্রাম থেকে আরো দূরে আরাকান সড়কের পার্শ্বে গভীর অরণ্যানী ঘেরা চুনতী গ্রামে। এদিকে ঢাকার বংশাল এলাকায় গড়ে তোলা হল আন্দোলনের গোপন কেন্দ্র। এখান থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে পাটনা এবং পাটনা থেকে বাহওয়ালপুরের খানপুর হয়ে মুজাহিদগণের কাফেলা ও প্রচুর অর্থ-সম্পদ নিয়মিত সিতানায় প্রেরিত হত। প্রায় এক শতাব্দী ব্যাপী এ কর্মকান্ড অব্যাহত ছিল।

সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রঃ)-এর আন্দোলন ছিল মূলতঃ সংস্কারধর্মী। সীমান্তে মুজাহিদ অভিযান ছিল এর একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়মাত্র। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে তিনি মুজাহিদদের কাফেলাকে সীমান্তের দুর্গম পার্বত্যে এলাকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছিল। মুজাহিদদের রক্তের বিনিময়ে সীমান্ত এবং পাঞ্জাবের মুসলিমগণ আগ্রাসী শিখ শক্তির নির্যাতন থেকে অনেকটা রক্ষা পেয়েছিলেন। উপরন্তু পেশোয়ার কেন্দ্রিক একটি ইসলামী খিলাফত কায়েম করে চার বছরাধিক কাল তা পরিচালনা করার মাধ্যমে পরবর্তী যুগের ঈমানসমৃদ্ধ মুসলিমদের সামনে নবুওয়্যতের আদর্শে খিলাফতের এমন এক বাস্তব নমুনা তিনি পেশ করে গেছেন, যা আজ পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। [২০]

---

২০ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : মুহিউদ্দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮২-৯২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, পলাশীর যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজিত হওয়ার ছয় বছর পর মীর কাসিমের দেশীয় সৈন্যরা যখন পাটনায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ করছেন, তখন বাংলা ও বিহারের ইংরেজ ও তার দালাল জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝান্ডা তুলে ধরেন ফকীর মজনু শাহ। জমিহারা, গৃহহারা নিরন্ন চাষী, দিনমজুর, শিল্প ধ্বংসের ফলে বিভিন্ন পেশা থেকে বঞ্চিত কারিগর, বেকার তাঁতী, চাকুরীচ্যুত বুভুক্ষু সৈনিক ইত্যাদি সকল স্তরের অসংখ্য মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন। একজন দরবেশের নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রথম গণসংগ্রাম ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় আটত্রিশ বছর স্থায়ী হয়। । এ সময় একের পর এক সংঘটিত হয় ত্রিপুরা জেলার শমশের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮), সন্দ্বীপে আবু তোরাবের বিদ্রোহ (১৭৬৯), ফকীর করম শাহের নেতৃত্বে মোমেনশাহী সুসংগ ও শেরপুর জমীদারী এলাকায় গারো, হাজং, কোচ, মেচ, হাড়ি ও অন্যান্য অধিবাসীদের জাগরণ (১৭৭৫), শের দৌলত খাঁ, রামু খাঁ ও জান বখ্‌শ খাঁর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঝুম চাষীদের বিদ্রোহ (১৭৭৬-৮৯), রংপুর ও দিনাজপুরে কোম্পানীর ইজারাদার 'রাজা' দেবী সিংহ ও 'দেওয়ান' হরে রামের বিরুদ্ধে নূরুদ্দীনের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩), মোমেনশাহী ও জাফরশাহী পরগনায় জমিদার যুগোল কিশোর রায় চৌধুরী, গোবিন্দ চাকি, পাঁচু বসু ও রামচন্দ্র মুখার্জীদের অত্যাচারের প্রতিবাদে কৃষক বিদ্রোহ (১৮১২) প্রভৃতি । এসব গণবিদ্রোহের মধ্যদিয়ে পরাধীনতার মসিলিপ্ত ইতিহাস রক্তরঙিন, গৌরবময় ও উজ্জ্বল হয়ে উঠে। বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে এঁদের অবদান অসামান্য।

পলাশী উত্তর যুগে বাংলার অবক্ষয়প্রাপ্ত, ক্ষয়িষ্ণু ও পতনোন্মুখ মুসলিম সমাজে আশু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবী শ্রেণী অক্ষম ছিল। তাই মুসলিম উচ্চ শিক্ষিত স্তর থেকে নেতৃত্বের উন্মেষ না হওয়ায় সমাজের নিম্নস্তরের জনসাধারণ এ শূন্যতা পূরণ করে এবং তাদের জীবনবোধের ভিত্তিতে নেতৃত্ব গড়ে উঠে। এ পর্যায়ে হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (১৭৮১-১৮৪০ খ্রীঃ) সাধারণ কৃষক শ্রেণীর মধ্য থেকে ১৮১৮ সালে ফারায়েজী আন্দোলন

Dhaka University Institutional Repository

শুরু করেন। তিনি ধর্মীয় ফরজ কাজগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার উপর জোর দেন। তাই এ আন্দোলন 'ফারায়েজী আন্দোলন' নামে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তিনি গ্রাম-গঞ্জের জনসাধারণের দুঃখ মোচনের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন।[২১]

উল্লেখ্য যে, ফারায়েজী আন্দোলনের সাথে আরবের মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের সংস্কার আন্দোলনের অনেক মিল রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আহমদ মোস্তফা আবু হাকীমা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাবের একত্ববাদের ভিত্তি ছিল অনমনীয় ও অলঙ্ঘনীয় আল্লাহ্র একত্বের ধারণা। শেখ মুহাম্মদের এ ধর্মনীতিতে কোন নতুনত্ব ছিলনা অথবা তিনি নতুন কিছু করতেও চাননি। একজন সংস্কারক হিসেবে শেখ মুহাম্মদ তাঁর সহচরদের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্র বাণী আল্-কুরআনের নির্দেশের প্রতি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ও তাঁর পুন্যবান সহচরদের নির্দেশ কার্যকর করার দিকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন।[২২] মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাবের সংস্কার আন্দোলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে— ধর্মানুষ্ঠানে যে কোন প্রকার বিদ্আত বা নতুন আচার-আচরণ সংযোজন করা থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকতে হবে এবং মূল অনুষ্ঠান অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে এবং পরস্পর সহযোগিতা ও বিরামহীন জিহাদের মাধ্যমে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের মৌলিক নীতিকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।[২৩]

অন্যদিকে ফারায়েজীরাও মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্র একত্ববাদের বিশুদ্ধ ধারণার প্রতিফলন কামনা করে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সুন্নতের অনুসরণে মানব জীবন পরিচালনার অঙ্গীকার ঘোষণা করে, ইসলামের বিশ্বজনীন

---

২১ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), তৃতীয় খন্ড, (সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩, পৃঃ ২৩৮।

২২ Ahmad Mustafa Abu Hakima, History of Eastern Arabia, 1750-1800: The Rise and Development of Bahrain and Kuwait, Beirut, 1965, P. 125.

২৩ মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, 'মুসলিম ধর্ম সংস্কার আন্দোলন', বাংলাদেশের ইতিহাস, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪১।

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায়পরায়ণতা ও জুলুমহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আবেদন বাস্তবে রূপায়িত করার সংকল্প ব্যক্ত করে। তারা বিশুদ্ধ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কর্মময় অঙ্গনে মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি থেকে শির্‌ক, বিদ্‌আত, কুসংস্কার ও দূর্নীতি দূর করা এবং ইসলামের মৌলিক নীতি অনুসরণে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে সুসংহত, আনন্দদায়ক ও সুখময় করে তোলার আদর্শে নিবেদিত ছিল।

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ ইংরেজ শাসিত এ দেশকে 'দারুল্ হর্‌ব্' হিসেবে ঘোষণা করেন এবং যতদিন পর্যন্ত এ দেশ 'দারুল ইসলামে' পরিণত না হবে ততদিন পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখা এবং জুমা ও ঈদের নামাজ না পড়ার নির্দেশ দেন।[২৪] তিনি হিন্দুদের পূজা-পার্বণে কোন প্রকার আর্থিক বা দৈহিক সাহায্য-সহযোগিতা করাকে শির্‌ক ও হারাম বলে অভিহিত করেন। হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ সমাজ থেকে বিভিন্ন ভেদনীতি, হিংসা ও বিদ্বেষ দূর করে শ্রমের মর্যাদা ভিত্তিক মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করে আরায়েজীদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলেন। তিনি জমির আবাদকারী বা চাষীকেই জমির প্রকৃত মালিক বলে ঘোষণা করেন। ফলে তাঁর মতে, জমির ফসল চাষীরই প্রাপ্য এবং তাতে জমিদারের কোন অধিকার নেই। তিনি জমিদার ও জোতদারদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য কৃষকদের আহ্বান জানান এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভূমি স্তরের করের অবৈধ 'আবওয়াব' প্রদান করতে চাষীদের নিষেধ করেন।[২৫] তাঁর এ আহ্বানে শোষিত, বঞ্চিত ও নিষ্পেষিত মুসলিমগণ সম্বিত ফিরে পেল এবং নতুন প্রাণসঞ্চরন অনুভব করলো। ফলে তারা দলে দলে এসে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগল এবং বৃটিশ, হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করলো। অল্প সময়ের ব্যবধানে তাদের সংখ্যা দাঁড়াল দশ-বারো হাজার, যা হিন্দু জমিদারদের জন্য এক মহা আতংকের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এ প্রসঙ্গে Dr. James Wise বলেন ঃ "The Zaminders were

[২৪] Muin ud-Din Ahmed Khan, History of the Faraidi Movement, Karachi, 1965, P. 243.

[২৫] পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫০।

Dhaka University Institutional Repository

alarmed at the spread of the new creed which bound the Mussalman peasantry together as one man."[২৬]

এদিকে ১৮৪০ সালে হাজী শরীয়ত উল্লাহ্‌র ইন্তেকালের পর তাঁর একমাত্র পুত্র মুহ্‌সিন্‌ উদ্দীন আহ্‌মদ ওরফে দুদু মিয়া (১৮১৯-৬২) ফারায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পিতার ন্যায় তিনিও অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর সাংগঠনিক শক্তি ও দক্ষতা এত প্রবল ছিল যে, তাঁর আদেশ পালনে ষাট হাজার কর্মী সর্বদাই প্রস্তুত থাকতো।[২৭] তিনি পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সুসংহত করার জন্য ফারায়েজী সমাজ ব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত করেন। তিনি সমগ্র পূর্ব বাংলাকে কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক এলাকায় একজন করে খলিফা নিযুক্ত করেন। তাঁদের কাজ ছিল আন্দোলনের দিকে মানুষকে আহবান করা, কর্মী সংগ্রহ করা ও সংগঠন পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। এভাবে যে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী হল, এর শীর্ষে দুদু মিয়া অবস্থান নিলেন।[২৮] তাঁর প্রতিষ্ঠিত খিলাফত ব্যবস্থা ছিল রাষ্ট্রাভ্যন্তরে একটি 'ক্ষুদ্র রাষ্ট্র' সদৃশ। তাঁর পঞ্চায়েত ও খিলাফত ব্যবস্থা সম্পর্কে Muin Uddin Ahmad Khan বলেন ঃ

> "Thus he (Dudu Miah) recreated alongside the Khilafat system, traditional panchayet system of the villages, which united the rural people of all classes irrespective of status. By his hierarchic gradation of officers in the Khilafat leadership and on the basis of neutrality, equity and justice in the village arbitration arranged for the settlement of disputes and litigations of the Muslims, Hindus, Buddhists and

---

[২৬] Dr. James Wise, Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal, London, 1884, P. 22.
[২৭] আবদুল মওদুদ, ওহাবী আন্দোলন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৮।
[২৮] Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXIII, Pt. II, No. 1, 1894, P. 50; Encyclopaedia of Islam, Vol-II, P. 58.

Dhaka University Institutional Repository

Christians. To counter the corruption of the courts, false witnesses and bribes, his arbitration system was organised and it became so successful that in the Faraidi dominated areas filing of cases in the formal court nearly came to an end."[২৯]

দুদু মিয়া একটি ফারায়েজী ভ্রাতৃসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটি সাধারণ তহবিল গঠন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অত্যাচারী জমিদার, জোতদার ও নীলকরদের লাঠিয়াল বাহিনীর মোকাবেলায় পাল্টা একটি স্বেচ্ছাসেবক ফারায়েজী লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেন । এই বাহিনীর সাহায্যে তিনি ১৮৪০ হতে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত বেশ কয়েকটি দাঙ্গা এবং যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে কঠোরভাবে দমন করেন । ফলে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের সময় বিদ্রোহ দমনের অজুহাতে বৃটিশ সরকার দুদু মিয়াকে বন্দী করে কলকাতার আলীপুর জেলে আবদ্ধ রাখে । হাজী শরীয়ত উল্লাহর জীবদ্দশায় যে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল, তা ছিল মূলতঃ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে সীমিত । কিন্তু দুদু মিয়ার সময়ে এ আন্দোলন অনেকটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে ।

সাইয়েদ (মীর) নিসার আলী ওরফে তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) ছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহীদের একজন একনিষ্ঠ শীষ্য । পবিত্র মক্কা নগরীতে সাইয়েদ সাহেবের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁরই নির্দেশে তিনি হজ্জব্রত পালন শেষে ১৮২৭ সালে বাংলায় ফিরে এসে চব্বিশ পরগণা জেলার নারিকেল বাড়িয়ায় বিভিন্ন সমাজ-সংস্কারকর্ম শুরু করেন । মীর্জা গোলাম আম্বিয়ার সাহচর্য এবং পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই তিতুমীর সহজে প্রতিষ্ঠা পান । সফদরপুরে তীতুমীরের শিষ্যরা একটি ভগ্নপ্রায় পুরনো ঐতিহ্যবাহী মসজিদ মেরামত করে তাতে তাদের প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে । এখানে তারা জমিদারদের অন্যায় তৎপরতা প্রতিরোধকল্পে ঐক্যবদ্ধ হয় ।

---

[২৯] Muin Uddin Ahmad Khan, 'Religious Reform Movements of the Muslims', History of Bangladesh, 1704-1971; Sirajul Islam (ed.), Social and Cultural History, Vol. Three, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1992, PP. 286-87.

Dhaka University Institutional Repository

প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়ে জমিদারগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কর্মসূচী গ্রহণ করে।[৩০]

হিন্দু জমিদারদের সাথে তিতুমীরের শিষ্যদের বিভিন্ন দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। ফলে তিতুমীরের আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও রানাঘাট এলাকায় সাতজন বৃহৎ হিন্দু জমিদার একজোট হয় এবং তিতুমীরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতা, শান্তিভঙ্গ, মুসলিম রাজত্ব তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র, হিন্দু ধর্মের ক্ষতি সাধন ও পবিত্রতাহানি এবং হিন্দুজনগোষ্ঠীর উপর বিদ্বেষমূলক সাম্প্রদায়িক আক্রমণের অজুহাতে কলকাতার হিন্দু পত্র-পত্রিকায় এবং ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে এক দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারণা শুরু করে। অন্যদিকে নীলকররাও তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার কারণে তিতুমীরের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠে এবং তাঁর দলকে ধর্মীয় নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে। এভাবে চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও রানাঘাটের বিস্তীর্ণ এলাকার জোটবদ্ধ হিন্দু জমিদারদের চক্রান্ত, দাড়ি ট্যাক্স, কোর্টে মামলা-মোকদ্দমার হয়রানি, লাঠিয়ালদের আক্রমণ এবং ইংরেজ প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বের কারণে কোনঠাসা হয়ে অবশেষে তিতুমীরের শিষ্যগণ নারিকেল বাড়িয়ায় 'বাঁশের কেল্লা' প্রতিষ্ঠা করে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে ৭ই নভেম্বর, ১৮৩১ সালে লাউ ঘাটিতে তিতুমীরের বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ বেধে যায় এবং তিতুমীরের শিষ্যদের সাহসিকতা ও ক্ষিপ্রগতির মুখে জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের সম্মিলিত বাহিনী চরমভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়এবং ঐ বিস্তীর্ণ এলাকায় তিতুমীরের শিষ্যদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কায়েম হয়।[৩১]

লাউঘাটির ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষে অসংখ্য দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয় ও প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয়। এরই ফলশ্রুতিতে বারাসত ও নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ নভেম্বর, ১৮৩১ সালে মেজর স্কট হার্ডিং-এর নেতৃত্বে

---

[৩০] বিস্তারিত দেখুনঃ মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, 'মুসলিম ধর্মসংস্কার আন্দোলন', পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫১।
[৩১] Muin Uddin Ahmad Khan, Titu Mir and His Followers, Dacca, 1980, PP. 18-21.

Dhaka University Institutional Repository

এক রেজিমেন্ট পদাতিক বাহিনী এবং ক্যাপ্টেন সাদারল্যান্ডের নেতৃত্বে একদল অশ্বারোহী সৈন্য, এক ব্যাচ গোলন্দাজ সৈন্য ও দুটি ভারী কামান সম্বলিত একটি সৈন্যবাহিনী কলকাতা থেকে নারিকেল বাড়িয়ার দিকে রওয়ানা হয়। ১৯ নভেম্বর শনিবার সকালে ঘনঘন কামান দেগে সৈন্যবাহিনী তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। একটি নিয়মিত সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তিতুমীরের বাহিনীর ছিলনা। তবুও তাঁরা আত্মসমর্পন না করে শাহাদাতবরন করেন। নারিকেল বাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা পরিণত হয় রক্ত, লাশ আর পোড়ামাটির এক বিধ্বস্ত জনপদে। তিতুমীর তাঁর মহান দায়িত্ব সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি বটে, কিন্তু যে ধর্মীয় ও নৈতিক অনাচার এবং হিন্দুজমিদার, মহাজন ও নীলকরদের অন্যায়-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করেছিরেন, তা পরবর্তীকালে মুসলিমদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় আজাদীর পথে আলোকবর্তিকার কাজ করেছে।

এখন প্রসঙ্গ ক্রমে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। ১৮৫৭ সালের বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামকে তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠী 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে আখ্যায়িত করলেও প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল বৈদেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সত্যিকার আযাদী সংগ্রাম বা স্বাধীনতা সংগ্রাম। সমগ্র ভারতবর্ষে অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে যে তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তা হচ্ছে ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ, ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ১৯৪৭ সালের স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। প্রথম দু'টিতে মুসলিমদের চরম বিপর্যয় হলেও তৃতীয়টিতে তাঁরা সফলতা অর্জনে সক্ষম হন। সুতরাং প্রথম দু'টি ছিল তৃতীয়টিতে সফলতা অর্জনের প্রেরণার উৎস। ১৮৫৭ সালে সারা ভারতের সকল শ্রেণীর জনগণ যে বৃটিশদের বিরুদ্ধে রুদ্ররোষে ফেটে পড়েছিল, তার কারণ ছিল নানাবিধ। শতাব্দীর পুঞ্জিভূত আক্রোশ আগ্নেয়গিরির ন্যায় বিস্ফোরিত হয়েছিল এ সংগ্রামে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্, শাহ আবদুল আজিজ, সাইয়েদ আহমদ শহীদ, শাহ ইসমাইল শহীদ, হাজী শরীয়তুল্লাহ্, দুদু মিয়া, তিতুমীর প্রমুখ বীর-মুজাহিদগণ যে জিহাদী প্রেরণার সঞ্চার করে রেখেছিলেন, তা যেন বারুদের স্তূপে দিয়াশলাইয়ের

Dhaka University Institutional Repository

কাজ করলো। চারিদিকে দাউ দাউ করে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠলো। স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে যে যেখানে ও যেভাবে পেরেছে সংগ্রামে যোগদান করেছে। সিপাহীদের সাথে যোগ দিয়েছে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল স্তরের সাধারণ মানুষ - কৃষক, মজুর, সরকারী, বেসরকারী কর্মচারী। ফলে কোথাও কোথাও নিয়ম-নীতি লংঘিত হয়েছে, হয়েছে লুটতরাজ ও অপ্রয়োজনীয় হত্যাকান্ড। কোন আদর্শবান কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে এ সংগ্রাম পরিচালিত হয়নি। অথচ বৃটিশরা এ ক্ষেত্রে মুসলিমদের একচেটিয়াভাবে দায়ী করে এবং পৈশাচিকতার সাথে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, যা মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি কলংকজনক অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত।[৩২] এ সম্পর্কে মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ্ বলেন ঃ

> "বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে প্রশমিত হওয়ার পূর্বেই ১৮৫৮ সালের ১ নভেম্বর ইংল্যান্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ... মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া যেই অর্ধ-লক্ষাধিক নর-নারী মধ্যভারত ও নেপালের জঙ্গল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রিটিশের নিকট আত্মসমর্পণ করে, বিদ্রোহোত্তরকালে প্রথম আঘাত পড়িয়াছিল তাহাদেরই উপর। বিদ্রোহ, ইংরেজ হত্যা, ট্রেজারী ও অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রভৃতি অভিযোগে ইহারা অভিযুক্ত হয়। ... কতজনের যে ফাঁসি হইল, কত হাজার হাজার লোকের প্রতি যে স্বল্পমেয়াদী কারাবাসের আদেশ হইল তাহার হিসাব এক্ষণে পাওয়া দুষ্কর। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসে যাঁহারা দন্ডিত হইয়াছিলেন, শুধু তাঁহাদেরই সংখ্যা ছিল দশ হাজারের উর্ধ্বে। ... বিদ্রোহে উস্কানি, ইংরেজ নরনারী হত্যায় প্ররোচনা, পলাতকদের আশ্রয় এবং আর্থিক সাহায্য দান, বিদ্রোহীদের গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্যাদি ও সংবাদ গোপন প্রভৃতি নানা কাল্পনিক অভিযোগে হাজার হাজার মুসলমান তাহাদের জোত-জমি, তালুকদারী, জমিদারী, নগদ টাকা পয়সা ব্রিটিশের হাতে তুলিয়া দিতে বাধ্য হয়। সদাশয় সরকার ইহার সমস্ত নিজেরা হজম না করিয়া কিছু কিছু হিন্দুদের মধ্যেও বিলি-বন্টন করিয়া দিয়া নূতন আর একটি রাজভক্তের দল সৃষ্টির প্রয়াস পান"।[৩৩]

---

৩২ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন : আব্দুল মওদূদ, সিপাহী বিপ্লবের পটভূমিকা, শতাব্দী পরিক্রমা, ঢাকা, ২০০২; আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা, ২০০২; R.C. Majumdar, The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857, Calcutta, 1957; R.C. Dutta, Economic History of India in the Victorian Age, Calcutta, 1906; J. E. Kaye, A History of the Sepoy War in India, 1857-58, London, 1877, Vol. I;

৩৩ মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ্, আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃঃ ১২৪-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

আনিসুজ্জামান অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সিপাহী অভ্যুত্থানের সমস্ত দায়িত্বটাই ভারতীয় মুসলমানদের ঘাড়ে এসে পড়েছিল। দেশে ও বিলেতে শাসক মহলে এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, মুঘল শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যেই মুসলিমরা এই বিদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন। ফলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মোটা অংশটাই তাদের ভাগ্যে জুটেছিল।[৩৪] এ সম্পর্কে মাওলানা ফজ্‌লে হক খয়রাবাদী স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন এভাবে যে, স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তবেই কোন হিন্দুকে আটক করা হতো। কিন্তু পালাতে পারেনি এমন মুসলিম সেদিন বাঁচেনি।[৩৫] শুধু ফাঁসীতে ঝুলিয়ে শহীদ করা হয় বাংলা-ভারতের প্রায় ৭০০ জন আলিমকে। তাছাড়া শত শত আলিমকে পাঠানো হয় দ্বীপান্তরে। এতদ্‌সত্ত্বেও বিপ্লবের জের চলে আরো কয়েক বছর। ১৮৬৪ সালে আম্বালায়, ১৮৬৫ সালে পাটনায় এবং ১৮৭০ সালে মালদহে পরিচালিত সরকার উৎখাত সংক্রান্ত মামলাগুলো সে সময়কার জিহাদ ও ফারায়েজী আন্দোলনের সক্রিয় তৎপরতার প্রমাণ বহণ করে। এসব মামলার বেশীর-ভাগ অভিযুক্তকেই যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়।

স্বাধীনতা বিপ্লব-পরবর্তী দীর্ঘ এক যুগেরও বেশী সময় ধরে জিহাদ ও ফারায়েজী আন্দোলনের কর্মীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামী তৎপরতা অব্যাহত থাকলেও তা ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসে। বিদ্রোহ দমনের নামে ইংরেজদের ব্যাপক দমননীতির ফলে মুসলিম সমাজ খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনই এক পরিস্থিতিতে প্রথমবারের মতো ইংরেজদের সাথে মুসলিমদের আপোসের একটি ধারা প্রবল হয়ে উঠে। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ) (১৮০০-১৮৭৩) এ ধারারই প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকে যে তিনজন মহান ব্যক্তি বাংলায় মুসলিমদের সামগ্রিক সংস্কার সাধনে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁরা হলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ, তিতুমীর ও মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী। তিনি (জৌনপুরী) শাহ আবদুল আজিজ(রঃ)-এর সরাসরি ছাত্র ছিলেন এবং সাইয়েদ আহমদ শহীদের

---

৩৪ আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃঃ ২৪৩।

৩৫ দেখুন : সানা উল্লাহ্ নূরী, 'স্বাধীনতা সংগ্রাম : শেরে বাংলা ও লাহোর প্রস্তাব', আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আবদুল গফুর (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৯-৭১।

Dhaka University Institutional Repository

(রঃ) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[৩৬] সাইয়েদ আহমদ শহীদ ভারতবর্ষকে 'দারুল হর্‌ব' ঘোষণা করে প্রথমে শিখ ও পরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন।[৩৭] তাই মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীও শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদে যোগ দেন। বালাকোটের যুদ্ধের পর ১৮৩৫ সালে তিনি বাংলায় হিজরত করেন এবং বাকী জীবন সমাজ-সংস্কার কর্মে অতিবাহিত করেন।[৩৮] অন্য বর্ননা অনুসারে, তিনি জিহাদ আন্দোলনে শরীক হতে মুর্শীদের অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে জিহাদে যোগদান না করে বাংলায় ধর্ম প্রচারের আদেশ দেন। মুর্শীদের নির্দেশ মোতাবেক তিনি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সপরিবারে বাংলায় স্থায়ীভাবে চলে আসেন।[৩৯]

প্রথমে তিনি বৃটিশ বিরোধী ছিলেন।[৪০] তবে পরবর্তী সময়ে তিনি ব্রিটিশ বিরোধিতাকে ধর্ম প্রচারের অন্তরায় এবং মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন[৪১] এবং সাইয়েদ আহমদ শহীদের পথ ও মত থেকে সরে যান।[৪২] কারণ তিনি মনে করতেন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হুকুম পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে ১৮৬৭ সালে তিনি জিহাদ আন্দোলনের মূল spirit হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিমদের মধ্যে 'ভিতর থেকে সংস্কার' (reform from within) তথা অন্তর্বিপ্লবের ধারণা প্রচার করেন। তিনি প্রচার যুদ্ধের মাধ্যমে অশিক্ষিত গ্রামীণ জনসাধারনের অনৈসলামী আচার-বিশ্বাস ও হিন্দুয়ানী রীতি-নীতি দূর করে বাংলায় ইসলামের ভিত্তি শক্তিশালী করার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ইংরেজদের প্রতি নমনীয় নীতি গ্রহণ করে তিনি জিহাদ ও ফারায়েজী আন্দোলনের নিয়ম-নীতির প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন। তিনি ইংরেজ শাসিত ভারতকে 'দারুল

---

[৩৬] James Wise, Notes on the Races, Castes and Trades of Estern Bengal, op. cit., P. 29; J. C. Jack, Bengal District Gazetteer, Bakerganj, Calcutta, 1918, P. 34.

[৩৭] Mohiuddin Ahmad, Saiyid Ahmad : His Life and Mission, Academy of Islamic Research and Publications, Lucknow, P. 128.

[৩৮] আবদুল মওদূদ, ওহাবী আন্দোলন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৮-২৯।

[৩৯] ড. এম.এস.এ. ইব্রাহিমী, 'কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ)', ইসলামী বিশ্বকোষ, ৭ম খন্ড, ই.ফা.বা. ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৯, পৃঃ ৩৩০; ইছমত আলী (অনূদিত), মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী সাহেবের জীবনী, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃঃ ৩৬-৩৭।

[৪০] আবু জাফর শামসুদ্দীন, আত্মস্মৃতি (১), ঢাকা, ১৯৮৯, পৃঃ ৭।

[৪১] Abdul Hai, Nuzhatul Khawater, Vol. II, Hyderabad, 1947, PP. 394-96.

[৪২] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম' বলে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং এখানে জুমুআ ও ঈদের নামাজ অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেন [৪৩] এবং স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে ইমাম আবু হানিফার (রঃ) বক্তব্য উদ্ধৃত করেন ।[৪৪]

ইংরেজ সরকার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ১৮৭০ সালে কলকাতায় নওয়াব আবুদল লতিফ আয়োজিত 'Mohamedan Literary Society'-এর সভায় মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী যে বক্তব্য প্রদান করেন, তাতে তাঁর ঐ মনোভাবের জোরালো প্রতিধ্বনি মেলে ।[৪৫] উক্ত সভায় মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ইংরেজ শাসিত এ দেশে জিহাদ করা আইনসঙ্গত হতে পারে না । এ সিদ্ধান্ত 'ফাত্ওয়া-ই-আলমগীরী'তে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে ।[৪৬] মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর এ ফাত্ওয়া প্রদানের ফলে বৃটিশদের সাথে বাংলা-ভারতের মুসলিমদের সম্পর্ক অনেকটা ঘনিষ্ঠ হয় । এতদ্ব্যতীত তিনি ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেননি । বরং তাঁর পুত্র মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী মুসলিমদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে জোরালো অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন ।[৪৭] ইংরেজদের সপক্ষে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর উক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে তিনি ইংরেজ সরকার থেকে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন । এমনকি ইংরেজ সরকার তাঁর প্রশংসা করে সার্টিফিকেটও প্রদান করে ।[৪৮]

উনিশ শতকের শেষ দিকে মাওলানা কারামত আলীর সনাতনপন্থী অনুসারীদের সাথে জিহাদ ও ফারায়েজী আন্দোলনের কর্মীদের মাজহাবী বিতর্ক

---

[৪৩] ইসলামী বিশ্বকোষ, ৭ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩১ ।

[৪৪] মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ্, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃঃ ২৫৮ ।

[৪৫] মুহা. আবদুল বাকী, 'মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর রাজনৈতিক মানস ও চিন্তার বিবর্তন', বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা 'ইতিহাস', পঁয়ত্রিশ বর্ষ প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ১৪০৮ বাংলা, পৃঃ ৭১ ।

[৪৬] W. W. Hunter, The Indian Mussalmans, এম. আনিসুজ্জামান অনূদিত, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃঃ ১৯৪ ।

[৪৭] রিপোর্ট, পূর্ব বঙ্গ ও আসাম শিক্ষা সমিতি, ১৯১০, পৃঃ ৭ ।

[৪৮] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী, ই.ফা.বা., ঢাকা, ১৯৯৫,পৃঃ ১৬৪-৬৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

চরম আকার ধারন করে। সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে 'বাহাস' বা তর্কযুদ্ধ মুসলিম সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে পরিণত হয়। 'বাহাস'-এর খোলাখুলি ও যুক্তিসঙ্গত বিতর্কের মধ্যদিয়ে মুসলিমগণ জিহাদসহ ইসলামী জীবন বিধানের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কেও সচেতন হওয়ার সুযোগ পায়।[৪৯] মুসলিমদের বিভিন্ন চিন্তা ও মতকে কেন্দ্র করে পরিচালিত 'বাহাস' পরবর্তীকালে মুসলিম ও খৃষ্টানদের মধ্যকার বাহাসে রূপ নেয়। এ ক্ষেত্রে মুন্‌শী মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৫০] এ পর্যায়ে মুসলিমদের বিভিন্ন দলের মধ্যকার বিভেদ অনেকাংশে প্রশমিত হয় এবং তাঁরা আত্ম-পরিচয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন।

ঢাকা, কলকাতা, হুগলী ও চট্টগ্রামের উচ্চতর মাদ্রাসাগুলো থেকে পাশ করে বেরিয়ে আসা গ্রাজুয়েটগণ এসময় মুসলিম জাগরণে মুখ্য ভূমিকায় এগিয়ে আসতে থাকেন।[৫১] শহুরে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিমগণ জিহাদ ও ফারায়েজী আন্দোলনের মৌলিক পুনর্গঠন এবং তাঁদের ইংরেজ বিরোধী নিরাপোস সংগ্রামের সাথে একাত্ম হতে পারেননি। ইসলামের পূর্ব গৌরব বা ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন যদিও তাঁরা দেখেছেন, কিন্তু সেই সাথে পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্যেও তাঁরা গৌরব খুঁজেছেন। তাই তাঁরা ইংরেজদের সাথে আপোস করেছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও ভাবধারার চাকচিক্যে বিমোহিত এই শহুরে শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির নেতৃত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসেন নওয়াব আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও সৈয়দ আমীর আলীর মত 'Enlightened' বা 'আলোক প্রাপ্ত' ব্যক্তিবর্গ। দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও এ তিনজনই ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলিমদের স্বাধিকার আদায়ের নীতিতে বিশ্বাস করতেন। তাঁরা মনে করতেন, ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে 'আধুনিকীকরণ' ছাড়া মুসলিমদের

---

[৪৯] পূর্বোক্ত।

[৫০] এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে মুন্‌শী মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র অবদান ও কর্মকান্ড সম্পর্কে আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করবো।

[৫১] দেখুন : মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৪-৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষে ভারতে আত্মমর্যাদা নিয়ে টিকে থাকা সম্ভব নয়। নওয়াব আবদুল লতিফ ও স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলিমদেরকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে এনে শিক্ষায় উন্নতি লাভের মাধ্যমে সামাজিকভাবে যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠার প্রবক্তা ছিলেন। অন্যদিকে সৈয়দ আমীর আলী নৈতিক পুনর্গঠন ও রাজনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুসলিমদের সঙ্গত দাবী আদায়ের কথা বলেছেন। মুসলিম সমাজের মধ্যবিত্ত অংশই ছিল তাঁদের চিন্তার কেন্দ্র বিন্দু। মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে গড়ে তোলাই ছিল তাঁদের স্বপ্ন।[৫২]

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ও সরকারী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-৯৩ খ্রীঃ) মনে করতেন, আত্মমর্যাদা নিয়ে টিকে থাকার স্বার্থে মুসলিমদের অবশ্যই ইংরেজি শিক্ষা ও এর মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য।[৫৩] তিনি ১৮৬৩ সালে 'Mohamedan Literary and Scientific Society' প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মুসলিম অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীর লোকের মধ্যে নতুন জ্ঞান এবং প্রয়োজনীয় তথ্য বিতরণ করা।[৫৪] এ সম্পর্কে Dr. Sufia Ahmed বলেন ঃ

> 'To impart useful information to the higher and educated classes of the Mahomedan community by means of Lectures, Addresses and Discourses on various subjects in literature, science and society, which are delivered, at the

---

[৫২] পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৬।

[৫৩] Enamul Haque (ed.), Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents, Dacca, 1968, P. 193.

[৫৪] আ. ফ. সালাহ্ উদ্দীন আহমদ, 'উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মকান্ড', বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রথম খন্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ২৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

monthly meetings, in the Urdoo, Persian, Arabic and English languages'.[৫৫]

শাসক শ্রেণীর প্রতি পুরোমাত্রায় আনুগত্য স্বীকার করার ফলে আবদুল লতিফ ১৮৭৭ সালে 'খান বাহাদুর', ১৮৮০ সালে 'নবাব', ১৮৮৩ সালে 'সি.আই.ই.' এবং ১৮৮৭ সালে 'নবাব বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন।[৫৬] ফলে মুসলিম নেতারূপে তাঁর খ্যাতি কেবল বাংলাতে সীমাবদ্ধ ছিলনা, বরং একজন সর্বভারতীয় মুসলিম নেতা হিসেবেও তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন।[৫৭]

মুসলিম সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে আবদুল লতিফের প্রথম কাজ ছিল ইংরেজদের প্রতি মুসলিমদের যে বিরূপ মনোভাব রয়েছে, তা দূর করে সরকারের প্রতি তাদের অনুগত করে তোলা। তাঁর দ্বিতীয় কর্মসূচী ছিল মুসলিম সমাজে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। কারণ ইংরেজি ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে হিন্দু সম্প্রদায় ইতোমধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। তাঁর তৃতীয় কর্মপন্থা ছিল চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য সরকারের নিকট হতে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আদায় করা। সাংগঠনিক চিন্তা ও ঐক্যবদ্ধ কর্ম প্রয়াসের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি চতুর্থ কর্মসূচী হিসেবে সভা-সমিতি স্থাপন করেন। উচ্চবিত্তের সাথে মধ্যবিত্তের মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল সভা-সমিতির মাধ্যমে।[৫৮] শিক্ষার উন্নয়নকল্পে পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনের কথা তিনি ১৮৬১ সালে

---

[৫৫] Sufia Ahmed, Muslim Community in Bengal: 1884-1912; বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় : ১৮৮৪-১৯১২, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃঃ ৮৪।

[৫৬] ওয়াকিল আহমদ,উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা,প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ১০২।

[৫৭] আ. ফ. সালাহ্ উদ্দীন আহমদ, উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মকান্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৫।

[৫৮] ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

হুগলী মাদ্রাসা ও ১৮৬৯ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন। ধর্ম শিক্ষার জন্য মুহ্‌সিন ফান্ড ও অন্যান্য ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অর্থ নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, মুসলিম ছাত্রাবাস নির্মাণ, ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তিপ্রদান ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা হোক - এ বিষয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন রিপোর্টে এবং সোসাইটির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে সরকারকে অবহিত করেছেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতায় একটি স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল। তাই সরকারী খরচে প্রেসিডেন্সী কলেজ (১৮৫৪) স্থাপিত হলে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সেখানে হিন্দু-মুসলিম উভয়ের সমান প্রবেশাধিকার ছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁর উদ্যোগে মুহ্‌সিন ফান্ডের উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে (১৮৭৪)। এর সাথে মুসলিম শিক্ষক নিয়োগেরও ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতে ১৮৫৪ সালে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ইংরেজি-ফার্সী বিভাগ খোলা হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ বিষয়ে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন : 'দেশের জনসাধারণের শিক্ষার জন্য বিশেষতঃ মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি অতিবাহিত করেছি'।[৫৯]

Mohamedan Literary Society-এর সভায় তিনি ১৮৭০ সালে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীকে আহ্‌বান করে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন, যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। নওয়াব আবদুল লতিফ উক্ত বক্তৃতার ধারা বিবরণী নিজে প্রণয়ন করে তার পাঁচ হাযার কপি ভারতের মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন।[৬০]

আবদুল লতিফ ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে জোরালোভাবে সমর্থন করতেন এবং এটাকে তুলে দিয়ে এর স্থানে মুসলিমদের জন্য আধুনিক ইংরেজি স্কুল-কলেজ স্থাপন করার যে প্রস্তাব সৈয়দ আমীর আলী করেছিলেন, তিনি তার তীব্র

---

[৫৯] ওয়াকিল আহমদ কর্তৃক উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধিতা করেন। অবশ্য সরকার আবদুল লতিফের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁরই প্রভাব ও সুপারিশের ফলে বাংলাদেশে দু'টি সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থা - একটি আধুনিক এবং অপরটি ঐতিহ্যিক অর্থাৎ মাদ্রাসা—স্থায়ীভাবে টিকে আছে।[৬১]

নওয়াব আবদুল লতিফ সম্পর্কে অনেকের অভিযোগ এরকম - তিনি অত্যধিক রাজভক্তি দেখিয়েছেন, তাঁর কর্ম প্রয়াস আবেদন-নিবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তিনি রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ধারে কাছেও যাননি, তিনি রক্ষণশীল মনোভাব বজায় রেখে শিক্ষা-সংস্কার চেয়েছেন, তিনি বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে প্রাধান্য দিয়েছেন ইত্যাদি।[৬২] উক্ত সব মন্তব্য তাঁর ক্ষেত্রে আংশিক সত্য হলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি যা করেছেন তা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়, বরং তদানীন্তন পরিবেশ পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজের স্বার্থেই তা করেছেন। অবশ্য বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর মনোভাব এমনটি না হলে আরও ভাল হত। কলিকাতার ক্ষয়িষ্ণু, ভগ্ন, জরাগ্রস্ত সামন্তবৃত্তের গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে যদি বাংলার জনগণের সাথে একাত্ম হতে পারতেন, তাহলে তাঁর কর্মের সুফল সম্ভবতঃ অধিক ফলত। এতদ্‌সত্ত্বেও বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবশ্যই অনস্বীকার্য।

---

[৬০] Bradley-Birt, F.B. op. cit., P. 131.

[৬১] বদরুদ্দীন উমর, সংস্কৃতির সংকট, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃঃ ৫৭।

[৬২] দেখুন : আ. ফ. সালাহ্ উদ্দীন আহমদ, 'উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মকান্ড', প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৭; W. S. Blunt, India Under Ripon, London, 1909, P. 97; সালাহউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫-৫৭; ইমরান হোসেন, বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) বাংলায় মুসলিম সমাজের উন্নতি-অগ্রগতি ও জাগরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলার মুসলিমদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি (১৮৯০-১৯০৪ খ্রীঃ) হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি ১৯০৯ সালে ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হন। ইতোপূর্বে আর কোন ভারতীয় এ সম্মান পাননি। তিনি ১৮৬৪ সালে খান বাহাদুর, ১৮৭৫ সালে নবাব ও ১৮৮৭ সালে সি.আই.ই উপাধি লাভ করেন।[৬৩]

জ্ঞানগর্ভ, তথ্য ভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীল বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন সৈয়দ আমীর আলীর অবিস্মরণীয় কীর্তি। ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতি ভিত্তিক রচিত গ্রন্থসমূহ তিনি যে উদ্দেশ্যে রচনা করেন তা হচ্ছে— মুসলিম চিন্তা-চেতনার উৎকর্ষ সাধন, আত্ম-জিজ্ঞাসার উদ্বোধন এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষের মাধ্যমে মুসলিম জাগরণ ত্বরান্বিত করা। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থই ইংরেজিতে রচিত। তবে দু'একটি উর্দু গ্রন্থও আছে। তাঁর প্রধান প্রধান কয়েকটি গ্রন্থ হচ্ছে-

1. A Critical Examination of Life and Teaching of Muhammad (Sm), Eden Burg, 1873.
2. The Spirit of Islam, London, 1891.
3. Legal Status of Women in Islam, London, 1891.
4. A Short History of the Saracens, London, 1898.
5. Christianity from the Islamic Stand-point, London, 1906.

তাঁর মতে, মুসলিম জাতির পতনের মূল কারণ ইসলামের আদর্শ পুরোপুরি অনুসরণ না করা এবং ইসলামকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা ও হযরত মুহাম্মদ (স) এর

[৬৩] আ. ফ. সালাহ উদ্দীন আহমদ, রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা, পৃঃ ২৮৮; বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ, পৃঃ ৫৮-৫৯; ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ১ম খন্ড, পৃঃ ১১২-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনাদর্শের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাধ্যমেই মুসলিমদের পুনর্জাগরণ সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।[৬৪] স্যার সৈয়দ আহমদের ন্যায় সৈয়দ আমীর আলী ইসলামকে উনিশ শতকের ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার আলোকে পুনর্মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা করার প্রয়সা পেয়েছেন। একদিক দিয়ে তিনি স্যার সৈয়দকেও ছাড়িয়ে গেছেন। স্যার সৈয়দ আহমদ যেখানে বলেছেন যে, ইসলাম প্রগতির পরিপন্থী নয়, সেখানে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামই প্রগতির প্রতীক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মুসলিমদের উচিত 'ইজ্‌তিহাদ্' প্রয়োগ করে সমকালীন অবস্থার আলোকে এবং যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী ইসলামের পুনর্মূল্যায়ন করা।[৬৫] A. Guillaume-এর বক্তব্যে এর সমর্থন পাওয়া যায়।[৬৬]

উনিশ শতকের মুসলিম নেতাদের মধ্যে তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম মুসলিমদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা চিন্তা করেন এবং ১৮৭৮ সালে National Muhammedan Association নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।[৬৭] অবশ্য কেহ কেহ উক্ত সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৮৭ সাল বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৮] তবে প্রথম মতটি সঠিক বলে মনে হয়। কারণ তাঁর আত্মজীবনীতে ও তা-ই উল্লেখ রয়েছে।[৬৯]

এ সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ন্যায় ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুসলিমদের কল্যাণ সাধন করা এবং অতীতের সুমহান ঐতিহ্য থেকে প্রেরণা লাভ করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সমকালীন যুগের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে একটা সমঝোতা সাধন করা।[৭০] এর অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল - ভারতীয় মুসলিমদের

---

[৬৪] Syed Ameer Ali, The Spirit of Islam, London, 1955 (8th edition), P. VII (Preface).

[৬৫] Syed Ameer Ali, The Spirit of Islam, Ibid, P. 184.

[৬৬] দেখুন : A. Guillaume, Islam, 2nd ed., Penguine, 1956, P. 175.

[৬৭] সুফিয়া আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৯; ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৩।

[৬৮] ইমরান হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০; সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৮৯।

[৬৯] K.K. Aziz (ed.), Ameer Ali : His Life and Works, Lahore, 1968, P. 567.

[৭০] The Rules and Objects of the Central National Mahomedan Association with a list of the members, Calcutta, 1882; K. K. Aziz (ed.), Ibid, P. 46.

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ, তাদের নৈতিক উন্নতি সাধন এবং সরকারের কাছ থেকে তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায় করা। ভারতের অমুসলিম অধিবাসীদের স্বার্থ-সংরক্ষণের প্রচেষ্টাও ছিল এ সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য।[৭১] ১৮৮৩ সালে সংগঠনটিকে সর্বভারতীয় পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে এর নাম পরিবর্তন করে Central National Muhammedan Association রাখা হয়েছিল। ১৮৮৮ সালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এর কমপক্ষে পঞ্চাশটি শাখা স্থাপিত হয়।

১৮৮২ সালে সংগঠনের পক্ষথেকে বড়লাটের কাছে একখানা 'স্মারকলিপি' পেশ করা হয় এবং এতে মুসলিমদের কতগুলি দাবি-দাওয়া উত্থাপন করা হয়। এদের মধ্যে একটি ছিল বাংলাতে অন্ততঃ সরকারী চাকুরীর এক-তৃতীয়াংশ যাতে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত থাকে সরকারকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।[৭২] সংস্থার ১৮৮২ সালের স্মারক পত্রে সরকারের নয়া শিক্ষানীতিকে গতিশীল বলে অভিনন্দিত করা হয়। এই নীতি ছিল মূলতঃ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি। স্মারকলিপির ভাষায়-

> "Every hope for the regeneration of India depends at present upon the spread of English education and the diffusion of Western ideas through the medium of the English language."[৭৩]

১৮৮২ সালে সৈয়দ আমীর আলী লন্ডন থেকে প্রকাশিত The Nineteenth Century নামক পত্রিকায় A cry from the Indian Mohamedans নামক প্রবন্ধে সরকারের কাছে সংস্থার দাবিগুলোর পুনরুল্লেখ করেন, যদিও নওয়াব আব্দুল লতিফের বিরোধিতার ফলে তা নাকচ হয়ে যায়।[৭৪]

---

[৭১] আ. ফ. সালাহ্ উদ্দীন আহমদ, রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মকান্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯০।
[৭২] Anil Seal, The Emergence of Indian Nationalism : Competition and Collaboration in Later Nineteenth Century, Cambridge, 1968. P. 312 (foot note).
[৭৩] K.K. Aziz (ed.), op.cit., P. 38.
[৭৪] সালাহ্ উদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আমীর আলীর চিন্তাশীল কর্মধারা ও মননশীল রচনাবলী বাংলার মানুষের কাছে যদি সরাসরি পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা হত, তা হলে সম্ভবতঃ তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে জোয়ার আনতে পারতেন। তবে তিনি সমাজের বদ্ধ মুখ, রুদ্ধ গতি অপসারিত করে নবজাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে খানিকটা হলেও সক্ষম হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।[৭৫]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের শেষপাদে উত্তর ভারতে দু'টি সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়। একটি দেওবন্দে (১৮৬৭ খ্রীঃ) এবং অন্যটি আলীগড়ে (১৮৭৫ খ্রীঃ)। প্রথমটির নেতা ছিলেন মাওলানা আবুল কাশেম নানুতুভী (১৮৩২-৮০ খ্রীঃ) এবং দ্বিতীয়টির স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-৯৮ খ্রীঃ)। দেওবন্দে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে প্রথমোক্ত আন্দোলন ও মতবাদ গড়ে উঠে। এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ মূলতঃ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (রঃ)-এর মতাদর্শের অনুসারী। প্রথম দিকে তাঁরা সক্রিয় রাজনীতি হতে দূরে ছিলেন। পরে অবশ্য তাঁরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। Moin Shakir-এর বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা প্রচন্ড বৃটিশবিরোধী ছিলেন, তবে কংগ্রেসের রাজনৈতিক সমর্থক ছিলেন।[৭৬] প্রথমে তাঁরা আধুনিক শিক্ষারও বিরোধিতা করতেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্যের ভাবধারা গ্রহণ করলে মুসলিমগণ খ্রীষ্টান হয়ে যাবে। তাই বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি এবং ইসলামী চেতনার বিকাশ সাধন ছিল তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। দেওবন্দপন্থীগণ মুসলিম লীগের দ্বিজাতি-তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না।[৭৭] তাঁরা আধুনিক চিন্তা-চেতনা বা জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণায় পশ্চাদ্‌গামী ছিলেন।[৭৮]

অন্যদিকে স্যার সৈয়দ আহমদ ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মুসলিম জাতির পশ্চাদ্‌পদতা দূর করতে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান। মুসলিম সমাজের উন্নয়নকল্পে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান এই যে, তিনি ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ১৮৭৫ সালে 'আলীগড় মোহামেডান ওরিয়েন্টাল কলেজ'

---

৭৫ ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ১১৬।
৭৬ Moin Shakir, Khilafat to Partition, 1919-1947, Delhi, 1970, P. 40.
৭৭ Z. H. Faruqi, 'Muslim Opposition to Pakistan', T. W. Wallbank (ed.), The Partition of India : Causes and Responsibilities, Boston, 1966, P. 59.

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপন করেন। এ কলেজে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে ধর্মীয় শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। এ কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্যার সৈয়দ মুসলিম সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের যে আন্দোলন গড়ে তোলেন, তা 'আলীগড় আন্দোলন' নামে পরিচিত। এ মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনে কবি আলতাফ হুসায়ন হালী, মুহ্‌সিনুল্ মুল্‌ক, নাজির আহমদ, চেরাগ আলী প্রমুখ মনীষীবৃন্দ যোগদান করে আন্দোলনের গতিকে ত্বরান্বিত করেন।[৭৯]

স্যার সৈয়দের রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ে তাঁকে আমরা দেখতে পাই একজন সাহসী, উদারমনা ও বৃটিশ সমর্থক নেতা হিসেবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে একজন কংগ্রেস বিরোধী মুসলিম নেতা হিসেবে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের সময় তিনি বৃটিশ সরকারকে এ যুক্তিতে সমর্থন করেছিলেন যে, বৃটিশ রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে মুঘল সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলে মধ্যযুগীয় সামন্তবাদই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে তিনি মনে করতেন যে, ইংরেজ শাসনের মাধ্যমেই বাংলা-ভারতের অধিবাসীগণ আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছে এবং বিভিন্নদিকে অভূতপূর্ব উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ১৮৫৮ সালে তিনি উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় একটি পুস্তক রচনা করেন,[৮০] যেখানে তিনি এ মত ব্যক্ত করেন যে, ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের মূল কারণ হল বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে ভারতীয়দের যোগাযোগ ও পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব। তাই তিনি সুপারিশ করেন যে, অনতিবিলম্বে ভারতীয় আইনসভায় ভারতীয় প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।[৮১] বৃটিশ সরকার তাঁর এ সুচিন্তিত সুপারিশকে স্বাগত জানায়।

সুতরাং বলা যায় যে, স্যার সৈয়দ এদেশে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের দাবি উত্থাপনের ব্যাপারে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাছাড়া প্রথম

---

[৭৮] S. Abid Hussain, The Destiny of Indian Muslims, Bombay, 1965, PP. 43-44.

[৭৯] আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৪-৫।

[৮০] পুস্তকটির উর্দু নাম 'আসবাব'-ই বাগাওয়াত-ই হিন্দ' এবং ইংরেজি নাম 'On the causes of the Indian Revolt'.

[৮১] G. F. L. Graham, The Life and Works of Sir Syed Ahmad Khan, London, 1909, 2nd ed., PP. 27-28; আরও দ্রঃ, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ'র ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, ঢাকা,, ১৯৮২, পৃঃ ৩৬১-৬২।

Dhaka University Institutional Repository

দিকে তিনি মনে করতেন যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলিম প্রকৃত অর্থে এক জাতি এবং তিনি তাদের এক হওয়ার জন্য মনে প্রাণে আহবান জানিয়েছিলেন।[৮২] ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত Indian Association -এর সভায় তাঁকে যে মানপত্র দেয়া হয়, তার উত্তরে তিনি বাঙালীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপর বিশেষভাবে জোর দেন।[৮৩]

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) স্থাপিত হওয়ার প্রায় এক বছর পর ১৮৮৬ সালে স্যার সৈয়দের নেতৃত্বে একটি কংগ্রেস বিরোধী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার নাম দেওয়া হয় 'United Indian Patriotic Association'. কংগ্রেস গঠিত হয়েছিল ইংরেজিশিক্ষিত উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের নিয়ে। অপরদিকে Patriotic Association-এর সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন নবাব ও জমিদার শ্রেণীর লোক এবং এঁরা ছিলেন বৃটিশদের একান্ত অনুগত। কংগ্রেসের মতো হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গই এ সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৮৮৮ সালে এ সমিতির একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, যেখানে এর উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। এ পুস্তিকায় দেখা যায় যে, Patriotic Association-এর হিন্দু সদস্যগণ যেমন কংগ্রেসকে হিন্দুবিরোধী সংস্থা বলে অভিহিত করেছেন, তেমনি আবার এর মুসলিম সদস্যগণও কংগ্রেসকে মুসলিম বিরোধী দল হিসেবে মনে করতেন। মুসলিম স্বার্থের প্রতি স্যার সৈয়দের সজাগ দৃষ্টি ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, কংগ্রেস ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুকরণে নির্বাচন প্রথার উপর ভিত্তি করে যে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রণয়নের দাবি করছিল, তা পূরণ হলে এদেশের মুসলিমগণ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেহেতু হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেহেতু সাধারণ নির্বাচনের ফলে তারাই ক্ষমতার সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে এবং মুসলিমরা বঞ্চিত ও অবহেলিত থেকে যাবে। বস্তুতঃ ১৮৯২ সালে Indian Councils' Act অনুযায়ী দেখা গেল, খুব কম সংখ্যক মুসলিমই নির্বাচিত হতে পেরেছে।

---

[৮২] The Moslem Chronicle, Calcutta, June 4, 1896.

[৮৩] Ibid; A. F. Salahuddin Ahmed, 'Political Thought and Activities in the Ninetheenth Century' in History of Bangladesh, Vol. one, Sirajul Islam (ed.), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1992, P. 258.

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৭-১৯২০)-এর ন্যায় কিছু সংখ্যক রক্ষণশীল ও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হিন্দু নেতা কংগ্রেসে অনুপ্রবেশের ফলে মুসলিম জনসাধারণের মনে কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল । এ সময় হিন্দুত্বের পুনরুত্থান আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং তিলক ও তাঁর অনুসারীরা এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছেন । তাঁদের উদ্যোগে ঘটা করে 'শিবাজী উৎসব' পালন করা হয়েছে । শুধু তাই নয়, গো-হত্যা নিবারণের জন্য গো-রক্ষা সমিতিও গঠিত হয়েছে । কিছু সংখ্যক হিন্দু নেতার এই ধরনের কার্যকলাপ এবং সেই সঙ্গে থিওডোর বেক ও থিওডোর মরিসন প্রমুখ কট্টর সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্ররোচনায় ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং কয়েকটি অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় ।

উনিশ শতকের উক্ত সাম্প্রদায়িক বিরোধ বিশ শতকে আরো তীব্র আকার ধারণ করে । বাংলার বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু ও মুসলিম নেতা উভয় সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্যপূণ সহ-অবস্থানের ভিত্তিতে এই বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন । যেমন-১৯১৬ সালের কংগ্রেস-মুসলিম লীগের লখ্নৌ চুক্তি, ১৯২৩ সালে সম্পাদিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সাথে মুসলিম নেতাদের বেঙ্গল প্যাক্ট, ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের পর কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা এ. কে. ফজলুল হক ও কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন প্রচেষ্টা এবং পরিশেষে ১৯৪৭ সালে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতার স্বাধীন যুক্তবাংলা গঠনের প্রস্তাব ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় মুসলিম জাগরণের নব-পর্যায়ে ধর্মীয় বিধি-বিধান সংক্রান্ত 'নসিহতনামা' বিষয়ক বহু বইপত্র প্রকাশিত হয় । সাহিত্য সৃষ্টির আকাঙ্খার চেয়ে সমাজ সংশোধনের প্রেরণাই এসব বই লেখার পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে । এসব বই-পুস্তক বাংলার মুসলিমদেরকে তাদের আত্মপরিচয়ে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রতিবেশী হিন্দুদের থেকে নিজেদের স্বকীয়তা সম্পর্কে সচেতন করতে সহায়ক হয় । উদাহরণস্বরূপ প্রখ্যাত আলিম মুহাম্মদ নঈমুদ্দীনের (১৮৩২-১৯০৮) 'জুবদাত আল্ মাসাইল', শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩১)-এর 'হজরত

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদের (স.) জীবন চরিত ও ধর্মনীতি' (১৮৮৭), 'ইসলাম' (১৮৯৬), 'নামাজ তত্ত্ব' (১৮৯৮) ও 'হজ্জ্ব বিধি' (১৯০৩); একীনুদ্দীন আহমেদের 'ইসলাম ও ধর্ম-নীতি' (১৯০০); সমিরুদ্দীন আহমদের 'মুহাম্মদীয় ধর্ম সোপান' (১৯০২) এবং সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর 'ঈদুল আযহা' (১৯০০) ও 'মৌলুদ শরীফ' (১৯০৩) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থের মাধ্যমে লেখকগণ মুসলিম জাগরণের যে প্রয়াস চালান, তা মুসলিমদের আত্মবিশ্বাস ও সচেতনতা ফিরিয়ে আনতে ব্যাপক অবদান রাখে। এতদ্ব্যতীত আরও যেসব গ্রন্থ তখন প্রকাশিত হয়, সেগুলো হচ্ছে– রিয়াজ উদ্দীন আহমদের 'সূর্য বিজয়' (১৮৯৫) এবং 'গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ' (১৮৯৯-১৯০৮); আবদুল করিমের 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' (১৮৯৮); মুইজুদ্দীন আহমদের 'তুরস্কের ইতিহাস' (১৯০৩); শেখ আবদুল জব্বারের 'মক্কা শরীফের ইতিহাস' (১৯০৬) ও 'মদীনা শরীফের ইতিহাস' (১৯০৭); নওশের আলী খান ইউসুফ জাঈয়ের 'বঙ্গীয় মুসলমান' (১৮৯১); কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫২)-এর 'অশ্রুমালা' (১৮৯৫) ও 'মহাশ্মশান কাব্য' (১৯০৪) ইত্যাদি।

এ সময়ে মুসলিম সমাজে একদল প্রখ্যাত সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। এঁদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ (১৮৬১-১৯০৭), মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩), পন্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশ্হাদী (১৮৫৯-১৯১৯), মুন্শী জমীর উদ্দীন (১৮৭০-১৯৩৭), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), দেলোয়ার হোসেন আহমদ মীর্জা (১৮৪০-১৯১৩), সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬), শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬), আবদুল হামিদ খান ইউসুফ জাঈ (১৮৪৫-১৯১০), মাওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), হাকিম হাবিবুর রহমান (১৮৮১-১৯৪৭), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭৯-১৯৩১) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৮৪]

---

[৮৪] বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। এঁদের মধ্যে মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এবং হাকিম হাবিবুর রহমানের জীবনের বিভিন্ন দিক ও অবদান সম্পর্কে পরে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ ও সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করা হল। উল্লেখ যে, হাকিম হাবিবুর রহমানের অবদান উর্দু সাহিত্যকে ঘিরে এবং অন্যদের বাংলা সাহিত্যকে ঘিরে আবর্তিত হয় - গবেষক।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলার মফস্বল এলাকায় বিশেষতঃ নদীয়া, যশোর, খুলনা ও মালদহে খ্রিষ্টান মিশনারী তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের বইপত্রে ইসলাম, মুসলিম ও রাসূলুল্লাহ্ (স.) সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর অপপ্রচার চালায়। তাদের এ অপতৎপরতার বিরুদ্ধে নব্যশিক্ষিত মুসলিম ও আলিম সমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাঁরা খ্রীষ্টানদের মোকাবেলায় সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসেন।[৮৫]

খৃষ্টান মিশনারী তৎপরতার বিরুদ্ধে সে সময় সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন যশোরের মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭)। এতদুদ্দেশ্যে তিনি নিম্নোক্ত কর্ম-কৌশল অবলম্বন করেন- ১. ওয়াজ-নসিহত, ২. লেখালেখি, ৩. পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচার, ৪. বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা, ৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং ৬. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণকে আত্মসচেতন করে তোলা। উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত প্রতিটি কর্ম-কৌশল মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছিল।

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ খ্রীষ্টানদের সাথে বেশ কিছু বাহাসে (তর্ক যুদ্ধে) অবতীর্ণ হয়ে খ্রীষ্ট ধর্মের অসারতা প্রমাণ করেন এবং মুসলিম জনগণের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আশার সঞ্চার করেন। তিনি শীঘ্রই উপলব্ধি করেন যে, খ্রীষ্টানদেরকে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে পরাভূত করার চেয়েও বেশী প্রয়োজন হল মুসলিমদের মধ্যে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার প্রচার। তাই তিনি গ্রাম-গঞ্জের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল স্তরের মানুষের সাথে ব্যাপক সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেন। শহরের Muslim Educational Conference-গুলোতে বুদ্ধিবৃত্তিক অংশগ্রহণ ও পান্ডিত্বপূর্ণ

---

[৮৫] খ্রীষ্টান মিশনারী বিষয়ক বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে; Muhammad Mohar Ali, The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities (1833-1857), Chittagong, 1965; সহ দ্রঃ Sunil Kumar Chatterji, Srerampore Missionaries and Christian Muslim Interaction in Bengal, Calcutta, 1981; K.P. Sengupta, The Christian Missionaries in Bengal, Calcutta; মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, 'বৃটিশ বাংলায় খৃষ্টান মিশনারী' শীর্ষক প্রবন্ধ, ৩৪-তম বার্ষিক সম্মেলন-২০০৩ উপলক্ষে বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'স্মরণিকা'; ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ ও তৎকালীন সমাজ, দৈনিক সংগ্রাম, ২৯ মার্চ, ২০০১; নাসির হেলাল, মুসলিম জাগরণে মুন্‌সী মেহের উল্লা, দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ জুন, ২০০২।

আলোচনার জন্য তিনি ছিলেন ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। আবার গ্রামাঞ্চলের ওয়াজ মাহফিলগুলিতেও তাঁর আকর্ষণ ছিল অতুলনীয়।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সহকর্মী ছিলেন শেখ জমিরুদ্দীন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে শেখ জমিরুদ্দীন খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে পুনরায় তিনি খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করে স্বধর্মে ফিরে যান এবং মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সহকারীরূপে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।[৮৬] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, শেখ জমিরুদ্দীন পুনঃইসলাম গ্রহণ করলে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌ তাঁকে লিখেছিলেন ঃ

> "প্রিয় ভ্রাতঃ আচ্ছালামু আলায়কুম। পরে জানিবেন- আপনার ১৪ই বৈশাখের পত্র পাইলাম। আমি আপনাকে এই পরামর্শ দিই, আপনি প্রথমতঃ কিছুদিন ধর্ম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ও নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী 'সুধাকরে' প্রকাশ করিতে থাকুন এবং ধর্ম সম্বন্ধে ২/১ খানা পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করুন, যদি ছোট ছোট পুস্তক ছাপার ব্যয় বহন করা আপনার ক্ষমতা না হয়, তবে খোদাতালার ফজল হইলে আমরা সে ভার গ্রহন করিব। এইভাবে ক্রমে সমাজের নিকটে পরিচিত হইলে আমরা দূর দারাজহস্ত ধর্মসভা হইতে আপনাকে নিমন্ত্রণ করাইব। মধ্যে কতকটা সভাতে বক্তৃতা করিলে আপনি শীঘ্রই মুসলমান সমাজের ভক্তিভাজন হইতে পারিবেন। তখন অবাধে আপনি বঙ্গের চারিদিকে ইসলাম প্রচার করিয়া প্রতিপিত্তি লাভ করিতে পারিবেন। আজকাল বঙ্গদেশে বাঙ্গালা অভিজ্ঞ ইসলাম প্রচারকের এতই আবশ্যক হইয়াছে যে, আপাততঃ ২০/২৫ জন ভাল প্রচারক হইলেও সে অভাব পূরণ হয়না।"[৮৭]

এমনিভাবে তাঁর উৎসাহে গড়ে উঠেছিল একটি দক্ষ ওয়ায়েয গোষ্ঠী। এঁরা হলেন শেখ (মুন্‌শী) মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, শেখ ফজলুল করিম, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ প্রমুখ মনীষী। ওয়ায ও বক্তৃতার ক্ষেত্রে তিনি এতটাই সাফল্য অর্জন করেছিলেন যে, তৎকালীন সময়ে বাংলা, বিহার ও আসামে তাঁর সমকক্ষ কোন ওয়ায়েয ছিলনা। তাই তাঁকে 'বাগ্মীকুল তীলক', 'বক্তাকুল

---

[৮৬] যশোর জেলায় খ্রীস্ট মন্ডলী, পৃঃ ৪২-৪৩; উদ্ধৃত : নাসির হেলাল, মুসলিম জাগরণে মুন্সী মেহের উল্লা, দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ জুন, ২০০২।
[৮৭] উদ্ধৃত : নাসির হেলাল, পূর্বোক্ত, মুন্সী মেহের উল্লা রচনাবলী, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৭৩-২৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

শিরোমনি', 'যশোরের চেরাগ', 'বাংলার মার্টিন লুথার', 'মুসলিম জগতের রামমোহন' ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৮৮]

উক্ত সময়ে মুসলিম গণজাগরণের ক্ষেত্রে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ ও তাঁর অনুসারীদের লেখালেখি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত পুস্তিকা 'খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা' (১৮৮৭)। খৃষ্টান মিশনারীদের ইসলাম বিরোধী আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার জন্য এ গ্রন্থ লেখা হয়েছে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'খ্রীস্টীয় বান্ধব' পত্রিকায় শেখ জমিরুদ্দীনের 'আসল কুরআন কোথায়' শীর্ষক প্রবন্ধখানা প্রকাশিত হয়, যাতে লেখক প্রমাণ করার চেষ্টা করেন 'আসল কুরআন' কোথাও নেই। এ লেখাটির জবাবে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ লিখেন 'ঈসাই বা খ্রীস্টানী ধোকা ভঞ্জন' শীর্ষক প্রবন্ধখানা, যা কলিকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সুধাকর' পত্রিকার ১২৯৯ ও ১৩০০ সালের চৈত্র-বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বের হয় এবং পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এর পরই জমিরুদ্দীন পুনরায় স্বধর্মে ফিরে আসেন। এভাবে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ একে একে রচনা করেন- ১. রদ্দে খ্রীস্টিয়ান ও দলিলোল ইসলাম-১ম খন্ড (১৮৯৫), ২. হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা (১৮৯৮), ৩. খ্রিস্টান ও মুসলমান তর্কযুদ্ধ (১৯০৮), ৪. ইসলামী বক্তৃতামালা (১৯০৮), ৫. জওয়াবোন্নাছারা (১৯০৯), ৬. বাবু ইশান চন্দ্র মন্ডল ও চার্লস্ ফাঙ্কের ইসলাম গ্রহণ (সংগ্রহ) প্রভৃতি গ্রন্থ।[৮৯] এসব পুস্তক-পুস্তিকায় তাঁর প্রগাঢ় ধর্ম জ্ঞান ও বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি যে কেবল নিজেই লিখেছেন তা নয়, বরং লেখালেখির ক্ষেত্রেও তিনি গড়ে তুলেছিলেন একটি লেখকগোষ্ঠী। এঁরা ছিলেন কেউ কেউ সরাসরি কবি-সাহিত্যিক এবং অন্যরা ছিলেন সাংবাদিক। তাঁর অনুসারী সাংবাদিকগণ ইতিহাসে 'সুধাকর দল' নামে সুপরিচিত। অন্যদিকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসারী কবি-সাহিত্যিকরা

---

৮৮ পূর্বোক্ত, মাসিক বাসনা, কলিকাতা, চৈত্র, ১৩১৫ বাংলা।
৮৯ নাসির হেলাল, পূর্বোক্ত; ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ ও তৎকালীন সমাজ, দৈনিক সংগ্রাম, ২৯ মার্চ, ২০০১; অধ্যাপক আবদুল গফুর (সম্পা.) আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

হলেন- শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, শেখ ফজলুল করীম বিদ্যাবিনোদ, মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ ।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ পশ্চাৎপদ মুসলিমদের জাগরণের লক্ষ্যে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ এবং প্রচারের মাধ্যমেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন । তিনি ব্যক্তিগতভাবে 'মিহির', 'মিহির ও সুধাকর' 'সোলতান' প্রভৃতি পত্রিকার সাথে জড়িত থেকে কাজ করেছেন, এমনকি পত্রিকার গ্রাহক বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন মাহফিলে ঘোষণা প্রদান করেছেন ।

মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য, তাদেরকে আত্মসচেতন করে তোলার জন্য, ইসলামের দাওয়াত তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌছে দেয়ার জন্য তিনি বক্তৃতা, লেখা-লেখি ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন, সমিতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেন । যেমন তিনি যশোরে 'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা' নামক সংগঠন, নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি, বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি, আঞ্জুমানে নূরুল ইসলাম, যশোরে 'মাদ্রাসায়ে কারামাতিয়া' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাসহ বহু স্কুল-মক্তব, মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন ।

বাংলার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন না হলে কোন কিছুতেই যে কল্যাণ হবে না, এ বিষয়টা মাথায় রেখেই তিনি ওয়ায মাহফিল ও সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করতেন । তাঁর জীবনীকার আসির উদ্দীন প্রধান এরূপ একটি জলসার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন :

> "চার সহস্রাধিক লোকের উপস্থিতিতে স্বনামধন্য বক্তা বাগ্মীকুল তীলক মুন্‌শী সাহেব মাগরেবের নামাজ অন্তে দন্ডায়মান হইয়া সমাজ পতন ও উদ্ধার বৃত্তান্ত, এবাদতের গৌরব, জীবনের কর্তব্য কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্ত্রী শিক্ষা, শিক্ষার উপকারিতা, মক্তব-মাদ্রাসা ও স্কুল স্থাপন, শিল্প-শিক্ষা, ধর্মগত প্রাণ গঠন, ব্যায়াম চর্চা, সভা-সমিতির উপকারিতা, বায়তুলমাল তহবিল গঠন, বাল্য বিবাহের দোষ, অপব্যয়, সমাজ উন্নতির উপায়, ঘোর স্বজাতি আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে রাত ১২টা পর্যন্ত বক্তৃতা করেন ।"[৯০]

---

৯০ উদ্ধৃত : নাসির হেলাল, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্নের দেয়া বিবরণ হতে জানা যায় যে, মেহেরুল্লাহ্ মুসলিম সমাজে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রচলন করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, উৎসাহ দিতেন কৃষিকাজ করার জন্য । তাঁর চেষ্টা বহু স্থানেই ফলবতী হয়েছিলো ।[৯১] এক কথায় বলতে গেলে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছেন, তা সত্যিই তুলনাহীন এবং বিস্ময়কর । মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সহকর্মী সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীও (১৮৭৯-১৯৩১ খ্রীঃ) মুসলিম জাতিকে আত্ম-পরিচয়ে উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন । ছাত্রাবস্থায় তিনি রেয়াজুদ্দীন মাশহাদীর 'সমাজ ও সংস্কারক' গ্রন্থ পড়ে সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানীর স্বাধীনচেতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন ।

স্বসমাজের স্বার্থের অথবা আদর্শের বিরুদ্ধে যখন কোন আঘাত এসেছে, তখনই তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন । সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের এক সভায় ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন আল্-কুরআনকে সর্বশেষ আসমানীগ্রন্থ এবং হযরত মুহাম্মদ (স.)কে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসাবে স্বীকার করতে চাননি; বরং তিনি উক্ত সভায় শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, মার্টিন লুথার, রামমোহন রায় প্রমুখকে প্রেরিত পুরুষ বলে উল্লেখ করেন । সিরাজী গিরিশ চন্দ্রের এই মতের তীব্র বিরোধিতা করে প্রকাশ্যে বক্তৃতা করেন ।[৯২] অনুরূপভাবে বনোয়ারী লাল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহযোগিতায় ও 'গোরক্ষিণী সমিতি'র উদ্যোগে আয়োজিত সভায় পন্ডিত যাদব চন্দ্র তালুকদার গো-হত্যার বিরোধিতা করে বক্তৃতা করলে সৈয়দ সিরাজী হিন্দুশাস্ত্র হতে বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেন যে, পূর্বকালে আর্যরা গো-হত্যা সমর্থন করতেন । [৯৩] তাঁর মত একজন তরুণের পক্ষে এসব প্রতিবাদ খুব দুঃসাহসের পরিচায়ক ছিল ।

---

[৯১] শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন, কর্মবীর মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ্, পৃঃ ৮৮ ।

[৯২] ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬০ ।

[৯৩] দেখুন, মোহাম্মদ সেরাজুল হক, সিরাজী চরিত, হিন্দুস্থান প্রিন্টার্স, কলিকাতা, ১৯৩৫, পৃঃ ৩০-৩৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

বনোয়ারী লাল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে আয়োজিত অপর একটি জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ । সৈয়দ সিরাজী উক্ত সভায় 'অনল-প্রবাহ' নামক একখানা কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি স্বদেশানুরাগ ও ইসলামের ঐতিহ্যপ্রীতি নিয়ে রচিত হয়েছিল। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ ইসলামী ভাবধারায় মুগ্ধ হয়ে ১৮৯৯ সালে নিজ ব্যয়ে 'অনল-প্রবাহ' কবিতাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। সৈয়দ সিরাজী পরের বছর অনল-প্রবাহ, তূর্যধ্বনি, মূর্চ্ছনা, বীরপূজা, অভিভাষণ; ছাত্রগণের প্রতি, মরক্কো সংকটে, আমীর আগমনে, দীপনা ও আমীর অভ্যর্থনা- এই নয়টি কবিতা নিয়ে 'অনল-প্রবাহ' বর্ধিত আকারে প্রকাশ করেন। স্বজাতির অধঃপতন ও পরাধীনতার জন্য তীব্র ক্ষোভ ও আক্ষেপ প্রকাশ করে জাতীয় মুক্তি ও উন্নতি সাধনের উদাত্ত আহবান ধ্বনি 'অনল-প্রবাহে'র প্রায় প্রতিটি কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে।[৯৪] 'ইসলাম প্রচারক'-এ এর সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, কবিতাগুলি মহাওজস্বিনী ভাষায় লিখিত। মুসলিমদের অতীত গৌরব-কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কবিতাগুলি বড়ই লালিত্যময়, তাই পাঠ করলে মুগ্ধ হতে হয়।[৯৫]

তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'উচ্ছ্বাস' (১৯০৭) ও 'উদ্বোধন' (১৯০৭) একই ভাবধারায় রচিত। তিনি এক্ষেত্রে ইসলামের গৌরবময় কাহিনী বর্ণনা করে ভারতীয় মুসলিমদের নবজাগরণ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। তিনি তুরস্ক ভ্রমনের পর তুরস্কের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচনা করেছেন 'তুরস্ক ভ্রমন' (১৯১৩), 'তুর্কী নারী শিক্ষা' (১৯১৩) প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থ। এরপর তিনি 'স্পেন বিজয়' (১৯১৪), 'সঙ্গীত সঞ্জিবনী' (১৯১৬), 'প্রেমাঞ্জলি' (১৯১৬) প্রভৃতি কাব্য এবং 'রায় নন্দিনী' (১৯১৫), 'তারাবাঈ', 'নূর-উদ্দীন' (১৯২৩) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন। তিনি এসব রচনায় প্রধানতঃ ইসলামী ভাববৃত্তেই বিচরণ করেছেন। উপন্যাসের শিল্পরীতিতে তিনি বঙ্কিম চন্দ্রের অনুসরণ করেছেন, কিন্তু ভাবের ক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন।[৯৬]

---

[৯৪] পূর্বোক্ত।
[৯৫] ইসলাম প্রচারক, কলকাতা, বৈশাখ ১৩০৭।
[৯৬] ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬২।

Dhaka University Institutional Repository

কোন কোন ক্ষেত্রে স্বসমাজের সমালোচনায়ও তিনি ছিলেন নির্ভীক ও অকপট। 'মোল্লা চিত্র' কবিতায় 'কাট-মোল্লা' শ্রেণীকে তিনি কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি উক্ত সময়ের মাদ্রাসা শিক্ষা-পদ্ধতিরও সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যে পর্যন্ত মাদ্রাসাসমূহের সংস্কার এবং সেখানে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, হাদিস এবং তাফসীর পাঠের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হবে, সে পর্যন্ত মাদ্রাসা দ্বারা অদ্ভূতজ্ঞান বিশিষ্ট 'কাটমোল্লা' ব্যতীত প্রকৃত আলিম তৈরি হওয়ার কোন আশা নেই।[৯৭]

'আত্মশক্তি ও জাতীয় প্রতিষ্ঠা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> "উন্নত জাতি অধঃপতিত হইলে একমাত্র প্রাচীন গৌরব কাহিনীই তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ এবং সচেতন করিতে পারে। প্রাচীন গৌরব কথাই তাহাদিগের কর্ণে অমৃতবাণী উচ্চারণ করে। আজ আমরা, বঙ্গের মুসলমান, যদি পূর্বপুরুষদিগের শক্তি-সাধনা ও প্রতিষ্ঠার বিষয় অবগত থাকিতাম তাহা হইলে বোধ হয় আমাদিগের দুঃখ-দুর্দশা-দীনতার দাসত্ব-শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া যাইত।"[৯৮]

সমাজের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভের উপায় যে আত্ম-শক্তি ও আত্ম-নির্ভরতা, সৈয়দ সিরাজী সে কথাও জোর দিয়ে বলেছেন। তাঁর মতে, বিশ্ব সংসারে সর্বদা যোগ্যের পূজা, উপযুক্তের আদর ও শক্তিশালীরই প্রতিষ্ঠা হয়।[৯৯]

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বাংলার মুসলিম সমাজে সচেতনতাবোধ জাগ্রত হতে থাকে। এ সময় থেকে দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম সমাজের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে বেশ কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। বাংলার মুসলিম জাগরণের ইতিহাসে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ

১. আঞ্জুমনে ইসলামী, কলিকাতা (১৮৫৫) হচ্ছে মুসলিমদের প্রথম সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। শ্রেণী-গোত্র নির্বিশেষে সকল মুসলিমের

---

[৯৭] ইসলাম-প্রচারক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯০৩।

[৯৮] ইসলাম-প্রচারক, মে-জুন, ১৯০৪।

Dhaka University Institutional Repository

স্বার্থসংরক্ষণ ও উন্নতি বিধান করা ছিল এর মূল লক্ষ্য।[১০০] Hindu Intelligencer এবং Hindu Patriot পত্রিকা দু'টি আঞ্জুমানের প্রতিষ্ঠাকে সময়োচিত সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেছিল।[১০১]

২. নবাব আবদুল লতিফ কুসংস্কার ও বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত করে মুসলিম সমাজকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত করা এবং ইংরেজ ও হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাদের মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে Mahomedan Literary Society প্রতিষ্ঠা করেন[১০২]

৩. সৈয়দ আমীর আলী ১৮৭৮ সালে 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন, যা ১৮৮৩ সালে 'Central National Mahomedan Association' নামে অভিহিত হয়।[১০৩] এর উদ্দেশ্য ছিল শাসনতান্ত্রিক উপায়ে মুসলিমদের স্বার্থরক্ষা ও উন্নতি বিধান করা এবং মুসলিম মানসকে গোঁড়ামিমুক্ত করার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করা।[১০৪]

৪. মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ আল্ উবায়দী সুহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৩৪-৮৫)-এর সক্রিয় সহযোগিতায় ১৮৭৯ সালে ঢাকায় মুসলিমদের প্রথম প্রতিষ্ঠান 'সমাজ সম্মিলনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় উন্নতি ও হিন্দু-মুসলিমের সম্প্রীতি সাধন ছিল সমাজ সম্মিলনী সভার প্রধান উদ্দেশ্য।[১০৫]

---

[৯৯] পূর্বোক্ত।
[১০০] Jayanti Maitra, Muslim Politics in Bengal, Calcutta, 1984, P. 76.
[১০১] Ibid, PP. 75-76.
[১০২] নওয়াব আবদুল লতীফ খান সি.আই.ই., মুসলিম বাংলা : আমার যুগে (অনুবাদ : আবুজাফর শামসুদ্দীন), ঢাকা, ১৯৬৮, পৃঃ ১৭; Enamul Haque (ed.), Nawab Abdul Latif : His Writings and Related Documents, Dacca, 1968, P. 142.
[১০৩] 'The Rules and Objects of the Central National Mahomedan Association with a List of the Members, Calcutta, 1882', in K. K. Aziz (ed.), Ameer Ali : His Life and Works, Lahore, 1968, P. 46.
[১০৪] Ibid, P. 8
[১০৫] ঢাকা প্রকাশ, ২৩ চৈত্র, ১২৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ঢাকা কলেজের কতিপয় ছাত্রের উদ্যোগে ১৮৮৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশীয় মুসলিমগণের সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন করাই এ সভার মুখ্য উদ্দেশ্য।[১০৬]

৬. সমাজ সংস্কার ও মুসলিম সমাজের কল্যাণ সাধনার্থে ১৮৮০ সালে চট্টগ্রামে 'ইসলাম এসোসিয়েশন' গঠিত হয়। আমান আলী ও কাজেম আলী মাষ্টারদ্বয় এ সমিতির কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিলেন।[১০৭]

৭. ১৮৯১ সালে চট্টগ্রামে 'মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি'-র প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জনহিতকর কর্ম ও শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এর অবদান ছিল অপরিসীম। মুসলিম ছাত্রদের জন্য হোস্টেল নির্মান, আর্থিক সাহায্য প্রদান, পাঠাগার স্থাপন ইত্যাদিসহ বিভিন্ন বিষয়ে সোসাইটি পরবর্তী কয়েক যুগ পর্যন্ত কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখে। খানবাহাদুর আবদুল আজিজ এ প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ ছিলেন।[১০৮]

৮. ১৯০১ সালে সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'নূর-অল্-ইমান সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।[১০৯] তবে ওয়াকিল আহমদ এর প্রতিষ্ঠাকাল উল্লেখ করেছেন ১৮৮৪ সাল।[১১০] ইসলাম প্রচার ও ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তার এ সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মহীপুরের জমিদার আবদুল মজিদ চৌধুরী এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[১১১]

৯. ১৯০২ সালে কলিকাতায় 'মোসলেম ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চা এবং সমাজসেবা ছিল এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য।[১১২]

১০. ১৯০৩ সালে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার প্রসার ও সমাজ-সেবার উদ্দেশ্যেই এর জন্ম হয়। মির্জা

---

১০৬ ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণী, ঢাকা, ১৮৮৪, পৃঃ ১; মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী, মাহে নও, বৈশাখ, ১৩৭৪।

১০৭ মাহবুবুল আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস, ১ম খন্ড, চট্টগ্রাম, ১৯৬৭, পৃঃ ১৩।

১০৮ আবদুর রহমান, যতটুকু মনে পড়ে, চট্টগ্রাম, ১৯৭২, পৃঃ ১৬, ২৬, ২৭৬, ৩৫৭, ৫৯৪।

১০৯ ইমরান হোসেন, বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১।

১১০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮০।

১১১ মুস্তাফা নূর উল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃঃ ১৩২।

১১২ ইমরান হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

সুজাত আলী বেগ, দেলোয়ার হোসেন আহমদ, সৈয়দ শামসুল হুদা, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন প্রমুখ এর সাথে জড়িত ছিলেন ।[১১৩]

১১. ১৯০৭ সালে কলিকাতায় 'খাদেমুল ইসলাম সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর উদ্দেশ্য হল মুসলিমদের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করা ।[১১৪] কিছুদিন নিষ্ক্রিয় থাকার পর উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ১৯০৯ সালে পুনরুজ্জীবিত হয় । [১১৫]

১২. ১৯০৭ সালে 'আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম' নামে একটি সমাজসেবামূলক সংগঠন ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠিত হয় । গরীব মুসলিম জনসাধারণের উন্নতি বিধান, ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তার, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা ছিল এ সমিতি প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ।[১১৬]

১৩. জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এবং গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯০৯ সালে মুর্শিদাবাদের নওয়াবের পৃষ্ঠপোষকতায় 'আঞ্জুমানে বাঙালী' প্রতিষ্ঠিত হয় ।[১১৭]

১৪. মুসলিম সমাজের এতিম সন্তানদের সাহায্য ও প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে ১৯১০ সালে নওয়াব সুলতানুল আলম কর্তৃক 'বীরভূম আঞ্জুমানে ইসলামিয়া' ও 'কলিকাতা মুসলিম এতিমখানা' প্রতিষ্ঠিত হয় ।[১১৮]

১৫. ১৯১১ সালে বীরভূমে 'আঞ্জুমানে মোজাক্কেরীয়া ইসলাম' নামক একটি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় । সমাজের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকান্ডের সাথে এ সংগঠনের সম্পৃক্ততা ছিল ।[১১৯]

১৬. জনসেবামূলক কার্যপদ্ধতি এবং দেশাত্মবোধ উদ্রেককারী সাহিত্য ও শরীর চর্চার লক্ষ্যে ১৯১১ সালে চট্টগ্রামে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর উদ্যোগে 'খাদেমুল ইসলাম সোসাইটি'-এর একটি শাখা স্থাপন করা হয় ।[১২০]

---

[১১৩] ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১০ ।
[১১৪] দি মুসলমান, ৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭ ।
[১১৫] পূর্বোক্ত, ১৭ ডিসে. ১৯০৯ ।
[১১৬] পূর্বোক্ত, ১২ এপ্রিল, ১৯০৭
[১১৭] পূর্বোক্ত, ৩০ এপ্রিল, ১৯০৯ ।
[১১৮] পূর্বোক্ত, ২৯ এপ্রিল, ১৯১০ ।
[১১৯] পূর্বোক্ত, ২৮ এপ্রিল, ১৯১১ ।
[১২০] পূর্বোক্ত, ২৫শে আগষ্ট, ১৯১১; আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৮, ৮৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. ইসলাম প্রচার, ইসলামের সত্যিকারের দিক নির্দেশনা জনগণের সামনে তুলে ধরে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা ও সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে ১৯১১ সালে 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে বাঙালা' প্রতিষ্ঠিত হয়।[১২১]

১৮. মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ও সৃজনশীল সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি', যা সমাজে অত্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।[১২২]

১৯. ইসলাম মিশন, সমাজ সংস্কার ও জাতীয় উন্নতি সাধনকল্পে মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা ইসলামাবাদী ও অন্যান্যদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ১৯১৩ সালে 'আঞ্জুমানে ওলেমায়ে বাঙ্গালা' নামক প্রতিষ্ঠানটি জন্ম লাভ করে। 'আল্ এসলাম' নামক একটি পত্রিকাটি এর মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়।[১২৩]

২০. ১৯২৬ সালের ১৯শে জানুয়ারী ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' গঠিত হয়।[১২৪] এ সংগঠনের লক্ষ্য ছিল- "...বুদ্ধির মুক্তি অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তিদান।"[১২৫] এর মুখপত্র 'শিখা' (১৯২৬) মুসলিম সমাজের গোঁড়ামী, সংকীর্ণতা ও কূপমন্ডুকতার বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়।[১২৬]

২১. উত্তর ভারতে ড. সাইফুদ্দিন কিচ্‌লুর নেতৃত্বে গঠিত 'তান্‌জিম্' কমিটির অনুকরণে ১৯২৬ সালে বাংলায় 'বেঙ্গল তান্‌জীম কমিটি' গঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ও সমাজের জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা।[১২৭]

---

[১২১] দি মুসলমান, ৫ নভেম্বর, ১৯২০; ইসলাম দর্শন, চৈত্র, ১৩২৭।
[১২২] আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৬।
[১২৩] আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫-১৭; আফতাব উদ্দীন চৌধুরী, অতীতের কথা, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃঃ ১০; আল্-এসলাম, পৌষ, ১৩২৭ এবং আষাঢ়, ১৩২৭ সংখ্যা।
[১২৪] বার্ষিক বিবরণী, শিখা, ১ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩৩৩, পৃঃ ২১।
[১২৫] কাজী আবদুল ওদুদ, শাশ্বত বঙ্গ, কলিকাতা, ১৩৫৮, পৃঃ নিবেদন অংশ।
[১২৬] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪৭।
[১২৭] দি মুসলমান, ২৮শে মে, ১৯২৬ এবং ৪ঠা জুন, ১৯২৬ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

২২. মজিবর রহমান খাঁ এবং আবুল কালাম শামসুদ্দীনসহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ১৯৪২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন।[১২৮] সমাজের অগ্রগতি ও মঙ্গলের জন্য বুদ্ধির মুক্তি ও চিন্তার রাজ্য থেকে নৈরাজ্য দূরীকরণই ছিল এ সমিতির মূল উদ্দেশ্য।[১২৯]

উপর্যুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও এ জাতীয় আরও বেশ কিছু আঞ্জুমান ও সমিতির পরিচয় পাওয়া যায়, যেগুলো মুসলিম সমাজের উন্নতি, অগ্রগতি ও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে তথা বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। যেমন- আঞ্জুমানে তরক্কীয়ে কওম, আঞ্জুমানে মইদুল ইসলাম, আঞ্জুমানে জাহেদুল ইসলাম, আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম, আঞ্জুমানে আহলে হাদীস, আঞ্জুমানে আহমদী প্রভৃতি।[১৩০]

সমাজ হিতৈষণার ক্ষেত্রে সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। দেশ, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র প্রভৃতির উন্নতি, সংস্কার, পরিবর্তন একান্তভাবেই সংবাদ-সাহিত্য সাপেক্ষ। সংবাদ-সাহিত্যের প্রচার কালে এখন দল ভাঙ্গে গড়ে, নেতৃত্বের হয় উত্থান-পতন, দেশ-জাতি-সম্প্রদায়ের কথা বিকোয়- এমনকি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং পতনও এর উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। কাজেই একে বলা হয় - চতুর্থশক্তি ।[১৩১]

বাঙালী মুসলিম কর্তৃক বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের প্রচেষ্টা শুরু হয় উনিশ শতকের শেষ পাদে। ১৮৮৯ সালে 'সুধাকর'-এর প্রকাশকাল থেকে এই প্রচেষ্টা শুরু হয়। মুন্‌শী মোহাম্মদ রিয়াজুদ্দীন আহমদ, পন্ডিত রেয়াজ উদ্দীন মাশহাদী, মৌলভী মেরাজুদ্দীন, মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌, মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, শেখ আবদুর রহীম এবং কবি মোজাম্মেল হক প্রমুখ বুঝতে পারেন

---

[১২৮] মাসিক মোহাম্মদী, আষাঢ়, ১৩৫১।

[১২৯] বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য ; আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃঃ ২২৪-৪৪।

[১৩০] বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য : ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৪-২৪২ (সভা-সমিতি)।

[১৩১] আবুল কালাম শামসুদ্দীন, 'মুসলিম বাঙলার সংবাদ-সাহিত্য', মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০।

Dhaka University Institutional Repository

যে, বাংলার মুসলিমদের অভাব-অভিযোগ ও দুঃখ-বেদনা ব্যক্ত করার জন্য প্রয়োজন বাংলা ভাষায় একটি সাপ্তাহিক মুখপত্র। আর তাই এঁদের প্রচেষ্টায়ই 'সুধাকর' প্রকাশিত হয়।[১৩২]

সুধাকরের পূর্বেও বেশকিছু সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলোর অধিকাংশই ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হত।[১৩৩] হানিফি (১৯০৩), আহলে হাদীস (১৩২২), আল্ বুশ্‌রা (১৯২১), শরীয়াত (১৯২৪), আহমদী (১৯২৫), হানাফী (১৯২৬) প্রভৃতি সাময়িকী বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী মুসলিম ধর্মীয় গোষ্ঠীর মুখপত্র হিসাবে পরিচালিত হত। এ সময়ের পত্র-পত্রিকার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাঙালী মুসলিম সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুখপত্র 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন মন্তব্য করেন যে, তৎকালে বাংলার মুসলিম সমাজে যেসব পত্র-পত্রিকা চালু ছিল তার অধিকাংশই ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বের হত। সেই যুগে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন মতবাদ প্রচার করা ছিল বিপদজনক।[১৩৪]

অন্যদিকে আখবারে ইসলামীয়া (১৮৮৪), ইসলাম প্রচারক (১৮৯১, ১৮৯৯), নূর-আল ইমান (১৯০০), আল্ এছলাম (১৯১৮), ইসলাম দর্শন (১৯২০), আইনুল ইসলাম (১৯২৩), তবলীগ (১৯২৭), আল্ মুসলিম (১৯২৮), মক্তব (১৯৩০) প্রভৃতি পত্রিকা ইসলাম ধর্ম বিষয়ে রক্ষণশীল আদর্শ প্রচার করত। আবার কিছু কিছু পত্রিকা বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাহিত্য গোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে কাজ করতো। পূর্বোক্ত 'নূর আল-ইমান' ও 'আল্ এছলাম' ছিল যথাক্রমে 'নূর আল্ ইমান সমাজ' ও 'আঞ্জুমানে ওলেমায়ে বাঙ্গালা'র মুখপত্র। তাছাড়া ইসলাম দর্শন (১৯২০) আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে বাঙালার, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা (১৯১৮) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির, সাম্যবাদী (১৯২৩) আঞ্জুমানে তরক্কীয়ে কওমের, লাঙল (১৯২৫) শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ দলের, গণবাণী (১৯২৬) বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দলের, শিখা (১৯২৬) মুসলিম সাহিত্য সমাজের, মোয়াজ্জিন

---

১৩২ আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পূর্বোক্ত।
১৩৩ ইমরান হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫।
১৩৪ মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ২৬, ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

(১৯২৮) খাদেমুল এনছান সমিতির এবং সাপ্তাহিক ও মাসিক মোহাম্মদী ১৯৩৭ সালের পর মুসলিম লীগের মুখপত্ররূপে কাজ করেছিল। কিছু কিছু দৈনিক পত্রিকাও রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। যেমন, আজাদ (১৯৩৬) মুসলিম লীগের, কৃষক (১৯৩৮) কৃষক-প্রজা পার্টির এবং নবযুগ(১৯৪৬) এ. কে. ফজলুল হকের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা প্রচার করত। ইংরেজি দৈনিক 'স্টার অব ইন্ডিয়া' ও 'মর্নিং নিউজ' মুসলিম লীগের মুখপত্র ছিল।[১৩৫] নিম্নে আলোচ্য সময়ে প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাময়িকপত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল ঃ

১. **মিহির ও সুধাকর** : শেখ আবদুর রহীম ও মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত ও ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত এ সাপ্তাহিক পত্রিকাখানা সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ে অত্যন্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতো।

২. **কোহিনূর** : এ.কে.এম. রওশন আলী সম্পাদিত শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ক এ মাসিক পত্রিকাখানা তিনটি পর্যায়ে যথাক্রমে ১৮৯৮, ১৯০৩ ও ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার এবং সমাজের হিন্দু-মুসলিমদের মিলন ও সমঝোতাই ছিল এর উদ্দেশ্য। পত্রিকাটি কলিকাতা অনাথ-আশ্রমের সাহায্যার্থে প্রকাশিত ও প্রচারিত হত, যা নিঃসন্দেহে একটি সমাজসেবামূলক পদক্ষেপ।[১৩৬]

৩. **সোলতান** : মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদিত প্রথমে মাসিক ও পরে সাপ্তাহিক হিসেবে তিনটি পর্যায়ে যথাক্রমে ১৯০১ সাল, ১৯০২ সাল ও ১৯২৩ সালে প্রকাশিত এ পত্রিকাখানার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত উদার। এটি রাজনীতিতে ছিল জাতীয়তাবাদের সমর্থক এবং হিন্দু-মুসলিম মিলন প্রয়াসী। সমাজ সচেতনতা সৃষ্টিতে এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

---

[১৩৫] দ্রঃ মুস্তাফা নূর উল ইসলাম, প্রাগুক্ত; আবুল মনসুর আহমদ, প্রাগুক্ত; আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত; ইমরান হোসেন, প্রাগুক্ত।

[১৩৬] মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

৪. মোহাম্মদী : মাওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত সাহিত্য, ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক এ সৃজনশীল ও ব্যতিক্রমধর্মী পত্রিকাখানা ১৯০৩ সালে মাসিক ও ১৯০৮ সালে সাপ্তাহিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেন ঃ "কত মুসলিম সংবাদপত্র এলা গেলো; কিন্তু সাপ্তাহিক মোহাম্মদী এখনও দীর্ঘ ৩৫ বৎসর ধরে ঘড়ির কাঁটার নিয়মানুবর্তিতার মতো বাংলার মুসলমানদের দুয়ারে তার সাপ্তাহিক হাজিরা দিয়ে আসছে — এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তার একদিনও ব্যত্যয় ঘটেনি।"[১৩৭] তখন মোহাম্মদীর কণ্ঠে ধ্বনিত হতো বাঙালী মুসলিমদের নানা অভাব-অভিযোগ, উহার প্রতিকারের উপায় এবং দাবী।[১৩৮] স্বতন্ত্র বাঙালী মুসলিম সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বপক্ষে একটানা দীর্ঘকাল তত্ত্বগত প্রচার চালানোর ক্ষেত্রে পত্রিকাটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।[১৩৯]

৫. আল-এসলাম : মাওলানা আকরম খাঁ ও মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদিত এ মাসিক পত্রিকাখানা ১৯১৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।[১৪০] পত্রিকাখানা সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখে।

৬. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সম্পাদিত এ ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাখানা ১৯১৮ সালে ১ম প্রকাশিত হয়। সাহিত্য ও সমাজ চিন্তায় প্রগতিশীল ও উদার এবং ভাষাগত প্রশ্নে বাংলা ভাষার সমর্থক এ পত্রিকাখানা সমাজে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় প্রশংসনীয় অবদান রাখে।[১৪১]

৭. সওগাত : মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন সম্পাদিত উদার ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন এবং নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত এ মাসিক সাহিত্য পত্রিকাখানা ১৯১৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তবে ১৯২৮ সালে এর সাপ্তাহিক ও বার্ষিক সংস্করণ বের হয়।

---

[১৩৭] আবুল কালাম শামসুদ্দীন, প্রাগুক্ত।
[১৩৮] মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ, যুগবিচিত্রা, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃঃ ২৭৬।
[১৩৯] অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ৩০৫।
[১৪০] আল্-এছলাম, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।

Dhaka University Institutional Repository

এটি ছিল মুসলিম পরিচালিত বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাটিতে মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন-চিন্তাসমৃদ্ধ রচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হত এবং সাহিত্যিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তরুণ লেখকদের লেখা প্রকাশ করে তাদের উৎসাহিত করা হত।[১৪২]

৮. **সাম্যবাদী** ঃ মোঃ ওয়াজেদ আলী ও আলী আহমদ ওলী ইসলামাবাদী সম্পাদিত এ ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানা সমাজসেবার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯২৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সচেতনতা গড়ে তোলাই এর মূল লক্ষ্য ছিল।[১৪৩]

৯. **শিখা** ঃ আবুল হুসেন (পরে কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল প্রমুখ) সম্পাদিত উদার, প্রগতিশীল ও সৃজনশীল এ বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকাখানা ১৯২৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর মূল বাণী ছিল 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'।[১৪৪] পত্রিকাটি প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 'মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারার পরিবর্তন সাধন'।[১৪৫]

১০. **বুলবুল** ঃ হাবীবুল্লাহ্ বাহার ও বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ সম্পাদিত এ প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকাখানা ১৯৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। নিরপেক্ষ সাহিত্যচর্চা ও বাঙালী সংস্কৃতি তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটি প্রশংসনীয় ভূমিকা ও অবদান রাখে। এটি শিখার সাথে তুলনীয়। মুসলিম নারী সমাজে শিক্ষা বিস্তার ও জাগরণের লক্ষ্যে পত্রিকাটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস চালায়।

উপর্যুক্ত সংবাদ সাময়িকীসমূহ ছাড়াও বাংলার আনাচে-কানাচে আরও বহু সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, যেগুলো মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে মূলবান অবদান রাখে। দু'টি ইংরেজি পত্রিকা বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজের কল্যাণার্থে গুরুদায়িত্ব পালন করেছিল। প্রথমটি 'দি মোসলেম ক্রনিকল এন্ড দি মোহামেডান

---

[১৪১] সৈয়দ এমদাদ আলী, বঙ্গভাষা ও মুসলমান, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩২৫।
[১৪২] মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।
[১৪৩] সাম্যবাদী, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩০।
[১৪৪] 'প্রকাশের নিবেদন, শিখা, চৈত্র, ১৩৩৩।
[১৪৫] পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

অবজার্ভার' এবং দ্বিতীয়টি 'দি মুসলমান'। এ দু'টি ছাড়া ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকা হল- শাহ বদিউল আলমের 'মোহামেডান অবজার্ভার' (১৮৮২), স্যার আবদুর রহিমের 'মুসলিম স্টান্ডার্ড' (১৯৩২), মুজিবর রহমানের 'কমরেড' (১৯৩৭), খাজা নাজিমুদ্দীনের 'স্টার অব ইন্ডিয়া' (১৯৩৭), 'মর্নিং নিউজ' প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত বাঙালী মুসলিমদের সম্পাদনায় বেশ কয়েকটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যেগুলো মুসলিম সমাজের অবস্থা অনুধাবন ও প্রতিকারের লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন- দৈনিক নবযুগ (১৯২০), দৈনিক সেবক (১৯২২), দৈনিক ছোলতান (১৯২৬), দৈনিক আজাদ (১৯৩৬), দৈনিক কৃষক (১৯৩৮) ইত্যাদি। অধঃপতিত বাঙালী মুসলিম সমাজের জাগরণে এগুলোর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উনিশ শতকের শুরুতে বাংলার মুসলিমরা ছিলেন গোষ্ঠী ও অঞ্চলে বিভক্ত। আরো সূক্ষ্মভাবে দেখলে, গ্রামীণ ক্ষেত্রে বর্ণবিভক্তি ছিল তখনকার এক প্রচ্ছন্ন সামাজিক বৈশিষ্ট্য। মুসলিমদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ছিল নিজেদের গোষ্ঠী কিংবা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। ফারায়েজী ও জিহাদ আন্দোলন তাদেরকে সেই বদ্ধ সামাজিক গন্ডী থেকে বের করে আনতে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছিল। উনিশ শতকের শেষ বছরগুলোতে পরিচালিত আন্দোলন মুসলিম সমাজের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দেয়। এই পরিবর্তন সৃষ্টিতে বিভিন্ন সামাজিক শক্তির ভূমিকা মূল্যায়ন করে ১৯০৫ সালে 'ইসলাম প্রচারক' মন্তব্য করেছে- "বৃটিশ শাসনের সার্বিক পরিণতি সম্পর্কে নব্যশিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা পুরোপুরি বুঝে উঠার আগেই ধর্ম প্রচারকগণ মুসলিম স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন"।[১৪৬]

দেরীতে হলেও নব্যশিক্ষিত শ্রেণীর অংশ গ্রহনের ফলে মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। উনিশ শতকের শেষ বছরগুলোতে ইসলাম প্রচারক আলিম সমাজ এবং নব্যশিক্ষিত মুসলিমদের মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই—

[১৪৬] ইসলাম প্রচারক, চৈত্র, ১৩১২।

Dhaka University Institutional Repository

ক) মুসলিম সমাজের বিরোধী ভাবাপন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিরোধ ও মতানৈক্য প্রশমিত হয়। তাদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়।

খ) গ্রামের মুসলিমগণ বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংযোগধারায় মিলিত হতে শুরু করেন।

গ) মুসলিমদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কার্যক্রম এক অভিন্ন ধারায় পরিচালিত হতে শুরু করে।

ঘ) বহু নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক সংগঠন এবং আঞ্জুমন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঙ) বিপুল সংখ্যক নসিহতমূলক, ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারমূলক, ইতিহাস ও ঐতিহ্যধর্মী, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মগৌরবমূলক এবং নিজস্ব জাতিসত্তা ভিত্তিক বই-পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হয়।

চ) বাংলা ভাষায় মুসলিমদের বেশ কিছু সংখ্যক পত্র-পত্রিকা ও সংবাদ-সাময়িকী প্রকাশিত হয়।

ছ) মুসলিম সমাজ জীবনে ওয়ায-মাহফিল নামক শান্তিপূর্ণ দ্বীনী সম্মেলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

ফলে মুসলিমগণ আত্মপরিচয়ে উদ্বুদ্ধ হন। সমস্বার্থ ও অভিন্ন আদর্শের পথ ধরে তাঁদের মধ্যে জাতিগত ঐক্য-চেতনা সৃষ্টি হয়। এক কথায়, উনিশ শতকের শেষ ভাগে মুসলমিদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে সংঘাত ও স্ববিরোধিতার বহু উপাদানের উপস্থিতি সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ও আদর্শিক স্বার্থের দু'টি ধারা বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীকে সমস্বার্থের এককেন্দ্রে ঐক্যবদ্ধ করে অভিন্ন রাজনৈতিক লক্ষ্যে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়। বিশ শতকের শুরু থেকে বাংলার মুসলিমগণ পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক যুগে প্রবেশ করে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যদিয়ে এ যুগ শুরু হয়। কংগ্রেসের আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলে মুসলিমদের উন্নতির সুযোগ আবার বন্ধ হয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দ এর কঠোর প্রতিবাদ জানালে ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারী বড়লাট ঢাকায় আসেন এবং ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশ্বাস দেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু হিন্দু নেতৃবৃন্দ এর তীব্র বিরোধিতা করলে তাদের এ সংকীর্ণ হিন্দু মানসিকতা মুসলিমদের মধ্যে জাতীয় স্বাতন্ত্রবোধকে প্রবলতর করে। ভারতীয় মুসলিমদের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে। লাহোর প্রস্তাবে ভারতের মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে কালক্রমে ১৯৪৭ সালে মুসলিমদের স্বাধীন আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মাওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮ খ্রীঃ)

(ক) জন্ম পরিচয় ও শিক্ষা-দীক্ষাঃ

পৃথিবীতে যুগে যুগে এমন কিছু ক্ষণজন্মা মনীষী জন্মগ্রহণ করেন, যাঁরা তাঁদের সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে সুধী সমাজে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় হয়ে থাকেন। উপহাদেশের রাজনীতিতে এমনই বহু মনীষীর আবির্ভাব হয়েছিল। উনিশ শতকের ক্রান্তিলগ্ন থেকে বিশ শতকের সত্তরের দশক পর্যন্ত যাঁরা দেশের স্বাধীনতা ও স্বাধিকার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছিলেন তাঁদের অন্যতম।[১]

মাওলানা আকরম খাঁ একটি নাম, একটি শতাব্দীর ইতিহাস। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমেই এতদঞ্চলের মুসলিমদের পতনের সূচনা হয়েছিল। জাতির ইতিহাসে সে পরাজয় ছিল অনাকাঙ্খিত। ফলে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় পঙ্গুত্ব এবং প্রয়োজন দেখা দেয় সঠিক দিক-নির্দেশনার। এতদুদ্দেশ্যে এগিয়ে এলেন মাওলানা আকরম খাঁ-সহ আরও অনেকে। মানব কল্যাণই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে তিনি যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন, তারই প্রেক্ষিতে এতদঞ্চলের মুসলিমদের জীবনে আবার ফিরে আসে নব-প্রেরণা, নব-উদ্দীপনা। তিনি উপমহাদেশের স্বাধীনতামূলক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুসমাজ, সর্বোপরি ইসলামের অপব্যাখ্যাকারী খৃষ্টান

---

১ আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংগালী মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা আকরম খাঁর অবদান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৭; (অপ্রকাশিত ও ঢাঃ বিঃ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত), পৃ ঃ ১; সহ দ্রঃ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ ঃ ৯।

Dhaka University Institutional Repository

মিশনারী– এ তিন শক্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে তিনি জাতির জন্য প্রশস্ত করেছিলেন মুক্তির পথ। কুশিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকার হতে মুসলিমদের রক্ষা করার জন্য তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।[২] তাই আবুল মনসুর আহমদ বলেন যে, মাওলানা আকরম খাঁ একটি ব্যক্তি মাত্র ছিলেন না, অন্যান্য অনেক নেতার মত তিনি শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানও ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি যুগের প্রতিনিধি–যুগের প্রতীক।[৩]

১৮৬৮ সালের ৭ই জুন, মোতাবেক ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩ই সফর ১২৮৬ হিজরী শুক্রবার সুবহি সাদিকের সময় বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার হাকিমপুর গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী আলিম ও মুজাহিদ পরিবারে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ জন্মগ্রহণ করেন।[৪] তবে তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে একাধিক মতও পরিলক্ষিত হয়। যেমন, কেহ কেহ ১৮৬৯ সালকে তাঁর জন্ম তারিখ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৫] অন্য একটি বর্ণনায় তাঁর জন্ম তারিখ ১৮৭৫ সাল বলেও উল্লেখ রয়েছে।[৬] কিন্তু বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, দৈনিক আজাদের বিভিন্ন বিশেষ সংখ্যা, তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত ও ডা. আবুল কাসেম প্রণীত 'বাংলার প্রতিভা' নামক গ্রন্থ এবং এ.টি.এম. আতিকুর রহমানের এম,ফিল থিসিস 'বাংলার রাজনীতিতে মাওলানা আকরম খাঁ' প্রভৃতিতে পর্যালোচনা সাপেক্ষে ১৮৬৮ সালকেই তাঁর জন্ম তারিখ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ মতই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। তাঁর পিতার নাম ছিল মাওলানা আবদুল বারী খাঁ এবং মাতার নাম ছিল রাবেয়া খাতুন। তিনি জন্মসূত্রেই জিহাদী

---

২ আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩।

৩ আবু জাফর (সম্পাদিত), মাওলানা আকরম খাঁ, 'জাতীয় জাগরণে আকরম খাঁ এবং মোহাম্মদীর ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৬, পৃ ঃ ২৯৪।

৪ Md. Kased Ali, Maulana Muhammad Akram Khan (1868-1968): His life and Works, unpublished Ph. D. Thesis, University of Calcutta, India, 1989, Chapter-II, P. 30.

৫ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ ঃ ৩৮৪; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ ঃ ৫।

৬ Md. Shamsul Huq, Bibliography on the Works of Maulana Mohammad Akram Khan, Diploma course in Library Science, Dhaka University, 1960-61.

Dhaka University Institutional Repository

প্রেরণায় উজ্জীবিত ছিলেন। কারণ ১৮৩১ সালে সংঘটিত বালাকোট যুদ্ধে তাঁর পূর্বপুরুষদের একজন শহীদের মর্যাদা লাভ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা আবদুল বারী খাঁ সীমান্ত অঞ্চলে সৈয়দ আহমদ শহীদের (রঃ) 'মুজাহিদ আন্দোলনে' শরীক হন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে গাজীর মর্যাদা লাভ করেন। তাছাড়া মীর নিছার আলী ওরফে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ছিল তাঁর পাশ্ববর্তী গ্রামে। ফলে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জিহাদী চেতনা তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়।

পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী আকরম খাঁ পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানেই আল্-কুরআন এবং 'গুলিস্তাঁ'ও 'বুস্তাঁ' অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন।[৭] কারণ তাঁর পিতা মাওলানা আবদুল বারী খাঁ আহ্লে হাদীস সম্প্রদায়ভূক্ত একজন বিজ্ঞ আলিম, মুহাদ্দিস ও সুবক্তা ছিলেন এবং তাঁর মাতা রাবেয়া খাতুন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও বিদুষী মহিলা ছিলেন। তাঁর পিতার লেখা গ্রন্থ 'খোশখৎ' বর্তমানে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত আছে।[৮] অতি শৈশবেই তাঁকে গ্রামের মক্তবে ভর্তি করা হয়। তীক্ষ্ম মেধার অধিকারী আকরম খাঁ অল্পদিনের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের জন্য পিতার সাথে তাঁকে কলকাতায় পাঠানো হয়। পিতা তাঁকে সেখানকার জুবিলী স্কুলে ভর্তি করে দেন। আকরম খাঁ উক্ত স্কুলে বেশীদিন অধ্যয়ন করতে পারেননি। কারণ তিনি অল্পদিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে পিতা তাঁকে চিকিৎসার জন্য পাটনায় নিয়ে যান। সেখানে প্রায় দু'বছর চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন এবং পুনরায় কলকাতায় ফিরে আসেন। পাটনা থেকে কলকাতা আসার পর তাঁর ছোটভাই আশরাফ খাঁর মৃত্যু হয়। ফলে তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে নিজগ্রাম হাকিমপুরে ফিরে আসেন। ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরই আকরম খাঁর পিতা-মাতা উভয়েই কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তখন আকরম খাঁর বয়স ছিল এগার বছর।[৯]

---

৭ জাফর আলম, স্মরণীয়-বরণীয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ ঃ ৯।

৮ Md. Kased Ali, op. cit., P. 39.

৯ আ.কা.মু. আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর তিনি এবং তাঁর ভাই মাতামহের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। মাতামহ তাঁকে মরহুম পিতার ইচ্ছানুযায়ী বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গলকোট থানার কুল্‌শুনা নামক গ্রামে পিতৃবন্ধু মাওলানা নিয়ামত উল্লাহ্‌র মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন।[১০] কুল্‌শুনা মাদ্রাসায় ভর্তির পর বালক আকরম খাঁ অত্যন্ত মনোযোগের সাথে অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। সম্ভবত: মাওলানা নিয়ামত উল্লাহ্‌র সাহচর্যে থাকাকালীন অবস্থায় তাঁর মনে 'আহলে হাদীস' চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটে। কারণ মাওলানা নিজে আহলে হাদীসের একজন বড় আলিম ছিলেন।[১১]

425623

কুল্‌শুনা মাদ্রাসায় পড়াশুনা সমাপ্ত করার পর তাঁর মামা তাঁকে কলকাতার মির্জাপুর ষ্ট্রীটে অবস্থিত লায়েক জুবিলী ইংলিশ স্কুলে ভর্তি করে দেন। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তাঁর তেমন ঝোঁক ছিলনা। এর কারণও সুস্পষ্ট। পরিবেশগত কারণে ছোটবেলা থেকেই তাঁর মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছিল। সে সময় ইংরেজদের অত্যাচার ও শোষণের ফলে রাজ্য ও সম্পদহারা মুসলিম জাতি তাদেরকে মনে-প্রাণে সহ্য করতে পারছিলেননা। সে কারণে তারা ইংরেজী ভাষা শিক্ষা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। ইংরেজী ভাষা শিখ্‌লে নাছারাদের আদব-কায়দা, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি মুসলিমদের সমাজ জীবনে প্রবেশ করে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করবে–এটাই ছিল সম্ভবতঃ তাঁদের বড় ভয়। আকরম খাঁও এ পরিবেশেই বেড়ে উঠেছিলেন। ঐতিহ্যবাহী মুজাহিদ পরিবারের সন্তান হিসেবে তাঁর মধ্যেও ইংরেজী ও ইংরেজ বিদ্বেষ ছাত্র জীবনেই প্রকট হয়ে উঠে। ছাত্র জীবনের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ "ফোর্ট উইলিয়ামের কাছ দিয়া যাতায়াতের সময় এই কেল্লা দখল করিবার নানা অসম্ভব কল্পনা আমার মনে জাগিত।"[১২]

ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তাঁর তেমন আগ্রহ না থাকার কারণে তিনি জুবিলী স্কুল ত্যাগ করে ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে ১৮৯৬ সালে তৎকালীন বিখ্যাত ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা'য় ভর্তি হন। কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁর এক নিকট আত্মীয়ার সাথে প্রথম বিবাহ

---

১০ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ্‌ আল্‌-গালিব, আহ্‌লে হাদীস আন্দোলন, হাদীস ফাউন্ডেশন, রাজশাহী, ১৯৯৬, পৃ ঃ ৩২০।

১১ আ.কা.মু. আবদুল্লাহ্‌, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১২।

১২ উদ্বৃত;, আ.কা.মু. আবদুল্লাহ্‌, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১২।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন।[১৩] উক্ত মাদ্রাসার ছাত্র থাকাকালীন তিনি উর্দু, ফার্সী, আরবী ও বাংলা ভাষায় ব্যাপক দক্ষতা অর্জন করেন।

কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালীন মোহাম্মদ আকরম খাঁ লক্ষ্য করলেন যে, মাদ্রাসার সিলেবাসে বাংলা ভাষা শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই রাখা হয়নি।[১৪] এতে তিনি সাংঘাতিকভাবে মর্মাহত হন। ফলে দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি মাদ্রাসার সিলেবাসে বাংলা ভাষা অন্তর্ভূক্ত করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তিনি বাড়ী বাড়ী গমন করে বাংলাভাষার আন্দোলনের জন্য ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করে বলেনঃ "বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে এদেশের আপামর জনসাধারণ সোচ্চার, সেক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা কোন জাতির সফলতা বয়ে আনতে পারেনা। আমাদেরকে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।"[১৫] এই বলে তিনি ছাত্র আন্দোলনের সাংগঠনিক শক্তি মজবুত করেন। তিনি ছাত্র ও অভিভাবকদের নিয়ে সভা-সমাবেশও করেন। এজন্য অবশ্য তিনি কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজনও হয়েছিলেন। অবশেষে আন্দোলনের তীব্রতা অনুধাবন করে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বাংলাকে পাঠ্যতালিকাভূক্ত করতে বাধ্য হন। উল্লেখ্য যে, ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার জন্য এদেশের ছাত্র-জনতা যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন, তার বীজ মোহাম্মদ আকরম খাঁ ১৮৯৬-৯৭ সালেই বপণ করেছিলেন।

কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ড.ই. ডেনিসন রস-এর বিদায় উপলক্ষে আকরম খাঁ 'ম্যাড্‌রাসা সংবাদ' নামে বাংলা ভাষায় ১৯১০ সালে একটি কৌতুকপূর্ণ কবিতা রচনা করেন। এর মধ্যে বাউল ঢং-এর সুরের মুর্ছনা অনুভূত হয়। হিন্দুয়ানী ভক্তিরস মিশ্রিত এই কবিতাখানা ১৯১০ সালে মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর দু'টো লাইন নিম্নরূপঃ

> 'রস সাগরে বান-ডেকেছে তোরা দেখ্‌বি কে রে আয়।
> যত অনুরক্ত রস ভক্ত ভক্তিরসে হয়ে মত্ত হাবুডুবু খায়।'[১৬]

---

[১৩] Md. Kased Ali, op. cit., P-45.
[১৪] আবু জাফর (সম্পাদিত), মাওলানা আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০০-২০১।
[১৫] আবু জাফর (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত।
[১৬] পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় তাঁর দখল কেমন ছিল, তা উক্ত কবিতা হতেও আঁচ করা যায়। ১৮৯৮ সালে তিনি যখন কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্র, তখন ইসলাম ধর্ম নিয়ে এক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। একদল খৃষ্টান ধর্মযাজক ইসলাম ধর্মের কুৎসা ও খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করে বাংলার নিরীহ মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানেন। এতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী খৃষ্টান ধর্মযাজকদের সর্বাত্মক মদদ দিচ্ছিল। তেজোদ্দীপ্ত তরুণ আকরম খাঁ এ পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু সভা-সমিতি করে স্বীয় অসাধারণ বাগ্মিতার মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলেন। সুচিন্তিত যুক্তি-তর্কসহ বাংলা ও উর্দু ভাষায় বিভিন্ন প্রচারপত্র লিখে চারিদিকে প্রচার করতে থাকেন। 'আখবারে মোহাম্মদী' সহ কিছু পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখে তিনি তাঁর মতামত তুলে ধরেন, যা জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বিতর্কটা মূলতঃ ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের মধ্যে হলেও আকরম খাঁর বক্তৃতা, রচনা, প্রচারপত্র ইত্যাদিতে মূল আক্রমণ ছিল বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে। কারণ তিনি মনে করতেন যে, বৃটিশ শাসন ভারত থেকে উৎখাত করতে পারলে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচার প্রপাগান্ডাও বন্ধ হবে। এতে প্রমাণীত হয় যে, ছাত্রাবস্থায়ই তাঁর মনে জাতীয় ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। তিনি ১৯০০ সালে মতান্তরে ১৯০১ সালে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হতে এফ. এম. (ফাইনাল) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।[১৭]

(খ) কর্মজীবনঃ

১. সাংবাদিকতাঃ

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শেষে সাংবাদিকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। মুসলিম সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক অবদান অনস্বীকার্য। তাঁকে মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার 'পথিকৃৎ' ও 'জনক' হিসেবে অভিহিত করা হয়।[১৮] ছোটবেলা থেকেই সংবাদপত্র পাঠের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল। তিনি লক্ষ্য করেন যে, হিন্দু

---

[১৭] আবুল কাসেম, মওলানা আকরম খাঁ, মাসিক মোহাম্মদী, ১৩৭৬ বাংলা, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ সংখ্যা, পৃঃ ৯৩; ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩৮৫-৮৬।

[১৮] বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত সংকলন 'পথিকৃৎ', ঢাকা-১৯৮৭, পৃ ঃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলিম জাতি শিক্ষা-দীক্ষাসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অনুন্নত। আর এ অনুন্নত মুসলিম সমাজ ও জাতিকে জাগ্রত করার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে সংবাদপত্র। অথচ মুসলিম সমাজে তা একেবারেই অনুপস্থিত।[১৯]

তখন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে হিন্দুসমাজ কর্তৃক পরিচালিত 'বঙ্গবাসী' ও 'হিতবাদী' ছিল শীর্ষস্থানীয়। এ পত্রিকাগুলোতে প্রায়শ: মুসলিম সমাজ ও ইসলাম ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করে প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হতো। এগুলো পাঠ করে মাওলানা আকরম খাঁ খুবই মনক্ষুন্ন হন এবং এর ফলে স্বীয় সমাজের মুখপত্র হিসেবে একটি পত্রিকা প্রকাশের ভাবনা ক্রমশ তাঁর মনে দৃঢ় হয়ে উঠে।[২০]

সংবাদ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও সংবাদপত্র প্রকাশের মত অর্থ ও জনবল তাঁর ছিলনা। তবে মনোবল ছিল তাঁর অসীম। তাই তিনি মোটেও নিরাশ হলেন না। তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্য নিজ গ্রাম হাকিমপুরে গেলেন কিন্তু অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হলো না। তাঁর পকেটে তখন ছিল তের পয়সা। তাঁর অনুরোধের প্রেক্ষিতে তাঁর ফুফু তাঁকে এক টাকা দিলে মোট একটাকা তের পয়সা পুঁজি নিয়ে পত্রিকা প্রকাশের লক্ষ্যে তিনি কলকাতা গমন করেন।[২১]

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, তাঁর সমকালীন আর এক বিপ্লবী সাংবাদিক ছিলেন পাঞ্জাবের মাওলানা জাফর আলী খান। তিনি তাঁর স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেন: "আমি কা'বার পথে একাই চলতে শুরু করেছিলাম, সাথী জুটতে জুটতে এখন কাফেলার সৃষ্টি হয়েছে।"[২২] মাওলানা আকরম খাঁ-ও সাংবাদিকতা শুরু করেছিলেন একাই। অসীম সাহস বুকে নিয়ে তিনি এ দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে শুধু কাফেলাই নয়, কাফেলার অনেকগুলো দলও এ পথে এগিয়ে আসেন। এ জন্যই

---

[১৯] জীবনী গ্রন্থমালা-১, মওলানা আকরম খাঁ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ১৪; মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহ্‌,মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ ঃ ৩৪।

[২০] মাওলানা আকরম খাঁর সাক্ষাৎকার (পুনঃ মুদ্রণ), দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৭ জুন, ১৯৭৫, পৃ ঃ ৩-৪; উল্লেখ্য যে, সাক্ষাৎকারটি প্রথম প্রকাশিত হয় দৈনিক আজাদের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত ১৯৬১ সালের ৩১শে অক্টোবর 'রজতজয়ন্তী' সংখ্যায়।

[২১] Abu Jafar, Maulana Akram Kahn: A Versatile Genius, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka-1984, P.20.

[২২] উদ্ধৃত: Abu Jafar, Ibid, P. 194.

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। 'আহ্‌লে হাদীস' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিকতার হাতে খড়ি। ১৯০১ সালে তিনি সর্বপ্রথম 'ত্রৈমাসিক মোহাম্মদী' সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন।[২৩] ১৯০৩ সালে মোহাম্মদী পত্রিকা মাসিক আকারে প্রকাশিত হয় এবং ১৯১০ সালে সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক মোহাম্মদী ছাড়াও তাঁর মালিকানা ও সম্পাদনায় একে একে প্রকাশিত হয় মাসিক আল্ এসলাম (১৯১৫), দৈনিক জামানা (১৯২০), সাপ্তাহিক ও দৈনিক সেবক (১৯২১), দৈনিক মোহাম্মদী (১৯২২), মাসিক মোহাম্মদী (১৯২৭), দৈনিক আজাদ (১৯৩৬), সাপ্তাহিক কমরেড (১৯৪৬) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা।[২৪] এসব সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমত গড়ে তুলে তিনি মুসলিমদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পশ্চাদ্‌পদতা এবং কুসংস্কার-মূলে আঘাত করে তাদের সামনে সামগ্রিক উন্নতির নতুন দ্বার উন্মোচন করতে সক্ষম হন।[২৫]

যে 'আহ্‌লে হাদীস' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি সর্বপ্রথম সাংবাদিক জীবনে প্রবেশ করেন, অল্প কয়েকদিন পর তা ছেড়ে দিয়ে তিনি 'মহাম্মদি আখবার' নামক আরেকটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। কাজী আবদুল খালেক সম্পাদিত এ পত্রিকায় মাওলানা আকরম খাঁ সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিনি এ পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ ও খবর বাংলা থেকে উর্দু ও উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তিনি কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্র থাকাকালীন এ পত্রিকায় খৃষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখতেন। এ পত্রিকায় কাজ করার সময়ই তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের লক্ষ্যে একটি পত্রিকা প্রকাশের কথা ভাবতে থাকেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ একটি পত্রিকা প্রকাশের খরচ বহন করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ঠিক এ সময়ে কলকাতাস্থ বটতলার এক পুস্তক ব্যবসায়ী একটি বাংলা 'ফারায়েয' প্রস্তুত করে দেয়ার বিনিময়ে তাঁকে

---

[২৩] জাফর আলম, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১০।
[২৪] Ranabir Samaddar, Leaders and Legacies: Maulana Maniruzzaman Islamabadi and Maulana Akram Khan; Essays in Memory of Momtazur Rahman Tarafdar, Edited by Perween Hasan and Mufakharul Islam, Centre for Advanced Research in the Humanities, Dhaka University, Dhaka-1999, P. 367.
[২৫] আবু জাফর (সম্পাদিত), মাওলানা আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

৫০ টাকা (মতান্তরে ৬০ টাকা) প্রদান করেন ।[২৬] টাকাগুলো পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং ঐ টাকা দিয়েই পত্রিকা প্রকাশের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । কলকাতার হুক লেনস্থ তাঁতি বাগানের একটি প্রেস হতে ১৯০৩ সালের ১৮ই আগষ্ট মোহাম্মদী পত্রিকার ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ।[২৭] কিন্তু প্রেস কর্তৃপক্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশে সম্মত না হওয়ায় সাময়িকভাবে মোহাম্মদীর প্রকাশ বন্ধ থাকে । এ পরিস্থিতিতে পত্রিকা প্রকাশের লক্ষ্যে মাওলানা আকরম খাঁ 'বসুমতি' প্রেসের প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ।[২৮] তিনি তাঁকে মোহাম্মদী প্রকাশের ব্যাপারে প্রথমে খুবই উৎসাহিত করেন । কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর প্রেস থেকে মোহাম্মদী প্রকাশে অক্ষমতা প্রকাশ করেন । ফলে নিজস্ব উদ্যোগে পত্রিকা প্রকাশের প্রাথমিক প্রয়াস ব্যর্থ হলে তিনি ভগ্ন মনে নিজ গ্রাম হাকিমপুরে প্রত্যাবর্তন করেন ।

গ্রামে অবস্থানকালে পিতৃবন্ধু কুষ্টিয়ার মাওলানা আবদুল্লাহ্ (মতান্তরে মাওলানা আব্বাস আলী)-এর সাথে আকরম খাঁর যোগাযোগ ও পরিচয় হয় । মাওলানা আবদুল্লাহ্ ছিলেন ধনী, তেল ব্যবসায়ী এবং কলকাতার বেলে পুকুর লেনের 'আলতাফী প্রেস'-এর মালিক । তিনি উক্ত প্রেস থেকে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন এবং তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাওলানা আকরম খাঁর সহযোগিতা কামনা করেন । তিনি সানন্দে সম্মতি প্রদান করলে মাওলানা আবদুল্লাহ্ মাসিক পনের টাকা সম্মানীতে তাঁকে পত্রিকার সম্পাদক ও শেখ হবিবর রহমানকে সহকারী সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ দেন ।[২৯] মাওলানা আকরম খাঁর সম্পাদনায় ও মাওলানা আবদুল্লাহ্র মালিকানায় ১৯০৩ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতার আলতাফী প্রেস থেকে মাসিক মোহাম্মদী ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হয় । এভাবে এর পঞ্চম সংখ্যা পর্যন্ত বের হয়ে পত্রিকাটি একই ব্যবস্থাপনায় প্রথমে পাক্ষিক ও পরে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয় । এ সময় ব্যবসায়িক অসফলতা লক্ষ্য করে মাওলানা আবদুল্লাহ্ পত্রিকা প্রকাশের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এবং

---

[২৬] জামাল-উল্-কুরায়শী, সুর্রাহ্, কলকাতা, ১২৮৫ হিঃ, পৃ ঃ ২৮৩ ।

[২৭] জীবনী গ্রন্থমালা-১, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৪; Abu Jafar, op. cit., P. 22; দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৭ই জুন ১৯৭৫, পৃ ঃ ৩-৪ ।

[২৮] বসুমতি প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । ১৮৯৬ সালে তিনি বসুমতি প্রেস প্রতিষ্ঠা করে সাপ্তাহিক বসুমতি প্রকাশ করেন । পরবর্তীতে ১৯১৪ সালে তিনি দৈনিক বসুমতি প্রকাশ করেন । সূত্রঃ সুবোধচন্দ্র গুপ্ত, সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ (কলকাতা, ১৯৭৬), পৃ ঃ ৬২ ।

[২৯] আ.কা.মু. আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২১

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকার মালিকানা ও ছাপাখানা মাওলানা আকরম খাঁকে প্রদান করেন। ১৯১০ সাল হতে মাওলানা আকরম খাঁ সম্পূর্ণ নিজ মালিকানা ও কর্তৃত্বাধীনে সাপ্তাহিক মোহাম্মদী প্রকাশ শুরু করেন এবং এর মাধ্যমে রাজনীতি, সমাজসেবা, ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চা এবং ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম থেকেই পত্রিকাটি মুসলিম সমাজের মুখপত্ররূপে স্বীকৃতি লাভ করে এবং বাংলার মুসলিমদের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সচেতনতার বাহনে পরিণত হয়। তাঁর লেখনীতে গোঁড়ামী বিবর্জিত যুক্তিবাদী মানস, স্বাধীন চিন্তাধারা ও জাতীয় অনুভূতি বিকশিত হতে থাকে। মোহাম্মদীর প্রথম দিকের সংখ্যাগুলোতে হানাফী মাযহাবের আলিমগন আহলে হাদীস সম্পর্কে যে সব বিতর্কিত মাস্‌আলা-মাসায়েল আলোচনা-সমালোচনা করতেন, বিশেষভাবে সেগুলোর জবাব থাকতো। তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সেগুলোর উত্তর দিতেন। সম্প্রদায়গত সংকীর্ণ কলহ-কোন্দল স্থায়ীরূপ লাভ করুক, তা তিনি কখনও পছন্দ করতেন না বা চাইতেন না। ফলে পত্রিকাটি পূর্বোক্ত সংকীর্ণ মতামতের পরিবর্তে অখন্ড মুসলিম সমাজের ঐক্য, সংহতি ও উন্নতি সাধনের মুখপত্রে পরিণত হয়।[৩০]

সাপ্তাহিক মোহাম্মদী প্রকাশের ফলে ভারতীয় মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে বিরাট বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ ঘটে। স্বল্পকালের মধ্যেই এই পত্রিকা বাংলা, আসাম ও বার্মার মুসলিমদের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠে। দুর্বার গতিতে এর খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে হতাশাগ্রস্ত মুসলিম জনগণের মধ্যে নতুন আশার আলো সঞ্চারিত হয়। বৃটিশ শাসকবর্গের বৈরী মনোভাব, অর্থসংকট, বহুবিধ বাধা-বিপত্তি ইত্যাদির মধ্যদিয়েও তিনি এ পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিমদের জাগরণমূলক প্রবন্ধ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত রচনা এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন খবর প্রকাশ করতে থাকেন। এ পত্রিকার মাধ্যমেই বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম জনগণ নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ তৎকালীন বৃটিশ শাসকবর্গের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হন।[৩১] সাপ্তাহিক মোহাম্মদী এ সময় মুসলিমদের স্বার্থ সংরক্ষণে হিন্দু সমাজের মালিকানায় পরিচালিত ও প্রকাশিত বহু সংখ্যক পত্র-পত্রিকার বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিল। মোহাম্মদ মোদাব্বেরের বক্তব্য অনুসারে —

---

[৩০] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'সাংবাদিকতায় বাঙ্গালী মুছলমান', মোহাম্মদী, ঈদসংখ্যা, পৌষ, ১৩৪২ এবং বার্ষিক সওগাত, কলকাতা, ১৩৩৩, পৃ ঃ ১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

এ সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকা বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত বাঙ্গালী মুসলিমদের জীবন-কাঠির কাজ করেছে ।[৩২]

১৯১৩ সালে সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর মাধ্যমে প্রচারাভিযান চালিয়ে মাওলানা আকরম খাঁ বাংলার বিভিন্ন মাযহাবের আলিমদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন । এরই ফলশ্রুতিতে মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী, মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং অন্যান্য ইসলামী চিন্তাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'আন্‌জুমান-এ-ওলামা-এ বাঙ্গালা' ।[৩৩] এ সংগঠনের মুখপত্র হিসেবে ১৯১৪ সালে (মতান্তরে ১৯১৫ সালে) মাওলানা আকরম খাঁ কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন 'আল্‌-এসলাম' নামক মাসিক পত্রিকা ।[৩৪] পত্রিকার উপজীব্য বিষয়াবলী হচ্ছে মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে– স্বধর্ম, স্বজাতি, স্বদেশ ও সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার সেবা করা । বাঙালি মুসলিম পাঠক সমাজে পত্রিকাটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং মুসলিম জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । প্রথমে এর সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ আকরম খাঁ এবং পরে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ।[৩৫] ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও মাওলানা ফররোখ আহমদ নিযামপুরী ছিলেন এর সহকারী সম্পাদক ।[৩৬] আল্‌-এসলাম পত্রিকায় যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত

---

[৩১] মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ ঃ ১৬ ।

[৩২] মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩৪ ।

[৩৩] ১৯১৭ সালে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানের বার্ষিক সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত রিপোর্ট, উদ্বৃত: আবুল ফজল, 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা', মাহেনও, ঢাকা, আষাঢ় ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, জুন ১৯৬২, পৃ ঃ ৩৫ ।

[৩৪] ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, আল্‌-এসলাম,উদ্বৃত: মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, ঢাকা-১৯৬৬, পৃ ঃ ৯১ ।

[৩৫] মুস্তাফা নূর উল্ ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত (১৯০১-১৯৩০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ ঃ ৪৩৫ ।

[৩৬] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩৮৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

হত, তা ছিল ইসলামী জাগরণধর্মী উচ্চ শ্রেণীর প্রবন্ধ এবং এগুলো তৎকালীন সময়ে মুসলিমদের সামাজিক ও জাতীয় জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৩৭]

১৯২০ সালের ২৪শে মে মাওলানা আকরম খাঁ কলকাতা থেকে 'জামানা' নামক একটি উর্দু দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উর্দু ভাষাভাষী মুসলিমদের মধ্যে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী এবং মুসলিম জাগরণের বার্তা পৌঁছানোর লক্ষ্যেই 'জামানা' প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এর প্রথম সংখ্যায় 'আমরা ও আমাদের নীতি' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন:

> "নিজেদের ব্যাপারে আমরা কেবল এইটুকু বলা যথেষ্ঠ মনে করি যে, আমরা একদিকে মুছলমান অপর পক্ষে হিন্দুস্থানীও বটে। তাই আমাদের পবিত্র ধর্মের খেদমত এবং প্রিয় দেশের কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা জামানার নীতিগত দায়িত্ব। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইহাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন যে আমরা এছলামী ভ্রাতৃত্ব ও ধর্মীয় সম্পর্কের বন্ধনকে সকল সময় দেশের সীমারেখা হইতে মুক্ত মনে করি।"[৩৮]

মূলত: এ নীতির উপর ভিত্তি করে মাওলানা আকরম খাঁ জামানা পত্রিকায় একদিকে ইসলাম ধর্ম ও স্বদেশের কল্যাণের লক্ষ্যে প্রচার চালান এবং অন্যদিকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে স্বীকার করে স্বদেশ থেকে বহুদূরে তুর্কী খলিফার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস গ্রহণ করেন। মোট চার বছর স্থায়ী এ পত্রিকা ভারতের বিশেষ করে বাংলার উর্দু ভাষাভাষী মুসলিমদের আত্ম-প্রত্যয়ী এবং সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।[৩৯]

উর্দু দৈনিক জামানা প্রকাশের পরপরই অসহযোগ আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে মাওলানা আকরম খাঁ সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায়

---

[৩৭] সৈয়দ মুর্তাজা আলী, আমাদের কালের কথা, চট্টগ্রাম, ১৯৬৮, পৃ ঃ ১১১।
[৩৮] দৈনিক জামানা, কলকাতা, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ২৪ মে, ১৯২০। সহ দ্রঃ দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৬ই জুন, ১৯৭৫, পৃ ঃ ৩।
[৩৯] এ.টি.এম. আতিকুর রহমান, বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৯০৫-১৯৪৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ ঃ ১০০-১০১।

Dhaka University Institutional Repository

'সেবক' নামে অন্য একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে ১৯২১ সালের ১লা ডিসেম্বর তিনি পত্রিকাটিকে দৈনিকে রূপান্তরিত করেন। কিন্তু ১০ই ডিসেম্বর 'অগ্রসর! অগ্রসর!!' শীর্ষক সরকার-বিরোধী সম্পাদকীয় প্রকাশ করায় সরকার কর্তৃক পত্রিকাটির প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং সম্পাদকীয় লেখার অপরাধে তাঁকে গ্রেফ্তার করে এক বছরের জন্য কারাগারে প্রেরণ করা হয়। এমতাবস্থায় তাঁর সহকর্মীবৃন্দ সেবকের বিকল্প অন্য একটি দৈনিক বের করার চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। কিন্তু সে সময়ে বৃটিশ-বিরোধী কোন দৈনিকের ডিক্লারেশন পাওয়া ছিল অনেকটা অসম্ভব ব্যাপার। তাই শেষ পর্যন্ত মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীকে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক করে সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর দৈনিক সংস্করণ হিসেবে দৈনিক মোহাম্মদী প্রকাশ করা হয়।[৪০] এ দৈনিকের সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ যুক্ত হয়ে তাঁদের মেধা ও শ্রম দ্বারা অচিরেই পত্রিকাটিকে প্রথম শ্রেণীর দৈনিকে পরিণত করেন এবং ক্রমান্বয়ে এর প্রচার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় মাওলানা আকরম খাঁ কারাগার থেকে পত্রিকা পরিচালনার ব্যাপারে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। ইতোমধ্যে দৈনিক সেবকের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে দৈনিক মোহাম্মদীর স্থলে দৈনিক সেবক পুনঃ প্রকাশিত হয়।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে দৈনিক জামানা ও দৈনিক সেবক প্রকাশিত হয়েছিল বিধায় ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক আন্দোলন প্রত্যাহারের পর পত্রিকা দু'টি ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারায়। পরে ১৯২২ সালের আগষ্ট কিংবা সেপ্টেম্বর মাসে দৈনিক সেবক এবং বছর খানেক পর দৈনিক জামানার প্রকাশও বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৪১] কিন্তু মাওলানা আকরম খাঁ সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর প্রকাশ অব্যাহত রাখেন। পরবর্তীতে ১৯২৭ সালের ৬ই নভেম্বর তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ে মাসিক মোহাম্মদী প্রকাশ শুরু করেন। প্রধানত: সাহিত্য পত্রিকা হলেও মুসলিম জাগরণের বিশেষ বাহন হিসেবে তিনি এ পত্রিকা প্রকাশ করেন। মাসিক মোহাম্মদীর মাধ্যমে প্রাচীনপন্থী এবং আধুনিকপন্থী মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গীর

---

[৪০] আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, ঢাকা-১৯৮৫, পৃ ঃ ৬৮।
[৪১] এ.টি.এম. আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১০১-১০২।

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বয় সাধন করা তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাই পত্রিকাটির ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় 'আত্মনিবেদন' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি বলেন:

> "বিভিন্ন ভাবধারার সমবায়ে এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে মোছলেম বঙ্গের স্তরে স্তরে আজ এক অভিনব জীবন সাধনা জাগিয়া উঠিয়াছে। একদিকে পুরাতনের মায়া, অন্যদিকে আধুনিকতার মোহ। পুরাতনের মায়া বহু শতাব্দীর সঙ্কলিত জ্ঞান-অজ্ঞানের সমস্ত সঞ্চয় একত্রে আকড়াইয়া ধরিয়া প্রাণ পণেও তাহাকে রক্ষা করার জন্য ব্যাকুল। আধুনিকতার মোহ প্রত্যেক রাজসিক বিকারকে জীবনের স্পন্দন এবং উচ্ছৃঙ্খলতার প্রত্যেক বিকাশকে জ্ঞানের মুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে ব্যগ্র। উভয় দিকের এই ব্যগ্র ব্যাকুল ভাবধারা প্রকাশকে অনেকে সংঘাত ও সংঘর্ষ নামে আখ্যাত করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয় ধারার মূল উৎস এবং উভয়ের চরম লক্ষ্য অভিন্ন। বাহ্যত ইহা সংঘাত, কিন্তু বস্তুত: ইহা নূতন জীবনের সূত্রপাত। এখনকার কর্তব্য উভয় ধারাকে বাহিরের আধুনিকতার হাত হইতে রক্ষা করা—সত্যকে তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উভয় ধারাকে গভীর ও নির্ম্মল করিয়া তোলা। এই প্রকারে দুই ধারার সহায়তা করিয়া আমরা যত শীঘ্র তাহাকে খরস্রোত করিয়া তুলিতে পারিব, তাহার মধ্যেকার অন্তরালে ক্লেদ কর্দ্দমের বর্ত্তমান ব্যবধান তত শীঘ্রই গলিয়া ধুইয়া অপসারিত হইয়া যাইবে।"[৪২]

মাসিক মোহাম্মদীর সম্পাদক হিসেবে 'আলোচনা' শীর্ষক অংশে/বিভাগে মাওলানা আকরম খাঁ নিয়মিত লিখতেন। তাঁর লেখায় সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা-প্রবাহের উপর আলোকপাত থাকতো। মাসিক মোহাম্মদীর বিভিন্ন সংখ্যা অধ্যয়ন করে তার প্রমান পাওয়া যায়। তাছাড়া আবুল কালাম শামসুদ্দীনের বক্তব্য হতেও তার সমর্থন পাওয়া যায়।[৪৩] এক কথায় বলা চলে, বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম প্রাধান্য বিস্তার এবং মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যেই তিনি 'আলোচনা' বিভাগে নিয়মিত লেখা প্রকাশ করতেন। মুস্তাফা নূরউল ইসলামের বর্ণনা মোতাবেক — এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক ও যুগোপযোগী করে ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যা প্রদান করা। ধর্মীয় ও সামাজিক বিতর্কে 'মাসিক মোহাম্মদী'

---

[৪২] মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক-১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, (নভেম্বর, ১৯২৭) পৃঃ ২।
[৪৩] দেখুন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১২৫, ১৩০-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছিল, তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্পষ্টত: উদার ও প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ।[৪৪]

মাওলানা আকরম খাঁ মোহাম্মদী পত্রিকার পাশাপাশি ১৯৩৬ সালের ৩১শে অক্টোবর 'দৈনিক আজাদ' প্রকাশ করেন, যা প্রায় অর্ধশতাব্দী স্থায়ী ছিল । এর প্রকাশ ছিল তাঁর সাংবাদিক জীবনের প্রধানতম সাফল্য এবং বাংলা-আসামের সাংবাদিকতার ইতিহাসে একটি অমর কীর্তি । বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিতাড়নের পেছনে এর অবদান ছিল অপরিসীম । একথা আমাদের সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, উপমহাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন, বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুসলিম জাগরণের পটভূমিতে ঐতিহাসিক যুগ-সন্ধিক্ষণেই দৈনিক আজাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল । দৈনিক আজাদ প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা প্রসঙ্গে এর এককালীন সম্পাদক (১৯৪০-৬২ সাল পর্যন্ত) আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেন:

> "বাংলার মুসলিম সাংবাদিকতার পরিচয় দিতে বসে একথা না বললে সম্ভবত: বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যে, 'আজাদ' থেকেই বাংলায় মুসলিম দৈনিকের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে । ... এর আগেও অবশ্য দৈনিক প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে । 'হাবলুল মতীন'-ই সম্ভবত: প্রথম মুসলিম বাঙলা দৈনিক । ... এই স্বল্পায়ু কাগজখানি ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল । তারপর ১৯১৯ সালে মুজাফফর আহমদ, নজরুল ইসলাম ও ফজলুল হক সেলবর্সির সম্পাদনায় দৈনিক নবযুগ প্রকাশিত হয় । ... এরপর দৈনিক সেবক, দৈনিক মোহাম্মদী, দৈনিক ছোল্‌তান, দৈনিক তরক্কী, দৈনিক কৃষক, দৈনিক ইত্তেহাদ প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু তাদেরও দীর্ঘ স্থায়িত্ব সম্ভব হয়নি ।"[৪৫]

১৯৩৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি কায়েদ-ই আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পুনর্গঠন উপলক্ষে কলকাতায় আসলে মাওলানা আকরম খাঁর সাথে তাঁর এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হয় এবং জিন্নাহ্ সাহেব মুসলিম লীগের বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে একটি বাংলা

---

[৪৪] সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৪৪৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করার জন্যও তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন । অপর দিকে দীর্ঘ প্রায় তিন যুগ (৩৫ বৎসর) ধরে সাংবাদিকতার সাথে অত্যন্ত সফলভাবে যুক্ত থাকায় এবং উপমহাদেশের মুসলিমদের আস্থা ও প্রশংসা অর্জন করায় বিভিন্ন স্থান থেকে একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য বহুদিন থেকে তাঁকে অনুরোধ জানানো হয় । এ পরিস্থিতিতে মাওলানা আকরম খাঁ প্রধানতঃ বাংলা ও আসামের বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলিমদের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরার জন্য এবং তাদের রাজনৈতিক প্রয়োজনে দৈনিক আজাদ প্রকাশ করেন । পত্রিকাটির ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'আজাদের আত্ম-নিবেদন' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকেই তা স্পষ্ট অনুধাবন করা যায় । উক্ত নিবন্ধে তিনি বলেনঃ

> "বাংলা ও আসামের বঙ্গ ভাষা-ভাষী মুছলমানের সংখ্যা তিন কোটিরও অধিক । এই তিন কোটি মুছলমানের দুঃখ-দরদ, অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্খা এবং জ্ঞাতব্য ও জিজ্ঞাসা অনন্ত, অপরিমিত । ইহার উপরে আছে প্রাদেশিক রাজনীতির নিত্য পরিবর্তনশীল গতিধারা, প্রতিকূল পরিবেশের নির্ম্মম ঘাত-প্রতিঘাত, গৃহ বিচ্ছেদ ও আত্ম-কলহের নিত্য নব অবদান । অথচ এই অবস্থায় এবং বিশ শতাব্দীর একমাত্র অবলম্বন হইতেছে কএকখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র । এই শোচনীয় দৈন্যের অনুভূতি মোছলেম বঙ্গের জাতীয় অন্তরকে যাতনা দিয়া আসিতেছে বহুদিন হইতে । এই দৈন্যের অনুভূতিতে অস্থির হইয়া ...দীর্ঘকালের ব্যাকুল অপেক্ষার পর, আমাদের শেষ জীবনের আকুল আকাঙ্খাটি একমাত্র আল্লাহ্‌র সাহায্যে আজ বাস্তবে পরিণত হইল । তিনকোটি মুছলমানের সত্যকার সেবক ও নিরপেক্ষ প্রতিনিধিরূপে দৈনিক আজাদ হাতে করিয়া সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইতে পারিলাম ।"[৪৬]

দৈনিক আজাদ পত্রিকার মাধ্যমে মাওলানা আকরম খাঁ একদিকে মুসলিমদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবি-দাওয়া গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন এবং অন্যদিকে অব্যাহত প্রচার চালিয়ে শিক্ষা, সম্পদ ও রাজনীতিতে প্রতিপত্তিশালী হিন্দু সমাজের বিরোধিতা ও প্রতিকূলতা মোকাবেলা করার লক্ষ্যে মুসলিমদের সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তিতে

---

[৪৫] উদ্ধৃতঃ মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্‌, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৮-২৯ ।
[৪৬] এ.টি.এম. আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পরিশিষ্ট-৮, দৈনিক আজাদের প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়, পৃ ঃ ১৪৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিণত করতে সচেষ্ট হন।[৪৭] ফলে অল্পদিনের মধ্যে দৈনিকটি বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলিমদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং বাংলা-আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এর ব্যাপক চাহিদা পরিলক্ষিত হয়।[৪৮] প্রকাশের পর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে পত্রিকাটি নির্ভীকভাবে মুসলিম লীগ ও মুসলিম সমাজের স্বার্থে অব্যাহতভাবে প্রচারকার্য চালিয়ে যায়। ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর থেকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিমদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বাংলায় জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে পত্রিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ মোদাব্বের অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মুসলিম লীগ মুসলিম জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবী নিয়ে এগিয়ে চললো, 'আজাদ' জাতির সামনে তুলে ধরলো এক নতুন আদর্শ। মিঃ জিন্নাহ্‌র নেতৃত্ব ও আজাদের সমর্থন উপমহাদেশে এক অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনের সূত্রপাত করলো। যার ফসল হচ্ছে পাকিস্তান।[৪৯] উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের রাজনীতিতে মাওলানা আকরম খাঁ প্রতিষ্ঠিত 'দৈনিক আজাদ' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর ধারাবাহিকতা ১৯৯৫ সালের ১৮ই আগষ্ট পর্যন্ত প্রায় ৫৯ বছর অব্যাহত থাকে।

উর্দু ও বাংলা পত্রিকার পাশাপাশি তিনি ১৯৪৩ সালে (মতান্তরে ১৯৪৬ সালে) সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্রিকা 'কমরেড' প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির সর্বপ্রথম মালিক ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আলী।[৫০] তিনি পত্রিকাটি খাজা নূরুদ্দীন এর নিকট বিক্রি করে দিলে পরে তাঁর নিকট হতে মাওলানা আকরম খাঁর দ্বিতীয় ছেলে সদরুল আনাম খাঁ পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করেন। কমরেড পত্রিকার সম্পাদনা মাওলানা আকরম খাঁ কলকাতা আজাদ অফিস থেকে আরম্ভ করলেও পরবর্তীকালে মুজিবর রহমান খাঁর সম্পাদনায় তা বের হতো। ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন কমরেড সম্পাদনায়

---

[৪৭] আবুল ফজল, 'আজাদ দীর্ঘজীবি হোক', দৈনিক আজাদ, রজত জয়ন্তী সংখ্যা, উদ্ধৃতঃ মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪-৪৫।

[৪৮] আবুল কালাম শামসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৬।

[৪৯] মোহাম্মদ মোদাব্বের, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সচিত্র বাংলাদেশ, ১৬ অক্টোবর, ১৯৮০; আ. কা. মু. আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।

[৫০] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।[৫১] মাওলানা আকরম খাঁ 'মুসলিম ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস'-সংক্রান্ত অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, যেগুলো সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ইংরেজীতে অনুবাদ করে 'কমরেড'-এ ছাপিয়েছেন। ঐ সময় কলকাতা থেকে 'The Star of India', 'The Mornig News' ইত্যাদি পত্রিকাও বের হত।[৫২] প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মাওলানা আকরম খাঁ ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ না পেলেও ব্যক্তিগত অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইংরেজীতে তিনি যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর ইংরেজী জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় 'কমরেড' সম্পাদনা কালে। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন বলেন যে, Comrade'-এ ছাপাবার আগে প্রতিটি প্রবন্ধ মাওলানাকে পড়ে শোনাতে হতো। সে সময় লক্ষ্য করা গেছে শব্দ প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর সূক্ষ্ম সচেতনতা; ভুল বা অসার্থক প্রতিশব্দ ব্যবহারের ত্রুটি তিনি সহজেই ধরে ফেল্‌তেন।[৫৩]

২: রাজনীতি :

বাংলায় মুসলিম জাগরণের অন্যতম দিশারী মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন একজন দেশ প্রেমিক ও নিবেদিত প্রাণ রাজনীতিবিদ। একজন সফল রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি যুগযুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর সাংবাদিকতা ছিল আসলে তাঁর রাজনৈতিক সত্তারই বহিঃপ্রকাশ। তাঁর রাজনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাগরণ। মূলতঃ মুসলিম জাতির আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম হতে ষাটের দশক পর্যন্ত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তার প্রায় প্রত্যেকটির সাথেই তাঁর নাম ওৎপ্রোতভাবে জড়িত।

---

[৫১] অধ্যাপক তাজাম্মুল হোসেন, আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা, ঢাকা, জানুয়ারী-মার্চ সংখ্যা, ১৯৯৫, পৃ ঃ ৭।

[৫২] Md. Kased Ali, op. cit., P. 44; আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৩২।

[৫৩] Dr. Syed Sajjad Hossain, In Memory of Moulana Akram Khan, Quoted in Abu Jafar's Maulana Akram Khan: A Versatile Genius, op. cit., P.33.

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্র থাকাকালীন সময়েই তাঁর মধ্যে জাতীয় ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। ১৮৮৬ সালে স্যার সৈয়দ আয়োজিত 'All India Muslim Education Conference' (নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন)-এর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে প্রকৃতপক্ষে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। এ আন্দোলনের সূত্রে তিনি তারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন।[৫৪] কোন কোন বিবরণ হতে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন'-এ তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগদান করেন। ঐ দিন নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামক একটি রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটলে মাওলানা আকরম খাঁ তাতে যোগদান করে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন।[৫৫] পাশাপাশি উক্তসব বিবরণে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে মাওলানা আকরম খাঁর অংশগ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। তাই বিষয়টি স্ববিরোধী বলেই মনে হয়। কারণ, প্রধানত: বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতি কংগ্রেসের হুমকী মোকাবেলা করার জন্যই ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মুসলিম লীগ গঠন করা হয়।[৫৬] তাই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী কংগ্রেস কর্মী মাওলানা আকরম খাঁ মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন, এ তথ্য সঠিক নয়। প্রসঙ্গতঃ এখানে আকরম খাঁর বক্তব্য উল্লেখ করা যায়। বার্ষিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত এক নিবন্ধে তিনি বলেন: "এই আন্দোলনের (বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী) সময় 'গভর্নমেন্টকে সমর্থন করার জন্য' মোসলেম লীগের সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য যে, মিঃ আবদুর রসূল এবং তাঁহার স্বমতাবলম্বী মুছলমানদিগকে লীগের

---

[৫৪] দেখুন, দেওয়ান আবদুল হামিদ, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ঢাকা-১৯৭০, পৃ ঃ ১১-১৩; আনিসুজ্জামান, 'সাহিত্যিক ও সাংবাদিক', দৈনিক আজাদ, ৭ জুন ১৯৬৮, পৃ ঃ ৪(ঘ), বিশেষ সংখ্যা।

[৫৫] মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্‌, মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ই.ফা.বা., ঢাকা-১৯৮৩, পৃ ঃ ৩৪; ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌ রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, ই.ফা.বা., ঢাকা-১৯৯৫, পৃ ঃ ৩২৮; সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৬ , পৃ ঃ ৩৩; মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ ঃ ২৬; Abu Jafar, Maulana Akram Khan: A Versatile Genius, Dhaka-1984, P. 52.

[৫৬] কে এম. মোহসীন, বঙ্গভঙ্গ; উদ্বৃত: মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত), বঙ্গভঙ্গ, ঢাকা-১৯৮১, পৃ ঃ ১০।

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিসীমায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইলনা।"[৫৭] একই নিবন্ধে মাওলানা আকরম খাঁ আরও উল্লেখ করেন যে, আবদুর রসূল ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক গুরু। কাজেই মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন না। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে তিনি মুসলিম লীগের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন।

বৃটিশ ভারতীয় সরকার প্রধানতঃ প্রশাসনিক কারণকেই বঙ্গ-ভঙ্গের মূল যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করলেও আবদুর রসূলের ন্যায় মাওলানা আকরম খাঁও মনে করতেন এর কারণ ছিল রাজনৈতিক।[৫৮] তাই বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে তিনি এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর ভাষায়– "উদীয়মান বাঙালী জাতির রাজনৈতিক শক্তিকে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া ফেলার জন্যই গভর্নমেন্ট দুরভিসন্ধিমূলে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছে, সুতরাং তাহার প্রতিবাদ হওয়া উচিৎ।"[৫৯] তাছাড়া পশ্চিম বঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিমদের ভবিষ্যৎ চিন্তাও তাকে এ আন্দোলনে অংশ নিতে উৎসাহিত করে।[৬০] বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে মাওলানা আকরম খাঁ অনেক প্রভাবশালী জননেতার সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সখারাম গণেশ দেউসকর, কালি প্রসন্ন কাব্য বিশারদ প্রমুখ প্রভাবশালী জননেতার সহকর্মীরূপে বহু সভায় যোগ দিয়ে তিনি অসাধারণ বাগ্মী ও জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী নেতারূপে পরিচিতি লাভ করেন।[৬১] এক পর্যায়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদ আকারে ব্যাপকতা লাভ করলে ভারত সরকার আন্দোলনের চাপে নতি স্বীকার করে বঙ্গ-ভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন।[৬২] বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ১৯১১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর নওয়াব সলীমুল্লাহ্ ঢাকায় যে সভা আহবান

---

[৫৭] বার্ষিক মোহাম্মদী, কলকাতা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, পৃ ঃ ১৬২।

[৫৮] বদরুদ্দীন উমর, বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, কলকাতা-১৯৮৭, পৃ ঃ ১১।

[৫৯] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, আবদুর রসূল, বার্ষিক মোহাম্মদী, কলকাতা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, পৃ ঃ ১৬২।

[৬০] পূর্বোক্ত, ১৬২।

[৬১] আবুজাফর (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৩২; মাসিক মোহাম্মদী, ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃ ঃ ৯৫; বার্ষিক সওগাত, কলকাতা, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, পৃ ঃ ১৬৮; দৈনিক আজাদ, ৭ জুন ১৯৮৯, পৃ ঃ ৪।

[৬২] কে. এম. মোহসীন, বঙ্গভঙ্গ, উদ্ধৃতঃ মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), বঙ্গভঙ্গ, ঢাকা-১৯৮১, পৃঃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

করেন, তাতে আবদুর রসূলসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বঙ্গভঙ্গ বিরোধী মুসলিম নেতৃবৃন্দ যোগ দেন।[৬৩] ১৯১২ সালের ২রা মার্চ কলকাতার লর্ড ডালহৌসী ইনস্টিটিউটে নওয়াব সলীমুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে 'Bengal Presidency Muslim Conference' অনুষ্ঠিত হয়।[৬৪] মাওলানা আকরম খাঁ উক্ত কনফারেন্সে অংশ গ্রহন করেন এবং বক্তব্য পেশ করেন।[৬৫] এ কনফারেন্সে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সঙ্গে সংযোগ রেখে বাংলার মুসলিমদের জন্য একটি প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য দু'বঙ্গের মুসলিম লীগকে সংযুক্ত করে 'Bengal Presidency Muslim League' গঠন করা হয়। ফলে মাওলানা আকরম খাঁ-সহ আরও অনেক কংগ্রেসী মুসলিম কংগ্রেসের সদস্যপদ বহাল রেখেও মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত হন এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি স্থাপনে তৎপর হন।

১৯১৫ সালের জানুয়ারীতে নওয়াব সলীমুল্লাহ্‌ মৃত্যুবরণ করলে বাংলায় মুসলিম লীগ অনেকটা নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় এ.কে. ফজলুল হক, মৌলবী মুজিবুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দসহ মাওলানা আকরম খাঁ বাংলায় মুসলিম লীগকে পুনরুজ্জীবিত করতে সচেষ্ট হন।[৬৬] ১৯১৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর বোম্বেতে অনুষ্ঠিত দু'টি পৃথক অধিবেশনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, ভারতের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে এ দু'টি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বৃটিশ সরকারের নিকট একটি যুক্ত পরিকল্পনা উপস্থাপন করবে। এ লক্ষ্যে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে যে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার কমিটি গঠন করা হয় তাতে বাংলার ১১জন সদস্যের মধ্যে

---

[৬৩] Shila Sen, Muslim Politics in Bengal: 1937-47, New Delhi, 1976, P.44.

[৬৪] ঢাকা প্রকাশ, ১০ মার্চ ১৯১২, পৃ ঃ ৩; মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌, নওয়াব সলীমুল্লাহ্‌ঃজীবন ও কর্ম, ঢাকা-১৯৮৬, পৃ ঃ ১৮৩।

[৬৫] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Matiur Rahman, From Consultation to Confrontation: A Study of the Muslim League in British Indian Politics: 1906-1912, London, 1970, P. 547-49.

[৬৬] সৈয়দ এমদাদ আলী, আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, কার্তিক ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, পৃ ঃ ৫।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আকরম খাঁ-ও অন্তর্ভূক্ত হন।[৬৭] কংগ্রেসের পক্ষে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিই উক্ত কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ করে।[৬৮] উভয় কমিটি ১৯১৬ সালের নভেম্বরে কলকাতায় মিলিত হয়ে যৌথভাবে একটি শাসনতান্ত্রিক সংস্কার পরিকল্পনা প্রনয়ণ করে এবং ১৯১৬ সালের ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ও লীগের বার্ষিক অধিবেশনে তা উথাপন করে।[৬৯] উভয় অধিবেশনে তা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। এটাই ইতিহাসে 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' নামে অভিহিত। এ চুক্তি অনুযায়ী কংগ্রেস প্রত্যেক প্রদেশে মুসলিম লীগের পৃথক বা স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী স্বীকার করে নেয়। মুসলিম লীগও নমনীয় হয়ে পাঞ্জাবে ৫০% এবং বাংলায় ৪০% মুসলিম প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করে জনসংখ্যার ভিত্তিতে তাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী প্রত্যাহার করে। অথচ সে সময়ে বাংলার মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৫২.৬%। কিন্তু চুক্তির শর্তানুসারে তাদের জন্য নির্ধারিত হয় ৪০% আসন। ফলে এ চুক্তিতে অসন্তুষ্ট হয়ে তৎকালীন প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি নওয়াব আলী চৌধুরীসহ অনেকেই লীগ রাজনীতি হতে সরে দাঁড়ান। কিন্তু এতে মাওলানা আকরম খাঁ হতোদ্যম না হয়ে হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতার রাজনীতি অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।[৭০]

মাওলানা আকরম খাঁ রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতার নীতি গ্রহণের পাশাপাশি বিশ্ব-মুসলিম ভ্রাতৃত্বেও বিশ্বাসী ছিলেন। এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি তুর্কী খিলাফতের প্রতি অনুগত ছিলেন। ১৯১৪ সালে সংঘটিত বৃটেন-জার্মানীর মধ্যকার যুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করলে ভারতীয় মুসলিমদের অধিকাংশ তুর্কী খিলাফতের ভবিষ্যত সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে খিলাফত রক্ষার প্রশ্নে বৃটিশদের বিরোধিতার পথ গ্রহণ করে।[৭১] এ পরিস্থিতিতে মাওলানা আকরম খাঁ

---

[৬৭] অন্য দশজন সদস্য হচ্ছেন নওয়াব আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ ইসমাইল, মৌলবী মুজিবুর রহমান, আবদুর রসূল, নওয়াব নাসির হোসাইন খান, এ.কে. ফজলুল হক, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলবী নাজিমুদ্দীন আহমদ, চৌধুরী আলীউজ্জামান এবং আবুল কাসেম। সূত্রঃ Syed Sharifuddin Pirjada (ed.), Foundation of Pakistan:All India Muslim League Documents, 1906-1947, Vol. 1, Karachi, 1969, P. 355.

[৬৮] Shila Sen, op. cit., P. 46.

[৬৯] Muhammad Abdur Rahim, The Muslim Society and Politics in Bengal: 1757-1947, Dhaka, 1978, P. 227.

[৭০] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, হিন্দু মেমোরিয়েল, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬৫৮।

[৭১] বদরুদ্দীন উমর, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

আপোসহীনভাবে তুর্কি খিলাফতের পক্ষে দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণে সচেষ্ট থাকেন।[৭২] অবশ্য এর পূর্বেই ১৯১৩ সালে চট্রগ্রাম লালদীঘি ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিয়ে তিনি মুসলিম জনসাধারণকে তুর্কী খিলাফত রক্ষায় এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন।[৭৩]

এদিকে বৃটিশ বিরোধী ভারতীয়দের দমনের উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯১৯ সালের ২১শে মার্চ পাশকৃত নিপীড়নমূলক 'রৌলট আইন' বাতিলের লক্ষ্যে ভারতীয়গণ জোর আন্দোলন গড়ে তোলে এবং ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে হাজার হাজার হিন্দু-মুসলিম এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। শান্তিপূর্ণ সভার উপর সশস্ত্র বৃটিশবাহিনীর বেপরোয়া গুলি বর্ষণে সেখানে সহস্রাধিক নর-নারী ও শিশু নিহত হয়।[৭৪] এ নির্মম হত্যাকান্ডের খবর সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সারা ভারতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং এতে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।[৭৫] জালিয়ানওয়ালাবাগের এ মর্মন্তুদ হত্যাকান্ডের পর মাওলানা আকরম খাঁ পাঞ্জাবে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ঘটনার ভয়াবহতা উপলব্ধি করেন এবং দ্রুত সেখান থেকে ফিরে এসে বাংলার বিভিন্নস্থানে অনুষ্ঠিত জনসভায় এ নির্মম হত্যাকান্ডের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়ে জনসাধারণকে বৃটিশ নৃশংসতা সম্পর্কে অবহিত করেন। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাওলানা আবদুল বারী লক্ষ্মৌতে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের বৈঠক আহবান করেন। এ বৈঠকেই সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটি গঠিত হয় এবং বোম্বাইকে কেন্দ্র করে ভারতের সকল প্রদেশে এর শাখা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়।[৭৬] এর ভিত্তিতে মাওলানা আকরম খাঁ বাংলায়

---

[৭২] মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন, 'আকরম খাঁর সাহিত্য সাধনা', দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৭ জুন, ১৯৬৮, পৃঃ ১১(৩), বিশেষ সংখ্যা।

[৭৩] আবদুর রহমান, যতটুকু মনে পড়ে, চট্রগ্রাম-১৯৭২, পৃ ঃ ৫৪-৫৫।

[৭৪] Tarachand, History of the Freedom Movement in India, Vol, III, India, 1967, PP. 479-80.

[৭৫] মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ্, আমাদর মুক্তি সংগ্রাম; ঢাকা-১৯৭৮, পৃ ঃ ২১৯।

[৭৬] মুহাম্মদ আবদুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসঃ ১৭৫৭-১৯৪৭, ঢাকা-১৯৭৬, পৃ ঃ ২২২।

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফত কমিটি প্রতিষ্ঠা করে নিজে এর সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এর সপক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ।[৭৭]

১৯১৯ সালের ১৭ই অক্টোবর কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির কর্মসূচী হিসেবে সমগ্র ভারতে 'খিলাফত দিবস' পালিত হয় । একই বৎসর ২৩ ও ২৪শে নভেম্বর দিল্লীতে প্রথম খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । এ সম্মেলনে এ,কে, ফজলুল হক, মহাত্মা গান্ধী এবং পন্ডিত মতিলাল নেহেরুসহ বিশিষ্ট হিন্দু নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন । মহাত্মা গান্ধী খিলাফত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে সরকারের সঙ্গে সকল ধরনের সহযোগিতা বর্জন করার প্রস্তাব করেন । অতঃপর ১৯২০ সালের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে যথাক্রমে মীরাট, কলকাতা ও ঢাকার আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত খিলাফত সম্মেলনে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় । এসব সম্মেলনে মাওলানা আকরম খাঁ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং খিলাফত রক্ষায় প্রয়োজনে অসহযোগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা করেন ।

১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস, খিলাফত কমিটি ও মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ কর্মসূচী চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয় । মাওলানা আকরম খাঁ এ কর্মসূচীকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেন । বাংলার জনপ্রিয় নেতা এ.কে. ফজলুল হক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীর সাথে দ্বিমত পোষণ করলেও মাওলানা আকরম খাঁ-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তা অব্যাহত রাখেন । মাওলানা আকরম খাঁ সংবাদপত্রের মাধ্যমেও খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যা যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে ।[৭৮]

সমগ্রদেশে যখন অসহযোগ কর্মসূচী জনপ্রিয় হয়ে উঠে, তখন ইংল্যান্ডের যুবরাজ-এর ভারত সফর ও কলকাতা আগমনকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে ১৯২১ সালের ১৮ নভেম্বর ও ২৪ ডিসেম্বর অসহযোগের অংশ হিসেবে হরতাল কর্মসূচী

---

[৭৭] খুরশীদ আহমদ, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, উদ্বৃতঃ আবু জাফর (সম্পাদিত),প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২০৭ ।

[৭৮] বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য, এ.টি.এম. আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৮-২০; আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা-১৯৭৫, পৃ ঃ ৩৪; Syed Sharifuddin Pirjada, op. cit., PP. 546-47; সৈয়দ মুর্তাজা আলী, আমাদের কালের কথা, চট্টগ্রাম-

Dhaka University Institutional Repository

পালন করা হয়। ফলে চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষ চন্দ্র বসু, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সাথে মাওলানা আকরম খাঁও গ্রেফতার হন। এসময় অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে উত্তেজনাকর সম্পাদকীয় প্রকাশের দায়ে সরকার আকরম খাঁ সম্পাদিত দৈনিক সেবক নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং এর জামানত বাজেয়াপ্ত করে।[৭৯] দীর্ঘ এক বছরেরও অধিক সময় কংগ্রেসের সঙ্গে খিলাফত কমিটি সমন্বিতভাবে আন্দোলন পরিচালনা করার পর ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যুক্ত-প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচৌরা থানার অধিবাসীরা পুলিশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে থানা আক্রমণ করে এবং জ্বালিয়ে দেয়। এ ঘটনায় ২১ জন কনষ্টেবলসহ থানার দারোগা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে।[৮০] এ ঘটনার প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী খিলাফত কমিটির সঙ্গে কোন যোগাযোগ ব্যতিরেকেই অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। এ প্রসঙ্গে আবুল কালাম শামসুদ্দীন অভিমত ব্যক্ত করেন যে, গান্ধীজী দেশবাসীকে যে অহিংস অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলন, তার সাথে এই হিংস্র ব্যাপারটা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, আন্দোলন চালিয়ে নেয়ার পক্ষে এটাই ছিল কৈফিয়ৎ।[৮১] এরপরও খিলাফত নেতৃবৃন্দ কংগ্রসের সহযোগিতা ছাড়াই খিলাফত আন্দোলন চালিয়ে যান। কিন্তু ১৯২৪ সালে তুরস্কের মোস্তফা কামাল পাশা কর্তৃক খিলাফতের বিলোপ সাধনের ফলে খিলাফত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।[৮২]

অসহযোগ আন্দোলনের আকস্মিক গতি পরিবর্তনে সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। ভারতের অন্যান্য স্থানের মত বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিও চরম সাম্প্রদায়িক কলহ-কোন্দলে রূপ নেয়। এ পরিস্থিতিতে মাওলানা আকরম খাঁ চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতার নতুন প্রেক্ষাপট রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। চিত্তরঞ্জন দাস ১৯২৩ সালের

১৯৭৫, পৃ ঃ ৯৪; Abu Jafar, op. cit., P. 36; ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯২০, পৃ ঃ ৪।

[৭৯] আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, ঢাকা,-১৯৮৫, পৃ ঃ ৬৭।

[৮০] মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২২৫।

[৮১] আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৯০।

[৮২] মোহাম্মদ এনামুল হক, 'বাঙ্গালী মুসলিম মানসে তুর্কী বিপ্লবের প্রভাব', ইতিহাস (ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা), বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৭৫, পৃ ঃ ১-৪।

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারীতে কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক বহাল রেখেই স্বরাজ লাভের লক্ষ্যে স্বরাজ্য দল গঠন করেন।[৮৩] ড. আনসারী, হাকিম আজমল খাঁ, বিঠল ভাই প্যাটেল, মতিলাল নেহেরু, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ডা. বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখের সাথে মাওলানা আকরম খাঁ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের এ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন।[৮৪]

স্বরাজ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চিত্তরঞ্জন দাস মুসলিমদের মধ্য থেকে বিচক্ষণ ও বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসেবে মাওলানা আকরম খাঁকে বেছে নেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে একত্রে গ্রেফতার হয়ে কারাবাসের সময় চিত্তরঞ্জন ও আকম খাঁ একে অপরের ঘনিষ্ঠ হন। কারাগারে হিন্দু culture এবং মুসলিম culture বিষয়ক নানা দিক নিয়ে তাঁরা প্রায়ই আলোচনা করতেন এবং হিন্দু-মুসলিম মিলনে কি ভূমিকা রাখা যায়, সে বিষয়েও ভাবতেন।[৮৫] হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতাকে রাজনৈতিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯২৩ সালের এপ্রিলে চিত্তরঞ্জন দাস উভয় সম্প্রদায়কে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ করেন, যা 'Bengal pact' নামে পরিচিত। স্যার আবদুর রহিম, মৌলবী মুজিবুর রহমান, মাওলানা ইসলামাবাদী প্রমুখ মুসলিম নেতার সাথে মাওলানা আকরম খাঁ 'Bengal Pact' প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বেঙ্গল প্যাক্টে সন্নিবেশিত শর্তাবলী ছিল মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে। এতে সন্নিবেশিত শর্তাবলী ছিল নিম্নরূপঃ

'সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে, বাংলাদেশে যাহাতে স্বায়ত্ত্ব শাসনের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সেজন্য এই প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটি চুক্তি আবশ্যক; যখন স্বায়ত্ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন এই চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ অধিকার পাইবে। লোকসংখ্যার অনুপাতে ও স্বতন্ত্র নির্বাচনের প্রথায় বাংলাদেশ ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হইবে। স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রত্যেক জিলার সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় শতকরা ৬০টি

---

[৮৩] ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ৭ জানুয়ারী ১৯২৩, পৃ ঃ ৬।
[৮৪] আবুল মনসুর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৪৯।
[৮৫] ডা. নরেশ চন্দ্র ঘোষ, চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন, কলকাতা-১৩৭৮, পৃ ঃ ৫০২-৩।

Dhaka University Institutional Repository

আসন পাইবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ৪০টি আসন পাইবে। সরকারী দফতরে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫৫টি চাকুরী সংরক্ষিত থাকিবে এবং যে পর্যন্ত তাহারা এই সংরক্ষিত পর্যায়ে না পৌঁছে সে পর্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে শতকরা ৮০ জনকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে। যে পর্যন্ত চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের হার উপরোক্ত পর্যায়ে না আসে সে পর্যন্ত তাহাদেরকে নূন্যতম যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইবে; ইহার পর মুসলমানগণ চাকুরীর শতকরা ৫৫টি ও অমুসলমানেরা শতকরা ৪৫টি পাইবে, মধ্যবর্তীকালে হিন্দুগন শতকরা ২০টি চাকুরী পাইবে। কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম সম্পর্কীয় কোন আইন ব্যবস্থাপক পরিষদে পাশ করিতে হইলে সে সম্প্রদায়ের আইন সভায় নির্বাচিত তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থন থাকিতে হইবে। মসজিদের সম্মুখে গান-বাজনা সহকারে মিছিল করা হইবেনা এবং গরু জবেহ করার ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবেনা।'[৮৬]

১৯২৩ সালের নভেম্বরে ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে মুসলিমগণ স্বরাজ্য দলকে ব্যাপকভাবে বিজয়ী হতে সহায়তা করে। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে স্বরাজ্য দল ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' পাশ হওয়ার পর রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তারা কলকাতা শহরের অলিতে-গলিতে প্যাক্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করে। রক্ষণশীল হিন্দু পত্রিকাগুলোও প্যাক্টের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়।[৮৭] প্যাক্ট বিরোধী হিন্দুগণ তাদের প্রচারনার সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে মুসলিমদের যুক্ত করতে চেষ্টা করলেও মাওলানা আকরম খাঁর কারণে তা ব্যর্থ হয়। ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে স্বরাজ্য দল ব্যাপকভাবে তিন-চতুর্থাংশ আসনে বিজয়ী হয়। চিত্তরঞ্জন দাস নিজে মেয়র নির্বাচিত হন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন এবং মাওলানা আকরম খাঁ কর্পোরেশনের 'Alderman' নির্বাচিত হন।[৮৮] ফলে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হিন্দুগন ক্রমেই চিত্তরঞ্জন দাস ও মাওলানা আকরম খাঁর প্রতি বিরোপ হয়ে উঠেন। ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে আহুত প্রাদেশিক কংগ্রেসের

---

৮৬ মুহম্মদ আবদুর রহিম, বাংলায় মুসলমানদের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৬-২৭।
৮৭ সাপ্তাহিক ছোলতান, কলকাতা, ১১ই জানুয়ারী-১৯২৪, পৃঃ ৪।
৮৮ আবুল মনসুর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৫১-৫২; Bazlur Rahman Khan, Politics in Bengal: 1927-36, Dhaka, 1987, P. 17.

Dhaka University Institutional Repository

বার্ষিক সম্মেলনে 'Bengal Pact' যাতে পাশ হতে না পারে, সে বিষয়েও উগ্র ও রক্ষণশীল হিন্দুগণ জোর প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু উক্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে মাওলানা আকরম খাঁ সভাপতি নির্বাচিত হন এবং তাঁর উদ্দীপনাময় ভাষণে উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত হিন্দু-মুসলিম প্রতিনিধিগণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হন এবং বেঙ্গল প্যাক্টের প্রতি তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ফলে সম্মেলনে সর্বসম্মতি ক্রমে 'Bengal Pact' পাশ হয়।[৮৯]

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন আকস্মিকভাবে চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু হলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চরম অবনতি ঘটে। ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে মসজিদের সামনে গান-বাজনাসহ মিছিলকে কেন্দ্র করে কলকাতায় হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে একাধিক মারাত্মক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়।[৯০] এরূপ পরিস্থিতিতে কংগ্রেসে ক্রমশ সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষায় কংগ্রেস কার্যত: ব্যর্থ হয়। তখন মাওলানা আকরম খাঁ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নিস্পৃহতা লক্ষ্য করে তিনি মর্মাহত হন। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বরে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রজাস্বত্ব সংশোধণী বিল আলোচনার জন্য উত্থাপিত হলে কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলসহ সকল হিন্দু সদস্য মুসলিম ও প্রজা স্বার্থের তীব্র বিরোধিতা করায় তিনি অধিকতর মর্মাহত হন এবং কংগ্রেসের রাজনীতির প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। পরে ১৯২৯ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কৃষ্ণ নগর সম্মেলনে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' চূড়ান্তভাবে বাতিল করা হলে তিনি কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করেন।[৯১]

রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই মাওলানা আকরম খাঁ কৃষক-প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাই তিনি ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করার পর প্রজা আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে কলকাতায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের ২৭জন মুসলিম সদস্য এক সভায়

---

৮৯ আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৭।
৯০ Shila Sen, op. cit., PP. 58-59.
৯১ আবুল মনসুর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৬৩; সাপ্তাহিক সওগাত, কলকাতা, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯২৮; মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, কার্তিক-১৩৪১, পৃ ঃ ৯।

Dhaka University Institutional Repository

মিলিত হয়ে প্রজাস্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। স্যার আবদুর রহিম সমিতির সভাপতি ও আকরম খাঁ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৯২] মাওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে ১৯৩২ সালের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন স্থানের আঞ্চলিক প্রজা সমিতিগুলো নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির অধীনে সংগঠিত হয়। ফলে ইহা অত্যন্ত শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৩৪ সালের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে স্যার আবদুর রহিম সদস্য নির্বাচিত হন। অতঃপর তিনি স্পীকার নির্বাচিত হয়ে সমিতির সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করায় সমিতির নতুন সভাপতি নির্বাচন প্রশ্নে নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্ত র্বিরোধের সৃষ্টি হয়। দলের অভ্যন্তরীণ কলহ চরম আকার ধারণ করলে মাওলানা আকরম খাঁর সঙ্গে এ.কে. ফজলুল হকের সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটে। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের প্রতিনিধিগণও পরস্পরকে ভুল বুঝতে থাকেন।[৯৩] এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রজা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে মাওলানা আকরম খাঁর অনুপস্থিতিতে এ.কে. ফজলুল হক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচিত হন এবং বাংলার বিভিন্ন স্থানের কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে প্রজা সমিতির সংহতি ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে 'নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা পার্টি' নামকরণ করেন এবং মাওলানা আকরম খাঁর পরিবর্তে শামসুদ্দীন আহমদকে সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করেন। এতে দৃশ্যত: প্রজা সমিতি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। মাওলানা আকরমখাঁ ও তাঁর অনুসারীগণ পূর্বের নামেই সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে

[৯২] The statesman, July 1929, P. 9; আবুল মনসুর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৬৩; Humaira Momen, Muslim Politics in Bengal: A Study of Krishak Praja Party and the Election of 1937, Dhaka-1972, P. 41.

[৯৩] Kamruddin Ahmad, A Socio-Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh, Dhaka-1975, P. 30.

Dhaka University Institutional Repository

তিনি নবগঠিত 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি'-তে যোগ দেন এবং এর অন্যতম সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ।[৯৪]

প্রজা-আন্দোলনের মূলধারা হতে মাওলানা আকরম খাঁ ১৯৩৬ সালে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও ১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশনে বাংলার কৃষক প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা উল্লেখ করে তিনি তাদের শিক্ষাদান ও স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনে বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ নির্ধারণের সুপারিশ করেন ।[৯৫]

ইতোমধ্যে ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৩৬ সালের আগষ্ট মাসে এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা পার্টি ছাড়া ইউনাইটেড মুসলিম পার্টিসহ বাংলার অন্যান্য দল-উপদলের মুসলিম নেতৃবৃন্দ কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । মাওলানা আকরম খাঁ তখন প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন ।[৯৬] ফলে আসন্ন নির্বাচনী যুদ্ধে এ.কে. ফজলুল হক ও তাঁর কৃষক-প্রজা পার্টির সঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ ও মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয় । ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস হতে মাওলানা আকরম খাঁ মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারাভিযান শুরু করেন এবং বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে ও মুসলিম সংহতির গুরুত্ব তুলে ধরে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন পত্র-পত্রিকাসমূহের মাধ্যমে মুসলিমদের সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন ।[৯৭] এসময় মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে তাঁর সাথে বাংলার সাধারণ মানুষের যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল সবচেয়ে বেশী ও ঘনিষ্ঠ ।[৯৮] ফলে তিনি নির্বাচনী যুদ্ধে মুসলিম লীগের পক্ষে

---

[৯৪] মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, পৃ ঃ ৬৬১-৬২; Mohammad Siraj Mannan, Muslim Political Parties in Bengal: 1936-47, Dhaka-1987, P. 25.

[৯৫] Bengal Legislative Council Debates, Vol. II, 29th July-16th August 1937, PP. 181-82.

[৯৬] The Mussalman, Calcutta, August 28, 1936, P. 16.

[৯৭] Shila Sen, op. cit., P. 82.

[৯৮] বশীর আল্ হেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ঢাকা-১৯৮৫, পৃ ঃ ১৮; Kamruddin Ahmad, op. cit., P. 34.

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হন। তিনি কংগ্রেস ও হিন্দুদের রাজনৈতিক কর্মসূচীকে মুসলিম স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হিসেবে ঘোষণা করেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত 'মোছলেম বঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেন:

> "বাংলার ব্যবস্থাপক সভার একটি আসনও যাতে হিন্দু সমাজের মনোনীত বা অভিপ্রেত মুছলমানদিগের হস্তগত না হয়, সে চেষ্টা আমাদিগকে যথাসাধ্য দৃঢ়তার সহিত করিয়া যাইতে হইবে এবং এ জন্য দরকার সকল শ্রেণীর মুছলমানদিগের একটা সত্যকার সংহতি সাধনের।"[৯৯]

মাওলানা আকরম খাঁ আসন্ন নির্বাচনকে মুসলিনদের 'জীবন মরণ-সংগ্রাম' হিসেবে আখ্যায়িত করে ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ৩০০ জন নেতা-কর্মী সংবাদপত্রে এক আবেদনের মাধ্যমে কৃষক-প্রজা পার্টির কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য প্রজা সাধারণের নিকট আকুল আবেদন জানান।[১০০] শুধু তাই নয়, তিনি এ সময় কৃষক-প্রজা পার্টির সভাপতি এ.কে. ফজলুল হকেরও তীব্র সমালোচনা করেন।[১০১] ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়। নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায় মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসনে স্বতন্ত্র মুসলিম প্রার্থীগণ সর্বাধিক ৪৩টি, মুসলিম লীগ ৩৯টি, কৃষক-প্রজা পার্টি ৩৬টি এবং ত্রিপুরা কৃষক সমিতি ৫টি আসন লাভ করে। মুসলিম লীগ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভে ব্যর্থ হলেও বাংলার নগর ও পল্লীর সকল ধরনের আসনেই কমবেশী সাফল্য লাভ করে। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী পার্টি কৃষক-প্রজা পার্টির সাফল্য শুধুমাত্র পল্লীর আসনগুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকে। নগর আসন ও বিশেষ আসনগুলোতে মুসলিম লীগের সাফল্য ছিল শতকরা একশত ভাগ। স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত মুসলিম সদস্যদের

---

[৯৯] মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, পৃ ঃ ৮০৫; সহ দ্রঃ এ.টি.এম. আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৫২।

[১০০] দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ১২ই পৌষ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, পৃ ঃ ১০।

[১০১] মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, ফাল্গুন, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃ ঃ ৩৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

অনেকেই মুসলিম লীগে যোগ দেয়ায় তাঁদের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৯-এ। কৃষক-প্রজা পার্টিতেও অনেক স্বতন্ত্র সদস্য যোগ দেয়ায় তাদের দলীয় আসন সংখ্যা ৫৫-এ উন্নীত হয়। অন্যদিকে কংগ্রেস এককভাবে ৬০টি আসন লাভ করাতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবেই স্বীকৃতি পায়। ফলে সংগত কারণেই এককভাবে কোন দলের পক্ষে মন্ত্রীসভা গঠন করা সম্ভব ছিলনা। অবশেষে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে এ.কে. ফজলুল হককে প্রধানমন্ত্রী করে বাংলায় প্রজা-লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং ১লা এপ্রিল উক্ত মন্ত্রীসভা দায়িত্ব গ্রহণ করে।[১০২]

ইতোমধ্যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কর্তৃক নওয়াব মোহাম্মদ ইসমাইল খাঁর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি মুসলিম লীগের কতিপয় নিয়ম-নীতি ও আদর্শের পরিবর্তন করে সংগঠনকে গণমুখী ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশ পেশ করে।[১০৩] উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে মাওলানা আকরম খাঁ মুসলিম লীগকে সুসংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৭ সালের ২৭শে জুলাই বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হকের কলকাতাস্থ বাসভবনে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার মুসলিম সদস্যদের এক মিটিং-এ মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর বক্তৃতাতে মুসলিম ঐক্যও সংহতির আবশ্যকতা তুলে ধরেন এবং ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থে পরিষদ সদস্যদের প্রয়োজনে প্রাণপাত করার আহবান জানান।[১০৪]

১৯৩৭ সালের ২২শে আগষ্ট কলকাতা ডেন্টাল কলেজ হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে মাওলানা আকরম খাঁকে সভাপতি এবং সৈয়দ বদরুদ্দোজাকে সেক্রেটারী করে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। পরের দিন মাওলানা আকরম খাঁ কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভা আহবান করেন। উক্ত সভায়

---

[১০২] বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: Shila Sen, op. cit.,PP. 88-96.
[১০৩] A.M. Zaidi, Evolution of Muslim Political Thought in India: Volume Five; The Demand for Pakistan, New Delhi, 1978, P. 55.
[১০৪] দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ২৮শে জুলাই, ১৯৩৭, পৃঃ ৩।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম লীগকে সুসংহত করার লক্ষ্যে বাংলার সর্বত্র মুসলিম লীগের শাখা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১০৫]

১৯৩৭ সালের ১৫ই অক্টোবর লক্ষ্মৌতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। এ অবস্থায় তাঁকে সভাপতি করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে একটি 'অর্গানাইজিং কমিটি' গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিতে মাওলানা আকরম খাঁকে অন্যতম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। তিনি এ কমিটির নিকট সংগঠনকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। এক্ষেত্রে তিনি ইউনিয়ন পর্যায়ে সংগঠন কায়েমের পর ক্রমান্বয়ে মহকুমা, জেলা ও প্রাদেশিক পর্যায়ে তা গঠনের পরামর্শ দেন। ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র উপস্থিতিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নবগঠিত Organizing Committee-এর এক বিশেষ সভা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও শাখা লীগসমূহের জন্য একটি গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়। এ গঠনতন্ত্রে মাওলানা আকরম খাঁর প্রস্তাবিত ইউনিয়ন পর্যায়ে লীগের শাখা প্রতিষ্ঠা এবং পর্যায়ক্রমে মহকুমা, জেলা ও প্রাদেশিক লীগ গঠনের পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। এ সভায় তাঁকে আহ্বায়ক নির্বাচিত করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্য পরিচালনার জন্য একটি ওয়ার্কিং কমিটিও গঠন করা হয় এবং অর্গানাইজিং কমিটির যাবতীয় কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব ওয়ার্কিং কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়। ওয়ার্কিং কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর মাওলানা আকরম খাঁ বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে অধিকতর মনোযোগী হন। এর পাশাপাশি তিনি বাংলায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নেও সচেষ্ট ছিলেন।[১০৬]

---

[১০৫] দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ২৪শে আগষ্ট, ১৯৩৭, পৃ ঃ ৫; সহ দ্রষ্টব্যঃ মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান, বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলিল, ঢাকা-১৯৮৮, পৃ ঃ ৩৬-৩৭।

[১০৬] এ.টি.এম. আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৫৮-৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টির কোয়ালিশন দলীয় সদস্য মৌলবী তমিজউদ্দীন, শামসুদ্দীন আহমদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ স্বপক্ষ ত্যাগ করায় হক মন্ত্রীসভা সংকটের সম্মুখীন হয়।[১০৭] এ সময় দলত্যাগী মুসলিম সদস্যদের সহযোগিতায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ফজলুল হক মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগে বাধ্য করে কংগ্রেস প্রভাবিত মন্ত্রীসভা গঠনের প্রয়াস পান। এ পরিস্থিতিতে মাওলানা আকরম খাঁ মুসলিমদের স্বার্থে হক মন্ত্রী সভাকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে দৈনিক আজাদ পত্রিকার মাধ্যমে সমগ্র বাংলায় জনমত গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেনঃ

> "বাংলার তিন কোটি মুছলমানকে বাঁচিতে হইবে, বাঁচাইতে হইবে, কংগ্রেস রাজের অভিশাপ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে-ইহাই আমাদের সংকল্প, ইহাই আমাদের সাধনা এবং বর্ত্তমানে ইহাই আমাদের সংগ্রাম। এই সংকল্প সাধনার জন্য প্রত্যেক মোছলেম হৃদয়ের ঈমান জাগ্রত উত্তিষ্ঠিত ও কর্ম্মরত হইয়া উঠুক"।[১০৮]

২০শে মার্চ মুসলিম লীগ ও খিলাফত কমিটির উদ্যোগে হক মন্ত্রীসভার উপর আস্থা স্থাপনের লক্ষ্যে কলকাতা টাউন হলে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ জনসভায় ২৭শে মার্চ নিখিল বঙ্গ হক মন্ত্রিত্ব দিবস পালনের কর্মসূচী গৃহীত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নেতা হিসেবে মাওলানা আকরম খাঁ বঙ্গীয় প্রাদেশিক জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের বাংলা শাখার সভাপতি মাওলানা আবুবকর সিদ্দিকী এবং কলকাতা খিলাফত কমিটির সেক্রেটারী রাগেব আহসানসহ বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে ২৭শে মার্চ অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে নিখিল বঙ্গ হক মন্ত্রিত্ব দিবস পালন করেন। মাওলানা আকরম খাঁর সভাপতিত্বে এ দিন কলকাতায় মোহাম্মদ আলী পার্কে মুসলিম লীগ ও খিলাফত কমিটির উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সভাপতির ভাষণে তিনি সমবেতভাবে

---

[১০৭] লীগ-প্রজা কোয়ালিশন সরকারে কৃষক-প্রজা পার্টির সেক্রেটারী শামসুদ্দীন আহমদকে মন্ত্রী না করায় এবং পরবর্তী সময়ে প্রজা পার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার কারণে প্রজা নেতৃবৃন্দের অনেকে ফজলুল হকের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে কোয়ালিশন দল ত্যাগ করেন এবং ব্যবস্থাপক পরিষদের ১৭ জন সদস্য সমন্বয়ে Independent Praja Party গঠন করেন। এ সম্পর্কিত বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ Shila Sen, op. cit., PP. 118-20.

[১০৮] দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ২২শে মার্চ, ১৯৩৮, পৃঃ ৪।

Dhaka University Institutional Repository

দলত্যাগীদের নিন্দা করার জন্য এবং তাঁদের মুসলিম সমাজ থেকে বর্জন করার জন্য মুসলিমদের আহবান জানান। দৈনিক আজাদ তা ব্যাপকভাবে প্রচার করে। ফলে ১৯৩৮ সালের এপ্রিলের বাজেট অধিবেশনে দলত্যাগীগণ কর্তৃক উথাপিত অনাস্থা প্রস্তাব ব্যর্থ হয়।[১০৯]

মুসলিম লীগকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার লক্ষ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল কমিটি গঠনের জন্য ১৯৩৯ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী মাওলানা আকরম খাঁ ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহবান করেন। এ সভায় বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হকও আমন্ত্রিত হন। এ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, জেনারেল কমিটির প্রথম অধিবেশন ১৯৩৯ সালের ৮ ও ৯ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। এতদ্ব্যতীত উক্ত অধিবেশনে উত্থাপনের লক্ষ্যে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র পুনঃপ্রস্তুতের জন্য মাওলানা আকরম খাঁ, সৈয়দ বদরুদ্দোজা ও হাবিবুল্লাহ বাহার — এ তিনজনকে নিয়ে একটি সাব কমিটি গঠিত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক একই তারিখে কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল কমিটির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে মাওলানা আকরম খাঁ মুসলিমদের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তাঁর বক্তৃতায় বলেনঃ

> "লীগের অর্থ যে যাহাই করুন, আমি মনে করি লীগের প্রকৃত অর্থ 'জমাত' এবং এই 'জমাত' জাতীয় জীবনের সকল দিক হইতে অপরিহার্য্য। জমাত ব্যতীত মুছলমান বাঁচে না, আর মুছলমান না বাঁচলে এছলাম বাঁচেনা। মুছলমানকে বাঁচাইতে হইলে জমাতকে বাঁচাইতে হইবে।"[১১০]

অধিবেশনের প্রথম দিনেই এ.কে. ফজলুল হককে সভাপতি, আকরম খাঁকে সহ-সভাপতি এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সেক্রেটারী নির্বাচিত করে সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।[১১১]

---

[১০৯] আবুল মনসুর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৭৪-৭৫।
[১১০] সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, কলকাতা, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৯, পৃ ঃ ৭।
[১১১] ঐ, পৃ ঃ ১৩

Dhaka University Institutional Repository

নতুন কমিটি গঠনের পর আকরম খাঁ-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগকে আরও ব্যাপকভাবে গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন ।

১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে মুসলিমদের স্বতন্ত্র আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠার দাবী সম্বলিত শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব বা লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয় ।[১১২] মুসলিম লীগের কার্য বিবরণীতে কোথাও 'লাহোর প্রস্তাব'কে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি । কিন্তু এ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর সমস্ত হিন্দু ও জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলোতে একে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে উল্লেখ করা হয় । ফলে ইহা ক্রমান্বয়ে পাকিস্তান প্রস্তাবে রূপান্তরিত হয় । ১৯৪০ সালের ২৫শে ডিসেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ সর্বপ্রথম একে পাকিস্তান প্রস্তাব হিসেবে উল্লেখ করলে মুসলিম লীগ মহলে এ নাম ব্যবহৃত হতে থাকে ।[১১৩] মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতি বৎসর ২৩শে মার্চ সমগ্র ভারতে পাকিস্তান দিবস পালনকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক ও মাওলানা আকরম খাঁর মধ্যে মতবিরোধ ঘটে এবং এতে সম্পর্কেরও অবনতি হয় । কারণ এ.কে. ফজলুল হক উক্ত সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করে তা বাতিলের নির্দেশ দেন ।

১৯৪১ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর কলকাতা মুসলিম ছাত্রদের উদ্যোগে আয়োজিত পাকিস্তান সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে মাওলানা আকরম খাঁ পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁর আপোসহীন মনোভাব ব্যক্ত করেন ।[১১৪] উক্ত সম্মেলনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পাকিস্তান 'ক্রীড' বা ধর্মাদর্শকে পূর্ণ সমর্থন ও জিন্নাহ্র নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয় এবং পাকিস্তানের আদর্শকে ধর্ম বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে ঘোষণা করা হয় ।[১১৫] উক্ত সম্মেলনে মাওলানা আকরম খাঁকে সভাপতি করে 'পাকিস্তান পল্লী প্রচার কমিটি' গঠন করা হয় । ইতোমধ্যে জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিলে যোগদান সংক্রান্ত বিষয়ে মত পার্থক্যের কারণে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও

---

[১১২] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন : A.M. Zaidi, op. cit., PP. 214-19.

[১১৩] Syed Sharifuddin Pirzada, The Pakistan Resolution and the Historic Lahore Session, Karachi-1968, PP. 17-18.

[১১৪] দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৪১, পৃ ঃ ৩ ।

[১১৫] ঐ, পৃ ঃ ৫;

Dhaka University Institutional Repository

এ.কে. ফজলুল হকের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।[১১৬] ফলে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এ.কে. ফজলুল হককে মুসলিম লীগ হতে বহিস্কার করেন এবং মাওলানা আকরম খাঁকে অস্থায়ী সভাপতি হিসেবে নিয়োগ দেন।[১১৭]

সমগ্র বাংলায় মুসলিম লীগের পক্ষে প্রবল জনমত গঠনের পাশাপাশি ১৯৪২ সালের ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সিরাজগঞ্জ সম্মেলনকে সামনে রেখে মাওলানা আকরম খাঁ সংগঠনকে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করার প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। নির্দিষ্ট তারিখে সিরাজগঞ্জে অত্যন্ত সফলভাবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে মাওলানা আকরম খাঁ ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ও সেক্রেটারী নির্বাচিত করা হয়, জিন্নাহ্র নেতৃত্ব ও পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয় এবং যথাশীঘ্র পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্যে সকল ধরনের ত্যাগ স্বীকার করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করা হয়।[১১৮] এ সময় বাংলায় কয়েকটি উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ পাকিস্তানের নামে এসব উপ-নির্বাচনে অংশ নেয় এবং জয় লাভ করে। ১৯৪২ সালের ২৩, ২৪ ও ২৫শে আগষ্ট আকরম খাঁর সভাপতিত্বে কলকাতায় প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির তিন দিন ব্যাপী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে মুসলিমদের আত্মরক্ষার্থে 'জনরক্ষা কমিটি' গঠনের জন্য এবং 'মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড' দলে যোগদানের জন্য মুসলিমদের আহবান জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১১৯] এ ছাড়াও এ.কে. ফজলুল হক সরকারের সমালোচনা করে অধিবেশনে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। একই অধিবেশনের অন্য প্রস্তাবে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে বলা হয়—পাকিস্তান প্রস্তাব দ্বারা কেবল ভারতের মুসলিম জাতিরই স্বাধীনতার সূচনা

---

[১১৬] বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: অমলেন্দু দে, পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক, কলকাতা-১৯৭২, পৃ ঃ ১০৭-২৬।

[১১৭] মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৭৯।

[১১৮] দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২; উদ্বৃত: মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮৭; দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২, পৃ ঃ ৫।

[১১৯] মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি, উপরন্তু এই উপমহাদেশের অন্যান্য সকল জাতিরও স্বাধীনতার দিক নির্দেশ করা হয়েছে।[১২০]

মাওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে অল্পদিনের মধ্যেই প্রাদেশিক লীগ এ.কে. ফজলুল হকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হয় এবং হক মন্ত্রীসভার পতন আসন্ন হয়ে পড়ে। অতঃপর ১৯৪৩ সালের ২৮শে মার্চ এ.কে. ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব হতে অব্যাহতি নেন এবং ১৩ই এপ্রিল মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী দলের নেতা খাজা নাজিমুদ্দীনের প্রধানমন্ত্রীত্বে ৭জন মুসলিম, ৩জন বর্ণহিন্দু ও ৩জন তফশিলী প্রতিনিধি নিয়ে বাংলায় নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।[১২১] ইতোমধ্যে ১৯৪৩ সালের ৬ই নভেম্বর কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে মাওলানা আকরম খাঁ পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আবুল হাশিম সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। প্রথমাবস্থায় উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলেও ক্রমান্বয়ে উভয়ের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কারণ আবুল হাশিম এক বক্তৃতায় ঢাকার নওয়াব গোষ্ঠী, ইস্পাহানী পরিবার এবং মাওলানা আকরম খাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে অভিহিত করেন।[১২২] এদিকে মাওলানা আকরম খাঁও তাঁকে 'কমিউনিস্ট' ও 'কাদিয়ানী' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এর ফলে প্রাদেশিক লীগ মূলত: দু'টি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। লীগের যুব নেতা-কর্মীদের সিংহভাগ আবুল হাশিমকে সমর্থন করায় তাঁরা বামপন্থী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। অপরদিকে অপেক্ষাকৃত প্রবীণ নেতৃবৃন্দ মাওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হন এবং তাঁরা ডানপন্থী হিসেবে পরিচিত হন। ১৯৪৪ সালের ১৭ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক লীগের কাউন্সিল অধিবেশনকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয় এবং পুনরায় মাওলানা আকরম খাঁ ও আবুল হাশিম যথাক্রমে সভাপতি ও সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।[১২৩]

---

[১২০] দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ২৭শে আগষ্ট, ১৯৪২, উদ্বৃত: মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১২৯-৩০; এ.টি.এম. আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮।

[১২১] মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃ ঃ ৩২৩।

[১২২] কামরুদ্দীন আহমদ, পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকা,-১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬৩।

[১২৩] বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্যঃ সিরাজ মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৫৬-৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৫ সালের জুন মাসে ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসন করে স্বায়ত্তশাসনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল সীমলায় ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এক প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মেলন আহ্বান করেন।[১২৪] এ সম্মেলনে ভাইসরয় ওয়াভেল ভারতীয় সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি অন্ত র্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিলে উক্ত সরকারে মুসলিম লীগই যেন মুসলিম প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পায় সে লক্ষ্যে আকরম খাঁ বাংলার মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করে বৃটিশ সরকার ও কংগ্রেসের উপর চাপ প্রয়োগের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনে জিন্নাহ্‌র দাবী ছিল, মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন এবং মুসলিমলীগই কেবল ভাইসরয়ের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে মুসলিম প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার রাখে।[১২৫] মাওলানা আকরম খাঁ জিন্নাহ্‌র দাবীকে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেন এবং কংগ্রেসকে এ দাবী মেনে নিয়ে 'সুবুদ্ধির' পরিচয় দিতে আহবান জানান।[১২৬] কিন্তু ভাইসরয় জিন্নাহ্‌র দাবী মেনে না নেয়ায় তাঁর পরিকল্পনা তথা সীমলা সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অতঃপর বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ১৯৪৫ সালের শীতকালে ভারতে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ফলে সেপ্টেম্বর মাসে প্রাদেশিক লীগ মাওলানা আকরম খাঁর সভাপতিত্বে নয় সদস্য বিশিষ্ট পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করে নির্বাচনী সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে। অক্টোবর মাসে মাওলানা আকরম খাঁ কংগ্রেস প্রভাবিত ওলামা সংগঠন 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ'-এর বিরোধিতা করে কলকাতায় মুসলিম লীগ সমর্থক 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম'-এর চারদিন ব্যাপী সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তার দায়িত্ব পালন করেন। এ সম্মেলনের তৃতীয় দিনে ২৮শে অক্টোবর বক্তৃতাকালে মাওলানা আকরম খাঁ কংগ্রেস সমর্থক জমিয়তকে ধ্বংস করার আহবান জানান এবং পাশাপাশি মুসলিমদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজনে ও পাকিস্তান দাবীর যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে জেহাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

---

১২৪ The Vicery broadcast on 14 June 1945. উদ্ধৃত: Shila Sen, op. cit. P. 201.

১২৫ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, ভারত যখন স্বাধীন হচ্ছিল (মাওলানা আবদুল্লাহ্‌ বিন সাঈদ কর্তৃক India Wins Freedom গ্রন্থের অনুবাদ), ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ ঃ ১৪৬।

১২৬ দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ৫ই জুলাই, ১৯৪৫, পৃ ঃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে মাওলানা আকরম খাঁ-সহ প্রাদেশিক লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মুসলিম লীগ প্রার্থীগণ বাংলার সব কয়টি মুসলিম আসন লাভ করেন।[১২৭] অন্যদিকে মাওলানা আকরম খাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও দৃঢ় ভূমিকার ফলে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ১২১টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৩টিতে বিজয়ী হয়। সর্বমোট প্রদত্ত ২৪, ৩৪, ১০০টি মুসলিম ভোটের মধ্যে মুসলিম লীগ প্রার্থীগণ ২০, ৩৬, ৭৭৫টি এবং অন্যান্য প্রার্থীগণ মাত্র ৩, ৯৭, ৩২৫টি ভোট লাভ করেন।[১২৮] নির্বাচনের এ ফলাফল হতে প্রতীয়মান হয় যে, মাওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ মুসলিমদের কাছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার নামে যে আবেদন করেন,তা অনেকাংশেই সফল হয়। এতে আরও উপলব্ধি করা যায় যে, বাংলার মুসলিমগন তাঁদের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসেবে মুসলিম লীগকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় আশাবাদী। কিন্তু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভাকে কেন্দ্র করে আকরম খাঁর সাথে তাঁর রাজনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। অন্যদিকে সেক্রেটারী আবুল হাশিম কর্তৃক সভাপতি আকরম খাঁর পূর্বানুমতি ব্যতীত পরপর দুইবার ১৯৪৬ সালের ১৫মে ও ২১ জুন আহূত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন সভাপতির নির্দেশে বাতিল ঘোষিত হয়। এতে উভয়ের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ দিবসকে কেন্দ্র করে কলকাতায় হিন্দু- মুসলিমদের মধ্যে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাংলার বিভিন্ন অঙ্গনে দাঙ্গা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ও বিরোধ

---

[১২৭] কামরুদ্দীন আহমদ, বাংলায় মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, ২য় খন্ড, ঢাকা-১৩৮২ বঙ্গাব্দ, পৃ ঃ ৫২।
[১২৮] The Star of India, 7 & 8 April, 1946, উদ্বৃত: Shila Sen, op. cit., P. 198.

Dhaka University Institutional Repository

চূড়ান্তরূপ ধারণ করে। এ অবস্থায় মুসলিমদের মনোবল চাঙ্গা করার লক্ষ্যে আকরম খাঁ সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর কলকাতা মুসলিম ইন্‌স্টিটিউট হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড এম্বুলেন্স ব্রিগেডের কেন্দ্রীয় শিক্ষা শিবিরের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুসলিম লীগের পতাকা উত্তোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আল্লাহ্‌র নামে এ পতাকা উত্তোলন করা হল। ভারতের দশকোটি মুসলিমের ইজ্জত এর সাথে জড়িত। শির গেলেও যেন ইজ্জত না যায়, এটাই আজ সকলের সংকল্প।[১২৯] মূল সভায় সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন: 'এছলামের জন্য, মুছলমান জাতির জন্য যাহা কিছু করা দরকার, তাহা কোরবানী করার সংকল্প আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। ... মুছলমানদের ন্যায্য অধিকার সম্ভবপর হইলে ভালবাসার দ্বারা, অন্যথায় প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগে অর্জ্জন করিতে হইবে।'[১৩০] তাঁর এ উদ্দীপনাময় বক্তব্য বাংলার মুসলিমদের পাকিস্তান অর্জনের চূড়ান্ত সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

মাওলানা আকরম খাঁ শারীরিক অসুস্থতার কারণে ১৯৪৬ সালের ৮ই নভেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতির পদ হতে অব্যাহতি চেয়ে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে নেতৃবৃন্দ নতুন সভাপতি নির্বাচনে ব্যর্থ হয়ে কাউন্সিলের পক্ষ হতে আকরম খাঁকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন। এ অবস্থায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তাঁর পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করে নেন।[১৩১] মাওলানা আকরম খাঁ পুনরায় সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার অব্যবহিত পর বাংলা-ভারতের রাজনীতির

---

[১২৯] দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৬, পৃ ঃ ৩; উদ্বৃত: এ.টি.এম. আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৭৭।

[১৩০] পূর্বোক্ত।

[১৩১] দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

গতি-প্রকৃতি আকস্মিকভাবে পরিবর্তিত হয়। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দিলেও ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য যে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এবং আকরম খাঁ উভয়েই প্রথম দিকে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে অখন্ড বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের পরিকল্পনার কারণে উভয়েই অবশেষে স্বীয় মত পরিবর্তন করেন। ১৯৪৭ সালের ২০শে জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এভাবে খন্ডিত হলেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী আসামের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল সিলেটকে গণভোটের সমর্থন সাপেক্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত রাখার বিধান জারী করা হয়।[১৩২] এটাকে সুযোগ মনে করে আকরম খাঁ ১৯৪৭ সালের ২১শে জুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির অধিবেশনে সিলেট গণভোট কমিটি গঠন করেন এবং নিজে উক্ত কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সিলেটকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। দৈনিক আজাদে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় 'গণ ভোটে সিলেটবাসীর কর্তব্য পাকিস্তানের আজাদী, না হিন্দুস্থানের গোলামী? জিন্দাপীর শাহজালালের মাজার শরীফকে কোথায় রাখিবেন? পাকিস্তানের দারুল ইসলামে, না হিন্দুস্থানের দারুল হরবে'?[১৩৩] অসংখ্য মুসলিম লীগ কর্মীও বাংলা হতে সিলেটে যেয়ে পাকিস্তানের অনুকূলে গণভোটের প্রচারে আত্মনিয়োগ করে। ফলে জুলাই মাসের প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত গণভোটে সিলেটবাসী মুসলিমগণ পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্তির পক্ষে ব্যাপকভাবে তাঁদের রায় প্রদান করেন।[১৩৪]

---

[১৩২] দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ১১ই জুন, ১৯৪৭, পৃ ঃ ৩।
[১৩৩] দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ২ জুলাই, ১৯৪৭, পৃ ঃ ৬।
[১৩৪] দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ১৫ই জুলাই, ১৯৪৭, পৃ ঃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

এ পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত বিভক্তির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান নামক নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটলে পূর্ববাংলা ও সিলেট পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়।

অতঃপর স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে মাওলানা আকরম খাঁ ঢাকায় চলে আসেন এবং আমৃত্যু এখানেই বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। ঢাকায় আসার পরপরই তিনি পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫১ সালে তিনি এ পদ থেকে অব্যাহতি নেন। এছাড়া তিনি নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি এবং পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ গণ-পরিষদ ১৯৫৪ সালে ভেঙ্গে যায়। মূলতঃ এ সময় তিনি রাজনীতি হতে ক্রমশ সরে দাঁড়ান এবং ১৯৬২ সালের ১লা নভেম্বর তিনি মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন।[১৩৫]

৩. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা :

রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন আমাদের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু এর প্রকৃত ইতিহাস হতে আমরা এখনও বঞ্চিত। ১৯৫২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের ছাত্র-শিক্ষক ও সাধারণ জনতা যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন, তার বীজ কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালীন মাওলানা আকরম খাঁ-ই যে সর্বপ্রথম ১৮৯৬-৯৭ সালে বপন করেছিলেন, এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর ঢাকায় মাওলানা আকরম খাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, উর্দুকে পূর্ব-পাকিস্তানের সরকারী ভাষা করা হবে না। প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সরকারী বাসভবন বর্ধমান হাউসে বহুসংখ্যক ছাত্র-শিক্ষক উপস্থিত হয়ে অবিলম্বে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে চালু করার

---

[১৩৫] দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৭ই নভেম্বর, ১৯৬২, পৃ ঃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। মাওলানা আকরম খাঁ তাঁদের দাবী পূরণের আশ্বাস দিলে তাঁরা বর্ধমান হাউস ত্যাগ করেন।[১৩৬] ঐ দিনই তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে আবুল কাসেম এবং আবুল কালাম শামসুদ্দীন মাওলানা আকরম খাঁর সাথে ভাষার প্রশ্নে আলোচনা করেন। আলোচনার পর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আবুল কাসেম জানান, মাওলানা আকরম খাঁ তাঁদের এ আশ্বাস দেন যে,পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলা ছাড়া অন্যকোন ভাষাকে চালানোর চেষ্টা করলে পূর্ব পাকিস্তান বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং তিনি নিজে সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিবেন।[১৩৭] মাওলানা আকরম খাঁ বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, শতকরা নিরানব্বই জন যে ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষা ব্যতিরেকে অন্য ভাষা তাদের উপরে চাপিয়ে দেয়ার কোনও প্রশ্ন উঠে না। আম বৃক্ষের নিকট হতে আখরোট ফল আশা করা যেমন সম্ভব নয়, বাংলাদেশেও (তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান) বাংলা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা শিক্ষা বা সরকারী অফিস আদালতের মাধ্যম হিসাবে আশা করা সেরূপ অসম্ভব ব্যাপার।[১৩৮] উর্দু সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, তিনি বাংলার পক্ষপাতি কিন্তু উর্দুর বিরোধী নন। তিনি উপরের শ্রেণীতে উর্দু বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেয়ার পক্ষপাতি। তাঁর মতে, বাংলার পক্ষপাতিত্ব করা মানেই উর্দুর বিরোধিতা করা বুঝায় না।[১৩৯] ইংরেজী ভাষা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ইংরেজ বিদ্বেষের সাথে এদেশের লোকজন যেন ইংরেজী ভাষাকে এ মূহুর্তে বিসর্জন না দেয়। তিনি এ ব্যাপারে আধুনিক ও প্রাচীন এই উভয় প্রকার গোঁড়ামিকেই ত্যাগ করার আহবান জানান।[১৪০] মাওলানা আকরম খাঁর উক্ত সব বক্তব্য ও কর্মকান্ড হতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বাংলা ভাষাকে পূর্ব-বাংলার মানুষের জন্য অপরিহার্য মনে করেছেন ঠিকই, তবে উর্দু এবং ইংরেজী ভাষার গুরুত্বকেও খাটো করে দেখেননি। কারণ জ্ঞান-চর্চার

---

[১৩৬] বশীর আল্ হেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৯১; রেজোয়ান সিদ্দিকী, পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ ঃ ৫৩।

[১৩৭] পূর্বোক্ত।

[১৩৮] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৯৪।

[১৩৯] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৯৫।

[১৪০] পূর্বোক্ত।

ক্ষেত্রে এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের লক্ষ্যে বাংলা ভাষার পাশাপাশি উর্দু এবং ইংরেজীও চর্চা করা জরুরী ।

১৯৪৮ সালের ৯ই মার্চ মাওলানা আকরম খাঁকে সভাপতি করে ভাষা কমিটি গঠন করা হয় । ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা আবুল কাসেমের বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, বাস্তব অসুবিধা দূর করে সরকারী অফিস-আদালতে বাংলাকে অফিসিয়াল ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সনের ৯ই মার্চ এক সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাওলানা আকরম খাঁকে সভাপতি করে ডঃ শহীদুল্লাহ্, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, ডঃ এনামুল হক প্রমুখসহ ১৪ জনের একটি উচ্চ পর্যায়ের ভাষা-কমিটি গঠিত হয় ।[১৪১]

পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও প্রাদেশিক সরকার উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন । ফলে সরকারী উদ্যোগে দু'টি সংস্কার কমিটিও গঠিত হয় । যথা (১) শিক্ষা সংস্কার কমিটি ও (২) ভাষা সংস্কার কমিটি । উভয় কমিটিতেই মাওলানা আকরম খাঁকে সভাপতি করা হয়েছিল । পূর্ব বাংলা সরকার উক্ত কমিটিদ্বয় গঠন করেন যথাক্রমে ১১ মার্চ ও ৯ মার্চ, ১৯৪৯ ।[১৪২] এ সম্পর্কে আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেন যে, মাওলানা আকরম খাঁর বাড়ীর বৈঠকখানাতেই সাধারনতঃ ভাষা সংস্কার কমিটির বৈঠক বসত । দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে কয়েকটি বৈঠকে ভাষা সংস্কার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় । পাকিস্তানী ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলা ভাষাকে নবরূপ দেয়ার জন্য এর কোন্ কোন্ বিষয়ে সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, তা নিয়ে কমিটির সভায় তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হত । তিনি ছিলেন এর বহুল সংস্কারের পক্ষপাতী । বর্ণমালা থেকে শুরু করে ব্যাকরণ পর্যন্ত এর আদ্যন্ত সংস্কার দরকার, কমিটির অধিকাংশ সদস্যেরও অভিমত ছিল এই ধরনের । কমিটির সদস্যদের মতে, বাংলা ব্যাকরণ নামে যা

---

[১৪১] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৬৬১ ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত রয়েছে, তা সংস্কৃত ব্যাকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। বাংলা ভাষাকে যেহেতু সংস্কৃতির দুহিতা কিংবা দৌহিত্রী বলে সদস্যগণ স্বীকার করেন না, তাই সংস্কৃত ব্যাকরণকে তাঁরা বাংলা ব্যাকরণ বলে মানতে রাজি নন।[১৪৩]

বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও মাওলানা আকরম খাঁ এবং তাঁর দৈনিক আজাদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রথম 'বাংলা একাডেমী' কথাটি ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রস্তাবাকারে জনসম্মুখে সর্বপ্রথম 'দৈনিক আজাদ'ই 'বাংলা একাডেমী' প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপন করে। 'আজাদ' পরে সম্পাদকীয় এবং উপ-সম্পাদকীয়তে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার দাবী জোরালোভাবে তুলে ধরেছিলো।"[১৪৪] অবশেষে ১৯৫৫ সালের ২৬শে নভেম্বর পূর্ব-বাংলা সরকার বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১৪৫] ১৯৬০ সালে মাওলানা আকরম খাঁ বাংলা একাডেমীর ফেলো নির্বাচিত হন।[১৪৬] অতঃপর ১৯৬১ সালের ৩রা আগষ্ট একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার মাওলানা আকরম খাঁকে বাংলা একাডেমীর প্রথম সভাপতি মনোনীত করেন।[১৪৭] মাওলানা আকরম খাঁ ১৯৬২ সালে রাজনীতি থেকে অবসর নিলেও আমৃত্যু তিনি সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশ ও সমাজের সেবা অব্যাহত রেখেছেন। অবশেষে ১৯৬৮ সালের ১৮ই আগষ্ট অসুস্থতা ও বার্ধক্যজনিত কারণে তাঁর সংগ্রামময় কর্মজীবনের অবসান ঘটে এবং ঢাকাস্থ বংশালে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।[১৪৮]

---

[১৪২] ঐ, পৃ ঃ ৬৬৭।
[১৪৩] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৬৭১।
[১৪৪] বশীর আল্ হেলাল, বাংলা একাডেমীর ইতিহাস, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৬), পৃ ঃ ১৪।
[১৪৫] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩৫।
[১৪৬] ঐ, পৃ ঃ ১২৮।
[১৪৭] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৪৮, ২১২।
[১৪৮] দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ১৮ আগষ্ট, ১৯৮৯, পৃ ঃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

৪. মাওলানা আকরম খাঁর সম্পূরক সমাজ সেবা

বিভিন্নমুখী গুণাবলী ও যোগ্যতার অধিকারী মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) একজন সফল সমাজ-সংস্কারক এবং সমাজ সেবকও ছিলেন। নিঃস্বার্থভাবে সমাজ সেবা করাই ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত। তাই সমাজ সেবার মহান ব্রত এবং মুসলিম জাগরণের উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি শিক্ষা জীবন শেষে কর্ম জীবনে প্রবেশ করেন। প্রকৃত পক্ষে সমাজ সেবা ও রাজনীতি চর্চাকে তিনি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে এ দুটি পৃথক কিছু ছিলনা, বরং একে অন্যের পরিপূরক ছিল। প্রায় পৌণে এক শতাব্দী ব্যাপী তিনি ছিলেন সমাজ-সংস্কার ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে আমাদের পথপ্রদর্শক।

মুসলিমদের শতাব্দীকালের ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংগ্রাম, সাধনা ও মুক্তির লড়াইয়ের জীবন্ত ইতিহাস এবং অবিভক্ত ভারতের মুসলিম জাগরণের অন্যতম পুরোধা মাওলানা আকরম খাঁ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলিমদের সার্বিক মুক্তির জন্য আজীবন সাধনারত ছিলেন। কুশিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকার হতে মুসলিমদেরকে রক্ষা করার মানসে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল নিরলস। বৃটিশ বেনিয়া ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নাগপাশ হতে মুসলিমদের মুক্ত করে তাদের কাংখিত আল্লাহ্ প্রদত্ত ইসলামী জীবন বিধান ভিত্তিক একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। বৃটিশ বেনিয়া ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এদেশীয় সহযোগীদের অর্থনৈতিক শোষণ হতে মুসলিমদেরকে তিনি দিয়েছিলেন মুক্তির আলো। পৌত্তলিক ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নিগড়ে বন্দীপ্রায় মুসলিমদের জন্য তিনি প্রসারিত করেছিলেন সাংস্কৃতিক মুক্তির প্রশস্ত রাজপথ। তিনি মুসলিমদের জন্য চেয়েছিলেন একটি নূতন আবাস ভূমি, যেখানে কায়েম হবে খোদা-প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা বা ইসলামী শরীয়াহ্, প্রতিষ্ঠিত হবে স্বর্ণালী খিলাফত যুগের আদল ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। বলাবাহুল্য, তাঁর জীবদ্দশায় মুসলিমদের পৃথক আবাস ভূমি কায়েম হয়েছিল কিন্তু জাতি মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি।[১]

---

১ ডাঃ মোহাম্মদ আইউব, 'সমাজ সংস্কারক মওলানা আকরম খাঁ', মাওলানা আকরম খাঁ, আবু জাফর (সংকলিত ও সম্পাদিত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ ঃ ২৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আকরম খাঁ এমন এক সময় কর্ম জীবনে প্রবেশ করেন, যখন এদেশের মুসলিম সমাজ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে হতাশাগ্রস্ত ও নির্জীব হয়ে পড়ে। যেসব মুসলিম নেতা ও কর্মী সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজের কল্যাণের লক্ষ্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, তাঁদের সাথে সাধারণ মানুষের প্রায় কোন যোগাযোগ ছিলনা। ফলে তাঁদের সুখ-দুঃখের সাথে অভিজাত শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের বিস্তর ব্যবধান ছিল। গ্রামের সাধারণ মানুষ যেমন তাঁদের সুখ-দুঃখের কথা কাউকে বলতে পারতোনা, তেমনি তাঁদের কথাও কেউ দরদ দিয়ে বলতোনা বা তাঁদের দুঃখ নিরসনে কেউ এগিয়ে আসত না। কর্ম জীবনে প্রবেশ করেই মাওলানা আকরম খাঁ সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে অবহিত হন। বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে এবং সভা সমিতিতে বক্তৃতা করার উদ্দেশ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সফর করার পর তিনি দেশের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সাথে পরিচিত হন। সাধারণ মানুষের অশিক্ষা-কুশিক্ষার সুযোগ নিয়ে খৃষ্টান মিশনারী কর্তৃক খৃষ্টধর্ম প্রচার, জমিদারদের অত্যাচার-অবিচার এবং সর্বোপরি বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবে মুসলিম সমাজে প্রচলিত অনৈসলামিক ক্রিয়াকলাপে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। খৃষ্টান পাদ্রীদের অপপ্রচার থেকে অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত মুসলিমদের রক্ষা করা, তাদের সুখ-দুঃখকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরে তার প্রতিকার করা, তাদের কল্যাণ সাধন এবং সর্বোপরি মুসলিম সমাজ থেকে সব ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করার মহান ব্রত নিয়ে তিনি ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। বৃটিশের হাত থেকে দেশ স্বাধীন করা, প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের অভ্রাতৃসুলভ মনোভাবের নিন্দা করা এবং মুসলিম সমাজ থেকে সব ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করে তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করার মানসে মাওলানা আকরম খাঁ যে ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তা আজকের যুগে অনেকের পক্ষে কল্পনা করাও হয়ত অনেকটা অসম্ভব ব্যাপার।[২]

---

২ আবু জাফর, 'জাতীয় জাগরণে আকরম খাঁ এবং মোহাম্মদীর ভূমিকা', মাওলানা আকরম খাঁ, আবু জাফর (সংকলিত ও সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩০৬-৩০৭; আবু জাফর, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর অবদান', দৈনিক আজাদ, ১৮ই আগষ্ট, ১৯৮২।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আকরম খাঁ মুসলিমদের বিভিন্নমুখী পশ্চাদ্‌পদতার জন্য স্বীয় সমাজের আত্মসচেতনতার অভাবকে দায়ী করেন।[৩] তিনি লক্ষ্য করেন যে, মুসলিমেরা জানে না তাদের ঐতিহ্য ও উৎপত্তির উৎস কোথায়, জানেনা কেন তারা ইংরেজদের পদানত কিংবা হিন্দুদের চেয়ে অনগ্রসর। তারা নানা প্রকার কুসংস্কারে লিপ্ত হয়ে আপন সমাজকে সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখে এবং ধর্মীয় অনুশাসন বিষয়ে চার ইমামের মাজহাবকে শেষ ব্যাখ্যা মনে করে তারা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছে।[৪] তাই তিনি এই সংকীর্ণ গন্ডী থেকে মুসলিমদের বের করে তাদের আত্মসচেতন করে তোলার প্রচেষ্টায় ব্রতী হন এবং প্রথমে স্বীয় সমাজের সংস্কারের লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন ও হাদীস ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, কুরআন ও হাদীসের বাণী ব্যাখ্যা করার 'স্বাধীনতা' সকল যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলিমের রয়েছে। এ মনোভাবের প্রেক্ষাপটে তিনি আহলে হাদীস আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন।[৫] এ আন্দোলন মুসলিমদের একটি বিশেষ সম্প্রদায় 'আহলে হাদীস'-এর ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন হলেও মুসলিম রাজনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব লক্ষণীয়। এ আন্দোলন মুসলিমদের নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে ধর্মকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। ফলে ধর্মীয় কুপমন্ডূকতা ও কুসংস্কার মুক্ত হয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতিতে তাদের অনেকেই পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হন।[৬]

প্রত্যক্ষ রাজনীতির পাশাপাশি ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারমূলক তৎপরতার মাধ্যমে মাওলানা আকরম খাঁ বাংলার মুসলিমদের সচেতন ও সংগঠিত করার কাজে ব্যাপৃত থাকেন। তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারমূলক বহু প্রতিষ্ঠানের নেতা ও কর্মী।[৭] জীবনের প্রথম দিকে মুসলিমদের মাজহাবি দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকলেও অচিরেই তিনি

---

৩ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, 'বাঙালী মুসলমানের রাজনৈতিক জনক', দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৭ই জুন, ১৯৮৯, পৃ ঃ ৪।

৪ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪।

৫ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪।

৬ এ.টি.এম. আতিকুর রহমান, বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

৭ আবুল ফজল, 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা', মাহে নও, ঢাকা, আষাঢ় ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ (জুন ১৯৬২), পৃঃ ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

সত্যানুসন্ধিৎসা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা বলে সংকীর্ণতা পরিহার করে বৃহত্তর মুসলিম সমাজের সংহতি সাধনে ব্রতী হন।[৮] মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সক্রিয় সহযোগিতায় তিনি মুসলিমদের মাজহাবি দ্বন্দ্বের অবসানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফলে এতদঞ্চলের মুসলিমদের কুসংস্কারের গন্ডী পেরিয়ে রাজনীতি ও সমাজের বৃহত্তর আঙ্গিনায় প্রবেশের অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি হয়। এ প্রসঙ্গে মাওলানা ইসলামাবাদী তাঁর 'আত্মজীবন'-এ লিখেন: "পরবর্ত্তী যুগে হানিফী ও মোহাম্মদীর মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধনের জন্য বঙ্গদেশে যাহারা চেষ্টা করিয়াছেন তন্মধ্যে আমি ও মওলানা মোঃ আকরম খাঁর চেষ্টা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও কার্য্যকরী হইয়াছিল"।[৯]

বাংলার মুসলিমদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পশ্চাদ্‌পদতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাওলানা আকরম খাঁ 'সমাজ হিতৈষী' আলিমদের একটি সংগঠনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। তাই ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী ও মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সহযোগিতায় তিনি একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং একই বছর ১৫, ১৬, ও ১৭ই মার্চ বগুড়া জেলার জয়পুর হাট রেল ষ্টেশনের নিকটবর্তী বানিয়া পাড়া গ্রামে আলিমদের এক সম্মেলন আহবান করেন। সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকার মাধ্যমে এ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য তিনি বাংলার প্রসিদ্ধ আলিম ও অন্যান্য 'সমাজ হিতৈষী' ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানান।[১০] নির্ধারিত তারিখে মাওলানা আকরম খাঁর সভাপতিত্বে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ইসলাম মিশন ও সমাজ-সংস্কার এবং জাতীয় উন্নতি সাধনকল্পে 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা' নামে আলিমদের একটি স্থায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মাওলানা আকরম খাঁ এর সম্পাদক ও মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী

---

[৮] বার্ষিক সওগাত, কলকাতা, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৬৮।

[৯] মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী, আত্মজীবন, শামসুজ্জামান খান (ভূমিকা ও সম্পাদনা), পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃঃ ১০২; মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী, আত্মজীবন, প্রথম ভাগ (অপ্রকাশিত), পৃঃ ২০৪; এ অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি খানা (যা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে) বাংলা একাডেমীর গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগের তদানীন্তন পরিচালক শামসুজ্জামান খানের ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল– গবেষক।

[১০] ১৯১৭ সালে আঞ্জুমানের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত রিপোর্ট, উদ্ধৃতঃ আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। হুগলীর মাওলানা মোহাম্মদ আবুবকর এর সভাপতি হিসেবে মনোনীত হন।[১১]

মাওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে সংগঠনটি সমাজের লোকদের গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা পরিহারে সচেষ্ট ছিল। শুধুমাত্র ধর্ম প্রচার ও সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে কর্তব্য সীমিত না রেখে শিক্ষার আধুনিকীকরণ এবং নারী শিক্ষা বিস্তারের দিকেও সংগঠনটি মনোযোগ দেয়। তাছাড়া আধুনিক প্রণালীতে মুসলিমদের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্মের প্রসারকে এ সংগঠনের উদ্দেশ্য হিসেবে স্থির করা হয়।[১২] ঘোষিত উদ্দেশ্য যথাসম্ভব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কতিপয় আলিমের তীব্র বিরোধিতা ও 'কুফরী' ফতোয়া প্রদান সত্ত্বেও আঞ্জুমান নেতৃবৃন্দ সংগঠনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অবিচল থাকেন।[১৩]

বাংলার মুসলিম সমাজের উন্নতির লক্ষ্যে আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠা ছিল একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। কারণ মুসলিম সমাজ এ সময় ধর্মীয় মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে নানা ধরনের অনৈসলামিক কর্মকান্ডে অংশ নেয় এবং অধঃপতনের প্রান্তসীমায় উপনীত হয়।[১৪] মূলতঃ বাংলার মুসলিমদের এ বিপর্যয় প্রতিহত করার লক্ষ্যেই সংগঠনের কর্মসূচী নির্ধারণ করা হয়। ১৯১৭ সালের মধ্যেই সংগঠনটি ১৩ জন বেতনভোগী ও ১৪ জন অবৈতনিক 'মোবাল্লিগ' (ধর্ম প্রচারক) নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়। এই মোবাল্লিগদের অব্যাহত প্রচারের ফলে বাংলার মুসলিমগণ শুধু ধর্মীয় বিপর্যয়ের হাত থেকেই রেহাই পায়নি; বরং শিক্ষা, সমাজ ও সম্প্রদায়গত স্বার্থের দিক দিয়েও উপকৃত হয়। মোবাল্লিগগণ 'খাঁটি ইসলাম' প্রচার ও ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি মুসলিমদের(ক) সাধারণ শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ, (খ) মামলা-মোকদ্দমার কুফল সম্পর্কে জ্ঞানদান, (গ) একতার প্রয়োজনীয়তা ও পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদের কুফল বিশদভাবে বুঝিয়ে দেয়া, (ঘ) অপব্যয় ও সুদী

[১১] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩৬।
[১২] পূবোক্ত, পৃঃ ৩৬।
[১৩] আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার জেনারেল সেক্রেটারীর পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট, মাসিক মোহাম্মদী, ঢাকা, আশ্বিন ১৩৭১, পৃঃ ৮৮৬; মাসিক আহলে হাদিস, কলকাতা, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ (মাস উল্লেখ নেই), পৃঃ ৪৪-৫।
[১৪] মাসিক মোহাম্মদী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮২।

Dhaka University Institutional Repository

ঋণ গ্রহণের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা, (ঙ) স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ প্রভৃতি সমাজকল্যাণমূলক দায়িত্বও পালন করতেন।[১৫] ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে মুসলিমদের মধ্যে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে মুসলিমগণ রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয়ে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। মাওলানা আকরম খাঁর বর্ণনা মোতাবেক, আঞ্জুমানের প্রচেষ্টার ফলেই এদেশের লোকের পারস্পরিক বিদ্বেষ ও ঝগড়া-ঝাটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। মুসলিমদের পারস্পরিক ফৌজদারী আর দেওয়ানীর যে শত শত মোকদ্দমা আদালতে চলছিল আঞ্জুমানের খাদেমদের প্রচেষ্টায় তার আপোষ নিষ্পত্তি হয়েছে। আঞ্জুমানের প্রচেষ্টার ফলেই মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যভাব ও জাতীয়তাবোধ দিন দিন বেড়েই চলেছে।[১৬]

মাওলানা আকরম খাঁ কর্তৃক ১৫১৫ সালে সম্পাদিত ও কলকাতা হতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'আল্-এসলাম'-এর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে তিনি এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেন: "স্বধর্ম, স্বজাতি, স্বদেশ ও সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার সেবা করার নিমিত্তই 'আল্-এসলামে'র প্রচার।"[১৭] সত্যিকার অর্থেই পত্রিকাটি স্বধর্ম, স্বজাতি, স্বদেশ ও মাতৃভাষার সেবা করতে সক্ষম হয়। ইসলাম ও মুসলিমদের জাগরণমূলক লেখায় পত্রিকাটি সবসময় পূর্ণ থাকতো। এ পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এবং সহকারী সম্পাদক ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।[১৮]

মাওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে ও সক্রিয় উদ্যোগে জনসেবা এবং সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমেও 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা' মুসলিমদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। আবুল ফজলের বর্ণনা মোতাবেক, ১৯১৭ সালে বিহার প্রদেশের আরা শাহবাদ জেলায় ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত হলে মাওলানা আকরম খাঁ তৎক্ষনাৎ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পরে মাওলানা মনিরুজ্জামান

---

[১৫] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮৮৮।
[১৬] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৯১৯।
[১৭] আল্-এসলাম, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, পৃ ঃ ১।
[১৮] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, 'আল্-এসলাম,' মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ ঃ ৯১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামাবাদীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ৩২,০০০ টাকা সংগ্রহ করে তিনি প্রায় দুই মাস ব্যাপী সেখানে অবস্থান করে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত স্থানসমূহের দুঃস্থ লোকদের মধ্যে এ অর্থ বন্টন করেন এবং তাদের মুখে হাসি ফোটান।[১৯] বিভিন্ন সময়ে বাংলায় বন্যাপীড়িতদের মধ্যে রিলিফ এবং ঔষধপত্র বিতরণ করেও 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা'র মাধ্যমে তিনি সমাজসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সংগঠনের পঞ্চ-বার্ষিক রিপোর্টে মাওলানা আকরম খাঁ উল্লেখ করেন, মুসলিমদের জন্য এটা আনন্দ সংবাদ যে, জনহিতকর কাজে আঞ্জুমানের স্থান অন্যান্য সকল সোসাইটির উপরে। ফল কথা, এদেশে এতদিন পর্যন্ত জনকল্যাণকর যাবতীয় কাজ খৃস্টান অথবা হিন্দু মিশনারীদের দ্বারাই সম্পন্ন হচ্ছিল, মুসলিমদের মধ্যে সর্বপ্রথম এই আঞ্জুমানের পক্ষ হতেই এর সূচনা হয়। বিগত ১ বছরের মধ্যে আঞ্জুমান এ ব্যাপারে পঞ্চাশ হাযার নয়শত টাকা সংগ্রহ এবং ব্যয় করেছে।[২০]

এভাবে বিভিন্ন কার্যাবলীর মাধ্যমে 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা' মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখের নেতৃত্বে অনগ্রসর পশ্চাদপদ মুসলিমদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অচলায়তনে তীব্র আঘাত হানতে সক্ষম হয়। ফলে বাংলার মুসলিমদের মধ্যে যে নবজাগরণের সূচনা হয় তা মুসলিম সমাজকে অপরাপর সম্প্রদায়, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানসিক ও নৈতিক শক্তি যোগাতে সক্ষম হয়।[২১]

এ.কে. ফজলুল হকের পদত্যাগের পর ১৯৪৩ সালের ১৩ই এপ্রিল মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী দলের নেতা খাজা নাজিমুদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রী করে বাংলার নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।[২২] তখন বাংলার অবস্থা ছিল অত্যন্ত সংকটাপন্ন। দেশময়

---

[১৯] আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, মাহে নও, ঢাকা, আষাড়, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃ ঃ ৩৭।
[২০] আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার জেনারেল সেক্রেটারির পঞ্চ-বার্ষিক রিপোর্ট, মাসিক মোহাম্মদী, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৯২২।
[২১] এ.টি.এম. আতিকুর রহমান, বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৯।
[২২] মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃ ঃ ৩২৩।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্ভিক্ষ-অনাহারে প্রচুর লোক মৃত্যুবরণ করেছিল।[২৩] এ পরিস্থিতিতে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি হিসাবে মাওলানা আকরম খাঁ বাংলার তীব্র খাদ্য সংকটে নাজিমুদ্দীনের সরকারের সঙ্গে সর্বাত্মক সহযোগিতার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালের জুন মাসে এক বিবৃতিতে তিনি জনসাধারণ ও মুসলিম লীগ কর্মীগণকে সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে খাদ্য-সংকট মোকাবেলায় সহযোগিতার আহবান জানান।[২৪] ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে অন্য এক বিবৃতিতে তিনি মুসলিম লীগ সদস্যদেরকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিনিধিত্বমূলক 'ফুড কমিটি' গঠন করার নির্দেশ দেন।[২৫] এ সময় মাওলানা আকরম খাঁ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেও খাদ্য সংকটে সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি মোহাম্মদী পত্রিকায় 'লীগ মন্ত্রীসভা ও খাদ্য সমস্যা' শীর্ষক এক আলোচনায় খাদ্য পরিস্থিতির চরম অবনতির জন্য পূর্ববর্তী হক মন্ত্রী সভাকে দায়ী করেন এবং দুর্ভিক্ষের মোকাবেলায় নাজিমুদ্দীন মন্ত্রী সভা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের প্রশংসা করেন।[২৬]

ত্রিপলী ও বলকান যুদ্ধের সময় ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে যুদ্ধবিধ্বস্ত মুমূর্ষু পীড়িতদের সেবায় তিনি তুর্কীফান্ডে এই অর্থ দান করেন। তুরস্কের মুসলিমদের বিপদের সময় তিনি মোহাম্মদী পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে চল্লিশ হাজার রোপী সংগ্রহ করে তুরস্কে পাঠিয়েছিলেন।[২৭] বিহারে 'ঈদুল আযহা'র দিনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে। তিনি নিজেই দাঙ্গা-বিক্ষুব্ধ এলাকায় গিয়ে দাঙ্গা নিবৃত্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার কাপড় সংগ্রহ করে পাঠান।[২৮] ১৯৪৫ সালে চট্রগ্রামের কাহার পাড়া গ্রামে একটি লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে। দক্ষিণ ভারতীয় অঞ্চলের 'কালা আদ্‌মী' নামক সিপাহীরা একটি কসাই পরিবারের মহিলাকে অপদস্থ

---

[২৩] দুর্ভিক্ষের বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ ভবানী সেন, নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, ২য় খন্ড, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ ঃ ২৭-৪৯; শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চাশের মন্বন্তর, কলকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

[২৪] দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ৫ই জুন, ১৯৪৩, পৃ ঃ ২।

[২৫] দৈনিক আজাদ, ২১ জুলাই, ১৯৪৩, পৃ ঃ ২।

[২৬] মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃ ঃ ৪৫২।

[২৭] আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌, বাংগালী মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা আকরম খাঁর অবদান, পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), ঢা. বি. ১৯৯৭, পৃ ৯৮।

[২৮] Md. Kased Ali, Maulana Muhammad Akram Khan (1868-1968): His Life and Works, Ph. D. Thesis (unpublished). P. 76.

করতে উদ্যত হয়। তার চিৎকার শুনে গ্রামের লোকজন এসে তাকে রক্ষা করে। রাতের অন্ধকারে ঐ রেজিমেন্টের সিপাহীরা গ্রামটিকে ঘেরাও করে অগ্নিদগ্ধ করলে গ্রামের জনগণ একতাবদ্ধ হয়ে এ অশুভ শক্তির মোকাবেলা করে। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে সিপাহীরা গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে বেশ কিছু লোক লাঞ্চিত, আহত ও নিহত হয়। এক বিবরণ অনুসারে, উক্ত ঘটনায় ১ জন নিহত, কিছু সংখ্যক আহত এবং তিনজন মহিলা ধর্ষিতা হয়।[২৯] পুরো চট্রগ্রামে এ ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। হরতাল পালিত হয়। অনেক প্রতিবাদ সভা আহবান করা হয়। চট্রগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে মুসলিম লীগ নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাশেষে মাওলানা আকরম খাঁ-কে চেয়ারম্যান করে একটি 'রিলিফ ফান্ড কমিটি' গঠন করা হয়। আজাদ কর্তৃপক্ষ রিলিফ ফান্ড খুলে সাহায্যের জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানান। এতে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে। প্রায় একত্রিশ হাজার টাকার প্রাপ্তি স্বীকারও আজাদে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩০] এ রিলিফ ফান্ডের সংগৃহীত অর্থ মাওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় রাওলাট বিধি (Roulatt Act)-এর পরিণামে জালিয়ানওয়ালাবাগের যে নৃশংস হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়, মাওলানা আকরম খাঁ নিজে স্বচক্ষে সেই হৃদয়বিদারক ঘটনাও দেখতে গিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।[৩১]

সাংবাদিক হিসেবেও মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর পরিচিতি ছিল সমুজ্জ্বল এবং সাংবাদিকতার মাধ্যমে স্বীয় সমাজের সেবা করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। সমকালীন অনগ্রসর মুসলিম সমাজের চৈতন্যোদয় এবং তাদের স্বার্থসংরক্ষণের লক্ষ্যে তিনি তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ ৬৭টি বছর সাংবাদিকতায় ব্যাপৃত ছিলেন। বিশেষ করে বৃটিশ শাসিত বাংলায় তাঁর সাংবাদিকতা এতদঞ্চলের মুসলিমদের রাজনৈতিক

---

[২৯] Md. Ksed Ali, Ibid, P. 76; আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ ঃ ২৫৭।
[৩০] আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ২৫৮।
[৩১] বিস্তারিত দেখুন ঃ মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ১৭১-১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

ও সামাজিকভাবে সচেতন করতে সহায়তা করে এবং এর ফলে বাংলার মুসলিমগণ পার্শ্ববর্তী প্রাগ্রসর হিন্দু সমাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে উদ্যোগী হয়।

হিন্দু সমাজ কর্তৃক পরিচালিত পত্রিকাগুলোতে প্রায়শ: মুসলিম সমাজ ও ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করে প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হত। এগুলো পাঠ করে মাওলানা আকরম খাঁ খুবই মনক্ষুন্ন হন এবং এর ফলে স্বীয় সমাজের মুখপত্র হিসেবে পত্রিকা প্রকাশের ভাবনা ক্রমশ: তাঁর মনে দৃঢ় হয়ে উঠে।[৩২] তাঁর আন্তরিক উদ্যোগে একে একে বেশ কয়েকটি উচুঁ মানের সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।[৩৩] এ সকল সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমত গড়ে তুলে তিনি মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পশ্চাৎপদতা এবং কুসংস্কারের মূলে আঘাত করে তাদের সামনে সামগ্রিক উন্নতির নতুন দ্বার উন্মোচন করতে সক্ষম হন।[৩৪]

রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিক পরিচয়ের পাশাপাশি সাহিত্যিক এবং ইতিহাসবিদ্ হিসেবেও তিনি সবিশেষ পরিচিতি লাভ করেন এবং সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে সমাজ সেবায় অবদান রাখেন। বৃটিশ শাসিত বাংলার মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতা দূরীকরণের লক্ষ্যে তিনি অসংখ্য ইতিহাস ও সাহিত্যকর্ম রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে খৃষ্টান মিশনারীদের অব্যাহত ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতা রোধকল্পে এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণকল্পে তিনি বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এসমস্ত সাহিত্য ও ইতিহাস-কর্ম মুসলিমদের খৃষ্টধর্ম বিমুখ এবং পাশাপাশি তাদের আত্মসচেতন করতে বিশেষ অবদান রাখে।[৩৫]

---

[৩২] দেখুন, দৈনিক আজাদের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রদত্ত মাওলানা আকরম খাঁর সাক্ষাৎকার, দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৬১ এবং পূনঃ মুদ্রন, দৈনিক আজাদ, ৭ জুন, ১৯৭৫, পৃ ঃ ৩-৪।

[৩৩] এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা হয়েছে।

[৩৪] আবু জাফর (সম্পাদিত), মাওলানা আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৯৫।

[৩৫] এতদ্‌সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে প্রদান করা হয়েছে– গবেষক।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আকরম খাঁ লক্ষ্য করলেন যে, মুসলিম সমাজ বিভিন্ন বিদ্‌আত ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত রয়েছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে তিনি এমন কতিপয় ভিত্তিহীন বিদ্‌আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন, যার দরুন ব্যক্তিগত ও জাতীয় অর্থের দারুন অপচয় হয় অথচ ধর্মীয় দিক থেকে এতে কোন ফায়দাই নেই।[৩৬] তিনি ঘোষণা করলেন যে, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু উপলক্ষে তাঁদের আত্মার মাগফিরাতের জন্য বিভিন্ন নির্ধারিত তারিখে 'মাতম', 'ছিয়ম', 'চেহলাম' ইত্যাদির যে ব্যাপক প্রচলন মুসলিম সমাজে রয়েছে, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে তার কোন ভিত্তি বা প্রমাণ নেই। এ সব অনুষ্ঠানে যে অর্থ ব্যয় হয়, তা জাতীয় অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর মতে, এর পরিবর্তে তিন দিন মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা এবং একদিন ও এক রাতের আহার্য প্রস্তুত করে মাইয়েতের বাড়ী পৌঁছে দেয়া ব্যতীত আর কোন 'রছম' পালন করা সঙ্গত নয়।[৩৭]

মাওলানা আকরম খাঁ দেখলেন যে, এক শ্রেণীর লোক মিথ্যা স্বপ্নের অজুহাতে স্বীয় কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অসৎ উদ্দেশ্যে যেখানে সেখানে নিত্য নতুন কবর আবিষ্কার করছে এবং তা ক্রমশঃ বেড়ে চলছে। ভন্ড ও ভ্রান্ত পীর-ফকীরদের প্ররোচনায় কবর পূজার ন্যায় শির্ক-এর কলুষ কালিমায় মুসলিমদের সামাজিক জীবন পংকিল হয়ে পড়ছে। অথচ এ অবস্থায় তিনি নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে পারেন না। তাই তিনি কবর পাকা করা, কবরের উপর পাকা ঘর নির্মাণ করা, কবরের উপর গম্বুজ প্রস্তুত করা, কবরকে আলোক সজ্জিত করা, কবরকে সিজ্‌দার স্থান বানানো, কোন ইষ্ট লাভ বা অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কবরস্থ ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা বা কিছু চাওয়া, মানত মানা, নযর-নেয়াজ মানা ইত্যাদি ধর্ম-গর্হিত রীতি-নীতিকে কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ ও পূর্ববর্তী ইমামদের বক্তব্য দ্বারা সম্পূর্ণ হারাম বলে প্রমাণ করেন।[৩৮] মাওলানা আকরম খাঁ নিজের ব্যাপারেও ছিলেন

---

৩৬ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃঃ ১৬৬-৭১।

৩৭ বিস্তারিত দেখুন : আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, বাংগালী মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা আকরম খাঁর অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৯৩-৯৮।

৩৮ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়, পৃঃ ১৭১-১৭৮ এবং ১৯৮-২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

সচেতন। তিনি মৃত্যুর পূর্বাহ্নে অসিয়ত করেছিলেন যে, তাঁর কবর যেন অনুরূপ ধর্ম-গর্হিত রীতি-নীতির শিকারে পরিণত না হয়।[৩৯]

মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন পীর পূজার চরম দুশমন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, একদল সরল-সহজ লোক পীর-সন্ন্যাসীদের খপ্পরে পড়ে তাদের শিক্ষা অনুসারে বৈরাগ্য অবলম্বন করছে এবং সংসার-বিমুখ হয়ে আপন কর্তব্য কর্মে অবহেলা করছে। তারা ইষ্ট লাভ এবং অনিষ্ট হতে রেহাই পাওয়ার জন্য পীরের শরনাপন্ন হচ্ছে। অথচ ইসলামের বিধান মোতাবেক, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ কারো উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারেনা। তাছাড়া ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। তাই তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের কটাক্ষ দৃষ্টি উপেক্ষা করে পীর-পুরোহিত পূজার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তিনি বলেন যে, ইষ্ট লাভ বা অনিষ্ট নিবারণের জন্য আল্লাহ্র পরিবর্তে গায়রুল্লার শরণ গ্রহণ আজ মুসলিম সমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত। এর প্রতিবাদ করতে গেলে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হতে হয়। অথচ এ সব অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করাই হচ্ছে ইসলামের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা।[৪০]

ইসলামী তাহ্যীব্-তামাদ্দুনের পরিবর্তে বিদেশী তাহ্যীব-তামাদ্দুন্ (সভ্যতা-সংস্কৃতি)-এর অনুকরণকে মাওলানা আকরম খাঁ অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। মুসলিমদের অনৈসলামিক চাল-চলন দেখে তিনি দুঃখ প্রকাশ করতেন। এক শ্রেণীর মুসলিমকে ইউরোপীয় কায়দায় সালাম কালাম করতে দেখে তিনি আবেগময় ভাষায় বলেন যে, দুঃখের বিষয়, একদিকে আত্ম-বিস্মৃতির এবং অন্যদিকে মোগল সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংক্রামক পরিবেশের প্রভাবে ভারতবর্ষের মুসলিমগণ সাধারণভাবে এবং অভিজাত শ্রেণীর শরীফ লোকেরা এই খোদা প্রদত্ত নিয়ামতকে বর্জন করে তার স্থলে আদাব, কুরনিশ, Hallo, 'এই যে' প্রভৃতি নূতন নূতন শব্দ আমদানী করে ফেলেন। এমনকি প্রজা জমিদারকে, পুত্র পিতাকে, জনসাধারণ সরকারী আমলাকে 'আচ্ছালামু আলাইকুম' বলে অভিবাদন করলে অনেক সময় তা বেয়াদবী ও

---

[৩৯] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৪০৪।
[৪০] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, তাফছীরুল কোরআন, ১ম খন্ড, পৃ ঃ ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

অসম্মানজনক বলে গৃহীত হয়। কিন্তু ইসলামের শিক্ষায় কোন প্রকার কৌলিন্য অভিমানের একটুও স্থান নেই।[৪১]

রক্ষণশীল ওলামা সমাজ তাঁর ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের পথে বাধা সৃষ্টি করতে ত্রুটি করেননি। কিন্তু তিনি ভাবাবেগে পরিচালিত হয়ে কোন সময় তাঁদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হননি। তিনি যুক্তিমূলক লেখনী ধারণ করে তাঁদের মোকাবেলা করেন এবং আদর্শ ও গঠনমূলক সংস্কারের মাধ্যমে সমাজ সেবায় আত্ম নিয়োগ করেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নে কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হলঃ

তদানীন্তন মুসলিম সমাজের অধঃপতনের চিত্রটি ফুটে উঠেছে হজ্জ্বযাত্রী মাওলানা আকরম খাঁর প্রতি কবি গোলাম মোস্তফার একখানা চিঠিতে। মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত উক্ত চিঠিতে কবি গোলাম মোস্তফা কবিতার সুরে বলেনঃ

ঘোর ঘনঘটা; আঁধার গগন, বিজলী হাসিছে অট্টহাসি,
নিখিল বঙ্গ-মুসলিম আজি ধ্বংস ভেলায় যেতেছে ভাসি।
কূলে কূলে ঐ ডাকে শিবাদল, কুকুর গৃধিনী বিকট রবে,
সমাজ শবের আশায় আশায় দিন গনিতেছে বসিয়া সবে।

... ...

পীর খুলিয়াছে মুরিদ ব্যবসা, খোশ তবিয়তে রয়েছে বেঁচে
মৌলভী আর মোল্লা খেতেছে আল্লার পাক কালাম বেচে।
বিবি তালাক আর কাফেরী ফতোয়া হরদম তারা করিছে জারী,
মানুষ মারিয়া মানুষের সাথে করিছে মানুষ ব্যবসাদারী।[৪২]

'কাট মোল্লা ও আকাট পন্ডিত' শিরোনামে মাসিক মোহাম্মদীতে আলোচনা করতে যেয়ে মাওলানা আকরম খাঁ স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন এভাবে যে, একদিকে তারা নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, অন্যদিকে বাংলা ও ইংরেজিতে তারা ক্রমাগত পড়ে আসছে ভারত ও ইউরোপের উত্তেজনাকর ইতিহাস। তার ওপর এ সময় সোনায় সোহাগা ছড়িয়ে দিলেন মুসলিম বঙ্গের কুসংস্কার জর্জরিত অদূরদর্শী ও

---

[৪১] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, তাফছীরুল কোরআন, ২য় খন্ড, পৃ ঃ ৪৮।
[৪২] গোলাম মোস্তফা, একখানি চিঠি (হজ্বযাত্রী মাওলানা আকরম খাঁর প্রতি), মাসিক মোহাম্মদী, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

'জাহের পরস্ত' মৌলভী সমাজ। তারা এ সময় ইসলামের যে স্বরূপ প্রকাশ করতে লাগলেন, তা দেখে স্বধর্মজ্ঞ শিক্ষিত যুবকগণ লজ্জায় মাথা হেঁট করে নিল, ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করতে লাগল। তখন আরম্ভ হল– এ পক্ষের কথার বহর আর ফাৎওয়ার শাসন। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে কথা বলা তাঁরা এক প্রকার জানেনই না, তার উপর জমাট বাঁধা তক্লিদ্ এবং সম্পূর্ণ অনৈসলামিক 'বোজর্গানেদ্বীন' পূজায় বা সেই পূজার বাহানায় স্বর্গের শাশ্বত পবিত্র কালামুল্লাহ্র আর হজরত রসূলে করিমের (সাঃ) প্রচারিত মূল ধর্মীয় বিধান হতে তথা প্রকৃত ইসলাম হতে এই আলিম সমাজ নিজেরাই দূরে সরে পড়ে। সুতরাং এই শ্রেণীর কাটমোল্লা ও আকাট পন্ডিতের মধ্যে তখন একটা তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং একদিকে যেমন আকাট পন্ডিতের প্রত্যেক কথাকে 'নাউজু বিল্লাহ্-কুফুরী কালাম-বিবি তালাক' ইত্যাদি যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা কাটমোল্লার দল 'হাবা আম্-মনছুরা' করে উড়িয়ে দিতে চাইলেন, অন্যদিকে ইউরোপের ও হিন্দু সমাজের অনুকরণমাত্রকে সম্বল করে আকাট পন্ডিতের দল কাটমোল্লার কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। অথচ এই উভয় দলই পরের অনুকরণে অন্ধ। ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ কাট মোল্লার নিজের দেখার ও দেখানোর শক্তি ছিলনা। আকাট পন্ডিতও তার সন্ধান করে দেখার কোন আবশ্যকতা অনুভব না করে চোখ বন্ধ করে 'হিন্দুদের অবলম্বিত ভাষা ও পরিভাষাগুলির গলাধ:করণ উদগারণ ও চর্ব্বিত-চর্ব্বণ' আরম্ভ করে দিলেন। তাঁরা এতটুকু কথা চিন্তা করে দেখার অবকাশ পেলেন না যে, খ্রিষ্টান বা হিন্দু ধর্ম সভ্যতা ও উন্নতির আলোক সহ্য করতে পারেনি বলে ইসলামও যে পারবে না, তার কোন মানে নেই। তাদের দেখা ও দেখানো উচিত ছিল যে, ইসলামের অমুক বিশ্বাস বা অমুক অনুষ্ঠান মানুষের উন্নতির বর্তমান সভ্যতার পরিপন্থী। তা তাঁরা করেননি এবং করতে পারবেনও না।[৪৩]

মুসলিম সমাজের সংকট প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন যে, একদিকে আমাদের আলিম সমাজ সত্যিকার ইসলামকে নিজেদের সংস্কার ও খেয়ালের

---

[৪৩] 'আলোচনাঃ কাট মোল্লা ও আকাট পন্ডিত', মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩৪ (১৯২৭)।

Dhaka University Institutional Repository

আবরণে চাপা দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন। সত্যিকার ইসলাম অপেক্ষা এই খেয়ালগুলোর মর্যাদা যে তাঁদের কাছে অধিক, তা প্রত্যেক ক্ষুদ্র-বৃহৎ পরীক্ষা দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে। অন্যদিকে মূলত: অসদুদ্দেশ্যে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষার ফলে এবং যুগের সর্বব্যাপী সাধারণ আবহাওয়ার প্রভাবে ধর্মের প্রতি একটা অনাস্থার ভাব দেশময় সংক্রমিত। এই ভাবের প্রভাবে অভিভূত হয়ে মুসলিম বঙ্গের ইংরেজী শিক্ষিত যুবকগণ একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিল। ভাষা সমস্যার ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রণালীর কল্যাণে এদেশে সে সময় হিন্দুস্থানের মত এমন মনীষীর উদ্ভব হয়নি, যাঁরা হিন্দুস্থানের আলিম ও ইংরেজি শিক্ষিত পন্ডিতদের মত এই অনাস্থার মূলোৎপাটন করতে সক্ষম হবেন। বরং তাঁরা পূর্বকথিত কাফেরী ফাৎওয়ার উপর নির্ভর করে যে জিনিসটাকে ইসলামরূপে তাদের সামনে উপস্থাপন করলেন, তা দেখে নব্য সমাজের মনের অজ্ঞাত অন্তঃস্থলে একটা অস্ফুট আর্তনাদের সৃষ্টি হল– ধর্ম আর বিবেককে একসঙ্গে অন্তরে স্থান দেয়া তারা যেন কষ্টকর বলে মনে করতে লাগল।

পক্ষান্তরে যে 'সহজিয়া ও স্বেচ্ছাচারীর দল ধর্ম ও নীতির ভয়ে' একদিন আড়ষ্ট হয়ে বসেছিল, চিরন্তন নিয়ম অনুসারে এই সুযোগে তারা কোমর বেঁধে ময়দানে আসল। আলিম সমাজের দ্বারা উপস্থাপিত এই তথাকথিত ইসলামকে দেখিয়ে ইংরেজি শিক্ষিত যুবকদের এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তারা নিজেদের সমস্ত দুষ্ট প্রতিভা ব্যয় করে ফেলতে কুণ্ঠিত হলনা। এদেশের আলিম সমাজের যে অনেক দোষ-ত্রুটি আছে এবং মঙ্গলের জন্য সেগুলোর প্রতিকার যে নিতান্ত আবশ্যক, একথা মাওলানা আকরম খাঁ অনেকদিন হতে বলে আসছেন। এই সব দোষ-ত্রুটি, তার কার্য-কারণ ও সেগুলোর প্রতিবিধানের উপায় সম্বন্ধে তিনি বারম্বার বিস্তারিতরূপে আলোচনা করেছেন– এবং সেজন্য তাঁকে অন্ধ-বিশ্বাসী ও সংস্কার বিরোধী আলিম সমাজের যথেষ্ট বিরাগভাজনও হতে হয়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে, সুখের বিষয় বাঙলার কয়েকজন আলিম নিজেদের মারাত্মক অবস্থা সম্যকরূপে উপলব্ধি করেছেন এবং তার মূলীভূত কারণগুলোর

Dhaka University Institutional Repository

অনুসন্ধান করে সে সমুদয়ের প্রতিকারের জন্য তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টারও ত্রুটি করেননি ।[৪৪]

আরবি শিক্ষা ও বৃটিশদের রাজনৈতিক অভিসন্ধি প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন যে, বাংলার মুসলিম সমাজের বর্তমান অধঃপতনের মূলে যে কয়টি কারণ ওতপ্রোতভাবে লুকিয়ে আছে, এ দেশের আরবি শিক্ষার উপর বৃটিশ রাজের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি তার একটা প্রধান কারণ । এ শিক্ষাপ্রণালী এবং তার ভিতরকার গুঢ় রহস্যগুলোর কথা যতই চিন্তা করে দেখা যায়, ততই এর সর্বনাশকর রূপটা চোখের সামনে প্রকট হয়ে উঠে । বস্তুত: এক শতাব্দী ব্যাপী এ হলাহল মিশ্রিত শরবৎকে বাংলার মুসলিমগণ আবেহায়াত মনে করে পরমানন্দে পান করে আসছে । এ সব শিক্ষা প্রণালীর আমূল সংস্কার হওয়া বাংলার মুসলিম সমাজের পক্ষে বিশেষভাবে আবশ্যক হয়ে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ শিক্ষা প্রণালী হচ্ছে জাতির প্রকৃত জীবনকাঠি-মরণকাঠি ।[৪৫]

সঙ্গীত সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সাধারণত: লোকের বিশ্বাস হচ্ছে ইসলামে সব ধরনের সঙ্গীতকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে । আমাদের দেশের আলিম সমাজ সাধারণভাবে সঙ্গীতের বিরুদ্ধে যেসব কঠোর অভিমত প্রকাশ করে থাকেন, তার ভিত্তিতেই জনসাধারণের মনে উপরোক্ত বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে আছে । কিন্তু এ সম্বন্ধে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করার পর এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জনসাধারণের এ বিশ্বাস বা আলিম সমাজের এ অভিমত মূলত: ইসলামের অর্থাৎ কোরআন ও হাদিসের দলিল-প্রমাণের সাথে আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । মাওলানা আকরম খাঁ স্পষ্টভাবে দাবী করেছেন যে, ত্রিশ পারা কোরআনের মধ্যে এরূপ একটি আয়াতও খুঁজে পাওয়া যাবেনা, যাতে সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ বলে দাবী করা হয়েছে । পক্ষান্তরে, হজরত রসূলে করিম (সাঃ) সঙ্গীত মাত্রকেই নিষিদ্ধ বলে আদেশ প্রদান করেছেন– এরূপ একটিও সহীহ্ হাদিস

[৪৪] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সমস্যা ও সমাধান, মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩৫ (১৯২৮) ।

[৪৫] মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ১২ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৩৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। অধিকন্তু ইমাম ইব্‌নে হাজম (রঃ), ইমাম চতুষ্টয়, ইমাম গাজালী (রঃ), শাহ আবদুল আজিজ (রঃ), মোল্লা আলী কারী (রঃ), কাজী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রঃ) প্রভৃতি শত শত ইমাম ও মোহাদ্দিস একবাক্যে সদ্ভাবপূর্ণ বা নির্দোষ আনন্দদায়ক সঙ্গীতকে সিদ্ধ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৪৬]

চিত্রকলার প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন যে, কোন প্রকার জীবজন্তুর ছবি আঁকা বা মুর্তি ব্যবহার করা ইসলামের বিধান অনুসারে সিদ্ধ কিনা, বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী হতে মুসলিম জগতের বিভিন্ন কেন্দ্রে সে সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা চলে আস্‌ছে। মিসরের স্বনামখ্যাত আলিম মুফ্‌তী আবদুহু, তাঁর প্রধান শিষ্য আল্লামা রশীদ রেজা প্রমুখসহ মিসর, সিরিয়া, ত্রিপলী প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্রের কতিপয় বিখ্যাত আলিম চিত্রকলা সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জীব-জন্তুর ছবি তোলা, আঁকা, ছাপা বা সেগুলির ব্যবহার করা ইসলামের বিধান অনুসারে কখনই নিষিদ্ধ হতে পারে না।[৪৭]

মাওলানা আকরম খাঁও এ বিষয়ে একমত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক ব্যাখ্যা প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যুগে যুগে দু'টি ধারা বিদ্যমান ছিল: রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল ধারা ও প্রগতিশীল ধারা। দ্বিতীয় ধারার আলিমগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে নতুন নতুন সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেন। বলাবাহুল্য, মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন এঁদের অন্যতম।[৪৮]

মহিলাদের পর্দা প্রথা বা হিজাব এবং অবরোধ-এ দুটো এক নয়, বরং ইসলামের দৃষ্টিতে এ দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। ইসলামে অবরোধ প্রথার কোন

---

[৪৬] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সমস্যা ও সমাধান (সঙ্গীত সমস্যা), মাসিক মোহাম্মদী, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৫; বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'সঙ্গীত সমস্যা', মাওলানা আকরম খাঁ, আবু জাফর (সম্পাদিত), ই.ফাবা., ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ ঃ ৬০২-৬৩২।

[৪৭] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'চিত্রকলা ও এছলাম', মাসিক মোহাম্মদী, ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ (১৯৩০); এতদ্‌সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্যঃ মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, 'চিত্রকলার প্রতি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীঃ একটি সমীক্ষা', নিবন্ধ মালা, দশম খন্ড, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮।

[৪৮] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, মুসলিম সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্রে ধর্ম ও সমাজ চিন্তা (১৯০১-১৯৪৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ ঃ সাত, (আভাষ)।

Dhaka University Institutional Repository

স্থান নেই। মহিলাদের অবরোধ প্রথা ও পাশ্চাত্যের অবাধ নারী-স্বাধীনতাজনিত উচ্ছৃঙ্খলতা– এ দুটি অকল্যাণকর প্রথার মাঝখানে ইসলাম এক অভিনব ও অনুপম ব্যবস্থা দিয়েছে। অথচ মাওলানা আকরম খাঁ লক্ষ্য করলেন যে, তদানীন্তন সময়ে বাঙালী মুসলিম সমাজের মহিলাদের পর্দার নামে ঘরের ভিতর চার দেওয়ালের সীমানায় অবরুদ্ধ করে রাখা হত। এটাকেই লোকেরা ইসলামের বিধান বলে মনে করত। অন্যদিকে নারী প্রগতির সমর্থনে যাঁরা অবরোধ প্রথার প্রতিবাদ করেছেন, তাঁরা অবাধ নারী স্বাধীনতার ক্ষতিকর দিকটির প্রতি মোটেও লক্ষ্য করছেন না। ফলে সমাজে দুটো ধারার সৃষ্টি হয়। মাওলানা আকরাম খাঁ মনে করেন ইসলাম এ দুটো চরম ধারার কোনটিকেই সমর্থন করেনা। এ বিষয়ে ইসলামের বিধান অত্যন্ত চমৎকার। ইসলামের হিজাব প্রথা হচ্ছে মহিলাদের শালীনতা ও আব্রু-ইজ্জত রক্ষা করার হাতিয়ার এবং মহিলারা প্রয়োজনবোধে পর্দা প্রথা বজায় রেখে অবশ্যই শালীনভাবে ঘরের বাইরে যেতে পারবে। আর এখানেই হিজাব ও অবরোধের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।[৪৯]

মাওলানা আকরম খাঁ বলেন, অবরোধের আদেশ না থাকলেও সুরুচী, শ্লীলতা ও ভব্যতার তাকিদ ইসলামে আছে। পক্ষান্তরে অবরোধের বাইরে এলেই নারীর চরিত্রের অধঃপতন ঘটে, এটি যেমন ঠিক নয় তেমনি এটিও ঠিক নয় যে, নারীগণ মাঠে-ময়দানে, রেলে-ষ্টিমারে ও থিয়েটারে-বায়স্কোপে ছুটাছুটি করে বেড়ালেই মুসলিমগণ দিন দিন দুই-চার হাত করে উঁচু হয়ে যাবে।[৫০]

প্রসঙ্গক্রমে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন যে, যেসব দলিল প্রমাণের ওপর নির্ভর করে অবরোধপন্থীরা নিজেদের জ্ঞান বিশ্বাস মতে অতিশয় দৃঢ়তার সাথে অবরোধের হুকুম দিচ্ছেন বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁরাই আবার সেইসব দলিল-প্রমাণকে সম্পূর্ণরূপে অমান্য করে চলছেন। ফলতঃ ইসলাম নির্দেশিত পর্দা তাঁরা মোটেই পালন করছেন না। অন্যদিকে ইসলামের দোহাই দিয়ে নারী প্রগতির সমর্থন অথবা

---

[৪৯] মোহাম্মদ, আকরম খাঁ, 'পর্দা, হেজাব ও অবরোধ', আল্-এসলাম, ৩য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২৪ (১৯১৭), পৃ ঃ ১৯৬, ২০৫।

[৫০] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'সংবাদ পত্রে মহিলা চিত্র', মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, পৃ ঃ ৫১৯-২০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত অবরোধ প্রথার প্রতিবাদ করছেন যাঁরা, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের আদর্শ হচ্ছে পাশ্চাত্যের স্বাধীনতা। ইসলামের নাম তাঁরা ব্যবহার করে থাকেন নিজেদের অভিসন্ধির অসঙ্গত তাকিদে অথবা মানসিক দুর্বলতার অন্যায় ইঙ্গিতে। অথচ অবরোধ ও উচ্ছৃঙ্খলার দুই অকল্যাণের মধ্যস্থলে এক অভিনব ও অনুপম সমাধান প্রদান করে ইসলাম।[৫১]

মানুষের রিপু তথা সহজাত বৃত্তি আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি। তা ধ্বংস করা সঙ্গত নয়, আবার এর অসঙ্গত ব্যবহারও ইসলামসম্মত নয়। নারীর প্রতি অবরোধের নির্দেশ নাই বলেই ইসলাম তাদেরকে জুম্‌আ, জামাআত, হজ্ব ও জিহাদের অনুমতি দিয়েছে। পক্ষান্তরে রিপুর অপব্যবহার নিষিদ্ধ বলে তাদেরকে নিকটাত্মীয়ের সাহচর্য ব্যতীত কোথাও গমন ও বেগানা পুরুষের সাথে নিভৃতে মেলামেশা করতে ইসলাম নিষেধ করেছে। যেসব কারণ ও উপকরণ মানুষকে পাপ ও অপরাধের দিকে যতটা ঠেলে দেয়, পাপরূপে তা ততটাই ঘৃণ্য, পরিহার্য ও নিষিদ্ধ। নর-নারী, বিশেষতঃ কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীর অবাধ মিলন, তাদের যথেচ্ছা বিচরণ প্রভৃতি একই কারণে নিষিদ্ধ। এসব অস্বীকার করার মানে ইসলামকে অস্বীকার করা। মাওলানা আকরম খাঁর বক্তব্যে এরই হুবহু প্রতিফলন ঘটে।[৫২]

বহু বিবাহের কুফল সর্বজন স্বীকৃত এবং এর প্রচলন থাকায় পত্নী-বিদ্বেষপ্রসূত কোলাহল প্রায় সর্বত্রই শোনা যায়। এর ফলে পরিবারে গৃহবিবাদ লেগেই থাকে। এতে বহু সন্তানের জনক-জননী হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। অন্যদিকে বহু সন্তানের প্রতিপালনও দুরূহ ব্যাপার। পিতার অবর্তমানে বৈমাত্রেয় ভাইদের গৃহবিবাদের ফলে অতি ধণী ও সম্পদশালী পরিবারও দরিদ্র পরিবারে পরিণত হয়। অন্যদিকে স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারে। স্ত্রী মৃত-স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিনী হয় বলে কোন কোন স্থলে প্রৌঢ়া পুত্রবতী নারীকেও বলপূর্বক হরণ করে বিবাহ করতে দেখা যায়। মুসলিম আইনানুসারে মেয়েও পিতার সম্পত্তির

---

[৫১] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'অবরোধ ও উচ্ছৃঙ্খলা', মাসিক মোহাম্মদী, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৯ (১৯৩২), পৃ ঃ ০৯।

[৫২] দেখুন, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'আলোচনাঃ নারী প্রগতি ও তাহার পরিণাম', মাসিক মোহাম্মদী, ৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪০ (১৯৩৪), পৃ ঃ ৪৪২।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারিনী। ফলে মুসলিমদের সম্পত্তি বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরূপ স্থানে সম্পত্তির লোভে বিবাহ নিয়ে প্রায়ই জোর-জবরদস্তি ও বিবাদাদি হতে দেখা যায়।[৫৩] তাই মাওলানা আকরম খাঁ বিনা প্রয়োজনে বহু বিবাহকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করেছেন।

মাওলানা আকরম খাঁ বলেন, ইসলামে বিবাহের একটা প্রধানতম শর্ত হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষ হতে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে পরস্পরের সম্মতি। ইসলামের পরিভাষায় একে 'ইজাব-কবুল' বলা হয়। এ ইজাব-কবুল ব্যতীত কোন বিবাহই সিদ্ধ হতে পারেনা। কাজেই বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর বিবাহ করাই হচ্ছে ইসলামের অভিপ্রেত ও আদর্শ। কারণ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকার মতামতের কোন মূল্য শরিয়তের আইনে নেই। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকার বিবাহ দিয়ে তাদের পিতা-মাতা তাদের সর্বনাশ করছে; শত-সহস্র শিশুর অকাল মৃতুতে সহায়তা করছে, আর এমনিভাবে মুসলিম জাতির মহাসর্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হচ্ছে।[৫৪]

ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। আর তাই ইসলামে অবাধ তালাক দেয়ার অনুমতি নেই। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় স্বামীকে অগত্যা স্ত্রী ত্যাগের অনুমতি দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইসলাম নারীকেও বিবাহ-বন্ধন ছেদ করার অনুমতি দিয়েছে। একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অবাধ অধিকার পুরুষের নাই। অথচ এ ব্যাপারে মুসলিম সমাজে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন যে, আজকাল মুসলিম সমাজ সাধারণত: তালাকের অধিকারের যে অপব্যবহার করছে, তা ইসলামের আদর্শ নয়– বরং তার বিপরীত একটি ঘৃণিত বিদ্‌আৎ ও অশাস্ত্রীয় ব্যভিচার মাত্র। পক্ষান্তরে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করাতেও নিয়মহীন, শর্তহীন অবাধ অধিকার আছে- এ ভ্রান্ত ধারণার ফলে মুসলিম সমাজ– বিশেষত: ধার্মিকতার 'সোল

---

[৫৩] 'সম্পাদকীয়', মাসিক মোহাম্মদী, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৬, পৃ ঃ ৬৩৬।
[৫৪] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'সর্দা বিলঃ বিবাহের বয়স নির্ধারণ', সম্পাদকীয়, মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৫, পৃ ঃ ৫৫৩-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

এজেন্সী'র দাবিদারগণ– স্ত্রী বর্জন ও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার যে ঘোর ঘৃণাজনক ব্যভিচার আরম্ভ করেছেন, তা চিন্তা করতেও বুক ফেটে যায়।[৫৫]

পরিশেষে বলা যায় যে, মাওলানা আকরম খাঁর মূল ব্রত ছিল ইসলামের প্রচার, প্রসার এবং মুসলিম সমাজের সামগ্রিক উন্নতি। কর্ম জীবনের শুরুতেই তিনি দেখলেন, ইসলাম যে আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে একদিন পৃথিবীতে সোনালী যুগের সূচনা করেছিল, বর্তমানে মুসলিম সমাজ সে আদর্শ থেকে বিচ্যুত। ইসলামপন্থীরা নানা ধরনের কুসংস্কার, ফিরকাবন্দী, আত্মকলহ ও দলাদলিতে মশগুল। এ ব্যাধি বাঙালী মুসলিম সমাজে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে আছে। ফলে এতদঞ্চলের মুসলিমগণ ইসলামের মূল আদর্শ হতে দূরে সরে গেছে। মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন সমাজ সচেতন ব্যক্তি। তাই বাঙালী মুসলিম সমাজের যেসব জটিল বিষয় নিয়ে ইতোপূর্বে তেমন কোন আলোচনা-পর্যালোচনা হয়নি, তিনি সেসব ক্ষেত্রে যুক্তি ও তথ্য নির্ভর আলোচনা করেন, প্রয়োজনে সমাজ সংস্কারের আহবান জানান এবং এ ভাবে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

---

৫৫ মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'এছলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার', মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৪, পৃ ঃ ১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মাওলানা আকরম খাঁর ঐতিহ্য চেতনা এবং ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনা

ক) মাওলানা আকরম খাঁ বিরচিত সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত ঐতিহ্য চেতনার স্বরূপ

যে জাতির ইতিহাস নেই, তার ঐতিহ্যও নেই। যাঁরা কর্মবীর, আত্মত্যাগী, দেশ প্রেমিক এবং সাহিত্যে যাঁদের জয়গাথা কীর্তিত তাঁরাই অমর, তাঁরাই ইতিহাসের দৃষ্টান্তস্থল। জাতি বড় হয় তার অতীতকে জেনেই, আর অতীত জাগ্রত হয় ইতিহাসে স্বকীর্তিধন্য সেই কিংবদন্তী পুরুষদের স্মরণপথে।[১] আমাদের জাতীয় জীবনে আজ যেসব স্মরণীয় পুরুষ বিস্মৃতির উত্তাল তমসাকে বিদীর্ন করে আপন কীর্তির মহিমায় দ্যুতিভাস্বর, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তাঁদের অন্যতম। পূর্ণ এক শতাব্দী (১৮৬৮-১৯৬৮) ব্যাপী তিনি অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে জীবন যাপন করেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে একটি শতাব্দীর জীবন্ত ইতিহাস ও প্রাণ পুরুষ। ঐতিহ্য চেতনায়, ইতিহাস সাধনায়, সাহিত্য চর্চায়, সাংবাদিকতায়, শিক্ষা আন্দোলনে, সমাজকর্মে ও রাজনীতিতে বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এ মহান ব্যক্তিত্ব স্বকীয় অনন্যতা ও স্বীয় কর্মধারার যে প্রমাণ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহে অবাক করার মত। এক কথায় তাঁর সমকালে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে এমন নিবেদিত প্রাণ ও ইতিহাস-ঐতিহ্য সচেতন ব্যক্তি খুব কমই ছিলেন।

মুসলিম বাংলার নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ দিশারী, বঙ্গীয় মুসলিম সাংবাদিকতার দিকপাল, নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক নেতা, আযাদী আন্দোলনের নকীব, পাকিস্তান আন্দোলনের শক্তিমান সংগঠক, ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশিষ্ট ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক, প্রভাবশালী বাগ্মী, সুদক্ষ সাহিত্যিক ও প্রতিথযশা ঐতিহাসিক মাওলানা আকরম খাঁ ইসলাম ধর্ম, মুসলিম শাসন এবং বাঙ্গালী মুসলিমদের বিভিন্ন সমস্যা ও সেগুলোর সমাধান বিষয়ক বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। এসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সাহিত্যিক ও

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আর এগুলো নিঃসন্দেহে তাঁর ঐতিহ্য চেতনার প্রমাণ বহন করে। এগুলোর ভিতর দিয়ে তাঁর সমাজ সেবা, ধর্ম প্রচার, ইতিহাস চর্চা, শিক্ষা বিস্তার ও আযাদী সংগ্রাম বিষয়ক চিন্তাধারা ও কার্যাবলী পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাঁর লেখাগুলো ভাবাবেগ ও প্রতিক্রিয়াশীলতার দোষ থেকে মুক্ত এবং প্রগতি ও যুক্তিবাদের মহিমায় ভাস্বর।

বৃটিশ-শাসিত বাংলার মুসলিমদের শিক্ষা, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক পশ্চাদ্‌পদতা দূরীকরণের লক্ষ্যে এবং তাদেরকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে মাওলানা আকরম খাঁ অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে খৃষ্টান মিশনারীগণ কেরি ও মার্সম্যান প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় পাদ্রীদের নেতৃত্বে ভারতে ব্যাপকভাবে খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার এবং ইসলাম ধর্মের কুৎসা রটনা করে মুসলিমদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন।[২] এ প্রসঙ্গে জানা যায় যে, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে আগমনের অব্যবহিত পরেই ভারতে খৃষ্টান মিশনারী তৎপরতা জোরালো হয়। প্রথমাবস্থায় খৃষ্টান মিশনারীগণ সুন্দরবন উপকূল অঞ্চলে ও চট্রগ্রাম শহরে পরিদর্শক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৬০৩ সালে তাঁরা চট্রগ্রামে একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তী সময়ে অন্যান্য অঞ্চলে মিশনারী তৎপরতার বিস্তৃতি ঘটান। প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁদের প্রয়াস তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। কিন্তু পরে মিশনারীগণ দেশীয় ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অসংখ্য বই ও প্রচারপত্র প্রকাশ করে দেশবাসীর মনোযোগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন।[৩]

বিশ শতকেও খৃষ্টান মিশনারীদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। এ শতকের শুরুতে বাংলার অনেক মুসলিম মিশনারীদের প্রচার, প্রলোভন ও বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। ১৯১১ সালের আদম শুমারীর রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলায়

---

১ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ ঃ ৯/ 'নিবেদন' অংশ দ্রষ্টব্য।

২ Cassell's Biographical Dictionary, London and New York, N.P.D., PP. 446, 910; মাসিক মদীনা, ঢাকা, মার্চ, ১৯৮৬, পৃ ঃ ১৩।

৩ আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট, মাসিক মোহাম্মদী, ঢাকা, আশ্বিন, ১৩৭১, পৃঃ ৮৮৩; বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ J. J. Caupos, History of the Portuguese in Bengal, Calcutta, 1919 এবং দিলীপ পন্ডিত, বাংলাদেশে খ্রীস্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস, কুমিল্লা, ১৯৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০১ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত খৃষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৭৯.৫% । পক্ষান্তরে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩১.৮% । আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টে আদম শুমারীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আনুপাতিক সংখ্যাবৃদ্ধির খতিয়ান তুলে ধরে দেখানো হয়, ১৯১১ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৫০ হাযার মুসলিম খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে।[৪] মাওলানা আকরম খাঁ মুসলিমদের এ প্রবণতা রোধ করে তাদের মুসলিম হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য সচেতন ও অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও খৃষ্ট ধর্মের অসারতা তুলে ধরে বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দে এ লক্ষ্যে তিনি 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা'র মুখপত্র 'আল্-এসলাম'-এ লিখেন 'মূল বাইবেল কোথায়?' । মুসলিমদের কাছে খৃষ্টধর্মের অসারতা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে রচিত 'যীশু কি নিস্পাপ?' ছিল তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত এ গ্রন্থে তিনি 'যীশু খৃষ্ট যে নিস্পাপ ছিলেন না,' তা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন এবং যীশু খৃষ্ট ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে পার্থক্য দেখাতে চেয়েছেন।[৫] তাঁর এ সকল সাহিত্য ও ইতিহাস কর্ম মুসলিমদের খৃষ্টধর্ম বিমুখ ও আত্ম-সচেতন করতে বিশেষ অবদান রাখে।

বাংলার মুসলিমদের মধ্যে বিরাজমান অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার দূরীকরণের লক্ষ্যে মাওলানা আকরম খাঁ যুক্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে সাহিত্য রচনা করেন। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত 'মোস্তফা চরিত' গ্রন্থে তাঁর যুক্তি নির্ভর ইতিহাস ও সাহিত্য রচনার ক্ষমতা বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়েছে। উনিশ শতকের শেষদিকে ধর্মনীতিতে যুক্তিবাদের যে সূচনা দেখা দেয়, বিশ শতকের তৃতীয় দশকে তার প্রবল প্রতিষ্ঠা ঘটে 'মোস্তফা চরিত' গ্রন্থে। এ গ্রন্থের 'উপক্রমনিকা' ভাগে মুসলিমদের কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ সম্পর্কে তিনি লিখেন - "আজ মুছলমান নিজের জন্মগত ও পারিপার্শ্বিক কুসংস্কারের চাপে কোরআনের সেই স্পষ্ট শিক্ষাকে একেবারে ভুলিয়া

---

৪ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮৮৪-৮৫ ।

৫ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, কলকাতা, ১৯১৫, ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, উদ্বৃত: আলী আহমদ (সংকলিত), বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ ঃ ১২-১৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

বসিয়াছে– ভুলিয়া বসাকেই, এমন কি সেই শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করাকেই আজ তাহারা 'এছলাম' বলিয়া মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।"[৬]

পীর পূজা, কবর পূজা ইত্যাদি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বাংলার মুসলিমদের ধর্ম সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে তৎকালীন মুসলিম ধর্মবেত্তাদের কটাক্ষ দৃষ্টি উপেক্ষা করে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি আরও লিখেন:

> "মুছলমানকে আজ আবার নূতন করিয়া শিখাইতে হইবে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রছুল ব্যতীত যিনি যত বড় পীর-দরবেশ, অলি বা আলেম হউননা কেন, যুক্তি-প্রমাণ ও দলিলের বিপরীত হইলে তাঁহার কথা মানিব না, কারণ ইহাই সম্পূর্ণ অনৈছলামিক শিক্ষা। এই শিক্ষা ও বিশ্বাসের ফলেই মুছলমানের যত সর্বনাশ হইয়াছে, এ কথাগুলি মুছলমান জনসাধারণকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে ... অন্ধ বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করাই এছলামের প্রধান শিক্ষা। ... আমাদের বক্তব্য এই যে, কোরআন এবং ছহী ও বিশ্বাস্য হাদীছ ব্যতীত, অন্য কোন সূত্রে আমরা যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণ অবগত হইব, তাহার সত্য মিথ্যা, বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য এবং প্রামানিক অপ্রমানিক হওয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া লইবার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের আছে। আরবী-পার্সী ভাষায় লিখিত পুস্তক মাত্রই মুছলমানের ধর্মশাস্ত্র নহে।"[৭]

মাওলানা আকরম খাঁ যুক্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে ১৯৩১ সালে প্রকাশিত 'সমস্যা ও সমাধান' গ্রন্থে বলেন যে, 'ইসলামের নামে প্রচলিত বহু নিষেধাজ্ঞা সত্য নয় এবং কোরআন-হাদীস উদ্ধৃত করে তা প্রমাণে সচেষ্ট হন। ফলে গোঁড়া আলিমদের সাথে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীগত বিরোধ দেখাদিলেও মুসলিমদের প্রগতির পক্ষে তাঁর সাহিত্য ও ইতিহাস কর্ম স্পষ্টত: বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।[৮] যুক্তিবাদের আশ্রয় নিয়ে মাওলানা আকরম খাঁ মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ আল্‌কোরআনের ব্যাখ্যা করেও বাংলার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিমদের অন্ধবিশ্বাসের মূলোৎপাটনে সচেষ্ট ছিলেন।[৯]

---

[৬] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃ ঃ ২-৩।
[৭] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৯-২০।
[৮] আনিসুজ্জামান, 'সাহিত্যিক ও সাংবাদিক', দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৭ই জুন, ১৯৬৮, পৃ ঃ ৬ (চ), বিশেষ সংখ্যা।
[৯] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, তাফছীরুল কোরআন, ৩য় খন্ড, ঢাকা, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, পৃ ঃ ৫৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

সাইয়েদ জামাল উদ্দীন আফগানীর 'প্যান-ইসলামিজম' (Pan-Islamism) বা 'বিশ্ব ইসলামবাদ' দ্বারা পাক-ভারতের একদল মুক্তিকামী মুসলিম তরুণ প্রবলভাবে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত হন। মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন এঁদের অন্যতম। বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। জনমত গঠনের জন্য তিনি যে পথ ও পন্থা অবলম্বন করেন তা ছিল সময়ের দাবী। একহাতে অসি এবং অপর হাতে মসি নিয়ে তিনি মুসলিমদের মধ্যে যে চেতনা সৃষ্টি করেছিলেন, সে ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত আছে। তিনি শিক্ষিত মুসলিম সমাজের চোখ খুলে দিতে সক্ষম হয়েছেন। ইতিহাস অধ্যয়ন করে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, মুসলিমদের পৃথক আবাসভূমির কোন বিকল্প নেই। সেজন্য তিনি নিজেকে রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত করেন এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কলম ধারণ করেন। পরিণতিতে সাংবাদিকতার জগতে তিনি নিজেকে 'un-paralleled' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের যে জাগরণ আমরা বিশ শতকে লক্ষ্য করি, তার মূলে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে যাঁরা অবদান রাখেন মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর প্রকাশিত পত্রিকাগুলো, বিশেষ করে মাসিক মোহাম্মদী ও দৈনিক আজাদ বাঙ্গালী মুসলিমদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করে। মাওলানা আকরম খাঁ শুধু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না, বরং মুক্ত চিন্তা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক মননশীলতার ক্ষেত্রেও তিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। এ বিষয়ে 'মোস্তফা চরিত' এবং 'সমস্যা ও সমাধান' প্রসঙ্গে একটু পূর্বেই ধারণা দেওয়া হয়েছে। মুসলিমদের সেই ঘোর দুর্দিনে মাওলানা আকরম খাঁর উক্তসব গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে গড়ে উঠে একদল সচেতন কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক, যাঁরা চিন্তার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী মুসলিমদের বহুদিনের অচলায়তন ভেঙ্গে তাদেরকে আস্থা সহকারে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রেরণা যোগায়।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর নেতৃত্বে কতিপয় সমাজ হিতৈষী আলিমের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা' । সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সবসময় গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা পরিহারে সচেষ্ট ছিলেন । তাই প্রথম থেকেই এ সংগঠনে অনেক ইংরেজী শিক্ষিত মুসলিমকেও যুক্ত হতে দেখা যায় । ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষায় আধুনিকীকরণ ও নারী শিক্ষা বিস্তারেও এ সংগঠন ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে । ফলে আলিম সমাজ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এক্ষেত্রে মাওলানা আকরম খাঁর অবদান অনস্বীকার্য ।

মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন শতাব্দীর প্রতিনিধি । তিনি লক্ষ্য করলেন, অধিকাংশ মুসলিমই তাঁদের ঐতিহ্য তথা গৌরবময় অতীত সম্পর্কে সচেতন নয়, বরং সম্পূর্ণ অনবহিত । তারা অবগত নয় কেন তারা ইংরেজদের পদানত বা হিন্দু সম্প্রদায়ের চেয়ে অনগ্রসর । তারা নানা প্রকার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, সমাজকে তারা অনেকটা সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে । ধর্মীয় অনুশাসনের ক্ষেত্রে তাদের অনেকেই চার ইমামের মাজহাবকেই শেষ ব্যাখ্যা ও রক্ষাকবচ হিসেবে মেনে নিয়েছে । ইজতিহাদের দরজা যে বন্ধ হয়ে যায়নি এবং তা যে সকল সময়ের জন্যই উন্মুক্ত, তা তারা বেমালুম ভুলে গেছে । তিনি এ সংকীর্ণ গন্ডী থেকে মুসলিমদের বের করে আনতে সচেষ্ট হন, তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে এবং আত্মসচেতন করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করেন । তিনি কোরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণ করেন যে, কোরআন ও হাদীসের বাণী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার অধিকার শিক্ষিত ও যোগ্য সব মুসলিমের রয়েছে । এতে করে অনেক মুসলিম নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন । তাঁরা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে ইসলামকে বুঝার জন্য এগিয়ে আসেন । ফলে ধর্মীয় কুপমন্ডুকতা ও কুসংস্কারমুক্ত হয়ে তাঁদের অনেকেই পরবর্তীকালে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন । আর এসবের অধিকাংশ কৃতিত্বই মাওলানা আকরম খাঁর । আমাদের জাতীয় জাগরণে তাঁর অবদান মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সানাউল্লাহ্ নূরী অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে সাংবাদিক, রাজনীতিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এবং ইতালীর বিপ্লবে মহান মনীষী মাতৃসিনা যে

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা গ্রহণ করেন, আমাদের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বিপ্লবে মাওলানা আকরম খাঁও একই ভূমিকা গ্রহণ করেন। জাতির ওপর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে ভলতেয়ারের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা যায়।[১০]

মাওলানা আকরম খাঁর 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থখানা বাঙ্গালী মুসলিমকে আত্মসচেতন করার ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। মুসলিম সমাজ কেন বিজাতীয় আচার-আচরণ ও সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে– এর কারণ অনুসন্ধান করে তিনি বুঝতে পারেন যে, এর একমাত্র কারণ স্বীয় সত্তা সম্বন্ধে অজ্ঞতা। তারা জানে না, তাদের ঐতিহ্যের উৎস কোথায়। তারা জানে না, তাদের উত্থান কোথায়, শেষ কোথায়। তারা জানে না, তারা কেন ইংরেজদের গোলাম ও হিন্দুদের পদানত। কাজেই এক্ষেত্রে প্রকৃত দরদীর সর্বপ্রধান কর্তব্য হচ্ছে– এ অচেতন ও দুর্ভাগা মানুষগুলোকে আত্মসচেতন করে তোলা। এ গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি ইসলামের মৌলিক ধর্ম বিশ্বাসের আলোকে সংস্কৃতির ব্যাখ্যায় অবতীর্ণ হন। কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে সাংস্কৃতিক শাখার সভাপতির ভাষণে মাওলানা আকরম খাঁ মুসলিমদের সংস্কৃতির রূপ কেমন হবে তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, জাতি হিসেবে মুসলিমদেরও একটা নিজস্ব ও পক্ষপাতহীন সংস্কৃতি আছে। দীর্ঘকালের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে, ইতিহাসের নানা সুখ-দুঃখপূর্ণ স্মৃতির মধ্য দিয়ে, জীবন রহস্যের বিবিধ দার্শনিক সাধনা ধারার স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়ে, শিল্প ও সাহিত্য সেবায় অভিনব রূপ-রসের অনুভূতি ও আস্বাদনের মধ্য দিয়ে, অতীতের বহু সঞ্চয় ও ভবিষ্যতের বহু সম্ভাবনাকে অবলম্বন করে মুসলিমদের এ সংস্কৃতি সৃষ্ট পুষ্ট ও জীবন্ত হয়ে আছে।[১১]

এদেশে ইসলাম প্রচারের সূচনা খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে। ব্যাপকভাবে এখানকার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে দ্বাদশ শতক থেকে। ফলে আটশ' বছর ধরে হিন্দু-

---

[১০] সানাউল্লাহ্ নূরী, 'সাহিত্যিক-সাংবাদিক আকরম খাঁ', মাওলানা আকরম খাঁ, আবু জাফর (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৫৪।

[১১] নাসিরউদ্দীন্, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৪৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম পাশাপাশি বাস করলেও ধর্মীয় কারণেই তাদের সাংস্কৃতিক পার্থক্য বজায় থাকে। মুসলিমদের স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত ও জোরদার করার রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হয় পাকিস্তান প্রস্তাব বা লাহোর প্রস্তাবের সাথে। কিন্তু সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য চেতনা জন্ম লাভ করে আরও বহু পূর্বে। এর মধ্যেও বাংলার মুসলিম সমাজে হিন্দু-মুসলিম মিলিত সাধারণ সমন্বয়বাদী ধারাও কম শক্তিশালী ছিলনা।[১২]

ইসলামী তাহ্‌যীব-তামাদ্দুন এতদঞ্চলে প্রচার ও প্রসার লাভ করুক–এটাই ছিল তাঁর কাম্য। তিনি বিদেশী তাহ্‌যীব-তামাদ্দুনের অন্ধ অনুকরণকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তাঁর মতে, সামাজিক জীবন ধর্মীয় জীবন হতে আলাদা নয়। তাঁর ধর্মীয় ভাবধারা ছিল অনেকটা স্যার সৈয়দ, মুফতী মোহাম্মদ আবদুহ্‌ ও রশীদ রিযার চিন্তাধারার মত। এঁদের ন্যায় তিনিও যুক্তিবাদ, মুক্তবুদ্ধি ও ইজতিহাদের অনুসারী ছিলেন। এ জন্যেই কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যায় তিনি কিছুটা মুজতাহিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবধারার দিক হতে আকরম খাঁকে বাংলার স্যার সৈয়দ বলেও কেউ কেউ মত ব্যক্ত করেন।[১৩]

মাওলানা আকরম খাঁ ঐতিহ্য সচেতন ছিলেন এবং ইতিহাস চেতনা তাঁর মধ্যে সক্রিয় ছিল। মুসলিম জাতির গৌরবময় অতীত তাঁকে সবসময় আচ্ছন্ন করে রাখতো। তিনি সবসময় তা ভাবতেন। তাঁর এতদ্‌সংক্রান্ত অনুভূতিকে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ব্যক্ত করেছেন এভাবে:

> "জাতীয় প্রাচীন ইতিহাস যেরূপ লোকদিগকে উদ্বুদ্ধ করে, যেরূপ তাহাদের মনে আত্মসম্মান জাগাইয়া দেয়, ...এরূপ আর কোন সাহিত্য দ্বারা হইতে পারে না। ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস প্রায়শঃ মুসলমানের বিকৃত চরিত্রের চিত্র মাত্র। আমাদের সন্তানগণকে ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য উপযোগী করিতে হইলে এখন হইতে আমাদিগকে জাতীয় ইতিহাসের আলোচনা করিতে হইবে। এবং এজন্য উপযুক্ত পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতে হইবে। ... 'রাজসিংহের' চন্দ্র শেখরের লেখককে

---

[১২] আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌, বাংগালী মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা আকরম খাঁর অবদান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পি.এইচ-ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), ১৯৯৭, পৃ ঃ ৪১৯।

[১৩] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪২০।

Dhaka University Institutional Repository

খালি গালি দিলে চলিবেনা। ঐতিহাসিক 'Search Light' দ্বারা তাহার অসত্যতা বা অর্দ্ধসত্যতা জগতের সামনে প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে। বাঙ্গালী মুসলমান তাহা করিয়াছে কি? ...বাঙালী মুসলমান ...তুমি কি এত অক্ষম? আমাদিগকে বাংলার মুসলমানের জাতীয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।"[১৪]

বাংলার মুসলিম সমাজ যে তাদের সব কিছু হারিয়ে ঐতিহ্যহীন হয়ে পড়েছিল, তা-ই মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন। এ গ্রন্থে তাঁর সমাজপ্রীতি ও সমাজের অবনতির জন্য বেদনার কথা স্পষ্টত:ই বোঝা যায়। মুসলিম বাংলার পতনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, মুসলিম বাংলার পতন যুগের ইতিহাস পাঠ করলে কালা ও গঙ্গার স্তোত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক গীত রচনা করেছেন, এরূপ বহু সৈয়দ, মীর্জা ও পাঠান কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। বাদশাহ্ আকবর কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারত হতে স্থানান্তরিত একদল ধর্মদ্রোহী পীর ও ফকিরের আগমনের ফলে এ সময় অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠে। মুসলিম জনসাধারণ কিরূপ সরাসরিভাবে হিন্দুদের দেব-দেবীদেরকে গ্রহণ করেছিল, তা উপলব্ধির জন্য ড: দীনেশ চন্দ্র সেন উল্লেখ করেছেন, 'গাজী ও দক্ষিণারায়নের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ বিষয়ে রচিত 'গাজী কালু ও চম্পাবতী' নামক পুঁথি এবং অনুরূপ অন্যান্য পুঁথি-কাজে ব্যাঘ্র সম্পর্কিত গীতি কবিতা বা বাঘের পাঁচালীতে পরিলক্ষিত হয় যে, হিন্দু দেবী গঙ্গাকে গাজীর মাসীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। জেবুলমুলক শামারুখ কাব্যে দেখা যায় যে, মুসলিম কবি হিন্দু দেব-দেবীগণকে মুসলিমদের পীররূপে অংকিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।[১৫]

মুসলিমদের মধ্যে কীভাবে কুসংস্কার এবং ইসলাম বিরোধী ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, মাওলানা আকরম খাঁ এ গ্রন্থে তার অনেকগুলো কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, বাংলার মুসলিম সমাজে ইসলাম বিরোধী ভাবধারা প্রবেশ করেছে প্রধানত: ফার্সী সাহিত্যের মাধ্যমে। দীর্ঘকাল পরে তা উর্দু সাহিত্যে

[১৪] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা, আল্ এস্‌লাম, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৯২৩।

[১৫] মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ ৪ ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

বিপুল পরিমাণে প্রবেশ করেছে এবং তার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে এ জাতীয় ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, বিশেষ করে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকদের সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এ সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেও নিজেদের যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতিকে সাথে করে নিয়ে আসে, যার কারণে বিভিন্ন ধর্মের রীতি-নীতি মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ ঘটে।[১৬]

মাওলানা আকরম খাঁ এভাবে ইসলাম বিরোধী সাহিত্য-সংস্কৃতি, ভাবধারা ও রীতি-নীতি মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশের সূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন এবং কুসংস্কারকে প্রতিহত করার জন্য যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (রঃ) নাম উল্লেখ করে তাঁকে মুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক বলে আখ্যায়িত করেছেন। সাথে সাথে তিনি শায়খ আহমদ সেরহিন্দী মুজাদ্দিদ-ই আল্‌ফ-ই-সানী (রঃ), শাহ্‌ ওয়ালী উল্লাহ্‌ (রঃ) এবং সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রঃ)-এর সংস্কারমূলক কার্যাবলীরও ভূয়সী প্রশংসা করেন।[১৭]

উপরোল্লিখিত সাহিত্য ও ইতিহাস কর্মে মাওলানা আকরম খাঁ যে সমস্ত আলোচনা করেছেন, তা মূলতঃ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারমূলক হওয়ায় প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে এগুলোর যোগাযোগ সামান্যই। তবে এগুলো বাংলার মুসলিমদের মধ্যে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলতে সক্ষম হয়, যার ফলে সুদীর্ঘ দিনের কূপমন্ডুকতা, কুসংস্কার ও হীনমন্যতা দূর করে তারা নিজেদের জাগ্রত ও অধিকার সচেতন করে অচিরেই অধিকার আদায়ের রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

মুসলিমদের রাজনৈতিক সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে তিনি অনেক রাজনৈতিক সাহিত্যও রচনা করেন। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বার্ষিক মোহাম্মদী পত্রিকার 'আবদুর রসুল' নামক এক রাজনৈতিক নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন যে, আত্ম-সম্মান জ্ঞানই মানুষের মুক্তির লিপ্সার জনক। যার মনে সত্যিকার আত্ম-সম্মান

[১৬] ঐ, পৃঃ ১২৯।
[১৭] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১৪৬-৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

অধীনে ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপনা পরিষদের নির্বাচন ঘোষিত হলে এ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রে মুসলিমদের প্রতি পূর্বেকার শাসনতন্ত্রের তুলনায় যতটুকু সুবিচার করা হয়েছে তার সুযোগ কাজে লাগিয়ে তারা যেন বাংলার রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে, সে লক্ষ্যে তিনি 'মোছলেম বঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখেন । এ প্রবন্ধে নির্বাচন পূর্ববর্তী বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তিনি সকল মুসলিমদের মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন ।[২০] তাঁর এ ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের পূর্বে বাংলার মুসলিমের নিকট মুসলিম লীগের অনুবর্তী হতে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । নির্বাচনের পরও ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগের শক্তি বৃদ্ধি, মুসলিম সংহতি এবং বাংলার মুসলিমদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে তিনি অনেক রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা করেন । এগুলোর মধ্যে 'হক ছাহেব কোন্ পথে?', 'মুক্তি অভিযান', 'সিরাজগঞ্জ সম্মেলন সম্বন্ধে' প্রভৃতি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য । বাংলার মুসলিম রাজনীতির বিভিন্ন সংকট সন্ধিক্ষণে লিখিত মাওলানা আকরম খাঁর এ প্রবন্ধগুলো এতদঞ্চলের মুসলিমদের সমকালীন রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম হয় । কাজেই এগুলোর রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, ঐতিহ্যিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম ।

'মুছলমানের জাতিত্ব ও সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে মাওলানা আকরম খাঁ মুসলিম জাতি ও মুসলিম সংস্কৃতির এক সুস্পষ্ট ধারণা উপস্থাপন করেছেন । মুসলিম জাতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, মুসলিম একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং সে জাতীয়তা ভৌগোলিক সীমারেখায় সীমাবদ্ধ নয়, কোন racial consideration বা বর্ণ ও বংশগত সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিও তার বিশালতাকে সংকীর্ণ করে দিতে সমর্থ নয় । মুসলিমদের জাতীয়তা প্রাদেশিকতা ও বর্ণ-বৈষম্যের বহু উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত একটা ব্যাপক বিশ্বজনীন ব্যাপার । মুসলিমদের ভাব ও বিশ্বাস বিকৃত বা বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে যেসব উপাদান-উপকরণের সংশ্রবে বা আক্রমণে, মুসলিমদের জাতীয়

---

[২০] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'মোছলেম বঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি', দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ৫ ও ১২ই পৌষ, ১৩৪৩ । সহ দ্রষ্টব্যঃ মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৪৩, পৃ ঃ ৮০১-৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের পক্ষে তাই হচ্ছে মারাত্মক হলাহল। মুসলিমদের জাতীয় জীবনের বিনাশকারী বৈরীর দল এই মারাত্মক হলাহলের প্রয়োগ করে তাদের সর্বনাশ সাধনের প্রচেষ্টা চিরকালই অব্যাহত রাখবে এবং সে সর্বনাশী প্রচেষ্টার আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করতে না পারলে জাতি হিসেবে মুসলিমদের মরণ অনিবার্য্য হয়ে পড়বে, এ সতর্কবাণীও কোরআনে পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হয়েছে।[২১]

'কালচার' বা সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, পাশ্চাত্য মনীষীরা Civilization ও Culture প্রভৃতির সংজ্ঞা ও তাৎপর্য সম্বন্ধে যেসব মতামত ব্যক্ত করেছেন, তা বুঝতে ও বুঝাতে গেলে ডার্উইনের অভিব্যক্তিবাদ হতে আরম্ভ করে এমন অনেক জটিল সমস্যার বিচার-আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হয়, যা আমাদের আয়ত্ত্বাধীন নয়, আবশ্যকও নয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ইসলাম ধর্মের ও মুসলিম জাতীয়তার ধাতু-প্রকৃতি ও অবয়ব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এদিক দিয়ে অন্য কারো সাথে তার কোন সামঞ্জস্য নেই। ইউরোপ আজ জাতীয়তার কাঠামো নির্মাণ করে চলছে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী উপকরণের মাধ্যমে। ইংল্যান্ডের স্বজাতিকতা দেশগত বা ভৌগোলিক, জার্মানের ন্যাশনালিজম সম্পূর্ণ racial বা বংশ ও গোত্রগত। অথচ এর প্রত্যেকটি ইসলামের আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই দেশগত গোত্রগত জাতীয়তার সংকীর্ণ সীমারেখাগুলোকে মানুষের স্মৃতিপট হতে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলাই ইসলামের মূল সাধনা ও সিদ্ধি। এক একটা জাতির এক একটা স্বতন্ত্র 'কালচার' বা সংস্কৃতি আছে। ভাব ও বিশ্বাসের যে সমষ্টিকে বিবেচনা করা হয় জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি হিসেবে, আজকালকার পরিভাষায় 'কালচার' বা সংস্কৃতি বলতে মোটামুটিভাবে তাকেই বুঝায়। পাশ্চাত্য মতবাদেও স্বীকৃত যে, সংস্কৃতি হচ্ছে মনোরাজ্যের ব্যাপার। জাতির অন্তরে সঞ্চিত যুগ-যুগান্তরের ভাবপুঞ্জ–সে ভাবপুঞ্জের মূল উৎস যাই হোক

---

[২১] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'মুছলমানের জাতিত্ব ও সংস্কৃতি', মাওলানা আকরম খাঁ, আবু জাফর (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩৭৮-৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

না কোন। এমনকি, জাতির কুসংস্কারগুলোকে পর্যন্ত তার সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত হিসেবে নির্দ্ধারণ করা হয়েছে।[২২]

কোন জাতিকে ধ্বংস করার পূর্বশর্ত হল সে জাতির সংস্কৃতি সমূলে বিনাশ করে দেয়া। সংস্কৃতির বিনাশ সাধন সম্ভব না হলে উক্ত জাতির ধ্বংস সাধন সম্ভব নয়। তাই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই কোন জাতির ধ্বংস সাধনের মূল হাতিয়ার। ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত অজস্র, যা মাওলানা আকরম খাঁর দৃষ্টিও এড়ায়নি। তিনি এ প্রসঙ্গে উক্ত প্রবন্ধে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, দুনিয়ার একজাতি অন্যজাতিকে পরাজিত করার চেষ্টা যেমন আবহমান কাল হতে চলে আসছে,ঠিক তেমনি এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতিকে গ্রাস বা বিধ্বস্ত করার জন্যও চিরকাল সংঘর্ষ চালিয়ে আসছে। কিন্তু সাময়িক জয়-পরাজয়ের এবং সংস্কৃতিগত সংঘাত-সংঘর্ষের পরিনাম ফলের মধ্যে একটা চিরন্তন পার্থক্য এই দেখা যাচ্ছে যে, পরজাতির নিকট সমরক্ষেত্রে পরাজিত হওয়ার পরও অনেক জাতি জাতি হিসেবে বেঁচে থাকে এবং একসময় নিজের নষ্ট স্বাধীনতাকে উদ্ধার করতে সমর্থও হয়। কিন্তু অন্য সংস্কৃতি কর্তৃক গ্রাসিত বা বিধ্বস্ত হওয়ার পর দুনিয়ার কোন নষ্ট সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার আর কখনও সম্ভব হয়নি এবং যেহেতু সংস্কৃতি বিলোপই জাতীয় জীবনের চরম বিলোপ ও বিনাশের প্রধানতম কারণ, সেজন্য সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতির অস্তিত্বেরও চির অবসান ঘটে। এই মন্তব্যের প্রমাণ অনুসন্ধানের জন্য শাস্ত্র বা ইতিহাস-পুস্তকের পৃষ্ঠা উদ্‌ঘাটন করার কোন প্রয়োজনই তিনি মনে করেন না। কারণ ভারতবর্ষই এর স্পষ্ট নিদর্শন। ভারতবর্ষে আর্য্য জাতির আবির্ভাব ও অভ্যুত্থানের পূর্বে এখানে যে সব জাতি বাস করত, তাদের একটা বিশিষ্ট ও উন্নত ধরনের সভ্যতা ছিল। আর্য্যরা ক্ষাত্রশক্তি বলে তাদের পরাজিত করে। পক্ষান্তরে এই আর্য্য জাতি আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরজাতি কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং গত এক হাজার বছর হতে পরজাতির অধীনতাপাশে আবদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু এই দুই জাতির বর্তমান অবস্থার মধ্যে আজ আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখা যাচ্ছে। ভারতের সেই সুসভ্য ও উন্নত আদিম জাতি দীর্ঘকাল হল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আর দীর্ঘকালের পরাধীনতা সত্ত্বেও

[২২] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩৮০-৮১।

Dhaka University Institutional Repository

এখানকার আর্য্য জাতি আজও জাতি হিসেবে টিকে আছে এবং পুনরায় জয়যাত্রার আয়োজন করছে। এই প্রভেদ-পার্থক্যের একমাত্র কারণ এই যে, আর্য্য জাতি আদিম অধিবাসীদের দেশ জয় করেই ক্ষান্ত হয়নি, পরাজিতদের সংস্কৃতিকেও সেই সঙ্গে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করে ফেলেছে। নিজেদের সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলার এবং যুগপৎভাবে পরজাতীয় সংস্কৃতির দাসত্বে আত্মসমর্পণ করার ফল আজ এই দাঁড়িয়েছে যে, বর্তমান ঘৃণিত জীবনের জঘন্যতার অনুভূতি হতেও আজ তারা বঞ্চিত হয়ে পড়ছে। এ তারতম্যের কারণ এই যে, পরাজিত জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিধ্বস্ত করে দেয়া এবং নিজেদের সংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পন করতে তাদেরকে বাধ্য করাই ছিল তখনকার সেই আর্য্য বিজেতাদের নিষ্ঠুর শাসনের একমাত্র উদ্দেশ্য।[২৩]

অতঃপর মাওলানা আকরম খাঁ সে যুগে হিন্দু সংস্কৃতি কর্তৃক মুসলিম সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে বিপুল ও ব্যাপক আগ্রাসন পরিচালিত হচ্ছিল, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে বলেন যে, মুসলিম সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে বিপুল ও ব্যাপক অভিযান গত অর্দ্ধ শতাব্দী হতে বিশেষভাবে আরম্ভ হয়েছে স্কুল-পাঠশালার জন্য নির্ধারিত বই-পুস্তকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় এবং সাহিত্যে সাধারণভাবে তার অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে, এ সর্বনাশী অভিযানের অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ করার জন্য দূরদর্শী মুসলিমগণ অনেকদিন হতে চেষ্টা করে আসছেন। এ অভিযান সম্বন্ধে সমাজকে সচেতন করার লক্ষ্যে তিনিও যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি। ইউনিভার্সিটি সংখ্যা 'মাসিক মোহাম্মদী'-র ভূমিকার শেষভাগে তিনি বলেছেন যে, 'মুছলমান এ সমস্ত অভিযোগের বিচার ও প্রতিকার চায়'। কিন্তু মুসলিমগণ আজ নিঃসন্দেহে জানতে পেরেছে যে, বিচার এ ক্ষেত্রে অসম্ভব। কারণ এ অভিযান ও আক্রমণ আরম্ভ করা হয়েছে ইচ্ছাকৃত একটা স্থায়ী ও ব্যাপক সংকল্প অনুসারে। হিন্দু সংস্কৃতির আঘাতে আঘাতে মুসলিম সংস্কৃতিকে বিধ্বস্ত করে ফেলা এবং তার স্থলে হিন্দু সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়াই এ সংকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।

---

[২৩] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩৮১-৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

এক কথায় ভারতের আদিম অধিবাসীদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে তাদেরকে চির পদানত দাস সমাজে পরিণত করা আর্য্য-সংস্কৃতির পক্ষে পূর্বে যেরূপ সম্ভব হয়েছিল, তারা মুসলিম সম্বন্ধেও আজ আবার তাকে বাস্তবে পরিণত করতে চাচ্ছে। মোটের উপর এটা হচ্ছে পূর্ব পরিকল্পিত দূরভিসন্ধি প্রসূত অভিযান। সুতরাং বিচারের স্থান এখানে নেই। মুসলিমদের ভাব, চিন্তা ও সংস্কারকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জাতীয় অস্তিত্বের প্রাণ-বস্তুটিকে সমূলে বিধ্বস্ত করে ফেলাই যে এই বিপুল-ব্যাপক ষড়যন্ত্রের প্রধানতম লক্ষ্য, মন্ত্রগুপ্তির শত চেষ্টা সত্ত্বেও আজ নানাসূত্রে ও বিভিন্ন উপলক্ষে তা প্রকাশ হয়ে পড়ছে।[২৪] তাঁর এ বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম সমাজকে ঐতিহ্য সচেতন করার মাধ্যমে তিনি একজন সচেতন ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

---

২৪ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩৮৫-৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

খ) মাওলানা আকরম খাঁর ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনা :

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছিলেন একজন অসাধারণ কীর্তিমান পুরুষ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ পন্ডিত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন বাংলায় মুসলিম জাগরণের অন্যতম দিশারী। তিনি শুধুমাত্র মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার 'পথিকৃৎ' এবং প্রথিতযশা রাজনীতিবিদই ছিলেন না; বরং তিনি একজন সমাজ সংস্কারক এবং আযাদী আন্দোলনের নকীব হিসেবেও ব্যাপক সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন উচুঁমানের ইতিহাসবিদ্ ও সাহিত্যিক। অন্যকথায় তিনি নিজেই ছিলেন একটি শতাব্দীর ইতিহাস। ইসলামী ইতিহাস ও সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট পান্ডিত্য ছিল। তিনি আজ থেকে প্রায় তিনযুগ পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু অদ্যাবধি তাঁর ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চা ও সাধনা বিষয়ক তেমন কোন মৌলিক গবেষণা হয়নি। অথচ বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর গুরুত্ব অবশ্যই অনস্বীকার্য। তাই এতদ্‌বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

মাওলানা আকরম খাঁ স্বীয় প্রতিভা ও অক্লান্ত সাধনার মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং ইসলামের ইতিহাসের উন্নতি ও অগ্রগতিতে যে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। তাঁর লেখা ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও প্রাঞ্জল। গ্রন্থ ও কলমই ছিল তাঁর নিত্য সহচর। তিনি একাধারে প্রায় ষাট বছর লেখনী পরিচালনা করেন, যেগুলোতে সাহিত্যের পাশপাশি ইতিহাসের মাল-মসলা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাঁর ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চার মূল কারণ বা উদ্দেশ্য ছিল পশ্চাদপদ মুসলিম জাতির মধ্যে চৈতন্যোদয় ঘটানো এবং তাদেরকে স্বীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। এক কথায় উপমহাদেশের উদাসীন মুসলিমদের জাগ্রত করাই ছিল তাঁর ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনার অন্যতম ব্রত। এর মূল লক্ষ্য ছিল মুসলিম সমাজের উন্নতি-অগ্রগতি ও সমাজ-সংস্কার। সমাজে যেসব বিজাতীয় অপসংস্কৃতি জমাট বেঁধেছিল, তিনি সেগুলোর বিরুদ্ধেও অবিরাম মসি পরিচালনা করেছেন। বিশেষ করে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তিকে এ দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য তাঁর তেজোদ্দীপ্ত লেখনী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আকরম খাঁর উল্লেখযোগ্য ইতিহাস ও সাহিত্যকর্ম :

ক) গ্রন্থাবলী

১. কোরআন শরীফ-বঙ্গানুবাদ (কলকাতা, ১৯০৫), প্রকাশকঃ মৌলভী আব্বাস আলী, ৩ হুক লেন, কলকাতা। (পরবর্তীতে বাংলা উচ্চারণসহ দুই খণ্ডে প্রকাশিত, ঝিনুক পুস্তিকা, ঢাকা)।

২. যীশু কি নিস্পাপ (কলকাতা, ১৯১৫), প্রকাশকঃ মুজাফফর আহমদ, ৩৩ ফুলবাগান রোড, কলকাতা।

৩. এসলাম মিশন (কলকাতা, ১৯১৭), প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা।

৪. কোরআন শরীফ-আমপারার বঙ্গানুবাদ ও টীকা (কলকাতা, ১৯২৪), প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা।

৫. মোস্তফা চরিত: উপক্রমনিকা ও ইতিহাস ভাগ (কলকাতা, ১৯২৫), প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা। (পরবর্তীতে কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা হতে প্রকাশিত, জুন ২০০০)।

৬. উম্মুল কেতাব-সূরা ফাতেহার বঙ্গানুবাদ ও টীকা (কলকাতা, ১৯২৯), প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা।

৭. কোরআন শরীফ-১ম খণ্ড ঃ সূরা ফাতেহা ও সূরা বাকারার তফসীর (কলকাতা, ১৯৩০), প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা।

৮. সমস্যা ও সমাধান (কলকাতা, ১৯৩১), প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা।

৯. মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য (কলকাতা, ১৯৩১), প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা।

১০. কোরআন শরীফ-২য় খণ্ড, সূরা আলে-ইমরানের বঙ্গানুবাদ ও টীকা (কলকাতা, ১৯৩৮), প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

১১. পাকিস্তান নামা (কলকাতা, ১৯৪৩), প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা ।

১২. তাফছীরুল কোরআন- প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খন্ড, (ঢাকা, ১৯৫৯-৬০), প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ বদরুল আনাম খাঁ ও মোহাম্মদ কামরুল আনাম খাঁ, ২৭-বি ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা ।

১৩. বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খৃস্টান ধর্ম (ঢাকা, ১৯৬২), প্রকাশকঃ মোহাম্মদ বদরুল আনাম খাঁ, ২৭-বি ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা ।

১৪. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস (ঢাকা, ১৯৬৫), প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ আকরম খাঁ, আজাদ অফিস, ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা ।

১৫. ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য; মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ঢাকা । প্রকাশকের নাম ও প্রকাশ কাল অনুপস্থিত ।

১৬. বারোয়ারী (উপন্যাস) (কলকাতা, ১৯৩৩), প্রকাশক: মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা ।

খ) প্রবন্ধাবলী ও কবিতা

১. এছলামের আদর্শ, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, কার্তিক, ১৩৩৪ ।

২. অভিব্যক্তিবাদ ও মুছলমান, বার্ষিক মোহাম্মদী, কলকাতা, ১৩৩৫ ।

৩. আবদুর রসুল, বার্ষিক মোহাম্মদী, কলকাতা, ১৩৩৫ ।

৪. জাতীয় পোষাক, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, ফাল্গুন, ১৩৩৫ ।

৫. ব্যাক টু দি কোরআন, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, আষাঢ়, ১৩৩৬ ।

৬. মওলানা ওবায়দুল্লাহ, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৩৩৬ ।

৭. মোহাম্মদ আলী, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, মাঘ, ১৩৩৭ ।

৮. গণিত ও গণতন্ত্র, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, ফাল্গুন, ১৩৩৭ ।

৯. মিশ্র ও স্বতন্ত্র নির্বাচন, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৩৩৮ ।

১০. মকতব-মাদ্রাছার পাঠ্য, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯ ।

১১. লেথিয়ান কমিটির রিপোর্ট, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, আষাঢ়, ১৩৩৯ ।

১২. প্রস্তাবিত ওয়াক্ফ আইন, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, ভাদ্র,১৩৩৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির বে-সরকারীকরণ, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০।

১৪. অনাচার ও তাহার প্রতিকার, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, ভাদ্র, ১৩৪০।

১৫. পতন যুগের ইতিহাস, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, অগ্রহায়ন, ১৩৪০।

১৬. সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও মুছলমানের অপরাধ, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, কার্তিক, ১৩৪১।

১৭. এসলাম ও মোহামেডান 'ল', মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৪২।

১৮. শিক্ষামন্ত্রীর পরিকল্পনা, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৩৪২।

১৯. শিক্ষার নব-পর্য্যায়', মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৪২।

২০. সাংবাদিকতায় বাঙ্গালী মুছলমান, ঈদ সংখ্যা, মোহাম্মদী, কলকাতা, পৌষ, ১৩৪২।

২১. বাংলা সাহিত্য ও মুছলমান, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, ফাল্গুন, ১৩৪২।

২২. বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইলেমা, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩।

২৩. হিন্দু মেমোরিয়েল, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, শ্রাবন, ১৩৪৩।

২৪. মোছলেম বঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৪৩।

২৫. আমার শওকত ভাইয়া, মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, পৌষ, ১৩৪৫।

২৬. য়্যা মোহাম্মদ আন্তা রাছুলুল্লাহ (কবিতা), দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ২০ শে মে, ১৯৩৮।

২৭. মুছলমানের জাতিত্ব ও সংস্কৃতি, দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯।

২৮. হক ছাহেব কোন পথে, দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ৬-৮ই নভেম্বর, ১৯৪১।

২৯. সিরাজগঞ্জ সম্মেলন সম্বন্ধে, দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২।

৩০. ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র, দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ৬ই আগষ্ট, ১৯৪৪।

৩১. মুক্তি অভিযান, দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ১৮-২০শে অক্টোবর, ১৯৪৬।

৩২. বায়তুলমাল তহবিল, মাসিক মোহাম্মদী, ঢাকা, আশ্বিন, ১৩৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. এছলামের রাজ্য শাসন বিধান (কতিপয় প্রবন্ধ), মাসিক মোহাম্মদীর বিভিন্ন সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৫৭-৫৮। [পরবর্তীতে প্রবন্ধগুলো আবু জাফর সংকলিত ও সম্পাদিত এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা কর্তৃক ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত 'মাওলানা আকরম খাঁ' শীর্ষক গ্রন্থে 'এছলামের রাজ্য শাসন বিধান' শিরোনামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থখানা A. Chakraborty M.A. কর্তৃক "Basic Principles of Islamic Constitution' শিরোনামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে]।[১]

মাওলানা আকরম খাঁ বিরচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে মোস্তফা-চরিত, মোস্তফা-চরিতের বৈশিষ্ট্য এবং মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস-এ তিনটি গ্রন্থ মূলত: ইতিহাস বিষয়ক। তাছাড়া সমস্যা ও সমাধান, পাকিস্তান নামা, বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম এবং এছলামের রাজ্য শাসন বিধান এ চারটি গ্রন্থে ইতিহাসের বিভিন্ন মাল-মসলা পুঞ্জীভূত রয়েছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থসমূহ ধর্ম ও সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত, যা মুসলিমদের ঐতিহ্য সচেতন হতে সহযোগিতা করে। অন্যদিকে তাঁর রচিত প্রবন্ধসমূহের মধ্যে পতন যুগের ইতিহাস, আবদুর রসুল, বাংলা সাহিত্য ও মুছলমান, মোছলেম বঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মুছলমানের জাতিত্ব ও সংস্কৃতি, এছলামের আদর্শ, হজরতের প্রাকনবুয়ত সমাজসেবা, আমাদের ইতিহাস ইত্যাদি প্রবন্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক। অন্যান্য প্রবন্ধগুলোতেও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক বিভিন্ন উপাদান কমবেশী পরিলক্ষিত হয়।

১. মোস্তফা-চরিতঃ এ বিশাল গ্রন্থখানা মূলত: একটি মৌলিক সীরাত গ্রন্থ। এটি বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম যুক্তিভিত্তিক ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রচিত মহানবী (সাঃ)-এর জীবন চরিত। মাওলানা আকরম খাঁ গ্রন্থটির আগা-গোড়া ভাষার আভিজাত্য রক্ষা করে চলেছেন। গুরুগম্ভীর এবং সংস্কৃতবহুল শব্দের প্রতি তাঁর যে একটি বিশেষ প্রবণতা আছে, এ গ্রন্থে এর পুরোপুরি নিদর্শন রয়েছে।[২]

---

১ এ টি এম আতিকুর রহমান, বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৫, পৃঃ ১৪৬-১৪৮; আ.কা.মু. আবদুল্লাহ্ , প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫১; মোঃ আবদুর রাজ্জাক, বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জী, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ১১, আবু জাফর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৭।

২ মুজীবুর রহমান খাঁ, 'এক অন্যান্য সাধারণ প্রতিভা', মাওলানা আকরম খাঁ (আবু জাফর সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রাচুর্যের দিক থেকেও এটি অনেক সমৃদ্ধ। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের বর্ণনা মতে, একজন নবী-রসূলের জীবনীকে এমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লেখার চেষ্টা বিশ্ব সাহিত্যে এটিই বোধ হয় সর্ব প্রথম।[৩] Abu Jafar এর ভাষায়–

> " ... Probably there is no other book on the life of Muhammad (sm) in Bengali that can be compared with 'Mustafa Charit'. In the book the Maulana Presented his arguments very clearly and logically based on correct traditions. Maulana's 'Mustafa Charit' has made him immortal".[৪]

মোস্তফা-চরিত গ্রন্থে কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যায় তিনি যে মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তি-বিচারের পরিচয় দিয়েছেন, তা দুর্লভ। ইজতিহাদের অনুশীলন দ্বারা বাঙ্গালী-মুসলিম মনীষার ইতিহাসে তিনি এক মহামূল্য ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন। মাওলানা আকরম খাঁ যখন জ্ঞান ও যুক্তির সাহায্যে মুসলিম সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে শুরু করেন, তখন মুসলিম সমাজে যুক্তির কদর ছিলনা। বরং যুক্তিকে অবজ্ঞা ও সন্দেহের চোখে দেখা হতো। ফলে কোন কোন মুসলিম পন্ডিত তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন।[৫] কিন্তু এতে তিনি পিছপা হননি। উল্লেখ্য যে, বাঙ্গালী মুসলিমের লেখা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনীগ্রন্থ শেখ আবদুর রহীমের 'হজরত মোহাম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি' (১৮৮৭)-তে যুক্তিবাদের সূচনা দেখা দিয়েছিল। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে এর প্রবল প্রতিষ্ঠা ঘটে 'মোস্তফা চরিতে'।[৬]

উর্দু ভাষায় মহানবী (সাঃ)-এর সীরাতের প্রথম সূত্রপাত করেছেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান। দার্শনিক যুক্তি-প্রমাণসহ স্যার সৈয়দ রচিত সীরাতগ্রন্থ 'খুতবাতে আহমদিয়া' ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয়। একই বছর এর ইংরেজী

---

৩ দেখুন, আবু জাফর (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩।

৪ Abu Jafar, Maulana Akram Khan: A Versatile Genius, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1984, PP. 43-44.

৫ আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃঃ ৩২৬।

৬ ড. আনিসুজ্জামান, 'সাহিত্যিক ও সাংবাদিক', মাওলানা আকরম খাঁ, আবু জাফর (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৫-৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্করণ 'Essays on the Life of Mohammad (sm)' নামে ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয়। 'খুতবাতে আহমদিয়া'র অনুকরণে এবং এর চেয়ে অনেকটা উন্নত আকারে ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয় সৈয়দ আমীর আলী রচিত 'The Spirit of Islam'. মাওলানা আকরম খাঁ কাজী মুহাম্মদ সুলায়মান রচিত সীরাত গ্রন্থ 'রহমাতুল্লিল আলামীন'-সহ উপরোল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের প্রশংসা করেছেন। কোন কোন বিষয়ে তিনি স্যার সৈয়দের অভিমত সমর্থন না করলেও তাঁর মানসপটে স্যার সৈয়দের চিন্তাধারার যে প্রভূত প্রভাব রয়েছে, তা 'মোস্তফা-চরিত' ও 'খুতবাতে আহমদিয়া'কে পাশাপাশি রেখে পাঠ করলে খুব সহজেই অনুমিত হয়।[৭]

স্যার সৈয়দের 'খুতবাতে আহমদিয়া'র প্রতিবাদ স্বরূপ আল্লামা শিবলী নুমানী 'সীরাতুন্নবী' নামক একটি বৃহৎ সীরাত গ্রন্থ সংকলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি এর দু'খন্ড রচনা সমাপ্ত করে ইন্তেকাল করেন। তাঁর পরিকল্পিত বাকী খন্ডগুলো রচনা করেন তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরী মাওলানা সুলায়মান নদভী। মাওলানা আকরম খাঁ 'মোস্তফা-চরিত'-এর কোন কোন স্থানে শিবলী নুমানীর 'সীরাতুন্নবী'-এর বহু অভিমতের বিরোধিতা করেন। অন্যদিকে ১৯৪২ সালে 'মোস্তফা-চরিত'-এর প্রতিবাদে প্রকাশিত হয় কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী'। মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর 'মোস্তফা-চরিত'-এ যে সকল অলৌকিক ঘটনা অস্বীকার করেছেন, কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর 'বিশ্বনবী'-তে যুক্তির মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যুক্তির সাথে সাথে তাঁর রচনায় কবিসুলভ শিল্পরস এবং চমকপ্রদ রচনাশৈলী রয়েছে। এ জন্য 'বিশ্বনবী' সাধারণ পাঠক মহলে অধিক জনপ্রিয়।[৮]

আমাদের দেশের অধিকাংশ পাঠক এখনও সূক্ষ্ম ও বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী নয় বলেই 'মোস্তফা-চরিত' তার যথোপযুক্ত সমাদর লাভে সক্ষম হয়নি। তবে ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ ও সূক্ষ্ম-বিচারে উত্তীর্ণ এ গ্রন্থখানা আধুনিকতার পরশরসে স্নিগ্ধ হয়ে একদিন সুধী সমাজের নয়নাভিরামে পরিণত হবে এবং

---

৭ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৫।
৮ এ. এইচ. এম. মুজতবা হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

জনসাধারণের কাছেও অধিকতর সমাদৃত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।[৯] 'মোস্তফা-চরিত' রচনায় মাওলানা আকরম খাঁ ঐতিহ্যাসিকদের পরিবেশিত তথ্য সমূহের উপরই কেবল নির্ভর করেননি, বরং কুরআন ও হাদীসের মানদন্ডে এসবের যাচাই-বাছাই করেছেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁর বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

> "হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনী রচনা-ব্যাপারে অন্যান্য লেখকগণ এ যাবৎ সাধারনতঃ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, আমি তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়াছি। ইহাদের অধিকাংশই হযরতের জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে প্রধানতঃ তাবরী, তাবকাত, এবন্-হেশাম ও ওয়াকেদীর উপর নির্ভর করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, কোরআন-হাদীসের মাপ কাঠিতে ঐসব বর্ণনার সত্যাসত্য নির্ধারণের চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সার্বভৌম মানব-ধর্মের যিনি প্রবর্তক, সেই মহাপুরুষের জীবনী আলোচনায় কেবল ইতিহাসকারদের উপর নির্ভর করা আমি নিরাপদ মনে করি নাই। তাঁহাদের প্রত্যেকটি কথাকে আমি কুরআন-হাদীসের তুলাদন্ডে পরিমাপ করিয়াছি। তাঁহাদের প্রত্যেকটি বর্ণনার সত্যাসত্যের জন্য আমি কুরআন-হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।"[১০]

যেসব হাদীস ইমামদের মতে নিখুঁত হিসেবে প্রমাণিত ও পরিগণিত, যুক্তির মাপকাঠিতে তিনি এর সত্যাসত্য নিরূপনেরও প্রয়াস চালান। তাঁর এ বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীকে এক শ্রেণীর আলিম নিন্দা করেছিলেন। হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উথাপন করায় অনেকে তাঁর কঠোর সমালোচনা করেন।[১১] কিন্তু এতে তিনি পিছপা হননি। যুক্তির মাপ কাঠিতে তিনি যে হাদীসসমূহ নিখুঁত হিসেবে নির্বাচিত করেছেন, এর আলোকেই তিনি 'মোস্তফা-চরিত' গ্রন্থখানা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই এ জীবন-চরিতটি অন্যান্য সীরাত গ্রন্থ অপেক্ষা স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এতে বহু নতুন নতুন তত্ত্ব, তথ্য ও সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থখানা দু'ভাগে বিভক্ত–উপক্রমণিকা ও ইতিহাস ভাগ। উপক্রমণিকাতে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও শ্রেণীবিন্যাস

---

৯ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৪১৬।

১০ মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা-চরিত (ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ষষ্ঠ প্রকাশ, জুন ২০০০), পৃঃ নিবেদন অংশ, ১ম পরিচ্ছেদ।

১১ ড. মুহাম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, বাংলা সাহিত্যে রসূল চরিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনাসহ মোট চৌদ্দটি পরিচ্ছেদ রয়েছে এবং ইতিহাস অংশে ইসলাম পূর্বযুগ ও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে ৭৯টি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

উপক্রমণিকাতে রসূল-চরিতের উপাদান ও রচনাপদ্ধতি সম্পর্কে প্রামাণ্য আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ অংশটি তাঁর অসাধারণ গবেষণার ফল। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত প্রধান প্রধান নবী-রসূলদের ধর্ম প্রচার প্রসঙ্গে আলোচনার শুরুতেই তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে বলেন যে, কোন ধর্মের বিশেষত্ব ও সত্যতার সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে হলে সে ধর্মের প্রবর্তক যিনি, সর্বপ্রথম তাঁকে সম্যকরূপে চিনে ও বুঝে নিতে হয়। তাই ইসলামের বিষয় সম্যকরূপে অবগত হতে হলে– ইসলামের সত্যতা ও বিশেষত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে হলে, সর্বপ্রথম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) চরিত্রের মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্যগুলিকেও সম্যকরূপে জ্ঞাত হতে– অন্তত: জ্ঞাত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।[১২]

মাওলানা আকরম খাঁ মনে করেন যে, নিরেট ইতিহাসের দৃষ্টিতে মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে ভক্তের অতিভক্তি এবং কিংবদন্তীর আবর্জনায় জীবনের সঠিক তথ্যসমূহ ঢাকা পড়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব ও যীশু খৃষ্টের ক্ষেত্রে অনেকটা তাই ঘটেছে। তাঁর মতে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ক্ষেত্রেও অবস্থা অনেকটা একইরূপ। তবে পার্থক্য এই যে, অন্যান্য মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী ও চরিত-কাহিনী হতে প্রক্ষিপ্ত ও মিথ্যা বর্ণনাগুলিকে বাছাই করে ফেলার উপায় নেই। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী রচয়িতাগণ চেষ্টা ও সাধনা করলে সত্য ও মিথ্যাকে আলাদা করতে সক্ষম হবেন। কারণ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের প্রধান উপকরণ-উৎস হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন, আল্ হাদীস এবং প্রাচীন আরবীয় ইতিহাস। তিনি মনে করেন যে, এসব উৎস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করতে হলে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।[১৩]

---

[১২] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা-চরিত, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১।
[১৩] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা-চরিত, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ২-৫

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আকরম খাঁর বর্ণনা হতে জানা যায় যে, আল্ হাদীস এবং প্রাচীন আরবীয় ইতিহাসের বিবরণ আল্ কুরআনের বিপরীত হলে তা গ্রহণযোগ্য হবেনা। অপরদিকে আল্ হাদীস সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, হাদীসের পরিভাষা, বিভাগ ও তার নিয়মাবলী সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ না করলে ইসলামের ইতিবৃত্ত বা হযরতের জীবনী যথাযথভাবে আলোচনা করা বা তৎ সংক্রান্ত সূক্ষ্ম আলোচনাগুলি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হবে না।[১৪] অন্যান্য সীরাতকারগণ সীরাত রচনার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত হাদীসকে সূক্ষ্মভাবে যাচাই-বাছাই না করেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মাওলানা আকরম খাঁ হাদীস গ্রহণকালে হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারী, সনদ ও মতন তথা হাদীসের যাবতীয় বিষয়কে যাচাই করার পর তা গ্রহণ করেছেন। তিনি জাল, ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও মওজু হাদীস যাচাই করার জন্য অশেষ অধ্যবসায় ও সাধনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বেশ কয়েকটি জাল হাদীসের উল্লেখ করেছেন।[১৫]

মাওলানা আকরম খাঁ প্রাচীন আরবীয় ইতিহাস ও জীবন-চরিত ব্যাখ্যা করে সেগুলোর সত্যাসত্য যাচাই করেছেন। অতঃপর তিনি ইমাম জুহরী, মূসা-ইব্ন-ওকবা, ইব্ন ইসহাক, আল্-ওয়াকিদী, ইব্ন সাআদ, ইমাম বুখারী, ইব্নুল্ কাইয়েম, ইব্ন জরীর আত্ তাবারী প্রমুখ পন্ডিতের যে মূল্যায়ন করেছেন, তা নতুন আলোর সন্ধান দেবে।[১৬] গ্রন্থের উপক্রমণিকা অংশের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে তিনি কতিপয় সীরাতকারের আরবী-উর্দু-ইংরেজী গ্রন্থের তালিকা প্রদান করেছেন, যেগুলো রসূল-চরিত রচনার ক্ষেত্রে মূল্যবান আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে 'হযরতের জীবনী ও পাশ্চাত্য লেখকগণ' শীর্ষক আলোচনায় তিনি পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান লেখকদের ইসলাম ও রসূল বিদ্বেষ বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের শোচনীয় অজ্ঞতা এবং জঘন্য মিথ্যাচার প্রমাণ করেছেন। প্রসঙ্গত ১৭শ, ১৮শ এবং উনবিংশ শতাব্দীর ১৫ খানা বইকে তিনি বলেছেন 'মিথ্যাবাদের বিশ্বকোষ'। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের কয়েকজন লেখক, যথা-গীবণ, হীগিন্‌স্, কারলাইল ও ডেভেনপোর্টকে তিনি রসূল-চরিত্রের গৌরব কীর্তনকারী হিসেবে উল্লেখ

[১৪] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪৬।
[১৫] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩৪-৪৬।
[১৬] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুনঃ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৭৮-৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে আল্ কুরআনকে খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থসমূহ, যেমন-ইঞ্জিল, বেদ, বাইবেল ইত্যাদির সাথে তুলনা করে আল্ কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। সুতরাং সবদিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, এ গ্রন্থের উপক্রমণিকা অংশটির ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

'মোস্তফা-চরিত' গ্রন্থের ইতিহাস ভাগ তথ্য সমৃদ্ধ ও বিশ্লেষণাত্মক, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্নমতেরও অবকাশ আছে। এর প্রথম পরিচ্ছেদে প্রাক ইসলামী আরবের অবস্থা, আরবের অধিবাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব, প্রতিটি আরবগোত্রের স্বতন্ত্র আবাসভূমি, বৈদেশিক প্রভাবহীনতা, কবিত্ব, স্মৃতিশক্তি, স্বাধীনতা, আতিথেয়তা, পরশ্রীকাতরতা, আভিজাত্য ও বংশ মর্যাদা ইত্যাদি প্রসঙ্গে তথ্যপূর্ণ আলোচনা স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি আল্ কুরআনের পরিচয়ের পর তাওরাত তথা বর্তমান বাইবেলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ঐতিহাসিক প্রমাদ, বর্তমানে বাইবেলের পরিণতি, বাইবেলের ঐতিহাসিক মূল্য, বাইবেলে খ্রীষ্টানদের নিজস্ব মতামত সংযোজন এবং ইঞ্জিলের ঐতিহাসিক মূল্য ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন, যা তাঁকে একজন ঐতিহাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

মাওলানা আকরম খাঁর বর্ণনা অনুসারে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের অভিমত হচ্ছে– হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে কুরবানী করার যে সংকল্প করেন, আল্ কুরআনে তার কোন প্রমান নেই। এর জবাবে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন যে, এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্‌র বাণীই যথেষ্ট। তিনি আল্-কুরআনের সূরা সাফ্‌ফাতের ৩য় রুকু হতে উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের ভ্রান্ত মতবাদ খন্ডন করেন।[১৭]

পঞ্চম পরিচ্ছেদে মাওলানা আকরম খাঁ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে তৎকালীন আরবের ভৌগোলিক অবস্থার এবং প্রাচীন জাতিসমূহের সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়েছেন, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে যার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তিনি ইসলাম-পূর্ব যুগে সমসাময়িক বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত

---

[১৭] দেখুন : মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তৎকালীন আরবের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে তিনি যে ধারণা দিয়েছেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন হতে এর তাৎপর্য ব্যাপক। তৎকালীন আরবদের নৈতিক অধঃপতন সম্পর্কে তিনি বলেন:

> 'পুং মৈথুন, নারীর অস্বাভাবিক মৈথুন ও পশু মৈথুন- এ সকল তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ও নির্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত। . . . স্বীয় গর্ভধারিণী জননী ব্যতীত অপর কোনও নারী, এমনকি সহোদরা ভগ্নী ও বিমাতা পর্যন্ত তাহাদের অগম্য ছিলনা'।[১৮]

সাধারণভাবে এমত প্রচলিত আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট মোতাবেক ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার সুব্হে সাদিকের সময় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু মাওলানা আকরম খাঁ যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণ করেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল মোতাবেক ৯ই রবিউল আউয়াল সোমবার সুব্হে সাদিকের অব্যবহিত পর জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্ম তারিখ বিষয়ে তাঁর পুনর্বিবেচনা ও পুনর্মূল্যায়ন সম্পর্কে দ্বিমত থাকলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি তাঁর এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একজন সচেতন ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করেছেন। কবি গোলাম মোস্তফা অবশ্য তাঁর 'বিশ্বনবী'তে মাওলানা আকরম খাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছেন এবং সাধারণভাবে প্রচলিত মতকেই সঠিক প্রতিপন্ন করেছেন।[১৯]

মাওলানা আকরম খাঁ রসূল-চরিত সম্পর্কে সাধারণ্যে প্রচলিত অনেক তথ্যই ভিত্তিহীন প্রমাণ করেছেন। হযরতের জন্মোপলক্ষে সংঘটিত অলৌকিক ঘটনা এদের একটি। একথা সত্য যে, মহানবী (সাঃ)-এর জন্মোপলক্ষে অনেক অলৌকিক উপকথা আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল এবং এখনো আছে। মাওলানা আকরম খাঁ যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে এগুলোর অসারতা প্রমাণ করেছেন। যেমন– সাধারণভাবে লিখিত নবী-জীবনী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, হযরত যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান

---

[১৮] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

করছিলেন, তখন গর্ভধারিণী বিবি আমেনা, তাঁর পিতামহ আবদুল মোত্তালিব ও অন্যান্য স্বজনগণ নানা ধরনের অলৌকিক ঘটনা দর্শন করেছিলেন । হযরতের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সূতিকাগৃহ হতে এক আশ্চর্য জ্যোতি প্রকাশ পেয়েছিল, যার সাহায্যে সিরিয়ার বসরা নগরী পর্যন্ত সকলে দেখতে পেয়েছিল । পারস্যের বাদ্‌শাহ নওশেরওয়ার সৌধচূড়াগুলো ভেঙ্গে পড়েছিল, অগ্নি-পূজকদের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত অগ্নিকুন্ডগুলি ভেঙ্গে অবলীলাক্রমে নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল, জগতের সমস্ত পশু মানুষের মত কথা বলতে সক্ষম হয়েছিল, ক্বাবা শরীফের ভেতর সংরক্ষিত ৩৬০টি মূর্তি এবং পৃথিবীর সকল প্রতিমা অধঃমুখে ভূ-পাতিত হয়ে পড়েছিল, নতুন নতুন গ্রহ-নক্ষত্রের উদয় হয়েছিল ইত্যাদি । মাওলানা আকরম খাঁ এগুলোকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও কল্পিত উপকথা হিসেবে প্রমাণ করেছেন । তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

> "ঐতিহাসিক তুলাদন্ডে সূক্ষ্মরূপে ওজন করিয়া লইবার পূর্বে এই শ্রেণীর কথকগণের প্রদত্ত বিবরণ বিশেষত: অস্বাভাবিক ও আজগুবী কিংবদন্তীগুলিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না । ... ইতিহাসের সহিত যাহার একটুও সম্পর্ক আছে, তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, হযরত ওমরের (রাঃ) খেলাফত যুগে পারস্য বিজয়ের পূর্বে পারস্যের অগ্নিকুন্ডগুলি একদিনের তরেও নির্বাপিত হয় নাই । হযরতের সময় মক্কা বিজয়ের পূর্বে কাবা মছজিদের একটি বোৎও স্থানচ্যুত বা ভূপাতিত হয় নাই । পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ঠাকুর প্রতিমা বা বোৎগুলির এবং সিংহাসনসমূহের ভূপাতিত হওয়ার বা চতুষ্পদ জন্তুদিগের কথা বলার ঘটনা কোন দেশের কোন ইতিহাসে স্থানপ্রাপ্ত হয়নাই ।"[২০]

তিনি যে ইতিহাস সচেতন ছিলেন এবং বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস চর্চার প্রতি তাঁর যে আগ্রহ ছিল, এ বক্তব্য তারই প্রমাণ বহন করে ।

বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে ফেরেশ্‌তাগণ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর বক্ষবিদারণ করেন বলে যে বর্ণনাটি সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে জমহুর আলিমগণ

---

[১৯] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৫১-৫২; কবি গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ ঃ ২৮৩-৮৮ ।

[২০] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৫৭-৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা করেছেন, মাওলানা আকরম খাঁ যুক্তিনির্ভর শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে তা ভিত্তিহীন প্রমাণ করেছেন।[২১] তিনি মূলতঃ বলতে চেয়েছেন যে, হযরতের বক্ষবিদারণের ঘটনাটি মি'রাজ রজনীতে সংঘটিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেনঃ

> "বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে ফেরেশ্তাগণ হযরতের বক্ষবিদারণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগের কথকগণ যে গল্পটি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত সত্যের কোনই সম্বন্ধ নাই। অসতর্ক রাবীদিগের কল্যাণে মে'রাজ সংক্রান্ত হযরতের বর্ণিত স্বপ্নের বিবরণটি নানা অত্যাচারের পর বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র।"[২২]

কিন্তু তাঁর এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বক্ষ-বিদারণ শুধু মি'রাজ রজনীতেই সংঘটিত হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবনে এ বক্ষবিদারণের ঘটনা কয়েকবারই সংঘটিত হয়েছিল। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কর্তৃক তা স্বীকৃত।[২৩]

মাওলানা আকরম খাঁর বর্ণনা হতে জানা যায়, ডাঃ স্পেঙ্গার বলেন যে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বিবি আমেনার কণ্ঠদেশে ও বাহুতে এক খন্ড লৌহ বিলম্বিত ছিল। এর দ্বারা তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, বিবি আমেনা মৃগী বা মূর্ছা বায়ু (Epilepsy, falling disease) পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মহানবী (সাঃ)-এর ওয়াহীর যথার্থতাকে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে ইউরোপীয় লেখকগণ আরও বলেন যে, বিবি আমেনা মৃগী রোগী হওয়ার কারণে তাঁর সন্তান হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)ও শৈশবে মৃগী বা মূর্ছা রোগে পীড়িত ছিলেন। বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে তিনি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতেন এবং এ রোগের বিকারেই মনে করতেন যে, তিনি আল্লাহ্র নিকট হতে ওয়াহী প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। W. Muir-ও হযরতের মৃগী রোগ সম্পর্কে বলেনঃ 'It was probably a fit of

---

২১ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৬৩-৬৮।

২২ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৬৮।

২৩ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রঃ ছুন্নত আল্-জামায়াত, ৭ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১৩৪৬/৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

Epilepsy' মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর 'মোস্তফা-চরিত' গ্রন্থে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এসব বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করেন।[২৪]

মাওলানা আকরম খাঁর বর্ণনা হতে জানা যায় যে, W. Muir-সহ অন্যান্য ইউরোপীয় লেখকগণ মহানবী (সাঃ)-এর খৎনা সম্পর্কে অনেক বাড়াবাড়ি করেছেন। তাঁদের মতে, তিনি 'মাখ্‌তুন' বা 'ত্বক-ছেদকৃত' অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু মাওলানা আকরম খাঁ এ বর্ণনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে বলেন যে, হযরতের জন্মের সপ্তম দিবসে আবদুল মোত্তালিব যে যথানিয়মে তাঁর খৎনা করিয়েছেন, ইতিহাস ও হাদীস গ্রন্থে এর প্রমাণ রয়েছে।[২৫] এতদ্ব্যতীত, পিতৃব্য আবু তালিবের সাথে ব্যবসায় উপলক্ষে সিরিয়া গমন ও পথিমধ্যে বাহিরা রাহেব নামক একজন ধর্ম যাজকের মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত হাদীসের বর্ণনাকে তিনি যুক্তির মাধ্যমে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রমাণ করেছেন। বিশেষ করে নানা প্রকার অলৌকিক ব্যাপার, যেমন– হযরতকে বৃক্ষ-প্রস্তরাদির সিজদা করা, তাঁর উপর মেঘের ছায়া করা, হযরতের দিকে বৃক্ষ-ছায়ার সরে আসা ইত্যাদিকে তিনি অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করেন। কারণ তাঁর মতে এগুলো ইসলামের মূল শিক্ষা ও প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কথা।[২৬]

প্রায় সকল ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থে সংক্ষেপে বা বিস্তৃতভাবে বিবি খাদিজার সাথে হযরতের বিবাহের কথা উল্লেখ আছে। মাওলানা আকরম খাঁ-ও এ বিষয়ে বিশদ ও নির্ভরযোগ্য আলোচনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা হতে জানা যায় যে, উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজণদের উপস্থিতিতে যথানিয়মে এ বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু বিবি খাদিজার বিবাহের প্রস্তাব সম্পর্কে এক শ্রেণীর কথক অতি ঘৃণিত বিবরণ প্রদান করেছেন এবং আমাদেরকে ভ্রান্তিতে ফেলার হীন মানসে কতগুলো

---

[২৪] মাওলানা আকরম খাঁ, মোস্তফা-চরিত, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৬৯-৭২।
[২৫] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৭৬।
[২৬] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৭৯-৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

অসত্য কথাকে ইতিহাসে স্থান দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য হতে জানা যায় যে, বিবি খাদিজার পিতা খোওয়ালেদ এ বিবাহে আদৌ সম্মত ছিলেন না। তাই খাদিজা তাঁকে বেদম মদ পান করিয়ে মাতাল করে ফেলেন এবং অজ্ঞান অবস্থায় তিনি বিবাহ কার্য সম্পাদন করেন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং এক পর্যায়ে বর ও কণের বংশের মধ্যে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়। আকরম খাঁর মতে এ বক্তব্য একেবারেই মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। কারণ বিবি খাদিজার পিতা খোওয়ালেদ তাঁর বিবাহের পূর্বে, এমনকি ফেজার যুদ্ধের পূর্বেই পরলোকগমন করেন এবং তাঁর পিতৃব্য ওমর বিন্ আসাদ তাঁকে হযরতের সাথে বিবাহ দেন। উক্তসব কথকের বক্তব্য হতে আরও জানা যায় যে, বিবাহের পূর্বে বিবি খাদিজা একদিন হযরতের হাত ধরে তাঁকে নিজের বুকের ও মুখের উপর টেনে এনে আলিঙ্গন করেন এবং বিবাহের জন্য তাঁকে নানা ধরণের মিনতি জানান। তাদের এ বক্তব্যও একেবারেই মিথ্যা, অবিশ্বস্ত ও কাল্পনিক। মূলতঃ রসূল-চরিত্রে কলংক লেপনের উদ্দেশ্যেই তাদের এ জঘন্য অপপ্রয়াস। মাওলানা আকরম খাঁ এসমস্ত বক্তব্যের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আমরা তাঁর ঐতিহাসিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাই।[২৭]

মার্গোলিয়থ মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে যে সব অসার মন্তব্য করেছেন, মাওলানা আকরম খাঁ তারও প্রতিবাদ করেছেন এবং যুক্তি দিয়ে তা খন্ডন করেছেন। মার্গোলিয়থ তৎপ্রণীত গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে বলেনঃ 'He with Khadijah performed some domestic rite in honour of one of the goddesses each night before retiring'. অর্থাৎ 'তিনি (হযরত) ও খাদিজা উভয়েই নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে পারিবারিক প্রথানুসারে প্রতিরাতে এক দেবীর পূজা করতেন'। এ ঘৃণ্য বক্তব্য এতকাল বিনা প্রতিবাদেই চলে আসছিল। মাওলানা আকরম খাঁ এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।[২৮]

---

[২৭] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৯০-৯৭।

[২৮] দেখুন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৫; ড. মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

অনেকে অভিযোগ করেছেন যে, মাওলানা আকরম খাঁ মহানবী (সাঃ)-এর মোজেজা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটি তা নয়। বরং তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে কোন্‌টা মোজেজা আর কোন্‌টা মোজেজা নয়,তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেন।[২৯] এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেনঃ

> "মোজেজা নিশ্চয়ই সত্য এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করাও নিতান্ত কর্তব্য। কিন্তু বিশ্বস্তরূপে তাহা প্রমাণিত হওয়া চাই। এজন্য আমাদের পূর্বতন আলেম ও ইমামগণ রেওয়ায়ৎ ও দেরায়াৎ সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, সত্যকে মিথ্যার আবর্জনা রাশির মধ্য হইতে বাছিয়া লইবার যেপথ তাঁহারা আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই যুক্তিসঙ্গত নিয়মাবলী অনুসারে সত্য-মিথ্যা এবং বিশ্বস্ত ইতিবৃত্ত ও কল্পিত উপকথাগুলি বাছাই করিয়া লইবার অধিকার আমাদের আছে। বরং কোরআনের আদেশ অনুসারে প্রত্যেক মুছলমান এইরূপ করিতে বাধ্য"।[৩০]

মাওলানা আকরম খাঁর মতে শাস্ত্র, ইতিহাস, যুক্তি ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মে'রাজের ঘটনা যে সত্য, তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। কিন্তু এ মে'রাজ দৈহিক নয়, স্বপ্ন-গত। তিনি শাহ্‌ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস-ই-দেহলবী (রঃ)-এর মে'রাজ সংক্রান্ত বক্তব্যকে উল্লেখ করেন এভাবে– 'মে'রাজের সমস্ত ঘটনাই হযরতের জাগ্রত অবস্থায় এবং সশরীরে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা রূপক ও বাস্তব জগতের সন্ধিস্থলে অবস্থিত অন্য এক জগতের কথা'।[৩১] অতঃপর তিনি বলেন যে, তিনি এ মত সমর্থন করেন না। এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেনঃ "শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক যুক্তি-প্রমাণই আমাদিগের এই অসমর্থনের প্রধান কারণ। নচেৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের হিসাবে আমরা শেষোক্ত (দৈহিক মে'রাজ) মতের মূল বিবরণ গুলিকেও অসম্ভব বলিয়া মনে করিনা।"[৩২] তাঁর মতে, যেহেতু নবী-রসূলগণের স্বপ্ন মিথ্যা হয়না, সেহেতু মে'রাজ সশরীরে হয়নি, বরং স্বপ্নযোগে হয়েছে। তাঁর ধারণা-অসতর্ক রাবীদের কল্যাণে মে'রাজ সংক্রান্ত হযরতের বর্ণিত স্বপ্নের বিবরণটি নানা

---

[২৯] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৪।
[৩০] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা-চরিত, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৫৫-৫৬।
[৩১] উদ্ধৃতঃ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ২৯০।
[৩২] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ২৯০।

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাচারের পর বর্তমান আকার ধারণ করেছে মাত্র ।[৩৩] তাঁর এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় । কারণ মহানবী (সাঃ) মে'রাজ শেষ করে ফিরে এসেতো একথা বলেননি যে, তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন । আর যদি তা বলতেন, তাহলে ব্যাপারটিতো সেখানেই মিটে যেতো, কোন তর্ক-বিতর্ক বা অবিশ্বাসের জন্ম দিয়ে তা এ পর্যন্ত গড়াতো না । কারণ পয়গম্বরদের স্বপ্ন সম্পর্কে কোন বিতর্ক বা অবিশ্বাস কারো জন্য শোভনীয় নয় । তাছাড়া এরূপ স্বপ্নের কথা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কোথাও নেই ।

ইসলামের ইতিহাসের কতগুলি মৌলিক প্রশ্ন-হযরতের জন্ম মক্কায় হওয়ার কারণ, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুষ্টিমেয় মুসলিম কর্তৃক বিরাট বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাজিত করতে সক্ষম হওয়ার কারণ, ইসলাম হযরতের জন্মভূমিতে প্রতিষ্ঠা পেলনা অথচ মদীনায় তা সম্ভব হল কি কারণে– এসব প্রশ্নের যে ব্যাখ্যা মাওলানা আকরম খাঁ দিয়েছেন, তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও গ্রহণযোগ্য । ইসলামের প্রাথমিক যুগের গল্পের মত বিচিত্র বহু ঘটনা, যেমন– বোরাকে আরোহন, উম্মে মাবুদের কথা, হযরতের রূপ বর্ণনা, দস্যুদের ইসলাম গ্রহণ ইত্যাদি ঐতিহাসিক মূল্য লাভ করেছে । অন্যদিকে বহু প্রচলিত উপাখ্যান, যেমন– হযরতের মৃত্যুকালে আক্কাছের প্রতিশোধ গ্রহণের ঘটনাকে তিনি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে মনে করেন ।[৩৪]

সাধারণভাবে প্রচলিত আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন মোতাবেক ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার ইন্তেকাল করেন । কিন্তু মাওলানা আকরম খাঁ এতে দ্বিমত করেন । তিনি বিভিন্ন যুক্তি-তর্কের আলোকে প্রমাণ করেন যে, ১২ই রবিউল আউয়াল নয়, বরং ১লা রবিউল আউয়াল সোমবার মহানবী (সাঃ) ইন্তেকাল করেন ।[৩৫]

পরিশেষে বলা যায় যে, নবী-জীবনী বিষয়ক উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও অন্যান্য বহুদিক নিয়ে তিনি 'মোস্তফা-চরিত' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন,

---

[৩৩] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৬৮ ।
[৩৪] ড. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৯৫ ।
[৩৫] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রঃ, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৫৭০ ।

Dhaka University Institutional Repository

যার ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। কাজেই 'মোস্তফা-চরিত' ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং বাংলা ভাষায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ সীরাতগ্রন্থ।

২. 'মোস্তফা-চরিতের বৈশিষ্ট্য' ঃ মাওলানা আকরম খাঁ এ গ্রন্থের ভূমিকায় মোস্তফা চরিত দ্বিতীয় খন্ড বিস্তারিতভাবে সুসম্পন্ন করার আশাবাদ ব্যক্ত করলেও তা মূলত: সম্ভব হয়নি।[৩৬] এ গ্রন্থে তিনি মোস্তফা চরিতের যে চারটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, সেগুলো হচ্ছে– তাওহীদ, সর্ব্ব ধর্ম সমন্বয়, মানবতার জয় ঘোষণা এবং সাম্যের প্রতিষ্ঠা। নবী-জীবনের এসব বৈশিষ্ট্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ক) তাওহীদঃ একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এ পৃথিবীতে রসূল হিসেবে আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নির্ভেজাল তাওহীদের প্রতিষ্ঠা। এটাই ছিল তাঁর নবী-জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে খ্রীষ্টধর্মের Trinity বা ত্রিত্ববাদ (God- the Father, God- the son and God-the real spirit), হিন্দু ধর্মের কল্পিত ভূত-প্রেত ও দেব-দেবীর পূজা ইত্যাদি আলোচনাও এখানে স্থান পেয়েছে, যার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য অনস্বীকার্য। মহানবী (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে দুনিয়ার ধর্মীয় অবস্থা এবং তাঁর আগমনের পর এর গুণগত পরিবর্তন সম্পর্কে মাওলানা আকরম খাঁ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) আবির্ভাবের সময় তাওহীদ, বিশেষ করে সত্যিকারের তাওহীদ দুনিয়া হতে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং নানাবিধ জাতগত শির্ক, ছিফাতগত শির্ক ও অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর পৌত্তলিকতা এর স্থানকে শোচনীয়ভাবে অধিকার করে নিয়েছিল। সেই ঘোর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন অন্ধকার বিশ্বকে স্বর্গের নূরে উদ্ভাসিত করেছিলেন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)। তাঁর প্রচারিত এই তাওহীদই সত্যিকারের তাওহীদ। পূর্ণ আল্লাহ্‌র পূর্ণস্বরূপে পূর্ণবিকাশ একমাত্র তাঁরই শিক্ষায় ঘটেছিল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র সত্য-স্বরূপকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন

[৩৬] দেখুন : আবু জাফর (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩০৪।

Dhaka University Institutional Repository

একমাত্র তিনি। আকরম খাঁর মতে এটাই হচ্ছে তাঁর নবী জীবনের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য।[৩৭] সুতরাং নির্ভেজাল তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত।

খ) সর্ব্ব ধর্ম সমন্বয়ঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে পৃথিবীতে যত নবী-রসূল বা ধর্ম প্রচারকের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাঁদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র ছিল বিশেষ কোন গোত্র, স্থান বা এলাকা। বিশ্বমানবতার কল্যাণ কোন দিনই তাদের লক্ষ্য ছিলনা। যেমন– যীশুখৃষ্ট এসেছিলেন এহুদার হারানো মেষপালগুলোকে খুঁজে বের করতে। হযরত মুসা (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটেছিল বনি ইসরাঈলকে দাসত্ব মুক্ত করতে। ভারতবর্ষের নয় নয়জন অবতার কেবল ভারতবাসীর জন্যই চিন্তা-ভাবনা করেছেন।[৩৮] অন্যদিকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এসেছিলেন বিশ্ব মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে। তাঁর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র ছিল সমগ্র বিশ্ব। তিনি ছিলেন বিশ্বনবী, তিনি এসেছিলেন বিশ্বমানবতার জন্য রহমত হিসেবে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ বলেনঃ

> "প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, ধর্ম সংক্রান্ত সকল বিকারের বিচার করিয়া যুগগত, জাতিগত, দেশগত ধর্মের সকল সংকীর্ণ গন্ডিকে চিরকালের তরে তুলিয়া দিয়া বিশ্ব মানবের সব বিচ্ছেদ, সব ব্যবধানের সীমান্ত রেখাগুলিকে স্থায়ীভাবে মুছিয়া ফেলিয়া হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা দুনিয়ায় সকল ধর্ম-সংঘর্ষের ও সকল ধর্ম-সমস্যার যে সমন্বয় ও সমাধান আনয়ন করিয়াছেন, বস্তুতই মানবের ইতিহাসে তাহা এক অনুপম ও অভিনব ব্যাপার। দুনিয়া জোড়া সংঘর্ষ-সংঘাতের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাই এই সমন্বয়ের সন্দেশ সর্ব প্রথমে বিশ্ববাসীর সম্মুখে ঘোষণা করিয়াছেন এবং একমাত্র তিনিই সেই সমন্বয় ও সমাধানকে বিশ্বের বুকে বাস্তবরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমার মতে ইহাই হইতেছে সেই রহমতরূপী মহামানবের নবী জীবনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য।"[৩৯]

---

[৩৭] মোহাম্মদ আকরমখাঁ, মোস্তফা-চরিতের বৈশিষ্ট্য, কলকাতা, ১৯৩২, পৃ ঃ ২৮।
[৩৮] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ২৯।
[৩৯] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

গ) মানবতার জয় ঘোষণা: হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক হিসেবে এ ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাঁর মাধ্যমেই বিশ্ব মানবতার বিজয় ঘোষিত হয়েছে, এ সত্য ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। তিনি যখন বিজয়ের বাণী নিয়ে এলেন, তখন লোকেরা বললো, আমাদের মত পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে যার জন্ম, আমাদেরই মত যিনি সুখ-দুঃখে পরিবেষ্টিত, তিনি আমাদের শিক্ষক হতে পারেন কিভাবে?[৪০] তারা আরও বললো, মোহাম্মদ কেমন রসূল? তিনি অন্ন ভক্ষণ করেন এবং হাটে-বাজারেও ঘুরে বেড়ান। রসূলই যদি হবেন তবে স্বর্গলোক হতে কোন একজন দেবদূত অবতীর্ণ হলনা কেন?[৪১] এর উত্তরে মহান আল্লাহ্‌ আল্‌-কুরআনে ঘোষণা করেন: 'হে মোহাম্মদ! তোমার পূর্বে আমরা মানুষ ব্যতীত অন্য কাউকে রসূলরূপে প্রেরণ করিনি। অতএব জ্ঞানীজনকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, তোমরা যদি অবগত না থাক'।[৪২]

উপরোক্ত বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের মুক্তির জন্য সুখ-দুঃখের সমভাগী মানুষকেই রসূল হিসেবে পাঠানো সঙ্গত ও সার্থক হতে পারে, কোন অবতার বা স্বর্গীয় দেবতাকে নয়। মানুষ হিসেবেই যে হযরতের জীবনের চরম সার্থকতা নিহিত, এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ এয়াকুব আলী চৌধুরীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন: 'হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) মানবতার সুমহান গৌরব। তিনি ঈশ্বরের পুত্র বা অবতার নহেন, তিনি মানুষ। ইহাতেই তাঁহার সার্থকতা ও ইহাতে তাঁহার অহঙ্কার। তিনি মানুষের মহিমা ও গৌরবের যে ডঙ্কা বাজাইয়াছেন মানুষের পক্ষে তাহা অতি বড় গৌরবের বিষয়'।[৪৩]

পরিশেষে মাওলানা আকরম খাঁ বিভিন্ন ধর্ম প্রচারকের শিক্ষা ও মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, খৃষ্ট, বুদ্ধ ও চৈতন্য অহিংস ও প্রেমের মন্ত্র প্রচার করে মানুষকে উৎকৃষ্ট নীতি শিক্ষা দিয়েছেন, সন্দেহ

---

[৪০] ঐ, পৃ ঃ ৪১।
[৪১] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪২।
[৪২] আল্‌ কুরআন, সূরা-আম্বিয়া, আয়াত নং-৯।
[৪৩] এয়াকুব আলী চৌধুরী, মানব মুকুট, উদ্ধৃত: মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

নাই। কিন্তু তাঁরা মানুষের উপাস্য সম্বন্ধে নীরব থেকে মহাপুরুষকে ঈশ্বরের আসনে বসতে দিয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে শোচনীয়রূপে পঙ্গু করে রেখে গেছেন। অন্যদিকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-ই মানুষকে প্রেম ও ক্ষমার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মহাপুরুষের কল্পিত দেবসিংহাসনে পদাঘাত করে মানবতার অতল সমতলে দাঁড়িয়ে উর্দ্ধে অঙ্গুলি তুলে বলেছেন, হে মানুষ, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ বড় নয়।[৪৪] বস্তুত: মানবতার এ বিজয় ঘোষণা দুনিয়ার ধর্ম-ইতিহাসে অভিনব ব্যাপার। একেই মাওলানা আকরম খাঁ নবী-জীবনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ঘ) সাম্যের প্রতিষ্ঠা: এ অধ্যায়ে মাওলানা আকরম খাঁ ইসলামের সাম্যবাদ ও প্রচলিত সাম্যবাদের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ধর্মশাস্ত্র বিশারদদের সাম্যবাদের নমুনা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাম্যবাদের নমুনাও উল্লেখ করেছেন। তিনি যীশু খৃষ্টের আবির্ভাবের সময় হতে শুরু করে খৃষ্টান জগতের সুদীর্ঘ দু'হাজার বছরের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। ইটালী, জার্মানী, ফরাসী ও ইংরেজ জাতি দাস-দাসীদের সাথে কি ধরনের আচরণ করেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখাও তিনি বর্ণনা করেছেন। সাম্যের নামে কি জঘন্য ও অমানবিক অপকর্ম তারা পৃথিবীর ইতিহাসে রেখে গেছেন, তারও একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দাসদের সাথে কি ধরনের আচরণ নিজে করেছেন এবং অন্যদের কি ধরনের আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তারও একটি প্রামাণ্য আলোচনা করে তিনি প্রমাণ করেছেন ইসলাম পৃথিবীতে কি ধরনের সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। তিনি বলেছেন যে, প্রেম ও সাম্যের এসব স্বর্গীয় আদর্শকে দুনিয়ার কার্যক্ষেত্রে বাস্তবরূপে প্রতিষ্ঠিত করে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) দুনিয়াকে সত্যিকারভাবে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছেন। এটাই তাঁর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য।[৪৫]

---

[৪৪] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫১।
[৪৫] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, কবি গোলাম মোস্তফা যেমন 'মোস্তফা-চরিত'-এর প্রতিবাদ স্বরূপ 'বিশ্বনবী' রচনা করেছেন, তেমনি সম্ভবত: 'মোস্তফা-চরিতের বৈশিষ্ট্য'-এর প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি 'বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য' লিখেছেন। লক্ষণীয় যে, 'মোস্তফা-চরিতের বৈশিষ্ট্য' যেমন ৪টি বিষয় নিয়ে রচিত, তেমনি 'বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য'-তেও তিনি ৪টি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করেছেন। যথা– ক) ইসলাম কী?, খ) আদর্শ প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ, গ) কয়েকটি প্রশ্ন ও তাহার জবাব এবং ঘ) হযরত মুহাম্মদ একক রসূল ছিলেন কি না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, 'মোস্তফা-চরিতের বৈশিষ্ট্যে'র জবাবেই রচিত হয় 'বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য'।

৩. মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস: গ্রন্থখানা মাওলানা আকরম খাঁর অক্ষয়কীর্তি। এ গ্রন্থে তিনি যে পান্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যিকার অর্থেই প্রশংসার দাবী রাখে। গ্রন্থটিকে তিনি 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' হিসেবে নামকরণ করলেও প্রকৃত পক্ষে এটা হচ্ছে মুসলিম ভারতের সামাজিক ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। গ্রন্থটিতে ২৬টি অধ্যায় স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে জাতীয় ইতিহাসের শুভ সূচনা, বাংলার সমসাময়িক অবস্থা, মুসলিম বাংলার পতন, অধঃপতনের বাস্তব উদাহরণ, হিন্দুদের পঞ্চতত্ত্ব রহস্য, মুসলিম সমাজে এর প্রভাব, মুসলিম ভারতের বিপর্যয়কাল, ইসলামের মৌলিক আদর্শ, মুসলিম বাংলায় অনৈসলামিক ভাবধারা অনুপ্রবেশের প্রকৃত কারণ প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্বও অনস্বীকার্য।

মাওলানা আকরম খাঁ গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে সম অর্থবাচক সংস্কৃত ও আরবী শব্দের একটি তালিকা এবং সম অর্থবাচক সংস্কৃত ও ফার্সী শব্দের একটি তালিকা প্রদান করেছেন। এতে বাংলা ভাষায় তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। অতঃপর ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে তিনি ইরানীদের আত্মবিরোধ, জরদাশ্‌ত (Zoroaster)-এর আবির্ভাব, শিক্ষা ও সংস্কার, বেদের প্রাচীনত্বের দাবী ও এর অসারতার প্রমাণ, আর্য্য এবং আর্য্যাবর্ত্ত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। ইতিহাসের দৃষ্টিতে এ আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, ইসলামের ইতিহাসের সূচনা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সময় হতে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সূচনা হয় হযরত আদম (আঃ)-এর যুগ হতে। মাওলানা আকরম খাঁর বর্ণনায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। ৭ম অধ্যায়ে 'জাতীয় ইতিহাসের শুভ-সূচনা' শিরোনামে তিনি বলেন:

> "ইছলামের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে মানব সভ্যতার প্রথম বিকাশের অর্থাৎ হজরত আদমের যুগ হইতে। আদম হইতে নুহ নবী পর্য্যন্ত সেই বিকাশের প্রথম যুগ, নুহ হইতে Patriarch বা কুলপতি হজরত ইবরাহীমের সময় পর্য্যন্ত নানাদিক দিয়া তাহার যুগোপযোগী বিবর্তন হইয়া আসিতে থাকে। হজরত মুছার যুগ পর্য্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ইহা একটা বিধি ব্যবস্থা সম্বলিত আঞ্চলিক শরিয়তের আকার ধারণ করিতে সমর্থ হয়। বনি ইছরাইল জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রকট হইয়া ওঠে এই সময়ে এবং তাওহীদ ধর্ম্মের প্রথম স্মৃতিসৌধ 'বায়তে-ঈল' বা বায়তুল্লাহ্ মক্কার মরু-প্রান্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় এই যুগে"।[৪৬]

অতঃপর তিনি য়াহুদ ও বানি ইসরাইল জাতির সংক্ষিপ্ত ও তথ্যবহুল ইতিহাস আলোচনা করেন। তাঁর বক্তব্য হতে জানা যায় যে, মহানবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় একটি আফগান প্রতিনিধি দল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বায়আত গ্রহণ করেন এবং তাঁদের ইচছা ও আগ্রহের ফলে আফগানিস্তানে ইসলামের প্রচার ও প্রসার শুরু হয়।[৪৭] ৮ম অধ্যায়ে তিনি মালাবার উপকূলে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস, মালাবার নামের উৎপত্তি, 'মোপলা' বা 'মপিল্ল'দের পরিচয় ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করেন এবং মালাবারে নির্মিত দশটি মসজিদের একটি তালিকা প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি সেখানকার স্থানীয় রাজা 'চেরুমাল পেরুমাল'-এর ইসলাম গ্রহণের ইতিহাসও আলোচনা করেছেন। মাওলানা আকরম খাঁর বিবরণ হতে জানা যায় যে, মহানবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় আরব নাবিক ও বণিকদের মাধ্যমেই মালাবারে ইসলাম প্রচারিত হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে,

---

[৪৬] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, আজাদ অফিস, ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ ঃ ৩৮।

[৪৭] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩৯-৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

আরব নাবিক ও বণিকগণ সদাসর্বদা এই পথ দিয়ে বঙ্গদেশ ও কামরূপ হয়ে চীন দেশে যাতায়াত করতেন। মালাবারই ছিল তাদের মধ্যপথের প্রধান বন্দর। এখানকার মোহাজিরদের[৪৮] ভাষাও ছিল আরবী। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) ও ইসলাম ধর্মের বিবরণ যে তাঁরা যথাসময়ে সম্যকরূপে অবগত হতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়। এ প্রসঙ্গে এও স্মরণ রাখতে হবে যে, আরব বণিকরাই ছিলেন হিজরী সপ্তম শতক পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারের প্রধান উদ্যোগী ও সদাসক্রিয় উপলক্ষ্য। তাঁর মতে, এই উৎসাহী ও ধর্মপ্রাণ প্রচারকদের সংশ্রবে আসার ফলেই মালাবারের আরব মোহাজিরগণ হযরতের জীবনকালে– খুব সম্ভব হিজরী সনের প্রথম দিকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মালাবারের অনারব অধিবাসীদের মধ্যে ইসলামের প্রসার আরম্ভ হয় এর কিছুকাল পরে– স্থানীয় রাজার ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে।[৪৯]

গ্রন্থের ৯ম অধ্যায়ে মাওলানা আকরম খাঁ মুসলিমদের সিন্ধু বিজয়ের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য হতে জানা যায় যে, মুহাম্মদ বিন্ কাসিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয় সমাপ্ত হলেও তার বহু পূর্বেই মুসলিমগণ পাক-ভারত উপমহাদেশে পর পর কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এসব অভিযানের কয়েকটিতে মুসলিমগণ সফলতা লাভ করেছিলেন এবং কোন কোনটায় তাঁরা অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। মূলতঃ ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতামলে ১৫ হিজরীর মধ্যভাগে এ অভিযানের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালিত হওয়ার পর খলিফা আল্ ওয়ালিদ ইব্ন আবদুল মালিকের শাসনামলে ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ বিন্ ইউসুফ সিন্ধু অভিযানের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ ইব্ন হারুন নমরী, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন

---

[৪৮] যে সব আরব মালাবারে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন, মোহাজির বল্‌তে তাঁদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

[৪৯] পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৮-৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

নবহান ও বোদায়ল ইব্ন তোহফা বজলীকে পরপর নিয়োজিত করেন। অতঃপর ৯৩ হিজরীতে মুহাম্মদ বিন্ কাসিমের নেতৃত্বে চূড়ান্তভাবে সিন্ধু বিজয় সমাপ্ত হয়।[৫০]

অতঃপর মাওলানা আকরম খাঁ পাক-ভারত ও বাংলাদেশে ইসলামের দ্রুত প্রসার ও অসাধারণ সফলতা লাভের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর দেয়া বিবরণ অনুসারে, ইসলাম যে ভারতে বিশেষতঃ বাংলাদেশে এমন অসাধারণ সফলতা লাভ করেছিল, তার প্রধানতম কারণ হচ্ছে ইসলামের সহজাত আধ্যাত্মিক শক্তি। অন্য কারণগুলো হচ্ছে আনুসঙ্গিক। ইসলামের মূলনীতি ও প্রধান আদর্শ হচ্ছে তাওহীদ বা অনাবিল একত্ববাদ। নর পূজা, প্রতীক পূজা, অবতারবাদ এবং পৌত্তলিকতার অভিশাপগুলোকে আল্লাহ্‌র দুনিয়া হতে ধুয়ে-মুছে সর্বশক্তিমান, সর্বমঙ্গলময় একমাত্র আল্লাহ্‌র পূজাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাঁর সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ মানব সমাজকে তাঁরই নামে এক অবিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃসমাজে পরিণত করা। হযরতের ইন্‌তিকালের পর আরবরা নিজেদের আবাসভূমি হতে বের হয়ে পড়েছিলেন প্রধানতঃ এ আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে।[৫১] এতদ্ব্যতীত তাঁর বক্তব্য হতে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর সাহাবাগণকে পাক-ভারতে অভিযান পরিচালনা করতেও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নাছায়ী শরীফ হতে একখানা হাদীস উদ্ধৃত করেন এভাবে– "ছাহাবী আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদিগকে হিন্দ্ অভিযানের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়াছেন। অতএব যদি আমি সেই সময় জীবিত থাকি তবে আমি তাহাতে আমার জান ও মাল ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইব না। ইহাতে যদি আমাকে কতল করা হয় তবে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদে পরিগণিত হইব, আর যদি ছহীছালামতে ফিরিয়া আসি তবে আমি হইব 'দোযখ-মুক্ত আবুহোরায়রা'।"[৫২] অতঃপর তিনি এ মর্মে উপসংহারে উপনীত হন যে, উল্লিখিত হাদীসে মুসলিম জাতিকে শুধু পাক-ভারত (হিন্দ্) অভিযানে উদ্বুদ্ধ করাই হয়নি, বরং একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এতে পাক-ভারত অভিযানের অপরিহার্যতাও ঘোষণা করা হয়েছে।

---

[৫০] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫২-৫৪।
[৫১] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৫।
[৫২] নাছায়ী শরীফ (২), পৃ ঃ ৬২; উদ্বৃত: পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর মাওলানা আকরম খাঁ আরবদের নৌ-বিজ্ঞান সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তাঁর বিবরণ হতে জানা যায় যে, পবিত্র কুরআন মাজীদের আটাশখানা আয়াতে জলযানের উল্লেখ রয়েছে এবং এ জলযান অর্থাৎ নৌকা বা জাহাজের ইতিহাস শুরু হয়েছে হযরত নূহ (আঃ)-এর সময় হতে। আরবগণ সামুদ্রিক এবং নৌযান পরিচালনায় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা যেমন পারদর্শী ছিলেন তেমনি ছিলেন নির্ভীক ও অসম সাহসী। আরব নাবিকগণ নৌ-বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। নৌযান পরিচালনার জন্য তাঁরা নক্‌সা বা মানচিত্রের সাথে একটি দিক্‌দর্শন যন্ত্রও আবিস্কার করেন, যা 'কুতুব নোমা' বা Compas নামে পরিচিত।[৫৩]

মুসলিম সমাজে কিভাবে ইসলাম বিরোধী ভাবধারা ও রীতি-নীতি অনুপ্রবেশ করলো, তার আদ্যোপান্ত একটি সংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত ইতিহাস মাওলানা আকরম খাঁ এ গ্রন্থে তুলে ধরেন। তিনি সত্যের খাতিরে মুসলিম রাজা-বাদ্‌শাহকেও ক্ষমা করেননি। বাংলার মুসলিম শাসকবর্গ সম্পর্কে মন্তব্য করে তিনি বলেন যে, 'মুসলিম বাংলার দীর্ঘ ইতিহাসে ইসলামী ভাবধারা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং মুসলিম তাহজীব ও তমদ্দুনে বিশ্বাসী এরূপ একজন চরিত্রবান শাসনকর্তা, সরকারী কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবেনা, যিনি বাংলার মুসলিমদেরকে তাদের ব্যক্তিগত অথবা সমাজ জীবনে শক্তি ও সাহস অর্জনে প্রেরণা যোগাতে সক্ষম ছিলেন। এটাই ছিল মুসলিম সমাজের মানসিক খাদ্যের দুর্ভিক্ষ, যা তাকে ভিতর হতে ধ্বংস ও অধঃপাতিত করে চলছিল।।[৫৪]

মুসলিম সমাজে ইসলাম-বিরোধী ভাবধারা ও রীতি-নীতি অনুপ্রবেশ করার পাশাপাশি বাংলায় হিন্দু জাগরণ ও পুনরুজ্জীবনের কারণ এবং মুসলিম শাসকবর্গের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, যখন মুসলিম মানস সম্পূর্ণভাবে ইসলামী ভাবধারা ও আদর্শ বিবর্জিত এবং এর নিজস্ব তাহজীব-তমদ্দুনের সাথে পরিচয়-শূন্য হয়ে এমনিভাবে শয়তানের কারখানায় পরিণত হতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় বাংলার

---

৫৩ মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৭০।
৫৪ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুদের মধ্যে বুদ্ধি ও ধর্মের এক অভূতপূর্ব জাগরণ ও পুনরুজ্জীবন দেখা দেয়। হিন্দুদের এই বুদ্ধির জয়যাত্রা ধর্ম ও পৌরাণিক সাহিত্যকে ভিত্তি করেই শুরু হয়। বাংলার তথাকথিত উদার, মহানুভব ও বিদ্যোৎসাহী মুসলিম নবাব ও সুলতানগণ তাঁদের নিজস্ব ধর্ম গ্রন্থসমূহ ও সাহিত্য চর্চার প্রতি নজর দেয়া অথবা একাজে কোন মুসলিমকে উৎসাহ দান ও পৃষ্ঠপোষকতা করার কোন প্রয়োজন অনুভব করেননি। সমসাময়িক সাহিত্য খুঁজে বাংলার এ সমস্ত নবাব ও সুলতানগণের দরবারে কোনদিন আল্-কুরআন অধ্যয়ন অথবা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন-চরিত ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার অনুষ্ঠান হয়েছে, এ ধরনের কোন আভাষ পাওয়া যায়না। অপরদিকে শত শত প্রাচীন পুস্তক ও পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পরিলক্ষিত হয় যে, তাঁদের অনেকেরই দরবারে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠের নিয়মিত সাহিত্যিক আসরের অনুষ্ঠান হত। বাংলা ভাষার এ উন্নতি যা হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন ব্যতীত কিছুই ছিলনা– গৌড়ের মুসলিম সুলতানগণের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই সম্ভব হয়েছিল।[৫৫]

অতঃপর 'মুছলিম বাংলার পতন' শীর্ষক শিরোনামে মাওলানা আকরম খাঁ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মুসলিম নবাব-বাদ্শাহ্গণের পৃষ্ঠপোষকতা এবং হিন্দু কবি, সাহিত্যিক ও ধর্ম-পুরোহিতগণের দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় যে পৌত্তলিকতাপূর্ণ আবহাওয়া বাংলায় সৃষ্টি হয়েছিল, তার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে বাংলার মুসলিমগণ হিন্দু দেবদেবীর প্রতি ক্রমে আকৃষ্ট ও বিশ্বাসী হয়ে উঠতে থাকেন। তান্ত্রিকদের অশ্লীল ও অপরাধমূলক জঘন্য সাধন-পদ্ধতি, বামাচারীদের যৌনধর্মী ও নোংরা আচার-অনুষ্ঠান, ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ সমাজের ক্ষতিকর সংস্কার, বিশ্বাস ও রীতি-নীতি এবং বৈষ্ণবদের প্রেমলীলা ও অবাধ যৌন আচরণ তখন বাংলায় ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। ফলে একদিকে নিত্যনতুন দেবদেবীর জন্ম এবং অপরদিকে প্রাচীন দেবদেবীগণের অবতারের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। বাংলার মানুষের দুঃখের পেয়ালাটি পূর্ণ করে তোলার জন্যই যেন এই সময়কার মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণের প্রায় সকলেই দ্বিতীয় যুগের হিন্দু কবিগণকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে হিন্দুদের দেবদেবীর স্তুতিমূলক পদাবলি, শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা ও যৌন

[৫৫] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৭৫-৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

আবেদনমূলক কীর্তন, মনসার ভাসান সঙ্গীত, দুর্গা ও গঙ্গার স্তোত্র এবং হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে বহু পুঁথি-পুস্তক রচনা করেন।[৫৬]

শুধু তাই নয়, এ সময় মুসলিম বাংলার ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতনের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে জনৈক মোহাম্মদ আকবর রচিত একখানা বন্দনা-গীতি নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

বিনএ করিআ বন্দি ফিরিস্তার পদ।
ছুন্নি কুলে ফিরিস্তা যে হিন্দুতে নারদ।।
তক্ত সিংহাসন বন্দি আল্লাহর দরবারে।
হিন্দু কুলে ঈশ্বর হেন জগতে প্রচারে।
পয়গাম্বর সকলে বন্দি করিয়া ভক্তি।।
হিন্দু কুলে দেবতা হেন হৈলা প্রকৃতি।।
হজরত আদম বন্দি জগতের বাপ।
হিন্দু কুলে অনাদিনর প্রচার প্রতাপ।।
মা হাওয়া বন্দম জগত জননী।
হিন্দু কুলে কালী নাম প্রচারে মোহিনী।
হজরত রছূল বন্দি প্রভু নিজ সখা।
হিন্দু কুলে অবতারি চৈতন্য রূপে দেখা।।
খোআজ খিজির বন্দি জলেতে বসতি।
হিন্দু কুলে বাসুদেব শূন্যে যে প্রকৃতি।।
আছবরা সকলে বন্দি নবীর সভাএ।
হিন্দু কুলে দোয়াদস গোপাল ধেয়াএ।।
আওলিয়া আম্বিয়া বন্দি রব্বানি কোরান।।
হিন্দু কুলে মুনিভাব আছএ পুরান।।
পীর মুর্সিদ বন্দম ওস্তাদ চরণ।
হিন্দু কুলে গুরু যেন করএ পূজন।।[৫৭]

---

৫৬ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮১।
৫৭ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুছলমানদের অবদান, পৃঃ ৮২; উদ্ধৃতঃ মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত বন্দনা-গীতি সম্পর্কে ড. এনামুল হক ও মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বলেন যে, কবি মোহাম্মদ আকবর তাঁর কাব্যের প্রারম্ভে যে মঙ্গলাচরণটি লিখেছেন তা বড়ই চমৎকার ও উপভোগ্য। কবি তাঁর বন্দনায় হিন্দু ও মুসলিম বিশ্বাসের মধ্যে কি কি সাদৃশ্য আছে তা নির্দেশ করতে গিয়ে একটি বেশ উপভোগ্য বর্ণনা দান করেছেন।[৫৮] এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উক্ত বন্দনা-গীতি ও এ সম্পর্কে সাহিত্যিক যুগলের মন্তব্য হতে আলোচ্য সময়ে মুসলিম বাংলা অধঃপতনের কোন্ অতল গহবরে নেমে গিয়েছিল এবং মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসে কিরূপ গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এ বন্দনা-গীতিতে মুসলিমের আল্লাহ্ ও হিন্দুর ঈশ্বর, হিন্দুর কালী ও মুসলিমের হাওয়া, হিন্দুর দ্বাদশ রাখাল ও রাসূলে করিমের (সাঃ) আছহাব এবং হিন্দু পুরান ও মুসলিমদের কুরআনকে অভিন্ন অথবা সমতুল্য বস্তুরূপে দেখানো হয়েছে। হিন্দু দেবতাদেরকে মুসলিমদের নবী বলে অভিহিত করা হয়েছে, শ্রীচৈতন্যকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অবতার বলে প্রচার করা হয়েছে এবং সকল হিন্দু দেবদেবীর প্রতি পূজা নিবেদন করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, বর্তমান সময়ের দুইজন অতি উচ্চ শিক্ষিত মুসলিম এই বন্দনা গীতিটিকে উপভোগ্য বলে এর প্রশংসা কীর্তন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। মুসলিম বঙ্গের ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক অধঃপতনের এর চেয়ে চূড়ান্ত নজীর আর কিছু হতে পারে না।[৫৯]

মাওলানা আকরম খাঁর বিবরন হতে জানা যায় যে, উচ্চ শিক্ষিত মুসলিম কবি-সাহিত্যিকই শুধু নয়, বাংলার গ্রাম-গঞ্জের দিকে তাকালে দেখা যায়, পল্লী বাংলায়ও এমন অনেক মুসলিম কবি রয়েছেন,যারা সর্পদেবী পদ্মা এবং পাতালের সপ্ত-কোটি নাগ বা সর্পের রাজা নারায়ণের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। কোন কোন কবি সীতা দেবীকে প্রণাম, জগন্নাথের পূজা এবং হিমালয়ের পূজাও করেছেন। এরা পীর পূজা এবং মক্কা-মদীনার প্রশংসা কীর্তন করতে যেয়ে হিন্দুদের কাশী,

---

[৫৮] ড. এনামুল হক ও মুনশী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য; উদ্বৃতঃ মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৪।

[৫৯] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮৪-৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

বৃন্দাবন ও অন্যান্য পবিত্রস্থানের পূজা করতেও দ্বিধা করেননি। কবি মোহাম্মদ ইউনুছ রচিত বন্দনা-গীতিই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

পশ্চিমের মূলস্থান মক্কাকে আমি বন্দনা করি।
হিন্দু মুছলমান সকলকে আমি ছালাম জানাই।
মক্কার পূর্বে ঠাকুর জগন্নাথকে বন্দনা করি।
যেখানে প্রভেদ নাই জাতি ধর্মের
....
(মক্কার) পূর্বে আমি পুন্যধ্যাম কাশীকে বন্দনা করি
যেখানে প্রতি ঘরে হরিনাম কীর্তন হয়
প্রতি ঘরের দুয়ারে যেখানে তুলসী-তরু রাখা হয়
....
(কাশীর) দক্ষিণে স্বর্ণলংকা পুরীকে আমি বন্দনা করি
আর বন্দনা করি ইন্দ্রজিৎ জননী মন্দোদরীকে।[৬০]

শুধু তাই নয়, তারা আরও একধাপ এগিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন। 'নূরন্নেহার ও কবির কথা' নামক গীতিকাব্যের রচয়িতা এ প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, বিস্‌মিল্লাহ্ ও শ্রী বিষ্ণু একই কথা। আল্লাহ্ দুই অংশে বিভক্ত হয়ে রাম ও রহিম হয়েছেন।[৬১] অতঃপর মাওলানা আকরম খাঁ বলেন যে, হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে গড়ে তোলার এই প্রবণতা শুধুমাত্র কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি বরং মুসলিমদের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সর্বস্তরেও এটা সঞ্চারিত হয়েছিল এবং উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করেছিল। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে জলদেবতা বরুণ-পীর বদরে, গৌরচন্দ্র চৈতন্য-গোরাচান্দ পীরে, ওলাই চন্ডিথ—ওলা বিবিতে, সত্যনারায়ণ– সত্যপীরে, লক্ষ্মীদেবী-মা বরকতে রূপান্তরিত হন। আর এই রূপান্তরিত দেবদেবীগণ মুসলিমদের নিকট তাদের প্রাপ্য পূজা এবং শ্রদ্ধাও অব্যাহত ভাবেই পেতে থাকেন।[৬২]

---

[৬০] উদ্বৃত: মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮৫।
[৬১] দেখুন: পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮৬।
[৬২] পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী পর্যায়ে মাওলানা আকরম খাঁ সুলতান হোসেন শাহ্, শ্রীচৈতন্য, সত্যপীর, রূপ ও সনাতন, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন, যার ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। এসব আলোচনা তাঁর ইতিহাস সচেতনতার প্রমাণ বহন করে। তাঁর বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মাধ্যমে মুসলিম বাংলার লক্ষ লক্ষ লোক ঐ সমস্ত ঘৃণ্য ও নোংরা আচার অনুষ্ঠান, অবাধ যৌন আচার, প্রেমমূলক মরমীবাদ এবং পুরাণে বর্ণিত রাধা কৃষ্ণের অশ্লীল প্রেমলীলাকে তাদের জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করে শত শত বছরের জন্য অভিশাপগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।[৬৩]

মুসলিম বাংলায় কীভাবে কুসংস্কার এবং ইসলাম বিরোধী ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটলো, তার অনেক সূত্রই মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে বর্ণনা করেন। তবে এর জন্য তিনি প্রধানতঃ ফার্সী সাহিত্য, হিন্দু কৃষ্টিঘেষা বাংলা সাহিত্য, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের চিরাচরিত ধর্মীয় বিশ্বাস, মারফতী এবং বৈষ্ণব ফকীরদের আচার-আচরণকেই দায়ী করেন। তাঁর মতে, ফার্সী সাহিত্যে অনেক ইসলাম বিরোধী ভাবধারা বিদ্যমান ছিল। সেগুলো মুসলিম শাসকদের আমলে ফার্সী চর্চার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে। দীর্ঘকাল পর এ জাতীয় ধ্যাণ-ধারণা উর্দু সাহিত্যেও বিপুল পরিমাণে প্রবেশ লাভ করে। বাংলা সাহিত্য মুসলিম বাদশাহ্দের হাতে বিশেষ উন্নতি লাভ করে এবং এর ফলে বাংলা সাহিত্যে বিদ্যমান অনেক ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারা ও আচার-অনুষ্ঠান মুসলিম সমাজে বিস্তার লাভ করে। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় সম্পর্কে তিনি বলেন, বর্ণ বিচারে উৎপীড়িত ও ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে জর্জরিত বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় যখন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়, তখন তারা নিজেদের যুগ-যুগান্তে

---

৬৩ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৬-৭।

Dhaka University Institutional Repository

র সঞ্চিত সংস্কারগুলোকেও সাথে করে নিয়ে আসে।[৬৪] তিনি আরও বলেন যে, মুসলিম মারফতী ফকীর বা মরমীবাদী ভিক্ষুক বা আউল-বাউলদের বিকৃত মতবিশ্বাস এবং গর্হিত আচার-অনুষ্ঠানও মুসলিম সমাজকে কলুষিত করে।[৬৫]

মাওলানা আকরম খাঁ কেবল ইসলামবিরোধী ভাবধারা ও রীতি-নীতির মূল সূত্র খোঁজ করেই ক্ষান্ত হননি। বরং কখন থেকে এবং কিভাবে মুসলিম মনীষীদের মনে এসব কুসংস্কারকে পরিশুদ্ধ বা সংস্কার করার প্রেরণা জাগে, তারও একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত তিনি এ গ্রন্থে তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (রঃ) নাম উচ্চারণ করেন এবং তাঁকে মুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক বলে অভিহিত করেন। অতঃপর তিনি মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফ-ই-সানী শেখ আহমদ সেরহিন্দী (রঃ), শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস-ই-দেহ্‌লবী (রঃ), সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রঃ) প্রমুখের সংস্কারমূলক কার্যাবলীও তুলে ধরেন। সুতরাং বলা যায় যে, মাওলানা আকরম খাঁর এ গ্রন্থখানা মুসলিম বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

৪. সমস্যা ও সমাধানঃ এ গ্রন্থখানা সরাসরি ইতিহাস বিষয়ক না হলেও ইতিহাসের কিছু মাল-মসলা এতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাঁর এ গ্রন্থখানা আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার আলোকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলামের কতিপয় অনুশাসন নিয়ে পন্ডিত মহলে ও আলিম সমাজে দীর্ঘদিন যাবৎ বিতর্ক চলে আস্‌ছে। যেমন– গান জায়েয কি-না, চিত্রকলা নিষিদ্ধ কি-না, ব্যাংকের সুদ বৈধ কি-না, ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার কোন্ ধরনের ইত্যাদি বিষয়গুলো রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদীদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে আসছে। মাওলানা আকরম খাঁ গ্রন্থখানা লিখে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে তাঁর মতামত পেশ করে রক্ষণশীল ও আধুনিক পন্থীদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করেন। এসব বিষয় কখন, কোন্ অবস্থায় ও

---

[৬৪] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৪২০-২১।
[৬৫] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪২১।

Dhaka University Institutional Repository

কোন্ প্রেক্ষাপটে বৈধ বা অবৈধ—ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে তা তিনি বিশদ আলোচনা করেন। সুতরাং ধর্মীয় দিকের পাশাপাশি এর ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক গুরুত্বও অনস্বীকার্য।

বাংলা ভাষায় এ ধরনের গ্রন্থ সম্ভবত: এটাই প্রথম। গ্রন্থটি প্রকাশের পর অবশ্য তিনি ব্যাপক সমালোচনার পাত্রে পরিণত হন। তবুও সত্যের খাতিরে বলতে হয়, তিনি সৎ সাহস নিয়ে এ সংকটাপন্ন ময়দানে ঝাঁপ দিয়েছেন। এটাই তাঁর কৃতিত্ব। তিনি ইসলামের সাথে আধুনিকতার সমন্বয় সাধনের সেতু বন্ধনের চেষ্টা করেছেন। এভাবে মুক্তমন নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুধাবনের চেষ্টা করলে আমাদের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান হবে, নূতন চিন্তা-চেতনার দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং মুসলিম সমাজ ও জাতি পাবে সঠিক দিক্ নির্দেশনা, এতে সন্দেহ নেই।

৫. বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম: খৃষ্টান মিশনারীদের অপপ্রচার থেকে ইসলাম ও মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার মানসিকতা নিয়েই মাওলানা আকরম খাঁ এ গ্রন্থখানা রচনা করেন। দেশ বিভাগের পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তানের খৃষ্টান মিশনারীদের খৃষ্টধর্ম প্রচারের তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। তারা ইসলাম, পবিত্র কুরআন ও হাদীস এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর চরিত্রের উপর বিভিন্ন রকমের অপবাদ আরোপ করতে থাকে। মাওলানা আকরম খাঁ এসব অপবাদের প্রতিবাদস্বরূপ ও তাদের আরোপিত মিথ্যাচারকে যুক্তির মাধ্যমে খন্ডন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এ গ্রন্থ রচনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। অবশ্য আবদুর রহীমের বিবরণ হতে জানা যায় যে, ১৯০৬ সালে সৈয়দ আমীর আলী 'Christianity from the Islamic stand-point' নামক এ ধরনের একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি খৃষ্ট ধর্ম ও ইসলামের তুলনামূলক আলোচনা করেন এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন।[৬৬]

'বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম' গ্রন্থে মাওলানা আকরম খাঁ খৃষ্টধর্ম যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, প্রথমেই তাদের উক্তসব মৌলিক বিষয়ের উপর

---

৬৬ আবদুর রহীম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ১৯৪৭-৫৭, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ ঃ ১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

আঘাত হেনেছেন। এ প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে পুস্তকের পুরো আলোচনাকে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে বিভক্ত করেন:

(১) খৃষ্টান ধর্মে ইসলাম, কুরআন মাজীদ ও রাসূলে করিমের (সা:) বিরুদ্ধে যেসব অপবাদ রচনা করা হয়েছে, অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের আলোকে সেসব বিষয়ের সুসঙ্গত প্রতিবাদ করা;

(২) হযরত ঈসা (আঃ)-এর নামে মিশনারীরা যে ধর্মের প্রচার করছেন এবং তাওরাত-ইঞ্জিল বলে যে সব পুঁথি-পুস্তক দুনিয়াময় প্রচার করে আসছেন, বস্তুত: তা যে আল্-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ কর্তৃক নাজিলকৃত তাওরাত-ইঞ্জিল নয় এবং সেগুলির অস্তিত্ব যে দুনিয়া হতে বহু শত বছর পূর্বে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে,তা ঐতিহাসিক ও দার্শনিক যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা;

(৩) যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া, তাঁর রক্তে বিশ্বাসী গুনাহ্গারদিগের নাজাতের ব্যবস্থা, তাঁকে অতিমানবিক গুণের অধিকারী ঈশ্বরের অংশ বা পুত্র বলে গ্রহণ করা- পাদ্রীদের এসব ধর্মীয় সংস্কারাদির অসারতা প্রতিপন্ন করা।[৬৭]

মাওলানা আকরম খাঁ উক্ত গ্রন্থে ইঞ্জিল কিতাব সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেন, তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বের দাবী রাখে। তিনি বলেন:

> "আজ আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি মথি বা Mathew নামক কোন একজন মানুষের লিখিত ইঞ্জিলের– আল্লাহ্র প্রেরিত ইঞ্জিলের নহে। 'কোন একজন মানুষের' বলিলাম, কারণ বাইবেলের অনুবাদক ও প্রকাশক স্বীকার করিতেছেন যে, মথির ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। মথি কোন্ ভাষায় প্রথম এই 'ইঞ্জিল' বা সুসমাচারখানা রচনা করিয়াছিলেন; সে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। অনেকের মতে এই সুসমাচার খানা মথি কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। এবরাণী ভাষায় খৃষ্টানদের হাতে আসিয়াছিল। তাহার একখানা গ্রীক অনুবাদ আমাদের কাছে পৌছিয়াছে। এই গ্রীক অনুবাদের ইংরাজি ও আরবী অনুবাদ, আর সেই অনুবাদের বাংলা, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদও বাইবেলের Authorised Version- এর

[৬৭] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম, ঢাকা, ১৯৬২, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

সংশোধিত ভার্সনের অনুবাদ । এইরূপে সাত নকলে আসল খাস্তা মথি নামক জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় মানুষের লিখিত ইঞ্জিলের বা সুসমাচারের একটা অনুবাদ আল্লাহ্ কর্তৃক হজরত ঈসার প্রতি নাজেল করা ইঞ্জিল নহে ।"[৬৮]

স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁর 'তাবঈনুল কালাম' গ্রন্থে প্রচলিত তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মত প্রকাশ করে বলেন যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলে একাধিক পরিবর্তন ঘটলেও তাতে আল্লাহ্র মৌলিক বাণীর বিকৃতি ঘটেনি । এ ব্যাপারে মাওলানা আকরম খাঁর অভিমত ছিল সম্পূর্ণ আলাদা । তিনি বলেন যে, খৃষ্টানদের বর্তমান বাইবেল কুরআনে বর্ণিত ইঞ্জিল নয়, বরং হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবন কাহিনী সম্বন্ধে কতগুলি উদ্ভট ও অনৈতিহাসিক পৌরাণিক কেচ্ছা-কাহিনীর সমষ্টি মাত্র ।[৬৯] এতদ্ব্যতীত মাওলানা আকরম খাঁ উক্ত গ্রন্থে খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদ ও পৌত্তলিকতা বিষয়ক মতকেও দলিল-প্রমাণ দ্বারা খন্ডন করেন ।

মাওলানা আকরম খাঁ দেখলেন, যে কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে খৃষ্ট ধর্ম দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা হলো তাদের এ কয়েকটি বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস: যীশুর বিনা বাপে জন্ম হওয়া, ক্রুশে তাঁর মৃত্যুবরণ করা এবং ভৌতিক দেহ নিয়ে তাঁর স্বর্গে গমন করা । খৃষ্টান পাদ্রীগণ আরো প্রচার করতে থাকেন যে, বাবা আদম (আঃ) কোন কালে দুটি গমের রুটি খেয়ে অপরাধী হন । তাঁর এ পাপ রক্তের মধ্যদিয়ে সমস্ত বনি আদমের দেহে সংক্রমিত হয় । তাই সদাপ্রভু প্রেমবশত নিজের ঔরসজাত যীশু খৃষ্টকে কুরবানী করে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন । এখন মানুষ যতই পাপ করুক না কেন, যীশুর কুরবানীতে বিশ্বাস করলেই তার নিস্তার অনিবার্য । অন্যথায় তার সমস্ত পুণ্যকর্ম ব্যর্থ । মাওলানা আকরম খাঁ দেখলেন, যদি তাদের উক্তসব ভিত্তিহীন বিশ্বাসগুলোর অসারতা প্রমাণ করা যায়, তবেই ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের উৎপাত বন্ধ করা সম্ভব । তিনি বস্তুত: তাই করলেন এবং বাইবেলের ব্যাখ্যা

---

[৬৮] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৮ ।
[৬৯] আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংগালী মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা আকরম খাঁর অবদান, অপ্রকাশিত পি-এচি.ডি. অভিসন্দর্ভ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েই প্রমাণ করলেন যে, তাদের উক্তসব মতাদর্শ অসার ও ভিত্তিহীন।[৭০] কাজেই ধর্মীয় গুরুত্বের পাশাপাশি গ্রন্থখানার ঐতিহাসিক গুরুত্বও অনস্বীকার্য।

৬. পাকিস্তান নামা: আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌র বিবরণ হতে জানা যায় যে, ১৯৪০ সালের পর থেকেই পাকিস্তান আন্দোলনের জোয়ার জোরদার হয়ে উঠে। বৃটিশ সরকার ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য ক্রিপ্‌স মিশন, পার্লামেন্টারী ডেলিগেশন ও ক্যাবিনেট মিশন– এ তিনটি মিশন পাঠান। কিন্তু সমস্যার সমাধান হলো না, এমনকি শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে একটি সমঝোতা সৃষ্টির জন্য মালাবার হিলে গান্ধী-জিন্নাহর কয়েক দিনের আলোচনাও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৭১] এ অবস্থায় দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র উপর এক আততায়ীর আকস্মিক আক্রমণের ফলে সমগ্র দেশে দেখা দিল দারুণ উত্তেজনা। উল্লেখ্য যে, আল্লামা মাশ্‌রেকীর এক গোঁড়া শীষ্য জিন্নাহর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে ছুরিকা উত্তোলন করে। অসাধারণ মনোবলের জন্যই এই আকস্মিক আক্রমণের কবল থেকে কায়েদে আজম প্রাণে বেঁচে যান।[৭২]

উপরোক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে পাকিস্তান আন্দোলনকে ভিত্তি করে মাওলানা আকরম খাঁ 'পাকিস্তান নামা' গ্রন্থখানা প্রকাশ করেন। কাজেই এর ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক গুরুত্ব অনেক। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কায়েদে আজমের ওপর আততায়ীর আকস্মিক আক্রমণে লেখকের মনে যে বেদনা পুঞ্জীভূত হয়েছিল তা হালকা করার জন্যই তিনি এ পুস্তকখানা লিখেছেন।[৭৩] অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, গ্রন্থখানা মূলতঃ রচনা করেছেন ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী। পরে মাওলানা আকরম খাঁ তা কিছুটা পরিবর্তন সাপেক্ষে স্বীয় নামে প্রকাশ করেন।[৭৪]

---

[৭০] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৪২২।
[৭১] আ. কা. মু. আবদুল্লাহ্‌, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৬৭-৬৮।
[৭২] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৬৮।
[৭৩] আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৫৯।
[৭৪] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ২৫৯-৬০।

Dhaka University Institutional Repository

৭. এছলামের রাজ্য শাসন বিধান ঃ এ গ্রন্থে মাওলানা আকরম খাঁ ইসলামী রাষ্ট্রের ২০টি মূলনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতি বিষয়ক একটি ব্যাপক ও ধর্ম-তাত্ত্বিক আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। তাই এর ধর্মীয় গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এতদ্‌সত্ত্বেও গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে যেসব ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে এ গ্রন্থের ঐতিহাসিক গুরুত্বকেও খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই।

গ্রন্থের সূচনালগ্নে ইসলামের এক ব্যাপক ও অভিনব ধারণা তিনি উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ব্যক্তিগত বা ব্যষ্টিগতভাবে জীবন সাধনার জন্য যেসব কল্যাণকে অর্জন করা এবং যেসব অকল্যাণকে বর্জন করে চলা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য, ইসলামের দৃষ্টিতে সেই অর্জন ও বর্জনের সমুদয় শিক্ষণ ও সাধনাই ধর্মের অঙ্গীভূত। সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও ধর্মনীতি প্রভৃতি নামে মানব জীবনের আলাদা কোন বিভাগ ইসলামে নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে অধ্যাত্ম জীবনের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করা এবং এবাদত-বন্দেগীও যেমন মানুষের ধর্ম, ঠিক তদ্রুপ আর্থিক জীবনের উন্নতি করা, সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, এমনকি স্ত্রীর সাথে প্রেমালাপও তার ধর্ম। সংক্ষেপে, মানুষের জীবন-সাধনাকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করার এবং এ সাধনাকে জীবনের সকল স্তরে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার স্বাভাবিক বিধানের নামই ইসলাম।[৭৫]

মাওলানা আকরম খাঁর মতে, স্থান, কাল ও পাত্রাদি অনুসারে জাতির হিতার্থে মুসলিম সমাজ নিজেদের রাষ্ট্র নায়ক নির্বাচনের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা সঙ্গত মনে করবেন, তা অবলম্বন করতে পারবেন। সে পদ্ধতি খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে অবলম্বিত পদ্ধতি হোক বা তার বাইরের কোন একটা অভিনব পদ্ধতিই হোক। এ প্রসঙ্গে তিনি ঐতিহাসিক বিবরণ টেনে এনে বলেন, বাস্তব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে স্পষ্টত: দেখা যাবে যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের বিশেষত: প্রথম তিন খলিফার পদাধিকার ও শাসন পরিচালনার ব্যাপারে বস্তুত: আল্লাহর কোনো আদেশ বা

---

[৭৫] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'এছলামের রাজ্যশাসন বিধান', মাওলানা আকরম খাঁ, আবু জাফর (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৪২১।

Dhaka University Institutional Repository

নিষেধের ব্যতিক্রম করা হয়নি। বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বাধীন অধিকারের সদ্ব্যবহারই করা হয়েছিল। বিভিন্ন খলিফার নির্বাচনে বা মনোনয়নে তাই জাতির মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল। ইসলামের শিক্ষায় এই নির্দেশটিতে দেখা যায় যে, মুসলিম রাষ্ট্রের সুশাসনের জন্য একজন আমীর বা ইমামের প্রতিষ্ঠা সর্বপ্রধান আবশ্যক। তাঁদের প্রতিষ্ঠা হবে কোন্ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনে, আল্লাহ্‌র আইনে বা রসূলের সুন্নাতে তার কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি। সকল যুগের, সকল দেশের ও সমগ্র মানব সমাজের জন্য এ শ্রেণীর কোনো আইন গঠন করে দেয়া সঙ্গতও হতে পারে না।[৭৬]

অবস্থার পরিবর্তনে ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ মন্তব্য করেন যে, এ পদ্ধতি ইসলামের অনেক ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। যেমন- সফরে নামাজ কসর করা, মতান্তরে নামাজ জমা করা ও অবস্থা বিশেষে কাজা করা, জিহাদের ময়দানে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করা, অজু ও ফরজ-গোসলের জন্য পানির অভাবে মাটি দিয়া তায়াম্মুম করার নির্দেশ ইসলামে দেয়া হয়েছে। নিতান্ত আবশ্যক হলে হারাম জিনিসও তখনকার জন্য হালাল হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মাজীদে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, ইসলামে সংকীর্ণ বা দুঃসাধ্য কোন ব্যবস্থাই প্রদান করা হয়নি [সূরা হজ্জ, ৭৭]। অবস্থা ভেদে শরীয়তের কতকগুলি অবস্থা পরিবর্তন হওয়া যে বৈধ ও সঙ্গত,এ সকল দলিল হতে তার স্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়।[৭৭]

এ প্রসঙ্গে তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্যও ঐতিহাসিক গুরুত্বের দাবীদার। তিনি বলেনঃ

> "হজরত রছুলে করিমের এন্তেকালের পর তাঁহার নিকট হইতে নির্দেশ পাওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা থাকিল না। এদিকে এছলাম রাজ্যের আয়তন ক্রমশঃই বিশাল হইতে বিশালতর হইয়া চলিল। রাষ্ট্রে ও সমাজ জীবনে নিত্য নূতন সমস্যার উদ্ভব হইতে লাগিল। তখন মহামান্য খোলাফায়ে রাশেদীন কোরআন ও ছুন্নাতের উপরোক্ত প্রকার নীতিগুলির অনুসরণে এবং নিজেদের জ্ঞান-বিবেক ও যোগ্য

৭৬ মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'এছলামের রাজ্যশাসন বিধান,' পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪৩১।
৭৭ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪৫৬-৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিদের পরামর্শ অনুসারে সে সমস্যাগুলির সমাধানও করিয়া দিতে লাগিলেন। একটি উন্নতিশীল জাতির ও তাহার নেতার পক্ষে যাহা করণীয়, সে সব করিতে তাঁহারা ত্রুটি করিলেন না। ফলে বহু নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তনতো হইলই, তাহা বাদে দরকারমত শরীয়তের কোনো কোনো নির্দ্দেশেরও ব্যতিক্রম বা পরিবর্ত্তন করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইলেন না।"[৭৮]

মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর উপর্যুক্ত বক্তব্যের সমর্থনে বহু ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণা করেছেন তাঁর এ গ্রন্থে। যেমন : রাসূলে কারিম (সা:)-এর জীবদ্দশায় কুরআন সংকলিত না হলেও হযরত আবু বকর (রা:)-এর খিলাফত আমলে প্রয়োজনের তাগিদে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কুরআন সংকলন,[৭৯] রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর জীবদ্দশায় প্রচলিত কুরআন তিলাওয়াতের সাতটি পদ্ধতির পরিবর্তে হযরত উসমানের (রা:) সময়ে একটি মাত্র সার্বজনীন পদ্ধতির প্রচলন,[৮০] যা বর্তমানেও প্রচলিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত প্রচলিত থাকবে ইত্যাদি।

মাওলানা আকরম খাঁ প্রামাণ্য ঐতিহাসিক সূত্রে আরও উল্লেখ করেন যে, আজকাল জুমুআর দিন দুইবার আজান দেওয়া হয়–একবার খোৎবা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে, আর একবার খোৎবার জন্য ইমাম সাহেব মিম্বরের উপর বসার পর। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সময়ে এবং আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) ও উমর ফারুক (রাঃ)-এর খিলাফত যুগে প্রথমোক্ত আজান প্রচলিত ছিলনা। তাঁদের ইন্তেকালের পর হযরত উসমানের (রাঃ) সময়ে লোকসংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। তখন তিনি খোৎবা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে মসজিদের বাইরে অবস্থিত 'জাওরা' নামক একটি উঁচুস্থানে দাঁড়িয়ে আর একবার আজান দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। তখন হতে জুমুআর দুই আজান প্রচলিত হয় (বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিজী, নাছায়ী)। জুমুআর আজান সম্বন্ধে কুরআন মাজীদেও উল্লেখ আছে। উক্ত আয়াতে এক আজান দেয়ারই পরোক্ষ নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায় (সূরা জুমু'আ, আয়াত ৯)। সুতরাং স্পষ্টত: দেখা যাচ্ছে যে, এ নূতন ব্যবস্থার কোনো সমর্থনই আল্লাহ্‌র কিতাবে বা তাঁর

---

[৭৮] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪৫৭।
[৭৯] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪৬২-৬৩।
[৮০] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪৬৩-৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

রসূলের সুন্নাতে বিদ্যমান ছিলনা। অবস্থার পরিবর্তন অনুসারে হযরত উসমান (রাঃ) এ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।[৮১]

মাওলানা আকরম খাঁ ইমাম নির্বাচন পদ্ধতি, মজলিস-ই-শূরা ও ইমাম নির্বাচনে এর গুরুত্ব এবং বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদীনের মনোনয়ন বা নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম তিন খলিফার নিয়োগ সম্বন্ধে হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) স্বতন্ত্র বা সমবেতভাবে বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর পরবর্তী দুই খলিফার অনুসরণ করার জন্য মুসলিম সমাজকে পুনঃ পুনঃ তাকিদ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স) এর একখানা হাদীস উদ্ধৃত করেন এভাবে– "ছাহাবী হোজায়ফা (রাঃ) বলেন: রাছুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা অনুসরণ করিবে আমার পরবর্ত্তী দুইজনের – আবুবকর ও ওমরের (রাঃ) (তিরমিজী, আহমাদ)"।[৮২] অতঃপর তিনি বলেন যে, এ দুইজন মহিমান্বিত খলিফার জীবনেতিহাস হতে তিনটি নজীর সংগৃহীত হতে পারে। প্রথমত: হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নির্বাচন, দ্বিতীয়ত: হযরত উমর (রাঃ)-এর মনোনয়ন এবং তৃতীয়ত: হযরত উসমান (রাঃ)-এর নির্বাচন সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক মনোনয়ন বোর্ড বা 'Electoral College' গঠন। তাঁর মতে, এ তিন খলিফার নির্বাচন পদ্ধতিতে বাহ্যিক যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তা মানুষের দৃষ্টিভ্রম ছাড়া কিছু নয়। কারণ এ তিন খলিফার নিয়োগই মূলত: ও বস্তুত: ইসলাম নির্ধারিত একই নীতির অনুসরণে সম্পাদিত হয়েছে এবং তা হচ্ছে– জনমতের সমর্থন লাভের অপরিহার্যতাকে কথায় ও কাজে স্বীকার করা। তিন খলিফার প্রত্যেকেই এ সমর্থন লাভ করেছিলেন।[৮৩]

অতঃপর মাওলানা আকরম খাঁ উপর্যুক্ত তিন খলিফার নির্বাচন প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন, ইসলামের দৃষ্টিতে এবং ইতিহাসের আলোকে

---

[৮১] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪৬৪।
[৮২] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫১৫।
[৮৩] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫১৬।

Dhaka University Institutional Repository

যার গুরুত্ব অবশ্যই অনস্বীকার্য।[৮৪] অবশ্য হযরত আলীর (রাঃ) খলিফা হওয়ার বিষয়টি ছিল ব্যতিক্রম। আর এর অন্যতম কারণ ছিল তদানীন্তন পরিবেশ-পরিস্থিতি। মাওলানা আকরম খাঁর এ আলোচনা হতে তাঁর ইতিহাস সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায়। অতঃপর মাওলানা সাহেব জনমতের গুরুত্ব প্রসঙ্গে ওহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতি, স্থান নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ক একটি ব্যাপক ও বিশ্লেষণমূলক বিবরণ প্রদান করেন। এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি টেনে এনে তিনি নিজেকে একজন সফল ও সচেতন ঐতিহাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।[৮৫]

তাঁর উপর্যুক্ত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থসমূহ ধর্ম ও সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত, যা আমাদের ঐতিহ্য সচেতন হতে সাহায্য করে। তাঁর রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে পতন যুগের ইতিহাস, আবদুর রসুল, বাংলা সাহিত্য ও মুছলমান, মোছলেম বঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মুছলমানের জাতিত্ব ও সংস্কৃতি, এছলামের আদর্শ, হজরতের প্রাক্ নবুয়ত সমাজ সেবা, আমাদের ইতিহাস ইত্যাদি প্রবন্ধ ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত এবং এগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রবন্ধগুলোতেও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক বিভিন্ন উপাদান কমবেশী দৃষ্টিগোচর হয়, যা তাঁকে একজন সফল ঐতিহাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

মুসলিমদের রাজনৈতিক সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে মাওলানা আকরম খাঁ অনেক রাজনৈতিক ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধও রচনা করেন। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বার্ষিক মোহাম্মদী পত্রিকার 'আবদুর রসুল' নামক এক রাজনৈতিক নিবন্ধে তিনি লিখেন, আত্মসম্মান জ্ঞানই মানুষের মুক্তির লিপ্সার জনক। যার মনে সত্যিকার আত্মসম্মান জ্ঞানের লেশমাত্রও আছে, সে নিজেকে এবং নিজের দেশবাসীকে কোন পরজাতির অধীনতার পাশে আবদ্ধ দেখে স্থির থাকতে পারেনা। লাঞ্ছিত উৎপীড়িত পরপদদলিত স্বজাতির মুক্তির জন্য তার প্রাণ স্বতঃই ব্যাকুল হয়ে উঠে এবং সে তার

---

[৮৪] বিস্তারিত দেখুন, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫১৬-২৬।
[৮৫] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৩২-৪২।

Dhaka University Institutional Repository

উপায়গুলো আঁকড়ে ধরতে চায়।[৮৬] ১৯৩০ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর সুরমা ভেলী মুসলিম সম্মেলনে মাওলানা আকরম খাঁ সভাপতি নির্বাচিত হন এবং এ উপলক্ষে রচিত তাঁর অভিভাষণে তিনি মুসলিমদের সমস্ত সংশয় দূর করে বৃটিশ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামে পূর্নোদ্যমে অংশগ্রহণের আহবান জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট ও দৃঢ় ভাষায় ঘোষণা করেন:

> "এছলাম মুক্তিরই প্রতীক-গোলামীর পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তাহার স্থিতি ও পুষ্টি এক প্রকার অসম্ভব। মুছলমান একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্ব করিবে এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত দুনিয়ার আর কোন ভাবের বস্তুর, ব্যক্তির বা শক্তির দাসত্ব সে কখনও কোন মতে স্বীকার করিবেনা– ইহা তাহার কলেমায় তাওহীদের একমাত্র শিক্ষা এবং ইহাই হইতেছে তাহার তাওহীদের মূলমন্ত্র। ... পরাধীন জীবনে তাওহীদের পূর্ণভাব কখনও বিকাশ লাভ করিতে পারেনা। ... যাহা সত্য তাহাই কহিতে হইবে এবং যাহা ন্যায্য তাহাই করিতে হইবে – ইহাই হইতেছে আল্লাহ্‌র হুকুম। কিন্তু পরাধীন জীবনে আমরা সত্য পালন করিতে ও ন্যায্য হইতে বারিত থাকিতে বাধ্য হই, অনেক সময় রাজদন্ডের ভয়ে এমন কথা বলি ও এমন কাজ করি, যাহা আমার জ্ঞান ও বিবেক অনুসারে অসত্য ও অন্যায়। ... ফলত: পরাধীন জীবনে মুছলমানের ঈমান যেমন সুস্থভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারেনা, শরীয়তও তদ্রুপ অক্ষত দেহে তিষ্টিতে পারেনা।"[৮৭]

বস্তুত: মাওলানা আকরম খাঁ স্বীয় অভিভাষণে এ ধরনের তেজস্বী বক্তব্যের মাধ্যমে নিজেদের ধর্মীয় অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই মুসলিমদের রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেন। কাজেই এক্ষেত্রে আমরা তাঁর ঐতিহ্য চেতনার প্রমাণ পাই এবং এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রবন্ধে মাওলানা আকরম খাঁ মুসলিমদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যেমন সচেতন করতে সচেষ্ট ছিলেন, তেমনি ভবিষ্যৎ শাসন সংস্কারে বাংলার মুসলিমদের রাজনৈতিক অধিকার যেন বৃদ্ধি পায় সে লক্ষ্যেও লেখনী পরিচালনা করেন। বস্তুত: মুসলিমদের রাজনৈতিক অধিকার বৃদ্ধি ছিল তাঁর

---

[৮৬] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'আবদুর রসুল', বার্ষিক মোহাম্মদী, কলকাতা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, পৃ ঃ ১৬২।
[৮৭] সাপ্তাহিক আহলে হাদিস, কলকাতা, ২রা অক্টোবর, ১৯৩০, পৃ ঃ ৭।

Dhaka University Institutional Repository

এসব রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনার মূল উদ্দেশ্য।[৮৮] বাংলার মুসলিমদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে তিনি যেসব রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা করেন, সেগুলোর মধ্যে 'হক ছাহেব কোন্ পথে?', 'মুক্তি অভিযান', 'সিরাজগঞ্জ সম্মেলন সম্বন্ধে' প্রভৃতি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। বাংলার মুসলিম রাজনীতির বিভিন্ন সংকট সন্ধিক্ষণে লিখিত মাওলানা আকরম খাঁর এ প্রবন্ধগুলো এতদঞ্চলের মুসলিমদের সমকালীন রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা দিতে সমর্থ হয়। কাজেই এগুলোর রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

'মুছলমানের জাতিতত্ত্ব ও সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে মাওলানা আকরম খাঁ মুসলিম জাতি ও মুসলিম সংস্কৃতির এক সুস্পষ্ট ধারণা উপস্থাপন করে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন।[৮৯] অতঃপর তিনি সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনামূলক আলোচনা করেন এবং মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন।[৯০] কোন জাতিকে ধ্বংস করার পূর্বশর্ত হল সে জাতির সংস্কৃতি সমূলে বিনাশ করে দেয়া। সংস্কৃতির বিনাশ সাধন সম্ভব না হলে উক্ত জাতির ধ্বংস সাধন সম্ভব নয়। তাই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই কোন জাতির ধ্বংস সাধনের মূল হাতিয়ার। ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত অজস্র, যা মাওলানা আকরম খাঁর দৃষ্টিও এড়ায়নি। তিনি এ প্রসঙ্গে উক্ত প্রবন্ধে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, দুনিয়ার এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতিকে পরাজিত করার চেষ্টা যেমন আবহমান কাল হতে চলে আসছে,ঠিক তেমনি এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতিকে গ্রাস বা বিধ্বস্ত করার জন্যও চিরকাল সংঘর্ষ চালিয়ে আসছে। ভারতবর্ষই এর স্পষ্ট নিদর্শন। ভারতবর্ষে আর্য্য জাতির আবির্ভাব ও অভ্যুত্থানের পূর্বে এখানে যেসব জাতি বাস করত, তাদের একটা বিশিষ্ট ও উন্নত ধরনের সভ্যতা ছিল। আর্য্যরা ক্ষাত্রশক্তি বলে তাদের পরাজিত করে। পক্ষান্তরে এই আর্য্য জাতি আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরজাতি কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং গত এক হাজার বছর হতে তারা পরজাতির অধীনতাপাশে

---

[৮৮] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'মোছলেম বঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি', দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ৫ ও ১২ই পৌষ, ১৩৪৩: সহ দ্রষ্টব্য: মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৪৩, পৃ ঃ ৮০১-৭।

[৮৯] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'মুছলমানের জাতিতত্ত্ব ও সংস্কৃতি', মাওলানা আকরম খাঁ, আবু জাফর (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩৭৮-৭৯।

[৯০] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩৮০-৮১।

Dhaka University Institutional Repository

আবদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু এই দুই জাতির বর্তমান অবস্থার মধ্যে আজ আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখা যাচ্ছে। ভারতের সেই সুসভ্য ও উন্নত আদিম জাতি দীর্ঘকাল হল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আর দীর্ঘকালের পরাধীনতাসত্ত্বেও এখানকার আর্য্য জাতি আজও জাতি হিসেবে টিকে আছে এবং পুনরায় জয়যাত্রার আয়োজন করছে। এই প্রভেদ-পার্থক্যের একমাত্র কারণ এই যে, আর্য্য জাতি আদিম অধিবাসীদের দেশ জয় করেই ক্ষান্ত হয়নি, পরাজিতদের সংস্কৃতিকেও সেই সঙ্গে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করে ফেলেছে। নিজেদের সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলার এবং যুগপৎভাবে পরজাতীয় সংস্কৃতির দাসত্বে আত্মসমর্পণ করার ফল আজ এই দাঁড়িয়েছে যে, বর্তমান ঘৃণিত জীবনের জঘণ্যতার অনুভূতি হতেও আজ তারা বঞ্চিত হয়ে পড়ছে। এ তারতম্যের কারণ এই যে, পরাজিত জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিধ্বস্ত করে দেয়া এবং নিজেদের সংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পন করতে তাদেরকে বাধ্যকরাই ছিল তখনকার সেই আর্য্য বিজেতাদের নিষ্ঠুর শাসনের একমাত্র উদ্দেশ্য।[৯১]

অতঃপর মাওলানা আকরম খাঁ হিন্দু সংস্কৃতি কর্তৃক মুসলিম সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে বিপুল ও ব্যাপক আগ্রাসন পরিচালিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে বলেন,স্কুল-পাঠশালার জন্য নির্ধারিত বই-পুস্তকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় এবং সাহিত্যে সাধারণভাবে তার অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। এই সর্বনাশী অভিযানের অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ করার জন্য দূরদর্শী মুসলিমগণ অনেকদিন হতে চেষ্টা করে আসছেন। এ অভিযান সম্বন্ধে সমাজকে সচেতন করার লক্ষ্যে তিনিও যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি। ইউনিভার্সিটি সংখ্যা 'মাসিক মোহাম্মদী'-র ভূমিকার শেষভাগে তিনি বলেছেন- 'মুছলমান এই সমস্ত অভিযোগের বিচার ও প্রতিকার চায়'।[৯২] এভাবে মুসলিম সমাজকে ঐতিহ্য সচেতন করার মাধ্যমে তিনি একজন সচেতন ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

মাওলানা আকরম খাঁ 'হজরতের প্রাক-নবুয়ত সমাজ সেবা' শীর্ষক প্রবন্ধে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুয়ত পাপ্তির পূর্বে তদানীন্তন সমাজের রূপরেখা

---

[৯১] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩৮১-৮৩।
[৯২] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩৮৫-৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

ও সার্বিক অবস্থা এবং 'হল্‌ফুল ফজুল' নামক সেবা সংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর সমাজ সেবার যে সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল বিবরণ দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে তাঁর ইতিহাস সচেতনতার প্রমাণ বহন করে এবং তাঁকে একজন ইতিহাসবিদ্ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ প্রবন্ধে তিনি আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শুধু একজন নবী বা রাসূলই ছিলেন না, তিনি একজন মহান সমাজ সংস্কারক এবং সমাজ সেবকও ছিলেন। তিনি শুধু নবুয়ত প্রাপ্তির পরই সমাজ-সংস্কারকের মহান দায়িত্ব পালন করেননি, বরং এর পূর্বেও সমাজের একজন সচেতন ব্যক্তি হিসেবে সমাজ সেবার দায়িত্ব নিঃস্বার্থভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি তদানীন্তন আরববাসীদের কতিপয় সমাজ সচেতন ব্যক্তির সহযোগিতায় যে সেবা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন, তা যুগযুগ ধরে মুসলিমদের জন্য সমাজ সেবার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে।

মাওলানা আকরম খাঁ প্রবন্ধের শুরুতেই আরবদের বার্ষিক মহাসম্মেলন 'ওকাজ মেলা' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৯৩] মাওলানার বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, ওকাজ মেলাকে কেন্দ্র করেই 'ফেজার যুদ্ধ'-এর দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে এবং ক্রমান্বয়ে তা হেজাজের প্রায় সকল গোত্র ও গোষ্ঠীতে ছড়িয়ে পড়ে। মহানবী (সঃ) তখন কৈশোরকাল অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেন এবং স্বয়ং এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সাঃ) নিজে বলেন: "আমি আমার পিতৃব্যগণকে শত্রুপক্ষের 'তীর' হইতে রক্ষা করিতেছিলাম– অর্থাৎ শত্রুপক্ষ তাঁহাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিলে আমি সেই তীর ফিরাইয়া দিতাম।"[৯৪] এ অন্যায় সমর পাঁচ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে মহানবী (সঃ) যুদ্ধের তীব্র ভয়াবহতা ও সহিংসতা এবং ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেলেন এবং নীরবে ধী-গভীর দৃষ্টিতে এই অহেতুক অনাচার ও তার করুন পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, মহানবী (সঃ)-এর পিতৃব্য জোবায়ের ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবও এ যুদ্ধে 'আলম-বরদার' বা পতাকাবাহী হিসেবে

---

[৯৩] বিস্তারিত দেখুন : মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'হজরতের প্রাক-নবুয়ত সমাজ সেবা', মাওলানা আকরম খাঁ, আবু জাফর (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩৯৯।

[৯৪] উদ্বৃত: মাওলানা আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪০০।

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ফলে তিনিও যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে নীরবে ভাবতে লাগলেন। এভাবে দুইজনের চিন্তা-চেতনার আদান-প্রদানের ফলে তাঁদের মনে নূতন চিন্তার উদয় হয় এবং সমাজের মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে তাঁরা আরও কতিপয় সমাজ সচেতন ব্যক্তির সহযোগিতায় 'হল্‌ফুল-ফজুল' নামক সেবা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।[৯৫]

'হল্‌ফুল ফজুল' হচ্ছে মূলত: ফজুল প্রতিজ্ঞা। তাঁরা সম্মিলিতভাবে যে প্রতিজ্ঞা করেন, মাওলানা আকরম খাঁ এ প্রবন্ধে তার বিবরণ প্রদান করেছেন।[৯৬] এ প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে তিনি বলেন:

> "সমবেত জনগণ আল্লাহ্‌র নামে হলফ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, তাহারা উৎপীড়িত ও অত্যাচারিতের পক্ষ সমর্থন করিবেন এবং অত্যাচারীর নিকট হইতে লোকের স্বত্বাধিকার আদায় না করিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। যতদিন সমুদ্রে একটি লোম সিক্ত করার মত পানি অবশিষ্ট্য থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা বলবৎ রহিবে।"[৯৭]

এ প্রতিজ্ঞা অনুসারে কিছুদিন পর্যন্ত বেশ কাজ হয়েছিল, তবে কালক্রমে বিশেষত: ইসলাম আবির্ভূত হওয়ার পর কোরেশ দলপতিগণ এ প্রতিজ্ঞার কথা প্রায় বিস্মৃত হয়ে গেলেন। কিন্তু মহানবী (সঃ) জীবনের কোন মূহুর্তে এ প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

> "আজও যদি কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি বলে– 'হে ফজুল প্রতিজ্ঞার ব্যক্তিবৃন্দ!' আমি নিশ্চয় তাহার সেই আহবানে সাড়া দিব। কারণ এছলাম আসিয়াছে ত কেবল ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং উৎপীড়িত, অত্যাচারিতকে সাহায্য করিতে।"[৯৮]

'আমাদের ইতিহাস' শীর্ষক প্রবন্ধে মাওলানা আকরম খাঁ মুসলিমদের ইতিহাস চর্চার আবশ্যকতা ও এর গুরুত্ব, জাতীয় ইতিহাস চর্চার সীমাবদ্ধতা ও

---

[৯৫] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪০০-৪০২।
[৯৬] দেখুন, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪০৩।
[৯৭] উদ্বৃত: মাওলানা আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪০৩।
[৯৮] উদ্বৃত: মাওলানা আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪০৪।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধকতা, উত্তরণের উপায়, ইতিহাস রচনার কতিপয় উপকরণ, সুলতান মুহাম্মদ বিন্ তুঘলককে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারানীর পরস্পর-সাংঘর্ষিক বক্তব্য অর্থাৎ বিপরীত মুখী আলোচনা এবং এর যথার্থতা বিশ্লেষণ, প্রসঙ্গক্রমে সমসাময়িক ধর্মীয় সাহিত্যের আলোকে সে সময় ও সমাজের বিভিন্ন মনীষীর সাথে মুহাম্মদ বিন্ তুঘলকের সম্পর্ক, তদানীন্তন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি এবং মুসলিম মন-মানসে এর প্রভাব, ভারতীয় সঙ্গীত ও মুসলিমদের সঙ্গীতের সমন্বয় ইত্যাদি বিষয়ে ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত তথ্যবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন, যা তাঁকে একজন সচেতন ঐতিহাসিক হিসেবে আমাদের সামনে প্রতিভাত করে তোলে ।

মাওলানা আকরম খাঁ সত্যিকার অর্থে একজন ইতিহাস-ঐতিহ্য সচেতন ব্যক্তি ছিলেন । মুসলিমদের ইতিহাস চর্চার আবশ্যকতা ও এর গুরুত্ব তিনি পুরো মাত্রায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন । তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্যেই এর প্রমাণ পাওয়া যায় । তিনি বলেন:

> "আজ আমাদের বিশেষ আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অতীতের ইতিবৃত্ত নিয়া দার্শনিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়ার, তার সার শিক্ষাগুলি আয়ত্ত করিয়া নেওয়ার – অতীতের সেই অভিজ্ঞতা যেন বর্ত্তমানে চলার পথকে নিয়ন্ত্রিত ও আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে । রাজনৈতিক গোলামীর অভিশাপে এবং নিজেদের কর্ম্মফলে এই সাধনা হইতে আমরা এতদিন বঞ্চিত হইয়া ছিলাম । আল্লার ফজলে সে সব বাধাই আজ দূরীভূত হইয়া গিয়াছে ।"[৯৯]

আমাদের জাতীয় ইতিহাস চর্চার সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে তিনি উক্ত প্রবন্ধে বলেন, এ সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ার সময় আমাদের সর্বপ্রথম বুঝতে হবে যে, এ দীর্ঘ দশ শতকের (এক হাযার বছরের) নানামুখী সমাজ জীবনের সম্যক পরিচয় লাভ করা দুঃসাধ্য না হলেও খুব সহজসাধ্য ব্যাপারও নয় । এর প্রথম ও প্রধান কারণ এই যে, আলোচ্য সময়ের ইতিহাস পুস্তকগুলি উচ্চাঙ্গের ফার্সী ভাষায়

---

[৯৯] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'আমাদের ইতিহাস', মাওলানা আকরম খাঁ, আবু জাফর (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৫৮৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

লিখিত এবং সেগুলি প্রধানত: নওয়াব-বাদ্শাহ ও আমীর-ওমারার উত্থান-পতনের বিবরণে সীমাবদ্ধ। দরবারী আওতার বাইরে অবস্থিত বিপুল মুসলিম জনগণের বিশেষ কোন পরিচয় ঐ সকল ইতিহাসে সাধারণত: খুঁজে পাওয়া যায়না। সমসাময়িক মূল ইতিহাসগুলি বাদে পরবর্তী যুগে যেসব ইতিহাস রচিত হয়েছে, সেগুলি একদিক দিয়ে আরও বেশী নিরর্থক। আরবীয় যুগের ঐতিহাসিক সাহিত্যের ও ইতিহাস-দর্শনের স্বয়ং সম্পূর্ণতা এক্ষেত্রে বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছে।[১০০]

তিনি শুধু ইতিহাস রচনার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেই আলোকপাত করেননি, বরং এ থেকে উত্তরণের উপায় এবং ইতিহাস রচনার উপকরণ সম্পর্কেও তিনি এ প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি যে একজন প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ ঐতিহাসিক ছিলেন, এক্ষেত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে, এক্ষেত্রে হতাশ হওয়ারও কোন কারণ নেই। সমসাময়িক সাহিত্যের আশ্রয় নিয়ে ইতিহাসের এই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোর ক্ষতিপূরণ অতি সহজে করা যেতে পারে। বলা আবশ্যক যে, এদিকে যথাযথভাবে নজর না দেয়ার ফলেই আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস আজও নানা প্রকার সর্বনাশকর ভ্রমপ্রবাদে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। নিজেদের অতীত ইতিহাস হতে আজও যে কোন অভিজ্ঞতা বা অনুপ্রেরণা সঞ্চয় করা সম্ভব হয়নি, তার প্রধান কারণ এটাই। মুসলিম জাতির ভাব-অভাব, ধ্যান-ধারনা, জ্ঞান-বিশ্বাস, সংস্কার-অন্ধবিশ্বাস, সুকীর্তি-কুকীর্তি, ধর্মীয় বাক্‌বিতন্ডা, কাব্য-সঙ্গীত, কেচ্ছা-কাহিনী, দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি যা কিছু সংগ্রহ করা যায়,তার প্রতিটি পাতা সযত্নে সঞ্চয় করতে এবং ধৈর্য্যের সাথে তার অনুশীলন করতে হবে। শুধু মুসলিমদের লিখিত সাহিত্যে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করে রাখলেও চলবেনা। এক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য সমসাময়িক হিন্দু সাহিত্যের অনুশীলন করারও বিশেষ প্রয়োজন।[১০১]

অতঃপর মাওলানা আকরম খাঁ এ প্রবন্ধে সুলতান মুহাম্মদ বিন্ তুঘলক সম্পর্কে ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারানীর পরস্পর বিরোধী বক্তব্য এবং এর যথার্থতা

---

১০০ মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'আমাদের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৮৭।
১০১ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ঐতিহাসিকদের বক্তব্য অনুসারে সুলতান মুহাম্মদ বিন্ তুঘলক একাধারে আদর্শ চরিত্র ফেরেশতা এবং অতি নীচাশয় শয়তান-উভয়ই এবং জিয়াউদ্দীন বারানী তাঁর 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে সুলতানের এই চরিত্র-বৈষম্যের পরিচয় দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে বারানীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আমাদের দেশের স্কুল-পাঠশালার মুসলিম ছাত্ররাও আজ বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছে যে, মুহাম্মদ বিন্ তুঘলক একদিকে যেমন অসাধারণ প্রতিভা, অকৃত্রিম বিদ্যানুরাগ, অতুলনীয় অধ্যবসায় ও নিঃস্বার্থ দানশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, অপরদিকে তেমনি নিষ্ঠুরতা, অদূরদর্শিতা ও অস্থির চিত্ততার জন্য তাঁর সবধরনের সাধু চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে। একাধারে এরূপ বিপরীত গুণের সমাবেশ বাস্তবিকই বিরল।[১০২] এরপর তিনি বলেন যে, মানুষের জীবনে একাধারে এরূপ বিপরীত গুণের সমাবেশ শুধু বিরল নয়, বরং অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে বারানীর সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, সমসাময়িক সাহিত্যের সাহায্য গ্রহণ করলে দেখা যাবে যে, জিয়াউদ্দীন বারানী যে বিষয়গুলিকে সুলতানের প্রধানতম দোষ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, বস্তুত: সেগুলোই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠতম গুণ।[১০৩]

সমসাময়িক ধর্মীয় সাহিত্যের আলোচনার মাধ্যমে মাওলানা আকরম খাঁ আমাদের সামনে নিম্নোক্ত ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ তুলে ধরেন:

১. তাতারী ফেৎনার পর মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

২. ভারতবর্ষ তাতারী আক্রমণ হতে রক্ষা পেলেও তাদের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া হতে নিরাপদ থাকতে পারেনি।

৩. বেশরা পীর-ফকিরদের প্রবর্তিত কদাচারে এবং বিদেশাগত নাস্তিক পন্ডিতগণের প্রচারিত গ্রীক ও ভারতীয় দর্শন, তন্ত্রযোগ ও অন্যান্য বাতিল আক্বীদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম এদেশে চরমভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে।

---

[১০২] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

৪. মুসলিম বিশ্বের এই ঘোর বিপদের সময় আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় যে শক্তিমান মুজাহিদ ও মুজাদ্দিদের আবির্ভাব ঘটে, তিনি হচ্ছেন অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ আলিম শায়খুল্‌ ইসলাম ইমাম তাকিউদ্দীন ইব্‌নে তায়মিয়া।

৫. ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়া আজীবন শির্ক, বিদ্‌আত, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার, বিচারহীন অন্ধ অনুকরণ ও অন্ধ আনুগত্য এবং বৈদান্তিক ও পৌত্তলিক ভাবধারার অনাচারের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন।

৬. ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়ার একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী মাওলানা শামসুদ্দীন ইবনুল হোওয়ায়রী কর্তৃক ভারতে বিশুদ্ধ হাদীস চর্চার সূচনা হয়।

৭. সুলতান মহাম্মদ বিন্‌ তুঘলক একজন বড় মাপের আলিম ছিলেন এবং সে যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম, 'মাওয়াফিক্‌' রচয়িতা কাজী শাহ্‌ আজদুদ্দীন ছিলেন তাঁর উস্তাদ।

৮. ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়ার একান্ত সহযোগী শিষ্য ও শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার দৌহিত্র মাওলানা এল্‌মুদ্দীন ছিলেন সুলতান মুহাম্মদ বিন্‌ তুঘলকের প্রধান ধর্মীয় উপদেষ্টা।

৯. দিল্লীর হযরত নিযাম উদ্দীন আউলিয়ার প্রতি সুলতান মুহাম্মদ বিন্‌ তুঘলকের যথেষ্ঠ ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল এবং তাঁর ইন্তিকালের পর সুলতান নিজে তাঁর লাশ কাঁধে বহন করেছিলেন।

১০. ইসলামের আদর্শ মোতাবেক দেশ শাসনের বিধান যখন ভারতবর্ষ হতে বিদায়ের পথে, তখন সুলতান মুহাম্মদ বিন্‌ তুঘ্‌লকের দ্বারাই তা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।[১০৪]

উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক তথ্য-সূত্রের সাহায্যে মাওলানা আকরম খাঁ বিভিন্ন দিকের পাশাপাশি সুলতান মুহাম্মদ বিন্‌ তুঘলকের বিভিন্ন যোগ্যতা ও গুণাবলী আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং সুলতান সম্পর্কে জিয়াউদ্দীন বারানীর ধারণা শোধ্‌রানোর চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, সুলতান মুহাম্মদের

---

[১০৩] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা, সংস্কার, দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপদ্ধতির মূল উৎস কোথা থেকে উৎসারিত হয়েছে, সমসাময়িক সাহিত্যের উক্তসব তথ্য হতে তা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয়। পক্ষান্তরে, জিয়াউদ্দীন বারানীর নিজের লেখা হতে জানা যায় যে, সে যুগের প্রচলিত ইসলাম-বিরোধী ধারণা, সংস্কার ও অনুষ্ঠানগুলোকেই তিনি প্রকৃত ইসলাম ও সুন্নাত-আল্ জামাআতের তরিকা বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সুলতান মুহাম্মদ যেসব সংস্কারের প্রবর্তন করেছেন, তা বারানীর দৃষ্টিতে এ কারণেই বিষবৎ ও বিসদৃশ বলে প্রতীয়মান হয়।[১০৫]

অতঃপর মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর প্রবন্ধে তদানীন্তন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি ও মুসলিম মন-মানসে এর প্রভাব এবং ভারতীয় সঙ্গীতের সাথে মুসলিম সঙ্গীতের সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনা ইতিহাসের দৃষ্টিকোন থেকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন এভাবে যে, দীর্ঘ হাযার বছর ব্যাপী হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের যেসব সংশ্রব বা সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল, সেসব সংশ্রব-সংঘর্ষের ফলে এই দুই বিপরীত প্রকৃতির সংস্কৃতি পরস্পরকে কি পরিমাণে প্রভাবান্বিত করতে সমর্থ হয়েছে, জাতীয় ইতিহাস সংকলনের পক্ষে তা হবে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। আমাদের জীবন-মরণ ও উত্থান-পতনের কার্য-কারণ পরম্পরার মূল সূত্র লুকিয়ে আছে সমাজ জীবনের এই উপেক্ষিত দিকটার মধ্যে। এই ক্ষেত্রে মুসলিম জাতি কোথায় কি পরিমানে হিন্দু সংস্কৃতির নিকট আত্মসমর্পণ করেছে, ইতিহাস পুস্তকগুলিতে তার সন্ধান খুব কম পাওয়া গেলেও সমসাময়িক মুসলিম সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরে, বিশেষতঃ নবাগত ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদগুলির সমর্থন ও প্রতিবাদমূলক সাহিত্যে সে সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মুসলিম সংস্কৃতি হিন্দু জাতির বিভিন্ন

---

১০৪ বিস্তারিত দেখুন, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৮৯-৯২।
১০৫ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৯২।

পর্যায়ে যে বৈপ্লবিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে তাকে মুক্তি ও মঙ্গলের পথে টেনে এনেছে, তার সন্ধান পাওয়া যাবে প্রধানতঃ হিন্দু সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরে ।[১০৬]

মাওলানা আকরম খাঁর বিবরণ হতে জানা যায় যে, ভারতীয় সঙ্গীত কলা এক সময় যে খুবই উৎকর্ষ লাভ করেছিল, তা ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের অন্যসব দিকের ন্যায় মুসলিমদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। মুসলিমগণ ভারতবর্ষে এসে এদেশের পরিবেশ-পরিস্থিতিতে ভারতীয় সঙ্গীতের চর্চা শুরু করলেন, তার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন, নানামুখী পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মধ্যদিয়ে একটা সম্পূর্ণ নূতন রূপ দান করলেন এবং অবশেষে সঙ্গীতকে মুসলিমদের নিজস্ব সম্পদে পরিণত করলেন ।[১০৭] এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ বলেনঃ

> "আমীর খোছরু, ছোলতান হোসেন শার্কী, মিয়া তানসেন এবং আরও অনেক সঙ্গীত বিশারদ মুছলমান ভারতীয় সঙ্গীতে আরবী ও পার্শী হইতে সংকলিত বহু মূল্যবান উপাদান যোগ করিয়া দিয়াছেন– অনেক নূতন তান, মান, সুর ও রাগ-রাগিনী সৃষ্টি করিয়াছেন। সেগুলি আজ ভারতীয় সঙ্গীতের অন্ততঃ অন্যতম প্রধান সম্পদ। মুছলমানেরা এদেশের সঙ্গীতকে নূতন রূপ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাতে নূতন প্রাণেরও সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার ও তাহার সৃষ্ট দেবদেবীর আবেষ্টনীর দুর্ভেদ্য দুর্গ দখল করিয়া মুছলমানরাই তাহার উপর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 'উত্তম গায়ক যত সকলে জবনে'– এ সত্যটা মোছলেম বিদ্বেষী হিন্দু লেখকগণকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে।"[১০৮]

পরিশেষে একটি বিষয়ের অবতারণা করা বিশেষ জরুরী এবং তা হচ্ছে– মাওলানা আকরম খাঁ পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের ইসলাম ও রসূল বিদ্বেষমূলক বক্তব্য কীভাবে গ্রহণ করেছেন এবং স্বীয় গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন? এর জবাবে বলা যায় যে, তিনি 'মোস্তফা-চরিত' গ্রন্থের উপক্রমণিকা অংশের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে 'হযরতের জীবনী ও পাশ্চাত্য লেখকগণ' শিরোনামে পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের ইসলাম ও রসূল-বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের শোচনীয়

---

[১০৬] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৯৪।
[১০৭] দেখুন, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৯৫।
[১০৮] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৬০১।

Dhaka University Institutional Repository

অজ্ঞতা ও জঘন্য মিথ্যাচার প্রমাণ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ ১৭শ, ১৮শ ও উনিশ শতকের ১৫খানা বইকে তিনি 'মিথ্যাবাদের বিশ্বকোষ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১০৯] তিনি ডা. স্প্রেঙ্গার, উইলিয়াম মূর, মার্গোলিয়থ প্রমুখের তীব্র সমালোচনা করেন। তাদের ভাষায়, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) 'মৃগী' বা 'মূর্ছা' রোগে পীড়িত ছিলেন। প্রমাণ হিসেবে তিনি W. Muir-এর বক্তব্যকে এভাবে উদ্ধৃত করেন : "It was probably a fit of Epilepsy."[১১০] তিনি আরও উদ্ধৃত করেন : "But uneasiness was again excited by fresh symptoms of a suspicious nature; and she (Halima) set out finally to restore the boy (Muhammad) to his mother (Amina), when he was five years of age." [১১১]

মাওলানা আকরম খাঁর বিবরণ হতে জানা যায় যে, মি. পোকক ল্যাটিন ভাষায় উল্লেখ করেনঃ "Tune maritus Halimoe; multum vereor, inquit, ne puer inter populares suos morbum Hypochondriacum contraxerit."[১১২] মাওলানা আকরম খাঁ এর অনুবাদ করেছেন এভাবে– "তখন হালিমার স্বামী কহিলেন– আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে যে, বালকটি তাহার সঙ্গীগণের নিকট হইতে Hypochondrical রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।"[১১৩] অতঃপর মাওলানা আকরম খাঁ Margoliouth-এর বক্তব্যকে উদ্ধৃত করেন এভাবে– "The condition of a fatherless lad (Mohammad) was not altogether desirable; and late in life Mohammad was taunted by his uncle Hamzah (when drunk) with being one of his father's (Abdul Muttalib's) slaves".[১১৪]

---

১০৯ বিস্তারিত দেখুন, মোস্তফা-চরিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬-৯০
১১০ ঐ, পৃঃ ১৭১
১১১ ঐ, পৃঃ ১৭১
১১২ উদ্ধৃত, মোস্তফা চরিত, পৃঃ ১৭২
১১৩ ঐ, পৃঃ ১৭২
১১৪ ঐ, পৃঃ ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে মাওলানা আকরম খাঁ পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের বিকৃত বক্তব্য আরও ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত করে তার তীব্র সমালোচনা করেন, পাশাপাশি সঠিক তথ্য তুলে ধরেন এবং নিজেকে একজন যোগ্য ঐতিহাসিক হিসেবে প্রমাণ করেন ।

উপর্যুক্ত সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি–

প্রথমত: মাওলানা আকরম খাঁ ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন না এবং ঐতিহাসিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পূর্ব পরিকল্পনাও হয়তোবা তাঁর ছিলনা । তবে নিঃসন্দেহে তিনি একজন ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি ছিলেন এবং ঐতিহ্য চেতনা তাঁর মধ্যে সক্রিয় ছিল ।

দ্বিতীয়ত: তাঁর ইতিহাস চর্চার মূল উদ্দেশ্য ছিল পশ্চাদ্‌পদ মুসলিম জাতির মধ্যে চৈতন্যোদয় ঘটানো এবং তাদেরকে স্বীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা । এক কথায় উপমহাদেশের উদাসীন মুসলিমদের জাগ্রত করাই ছিল তাঁর ইতিহাস সাধনার অন্যতম ব্রত । এর মূল লক্ষ্য ছিল মুসলিম সমাজের উন্নতি-অগ্রগতি ও সমাজ-সংস্কার ।

তৃতীয়ত: তিনি ঐতিহাসিক ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কোন ঘটনা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির সত্যাসত্য বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, যা একজন ঐতিহাসিকের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত । প্রমাণ হিসেবে তাঁর 'মোস্তফা-চরিত' ও 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থদ্বয় উল্লেখ করা যায় ।

চতুর্থত: ইতিহাস চর্চাকে promote করার লক্ষ্যে তিনি লিখনী পরিচালনা করেছেন, এর মাধ্যমে তিনি অন্যান্যদের উৎসাহিত করেছেন এবং এভাবে তিনি নিজেকে এক্ষেত্রে model হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন ।

পঞ্চমত: মাওলানা আকরম খাঁ শুধু গতানুগতিক ইতিহাস রচনায়ই অভ্যস্ত ছিলেন না, বরং সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক তথা বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস

Dhaka University Institutional Repository

চর্চায়ও তাঁর ব্যাপক দখল ছিল, যা তাঁকে একজন আধুনিক ঐতিহাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

সর্বশেষে বলা যায়– তিনি কেবল ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেননি। বরং সাংবাদিকতা, রাজনীতি, সাহিত্যচর্চা, সমাজ-সংস্কার ও সমাজ সেবা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তাঁর ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। ইতিহাস সাধনা ছিল তাঁর জীবনের বহুমুখী কর্মকান্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক মাত্র। আর এতসব কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় মুসলিম জাগরণ। বলাবাহুল্য, তিনি এক্ষেত্রে সফল ও সার্থক ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০ খ্রীঃ)

ক) জন্ম পরিচয় ও শিক্ষা-দীক্ষা :

যে সকল মুসলিম উপমহাদেশকে ইংরেজদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন এবং যাঁদের আবির্ভাবে বাংলার মুসলিমদের জাতীয় জীবন ধণ্য হয়েছে, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০ খ্রীঃ)তাঁদের অন্যতম ।[১] খৃষ্টীয় উনিশ ও বিশ শতকের বাংলার মুসলিম সমাজের জাগরণের ইতিহাসে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য ।[২] তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সৈয়দ ফতেহ্ শাহ্ । ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শ-প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে তাঁরা বাংলায় আগমন করেন । সুলতান নুসরত শাহ তাঁকে চট্টগ্রামের ফতেহাবাদে নিয়ে আসেন এবং বিশাল জায়গীর দান করেন । সেখানে তাঁদের প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে । এ প্রভাবশালী ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারেই মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ মতিউল্লাহ্ এবং মাতার নাম রহিমা বিবি ।[৩]

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর জন্ম তারিখ নিয়ে একাধিক মতের উল্লেখ পাওয়া যায় । মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের মতের সাথে মুহম্মদ আবদুল হাই এবং আবুল ফজলের মতের পার্থক্যটি স্পষ্ট । মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ইসলামাবাদীর জন্ম সাল ১৮৭৪ বলে উল্লেখ করেছেন । এ মতের পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায় এম. সিরাজুল হক, দেওয়ান আবদুল হামিদ, এম. এ. কুদ্দুছ, ছৈয়দ মোস্তফা জামাল ও আরো অনেকের লেখায় । এঁরা তাঁর জন্ম তারিখ ১৮৭৪ সালের ২২শে অক্টোবর বলে মনে করেন । তবে সাহিত্যের ইতিহাসে যে মতটি বিবেচিত হয়েছে, তা ভিন্ন । বাংলা সাহিত্যের

---

১ জাফর আলম, স্মরণীয় বরণীয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ ঃ ৩৯ ।

২ ড. কাজী দীন মুহম্মদ, 'মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীঃ ইসলামী রেনেসাঁর অন্যতম পথিকৃৎ', দৈনিক ইনকিলাব, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯৯, পৃ ঃ ১২ ।

৩ মোশাররফ হোসেন খান, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, জুন ২০০২, পৃ ঃ ৫-৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম ইতিবৃত্তকার মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯৬৮) এ কৃতী পুরুষের ভূমিষ্ঠকাল উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন যে, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে চট্রগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত আড়ালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালের গবেষকগণ তাঁর এ মতটিই গ্রহণ করেন। আবুল ফজল স্পষ্ট উল্লেখ করেন যে, তাঁর জন্ম ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক আঠারো বছর পরে। পারিবারিক সূত্রেও জানা যায় যে, ১৮৭৫ সালের আগষ্ট মাসের শেষ রবিবারে তাঁর জন্ম হয়।[৪]

শঙ্খ নদীর তীরে যে আড়ালিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছে বলে মনে করা হয়, তৎসম্পর্কেও ভিন্নমত রয়েছে। মুহম্মদ এনামুল হকের মতে তাঁর গ্রামের নাম বরমা। ছৈয়দ মোস্তফা জামাল অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ইসলামাবাদীর জন্মস্থান বরমা ও বরকল গ্রামের নিকটস্থ আড়ালিয়াতে। ইসলামাবাদীর দশম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত Eastern Examiner পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে উল্লেখ আছে:

> "Moulana Muniruzzaman Islamabadi's family history so far traced discloses the fact that originally his forefathers were from a noble family of Middle Eastern Countries and temporarily settled at Fatehabad area in Chittagong district but on later years Khan Mohammad Khan of the family shifted to Aralia in Patiya Ps. under the same district and settled there permanently".[৫]

উপরোক্ত বক্তব্য হতেও প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর পূর্ব পুরুষগণ খান মুহম্মদ খানের সময় হতেই আড়ালিয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সুতরাং

---

৪ মোশাররফ হোসেন খান, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৭-৮; মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ ঃ ১৩-১৪।

৫ Moulana Muniruzzaman Islamabadi (A Brief Portrait), Editorial, Eastern Examiner, 1960; উদ্ধৃতঃ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৪-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

আড়ালিয়াতেই তাঁর জন্ম হয়। মাহবুব উল-আলমের বক্তব্য হতেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।[৬]

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় নিজ বাড়ীতে পিতার কাছেই। তাঁর ওপর পিতার প্রভাব ছিল অসামান্য। কারণ পিতা ছিলেন বহুভাষাবিদ্ এবং অসামান্য সাহিত্যগুণের অধিকারী। সেজন্য তিনি 'মুন্‌শি মতি উল্লা' বা 'মতি উল্লা পন্ডিত' নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে আরবি, ফার্সী এবং উর্দুতেও যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এখানেই ইসলামাবাদীর সাহিত্যের উত্তরাধিকার লাভের মূল উৎসটির সন্ধান পাওয়া যায়। আরবি ও ফার্সী শিক্ষার উদ্দেশ্যে অতি অল্প বয়সে পিতা তাঁকে স্থানীয় মাদ্রাসায় ভর্তি করান। পাঁচ বছর বয়সে তিনি জুনিয়র মাদ্রাসায় পবিত্র কুরআন পাঠ ও মাস্‌আলা-মাসায়েল শিক্ষা শুরু করেন এবং ১২ বছর বয়সে তিনি জুনিয়র মাদ্রাসা পাশ করে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে হুগলী মাদ্রাসায় গমন করেন।

তখন চট্রগ্রামের কয়েকজন নামী-দামী শিক্ষক ও পন্ডিত ব্যক্তি হুগলী কলেজ ও মাদ্রাসায় কর্মরত ছিলেন। তাঁদের সহায়তায় তিনি ১৮৮৮ সালে হুগলী মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ইমাম বাড়া ও চন্দন নগর থেকে পড়াশুনা করেন। হুগলী মাদ্রাসা থেকে অল্পকালের মধ্যে সিনিয়র মাদ্রাসা পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং তৎকালীন আরবি শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ড. রস (Dr. Roos) ও মি. হ্যালী (Mr. Halley)-এর নিকট উচ্চতর জ্ঞান আহরনের লক্ষ্যে আগমন করেন। সেখানে ভর্তি হয়ে তিনি ১৮৯৫ সালে কৃতিত্বের সাথে জামাআতে উলা (ফাজিল) পাশ করেন এবং শিক্ষা জীবন শেষ করেন। অতঃপর তিনি ফার্সী ভাষায় মোক্তারী আইন পড়াশুনা করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে বাংলা শিখতে শুরু করেন।[৭] তবে তিনি মুখ্‌তারশীপ পাশ করেছিলেন কি-না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি।

---

৬ মোশাররফ হোসেন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১০।
৭ বার্ষিক সওগাত, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে উল্লেখ্য যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর যেমন ঝোঁক ছিল, তেমনি ছিল মনীষীদের জীবনেতিহাস, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের ওপর বিপুল পরিমাণ আগ্রহ। কলকাতায় অধ্যয়নকালে তাঁর জীবনে উপমহাদেশের চারজন বিখ্যাত মনীষীর প্রভাব পড়ে। তাঁরা হলেন– মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী, স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব আবদুল লতিফ এবং সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানী। তবে শেষোক্ত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাবে ইসলামাবাদী বাংলার বুকে ঈমান, আদর্শ এবং ত্যাগের মহিমায় জ্বলে ওঠার সাহসে উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছিলেন। আর তাই লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি নিজেকে তৈরি করতে থাকেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল ছাত্রজীবন শেষ করে তিনিও ইসলামের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করবেন।[৮]

শিক্ষাজীবন শেষে তিনি হুগলী সরকারী মাদ্রাসাতেই সর্বপ্রথম চাকুরীর প্রস্তাব পান। কিন্তু সেই চাকুরী গ্রহণে তাঁর কোন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়নি।[৯] তবু বাধ্য হয়েছিলেন স্বল্পকালের জন্য সেখানে কাজ করতে। নিম্নোক্ত বক্তব্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়: "Moulana Islamabadi was an employee of the government in the beginning of his career but as he declined to oblige the whimsical attitude of his superiors, he had to give up the job".[১০]

অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে পিতা-মাতা উভয়ের ইন্তেকালে তিনি অভিভাবকহীন হয়ে পড়লেন এবং দারুন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলেন। অতঃপর ১৮৯৭ সালে আছিয়া খাতুন নামক এক বিদুষী কণ্যার সাথে তিনি বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং স্ত্রীর অনুরোধে চাকুরীর উদ্দেশ্যে উত্তর বঙ্গে গমন করেন। তবে তাঁর 'আত্মজীবন' পাঠে জানা যায় যে, তিনি রংপুর থেকে এসে ১৮৯৭ সালে বিবাহ

---

৮ মোশাররফ হোসেন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১২।

৯ ছৈয়দ মোস্তফা জামাল (সম্পাদিত), স্যুভেনির, ইসলামাবাদী স্মৃতি সমিতি, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ ঃ ১২।

১০ M. Abul Khair, 'Muniruzzaman Islamabadi', Eastern Examiner, Chittagong, Nov. 1. 1967.

Dhaka University Institutional Repository

করেন।[১১] এতে প্রতীয়মান হয় যে, রংপুর গমনের পূর্বে বিবাহের যাবতীয় কথাবার্তা চূড়ান্ত হয় এবং রংপুর হতে প্রত্যাবর্তনের পর বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হয়।

শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি সংবাদ পেলেন যে, রংপুর জেলার বাগদুয়ার অঞ্চলের কুমুদপুর মাদ্রাসায় দ্বিতীয় মৌলভীর একটি পদ খালি আছে। তিনি সেখানে যান এবং চল্লিশ টাকা মাসিক বেতনে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি উক্ত মাদ্রাসার হেড মৌলবীর পদ অলংকৃত করেন। কিন্তু ভিন্ন মত অনুসারে, তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করে রংপুর জেলার হাড়গাছি সিনিয়র মাদ্রাসার সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট নিযুক্ত হন।[১২] রংপুরে অবস্থানকালে শিক্ষা-আন্দোলন, রাজনীতি, সমাজসেবা, ধর্ম প্রচার প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে তিনি একজন সংগ্রামী কর্মী হিসেবে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখিয়েছেন, মুসলিম জাগরণের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মাওলানা ইসলামাবাদী ১৯০০ সালে চট্টগ্রামে ফিরে এসে সেখানে মৌলভী আবদুল আজিজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুসলিম বোর্ডিং-এ সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে ৬ মাস দায়িত্ব পালন করেন। তারপর সিতাকুন্ড সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক পদে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন।[১৩] সিতাকুন্ড মাদ্রাসায় থাকাকালে তিনি একদিকে মিসরের 'আল্ মানার' ও 'আল্ আহরাম' পত্রিকায় আরবী প্রবন্ধ লিখতেন, অন্যদিকে উত্তর ও মধ্য ভারতের প্রখ্যাত উর্দু পত্রিকাসমূহে উর্দু প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন।[১৪] সিতাকুন্ড মাদ্রাসায় কবি ইসমাঈল হোসেন সিরাজী তাঁর সহকর্মী ছিলেন। তিনি ১৯০১ হতে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডে লিপ্ত ছিলেন। তখনকার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দিকের মধ্যে প্রধান হল– অবিভক্ত বাংলার মুসলিম শিক্ষা

---

১১ ঢাকা জাতীয় যাদুঘরের সাবেক মহাপরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খানের নিকট ইসলামাবাদীর অপ্রকাশিত 'আত্মজীবন' খানা সংরক্ষিত আছে এবং বর্তমান গবেষক তা থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিয়েছেন।

১২ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চট্টগ্রাম, ১৯৬৯, পৃ ঃ ১৩৮।

১৩ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ ঃ ১৭৩।

১৪ বিস্তারিত দেখুনঃ মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ ঃ ৩১২-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

কনফারেন্স আহবান, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ, জাতীয় মহা সমিতি গঠন প্রভৃতি ।

খ) কর্মজীবন:

১. সাংবাদিকতা প্রসঙ্গ: মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সাংবাদিকতা প্রসঙ্গে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পাদনা করেছেন । তিনি ছিলেন আমাদের বাংলা সাহিত্যের একজন উজ্জ্বল প্রতিভা । অথচ জনশ্রুতি আছে যে, মাত্র ১৭ বছর বয়সে মাওলানা ইসলামাবাদী আরবি, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় অগাধ ব্যুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম হলেও তখন পর্যন্ত তিনি বাংলা ও ইংরেজি তেমন কিছুই জানতেন না । তাই প্রশ্ন জাগে– তিনি কিভাবে বাংলা ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন? জবাবে বলা যায় যে, তিনি পরবর্তীকালে প্রয়োজনের তাগিদে নিজের চেষ্টা, শ্রম, অধ্যবসায় ও জাতীয উন্নতির প্রেরণায় বাংলা ভাষাকে খুব ভালভাবে আয়ত্ত করেন । বাংলা ভাষায় তিনি এতটাই দক্ষতা অর্জন করেন যে, পরবর্তীকালে তিনি বাংলা ভাষায় একজন অন্যতম সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ঐতিহাসিকের মর্যাদায় ভূষিত হন । ইসলামাবাদীর নিজের লেখায় তাঁর শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ও বাংলা সাহিত্য চর্চার ইতিহাস এভাবে প্রকাশিত হয়েছে: "এই অধম যখন ১৮৯৫ খৃ. মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর বংগে শিক্ষকতা কার্যে আত্মনিয়োগ করি, তখন বাংলা সাহিত্য চর্চার সংগে সংগে জাতীয় উন্নতির উপায় সম্বন্ধে ... স্বীয় ক্ষুদ্র শক্তি ব্যয়িত করতে থাকি ।"[১৫] আবুল ফজলের বক্তব্য হতে জানা যায় যে, পিতার কাছেই শৈশবে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর বাংলা শেখার গোড়াপত্তন হয়েছিল । পরে অবশ্য নিজের চেষ্টা আর সাধনায় তিনি তাতে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন ।[১৬]

মাওলানা ইসলামাবাদী কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলোর একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এবং তা ছিল মুসলিম সমাজের সার্বিক কল্যাণ

---

[১৫] উদ্ধৃত: মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৭ ।
[১৬] আবুল ফজল, রেখাচিত্র, চট্টগ্রাম, ১৯৬৮, পৃ ঃ ৩২১ ।

Dhaka University Institutional Repository

ও জাতীয় জাগরণ। ধর্মতত্ত্বের আলোচনা, ইসলামের ব্যাপক প্রচার, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম সম্পর্কিত নানা সংশয় ও অপপ্রচারের যুক্তিগ্রাহ্য জবাব, সমাজ-সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন এবং ইসলামের অনুশীলন ও গবেষণার ব্যাপক চর্চায় মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে এসব পত্রিকার ভূমিকা ছিল অসাধারণ। জাতীয় জাগরণ এবং আযাদী আন্দোলনকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যেও এসব পত্রিকার ভূমিকা ও অবদান ছিল অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে আবুল ফজল বলেন যে, এর প্রতিটি ভূমিকা ছিল মুসলিম জাগরণ, মুসলিমদের মনে জাতীয় চেতনা সঞ্চারিত করে দেয়া আর সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর দেশের স্বাধীনতার বাণী প্রচার করা।[১৭]

মাওলানা ইসলামাবাদী যখন সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন, তখনকার মুসলিম জীবন ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিবেশ ছিল সর্বদ্ধার রুদ্ধ কক্ষের মতো। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁদের ভূমিকা ছিল তদনুরূপ। ইসলামাবাদী জানতেন যে, মুসলিম সমাজে সংবাদপত্রের বহুল প্রচার না হলে কোন আন্দোলনই সার্থকরূপ পরিগ্রহ করবেনা। দ্বিতীয়ত: আলিম সমাজের ওপর তাঁর ছিল অগাধ আস্থা; সে যুগে এঁরাই ছিলেন সমাজে নেতৃস্থানীয় ও ভক্তির পাত্র। এঁদের কাছে দেশের দুর্দশার বাণী পৌঁছিয়ে দিতে পারলে এবং এভাবে এঁদেরকে রাজনৈতিক চেতনার মাধ্যমে সুসংঘবদ্ধ করতে পারলে পঙ্গু সমাজের বিপর্যয়-দশার মোচন সহজে সম্ভব হতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই তাঁদেরকে নিয়ে কিভাবে সমাজের ভেতর প্রবেশ করা যায়, সে চিন্তায় তিনি বিভোর থাকতেন। তিনি এর একমাত্র পথ হিসাবে সাহিত্যের আশ্রয় নিয়ে তাঁর সহকর্মীদেরও সে পথে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এ কারণেই এঁরা বক্তৃতায়, ইতিহাস চর্চায় ও ইসলামের বাণী প্রচারার্থ সাহিত্য ও সংবাদপত্র সেবায় অগ্রসর হয়ে আসেন। এভাবেই ধর্ম ও জাতীয় চেতনার ক্ষেত্র সৃষ্টিতে এঁদের এ অবদান আশাতীত ফলপ্রদ হয়েছিল। এজন্য সম্ভবত: কোন

---

১৭ আবুল ফজল, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩২৪।

Dhaka University Institutional Repository

কোন সমালোচক বলেছেন যে, 'মুসলিম সাংবাদিকতার সূত্রপাত এ আলিমদের হাতেই হয়েছিল'।[১৮] এ প্রসঙ্গে আবুল ফজলের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

> "এঁরা (মাওলানা ইসলামাবাদীসহ সমকালীন মুসলিম পন্ডিতগণ) সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পেরেছিলেন — জাতিকে জাগিয়ে তোলার এক শ্রেষ্ঠতম বাহন হচ্ছে সংবাদপত্র। সংবাদপত্র এ যুগের এক মোক্ষম হাতিয়ার, জাতীয় জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ। এ যুগ-সত্যটিও এসব আলিম নেতারাই বুঝতে পেরেছিলেন সর্বাগ্রে, জাতীয় চেতনা উন্মেষের সেই আদি অবস্থায়। নিঃসন্দেহে তাঁদের শক্তি আর সামর্থ্য অত্যন্ত সীমিত ছিল। তবুও জাতীয় স্বার্থের খাতিরে এঁরা সংবাদপত্র পরিচালনার মতো গুরু দায়িত্বও নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে দ্বিধা করেননি। প্রকৃত প্রস্তাবে এঁদের হাতেই আমাদের সাংবাদিকতার সূচনা। এঁরা যে শুধু মাসিক আর সাপ্তাহিক (পত্রিকা) প্রকাশেরই ঝুঁকি নিয়েছিলেন তা নয়, এমনকি সে যুগে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের দুঃসাহসও করেছিলেন। ... যা-ই হোক, সেদিন এ আলিম নেতৃবৃন্দ যে সমাজপ্রীতি আর দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, বাঙ্গালী মুসলমানের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে তা সত্যই স্মরণীয়।"[১৯]

উপর্যুক্ত পরিকল্পনার মধ্যেই ইসলামাবাদীর সাংবাদিক জীবনের ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা'র মুখপত্র 'আল্-এসলাম'-এর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই মূলতঃ ইসলামাবাদীর সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। তবে তাঁর হাতে-খড়ি হয় আরও আগে। সম্ভবত: শেখ আবদুর রহিম ও মুনশী রেয়াজুদ্দীন আহমদ প্রথম তাঁকে বিভাগীয় রচনা ও ফিচারাদি তৈরিতে সাহায্য করতেন। এ প্রসঙ্গে ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী বলেন যে, মাওলানা ইসলামাবাদীর সাংবাদিক জীবন আরম্ভ হয় 'মিহির ও সুধা করে'। মিহির ও সুধাকরের সম্পাদকদ্বয় মুনশী শেখ আবদুর রহিম ও মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ তাঁর ভেতর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্য হস্ত প্রসারিত করেছিলেন। তিনি মিহির ও সুধাকরে প্রকাশার্থে যেসব সমাজ হিতকর রচনা প্রেরণ করতেন, আবশ্যকানুরূপভাবে

---

[১৮] মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৩-২৪।
[১৯] আবু ফজল, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুর রহিম ও রেয়াজুদ্দীন তা সংশোধন ও পরিবর্তন করে মিহির ও সুধাকরে প্রকাশ করতেন।[২০]

মুন্‌শী রেয়াজুদ্দীন আহমদ পরে ১৮৯৯ সালে 'ইসলাম-প্রচারক' নব পর্যায়ে প্রকাশ করলে সে পত্রিকায়ও মাওলানা ইসলামাবাদী লিখতে থাকেন। এমনি একটি রচনার উদাহরণ– 'প্যারিসে বিশ্ব প্রদর্শনী'। এতদ্ব্যতীত তাঁর বহু লেখা ও রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এসব লেখার মাঝে মুসলিমদের গৌরবময় অতীত কাহিনী আত্মপ্রকাশ করেছিল। যাহোক তিনি সাময়িকপত্র সম্পাদনা ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯০৪ সালে সিতাকুন্ডের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে কলকাতা চলে আসেন এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হন।

ক) সাপ্তাহিক সোলতান (১৯০৪): 'সোলতান' প্রথমে সাপ্তাহিক আকারেই ১৯০৩ সালে আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদক রেয়াজুদ্দীন আহমদ তাঁর সহকারী সম্পাদক হিসাবে রাজশাহীর দিওয়ান নাসিরুদ্দিনকে গ্রহণ করেন। ৬ মাস পর সম্ভবত: ১৯০৪ সালে এর সম্পাদনার দায়িত্ব মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর উপর অর্পিত হয়। এ প্রসঙ্গে মাওলানা ইসলামাবাদী নিজে বলেন:

> "১৯০৩ অব্দে মোছলমান শিক্ষা-কনফারেন্সের ও এছলাম মিশনের উদ্দেশ্য প্রচারকল্পে কলিকাতা হইতে সোলতান নামক একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। উক্ত পত্রিকার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন মৌং মীর্জা ইউছুফ আলী মহীপুরের খানবাহাদুর, মোখতার ছমিরুদ্দিন ও মুনশী রেয়াজ উদ্দিন আহমদ সাহেব। ছোলতান প্রেসের নামকরণ হইয়াছিল এছলাম মিশন প্রেস। 'ছোলতান' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ৬ মাস পর উহার সম্পাদনা ও পরিচালনভার এই অধমের স্কন্ধে চাপিয়া

---

[২০] ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী, 'সাংবাদিক মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী', দৈনিক আজাদ (ইসলামাবাদীর তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত), ঢাকা, ১৯৫৩; উদ্ধৃত: মোশাররফ হোসেন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৪০; সহ দ্রষ্টব্য: জাফর আলম, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৪০, মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৪, Ranabir Samaddar, 'Leaders and Legacies: Maulana Maniruzzaman Islamabadi and Maulana Akram Khan', Essays in Memory of Momtazur Rahman Tarafdar, Edited by Perween Hasan & Mufakharul Islam, Centre for Advanced Research in the Humanities, Dhaka University, Dhaka, 1999, PP. 360-361.

Dhaka University Institutional Repository

পড়ে। তখন হইতে ১৯২৮ খৃঃ পর্যন্ত নানা বাধা-বিঘ্ন ও বিপত্তির ভিতর দিয়া ছোলতানের সহিত আমার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য থাকে"।[২১]

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামাবাদী এ পত্রিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর হতে 'সোলতান' বানান পরিবর্তিত হয়ে 'ছোলতান' রূপ পরিগ্রহ করে। অর্থাৎ 'স' 'ছ'-তে রূপান্তরিত হয়। পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার কারণ ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেন, মিহির ও সুধাকরে যে রাজনৈতিক অভিমত প্রকাশিত হতো, কিছুদিনের মধ্যে একদল লোক তার বিরুদ্ধবাদী হয়ে পড়েন। মতবিরোধ সবক্ষেত্রেই সমাজের অনিষ্টকর হয়ে উঠেনা– বরং তাতে করে অনেক সময় সমাজের মঙ্গলই হয়। এক্ষেত্রেও তাই হলো। মিহির ও সুধাকরের দলের সাথে তদানীন্তন একদল মুসলিম চিন্তানায়কের মতভেদের ফলে মুসলিম বাংলার আর একটি নতুন সাপ্তাহিক পত্রের জন্মলাভ সম্ভব হল। তা হচ্ছে 'সুলতান'। মীর্জা ইউসুফ আলী এ কাগজখানার প্রবর্তক এবং মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। সম্ভবতঃ ১৯০৩ সালে এ কাগজখানা সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে।[২২]

সোলতানের আবির্ভাব মুসলিম বাংলার সংবাদ-সাময়িকীর জগতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মুসলিম বাংলার জাগরণ ও সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে 'সোলতান' পত্রিকার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও মাওলানা আকরম খাঁর মতে, এ পত্রিকাটি ১৯০৮ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।[২৩] পরবর্তীকালে ১৯২৩ সালে ইসলামাবাদীর পক্ষ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে পুনরায় কলকাতার আপার সার্কুলার রোড থেকে পত্রিকাটি আরো উন্নতমানে বের হতে থাকে। ইসমাঈল হোসেন সিরাজী তখন এর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।[২৪] অতঃপর পত্রিকাটি দৈনিকে পরিণত হয়। ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী অবশ্য বলেন যে,

---

২১ মৌলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, আদি ইতিহাস, (কদম মোবারক এতিমখানার উদ্বোধনী সভায় পঠিত এবং পরে দৈনিক আজাদী-তে প্রকাশিত), ১৮ জানুয়ারী, ১৯৩১।

২২ আবুল কালাম শামসুদ্দীন, দৃষ্টিকোন, ঢাকা, ১৩৭৪, পৃঃ ১৭০।

২৩ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭০।

২৪ আবদুল কাদির, ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচনাবলী, বাংলা উন্নয়নবোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃঃ ৪২৯-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

সাপ্তাহিক ছোলতানেরই একটি দৈনিক সংস্করণ প্রকাশ করার চেষ্টা চলে ১৯২৬ সালে।[২৫] ইসলামাবাদীর আত্মজীবনীতে উল্লেখ আছে যে, দৈনিক সুলতান প্রকাশিত হওয়ার পরও এ সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ১৯২৮ সাল অবধি টিকে ছিল।[২৬] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ পত্রিকাতেই ভারতে শুদ্ধি-আন্দোলনের রিপোর্ট (১৯২৩) প্রকাশ করতেন।[২৭] এ পত্রিকা প্রকাশের পেছনে ব্যারিস্টার আবদুর রসূলের অবদান ছিল প্রচুর। তাঁর উদ্যোগেই মূলতঃ একটি প্রতিবাদী দল 'মিহির ও সুধাকর' হতে বের হয়ে 'ছোলতান' প্রকাশ করেন।[২৮]

খ) বাংলা দৈনিক 'হাবলুল মতিন' (১৯১২): প্যান-ইসলাম মতাদর্শের অন্যতম প্রবক্তা সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানীর অন্যতম শিষ্য আগা মইদুল ইসলাম ত্রিপলি ও বলকান যুদ্ধের সময় (১৯১২) 'হাবলুল মতিন' নামক একখানা পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। মুসলিম বাংলার পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সময়ে এর তিনটি সংস্করণ তিনটি আলাদা ভাষা-বাংলা, ইংরেজি ও ফার্সীতে প্রকাশিত হত এবং এগুলোর সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ড. আবদুল্লাহ্ আল-মামুন সুহ্‌রাওয়ার্দী ও আগা মইদুল ইসলাম।[২৯] ড. আনিসুজ্জামান 'হাবলুল মতিন' পত্রিকাটিকে সাপ্তাহিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৩০] কিন্তু মাওলানা ইসলামাবাদী নিজে পত্রিকাটিকে স্পষ্টভাবেই 'দৈনিক' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আগা মইদুল ইসলাম পারস্য হতে নির্বাসিত হয়ে কলকাতায় প্রায় ৪০ বছর রাজনৈতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকেন। তিনি ফার্সী সাপ্তাহিক 'হাবলুল মতিন', দৈনিক উর্দু ও বাংলা 'হাবলুল মতিন' এবং 'মুল্‌ক ও মিল্লাত' নামক ইংরেজী পত্রিকা পরিচালনা করে গেছেন। মাওলানা ইসলামাবাদী নিজেও কিছুকাল তাঁর

---

২৫ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত; ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৩; সওগাত, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৩/১৯২৬, পৃঃ ১২০।

২৬ ইসলামাবাদী, আদি ইতিহাস, প্রাগুক্ত।

২৭ ছৈয়দ মোস্তফা জামাল (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

২৮ Kamruddin Ahmed, A Social History of Bengal, Dacca, 1970, P. 12 & 15-6.

২৯ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৪; মনিরুজ্জামান (সম্পাঃ), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১; মোশাররফ হোসেন খাঁন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।

৩০ ড. আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ১৩৪-৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

সংসর্গে থেকে বলকান যুদ্ধের সময় (১৯১২) বাংলা দৈনিক 'হাবলুল মতিন' সম্পাদনার সৌভাগ্য লাভ করেন।[৩১] ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকীর দেয়া বিবরণ হতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, মুসলিমদের একমাত্র দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র 'হাবলুল মতিন' ও এর ইংরেজি সংস্করণ খুব বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ফার্সী 'হাবলুল মতিন' ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আগা সাহেবের মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩২] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌র বর্ণনা থেকেও তা প্রতীয়মান হয়।[৩৩] এক বর্ণনায় জানা যায় যে, রওশন আলী চৌধুরী কিছুদিন এ পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন।[৩৪] প্যান ইসলামবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে এ পত্রিকার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলকান যুদ্ধের সময় মুসলিম সমাজের সেবার ক্ষেত্রে এ পত্রিকার অবদান ছিল অতুলনীয়। মাওলানা ইসলামাবাদীর সম্পাদনায় বিভিন্ন সময় দৈনিক হাবলুল মতিনসহ অন্তত: তিনটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আর তাই তাঁকে বলা হয় 'বাংলা দৈনিক পত্রিকার প্রথম মুসলিম সম্পাদক'। অন্যদিকে বাংলা দৈনিক 'হাবলুল মতিন'ই ছিল মুসলিমদের সর্ব প্রথম বাংলা দৈনিক।[৩৫]

গ) আল্‌-এসলাম (১৯১৪): আঞ্জুমানে ওলামা ও ইসলাম মিশনের উদ্দেশ্য প্রচারকল্পে ১৩২২ (১৯১৪ ঈসায়ী) সালে 'আল্‌ এসলাম' নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। অবশ্য চৌধুরী শামসুর রহমান এর প্রকাশকাল ১৯১৬ সন বলে উল্লেখ করেছেন। এটা ছিল মাওলানা ইসলামাবাদীর জীবনের অন্যতম কীর্তি। পত্রিকা প্রকাশের প্রথম দিকে সম্পাদক হিসেবে কারো নাম থাকতো না। কারণ আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার মুখপত্র হিসেবেই এটা প্রকাশিত হতো। তবে

---

৩১ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী, কোরআনে স্বাধীনতার বাণী, পৃ ঃ ৩৪; মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩৮৯, ১০৯, টীকা নং-১৫।

৩২ ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত।

৩৩ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৭৪; সহ দ্রঃ ড. আনিসুজ্জামান প্রাগুক্ত; সওগাত, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৩/১৯২৬।

৩৪ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৯৩।

৩৫ সওগাত, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৩/১৯২৬।

Dhaka University Institutional Repository

নেপথ্যে মাওলানা ইসলামাবাদীই সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালন করতেন।[৩৬] এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার প্রধান কীর্তি তার মুখপত্র 'আল্ এসলাম' পত্রিকা। আঞ্জুমানের সেক্রেটারী, জয়েন্ট সেক্রেটারী ও এসিসটেন্ট সেক্রেটারী যথাক্রমে মৌঃ মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মৌঃ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এবং তিনি নিজে (ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্) ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক।[৩৭]

বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক হিসাবে মাওলানা আকরম খাঁর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যদিকে ড. আনিসুজ্জামানের বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর স্কন্ধে আরোপিত হয়।[৩৮]

এ পত্রিকার আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, স্বধর্ম, স্বজাতি, স্বদেশ ও সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার সেবা করার নিমিত্তেই 'আল্ -এসলামে'র প্রচার। ধর্ম তত্ত্বের আলোচনা, ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা উপস্থাপিত সংশয়াদির খন্ডন, সমাজ-সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাসাদির মূলোৎপাটন এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় অনুশীলন ও গবেষণা প্রভৃতি আল্ এসলামের প্রধানতম লক্ষ্য ও কর্তব্য।[৩৯] 'আল্ এসলাম' পরবর্তীকালে 'আল্ এছলাম' নামেও প্রকাশিত হতো। ষষ্ঠ বর্ষের সূচনায় আল্ এসলামের ঠিকানা পরিবর্তনের সময় নামের বানানের এ পরিবর্তন ঘটে বলে মনিরুজ্জামান উল্লেখ করেছেন। পত্রিকাটি কত বছর স্থায়ী হয়েছিল, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায়না। তবে চৌধুরী শামসুর রহমানের মতে পাঁচ বছর, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও আজহার ইসলামের বর্ণনায় ১৯২১ সাল পর্যন্ত,

---

[৩৬] আবুল ফজল, প্রাগুক্ত; ড. কাজী আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত; ড. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত; মুহম্মদ বরকত উল্লাহ্, 'আল্-এসলাম', পাকিস্তানী খবর, ঢাকা, ২৩ মার্চ, ১৯৬৬, পৃ ঃ ২৩।

[৩৭] ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, 'আল্ এসলাম', মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ ঃ ৯১।

[৩৮] ড. আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ ঃ ১৩৬; সহ দ্রঃ, ঐ, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, সতেরো অধ্যায় (আল্-এসলাম প্রসঙ্গে আলোচনা), ঢাকা, ১৯৬৪।

[৩৯] আল্ এসলাম, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২২।

Dhaka University Institutional Repository

বরকতুল্লাহ্‌র বিবরণে বাংলা ১৩২৭ সাল পর্যন্ত এবং ড. আনিসুজ্জামানের মতে, ষষ্ঠ বর্ষ দশম সংখ্যা (মাঘ ১৩২৭) পর্যন্ত পত্রিকাটি চালু ছিল ।[৪০]

কাজী আবদুল মান্নান পত্রিকাটি সম্পর্কে যে বিবরণ প্রদান করেন তা এরকম যে, সুসংগঠিত এবং বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত একদল মুসলিমের দ্বারা 'আল্ এসলাম' দীর্ঘকাল পরিচালিত হয়েছিল । পত্রিকাটি প্রকাশের ব্যাপারেও নিয়মিত ছিল । এর প্রত্যেক সংখ্যায় এক বা একাধিক ছবি থাকতো । রচনার দিক দিয়েও পত্রিকাটি সমৃদ্ধ ছিল । গল্প বা উপন্যাস প্রকাশের নিদর্শন না থাকলেও চিন্তামূলক এবং অনুসন্ধান ও পরিশ্রম সাপেক্ষ প্রবন্ধ ও আবেগপ্রবণ কবিতা এতে প্রকাশ করা হতো ।[৪১]

বস্তুত:পক্ষে আল্ এসলামের প্রভাব পরবর্তীকালেও বহুদিন বিদ্যমান ছিল । একথা বলা সম্ভবতঃ অযৌক্তিক হবেনা যে, আল্ এসলামই তৎকালে মুসলিম নবীন লেখকদের সূতিকাগৃহ ছিল । যেমন সাহিত্য সৃষ্টিতে, তেমনি ইতিহাস-ঐতিহ্য সমৃদ্ধ সংবাদ প্রকাশেও এর অবদান ছিল অবিস্মরণীয় । মূলতঃ বাংলায় মুসলিম জাগরণে পত্রিকাটির অবদান ছিল বিস্ময়কর ও অতুলনীয় ।

ঘ) দৈনিক সোলতান (১৯২৬): চৌধুরী শামসুর রহমানের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, ১৯২৬ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় মুসলিম সমাজের একমাত্র দৈনিক পত্রিকা হিসাবে 'দৈনিক সোলতান'-এর আবির্ভাব ঘটে । বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে এ দৈনিক পত্রিকাটির অবদান অপরিমেয় । পত্রিকাটি দৃঢ়কণ্ঠে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় । মূলতঃ জাতীয় স্বার্থরক্ষার তাগিদেই পত্রিকাখানা বের করা হয়েছিল ।[৪২] প্রায় পাঁচ বছরকাল অব্যাহতভাবে পরিচালিত হওয়ার পর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় ।[৪৩]

---

৪০ মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩৩; ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৯১; ড. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত; আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ ঃ ৪৩০ ।

৪১ কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ঢাকা, ১৯৬১, পৃ ঃ ২৯৫ ।

৪২ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৭৭ ।

৪৩ আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, ঢাকা, ১৯৫৮, পৃ ঃ ১৩৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

হাকিম আলতাফুর রহমানের বিবরণ হতে জানা যায় যে, পত্রিকাটির কোন নিজস্ব প্রেস না থাকায় নওরোজ প্রেস ক্রয় করে দৈনিক সোলতানের অফিস মীর্জাপুর স্ট্রীট হতে মেছুয়া বাজারে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখান থেকে দৈনিক সোলতান নিয়মিত প্রকাশিত হয়। মাওলানা ইসলামাবাদী একাই পত্রিকাটির সকল বিভাগ পরিচালনা করতেন। তবে পত্রিকা পরিচালনার জন্য একটি কমিটিও ছিল। কিছুদিন পর পত্রিকা পরিচালনার নিয়ম-নীতি সম্পর্কীয় মতানৈক্য পরিলক্ষিত হওয়ায় মাওলানা ইসলামাবাদী তৎকালীন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবদুল লতিফের মধ্যস্থতায় মুসলিম সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ ও প্রেসের খাতিরে পত্রিকাটির পূর্ণ দায়িত্ব পূর্বোক্ত পরিচালনা কমিটির হাতে অর্পন করেন।[৪৪]

প্রকৃতপক্ষে সাপ্তাহিক ছোলতানের তৃতীয় দফা চালু হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পত্রিকাটির একটি দৈনিক সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী বলেন:

> "আমরা কয়েকজন পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম সাপ্তাহিক ছোলতানের দৈনিক সংস্করণ বাহির করা হউক ... প্রস্তাব অনুসারে কার্য হইল। মনিরুজ্জামানের অর্থাভাব।... এমতাবস্থায় মনিরুজ্জামান সাহায্য প্রার্থনা করিলেন চট্টগ্রাম নিবাসী কলিকাতা প্রবাসী লুঙ্গী সওদাগর মৌলবী চৌধুরী সিদ্দিক আহমদের নিকট। তাঁহারা টাকা সাহায্য করিলেন। দৈনিক ছোলতান ও দৈনিক সেবক একযোগে কওমের সেবা করিতে রহিল।"[৪৫]

ঙ) দৈনিক আমীর (১৯২৯): দৈনিক আমীর সম্ভবত: মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত সর্বশেষ পত্রিকা। এরপর সাংবাদিকতার সাথে তাঁর খুব একটা সম্পর্ক ছিলনা। দৈনিক সোলতান পত্রিকাটি নানা গোলযোগের কারণে বন্ধ হয়ে গেলেও তিনি তাঁর উদ্দেশ্যকে হারিয়ে যেতে দেননি। তাই আর্থিক

---

[৪৪] মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩৫-৩৬; সহ দ্রঃ হাকিম আলতাফুর রহমান, মওলানা ইসলামাবাদী, চট্টগ্রাম, ১৯৬৯ (পুনঃ মুদ্রণ ১৯৮০), পৃ ঃ ৬৪-৬৫; ছৈয়দ মোস্তফা জামাল (সম্পাদিত), মওলানা ইসলামাবাদী, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ১৯৮০, পৃ ঃ ৬১-৬৭, দেওয়ান আবদুল হামিদ, স্যুভেনির, (ছৈয়দ মোস্তফা জামাল সম্পাদিত), ১৯৬৬।

[৪৫] ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

অসচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর শেষ চেষ্টার ফল 'দৈনিক আমীর' প্রকাশ করে তাঁর অগণিত ভক্তের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, দৈনিক সোলতান ত্যাগের পর মাওলানা ইসলামাবাদী এ.কে. ফজলুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯২৯ সালে কলকাতা থেকে এ পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। এর সম্পাদনা সহযোগী ছিলেন আলী আহমদ ওয়ালী ইসলামাবাদী। এক বছরের মধ্যেই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর মাওলানা ইসলামাবাদী কলকাতা ত্যাগ করে বার্মা গমন করেন।[৪৬] মাওলানা ইসলামাবাদী কলকাতায় দাঙ্গা-দুর্গত মুসলিমদের উপর পুলিশের নির্মম অত্যাচারের বিবরণ এ পত্রিকায় প্রকাশ করে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এ বিষয়ে একদিন খিলাফৎ কমিটির অফিসে কথা প্রসঙ্গে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, মাওলানা ইসলামাবাদী সত্যিই একজন দুঃসাহসিক ব্যক্তি।[৪৭]

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সরাসরি যেমন কতকগুলি পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম সাংবাদিক জীবনের ব্যাপকতর অনুশীলনের পথ নির্মান ও সুগম করেছিলেন, তেমনি পরোক্ষভাবেও নানা প্রতিষ্ঠান ও পত্রিকার সাথে যুক্ত থেকে তার উৎসাহ বর্ধনে সহায়তা করেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, অন্ধকারাচ্ছন্ন মুসলিম জাতিকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র-সাময়িকীর কোন বিকল্প নেই। তাই যা কিছু কর্তব্যকর্ম, তা যেন তিনি একাই সব্যসাচীর মতো করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে Ranabir Samaddar বলেন:

> "Hindu-Muslim problem, discrimination against the Muslims, low quality education, colonialism, Islam, the destiny of Islamic civilization and imperial power, particularly in Turkey, the state of the Bengali language – issues like these occupied his mind. He was going to write profusely. He contributed to news papers and

---

৪৬ ছৈয়দ মোস্তফা জামাল (সম্পাদিত), মওলানা ইসলামাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৬৫; সহ দ্রঃ ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত; মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত।

৪৭ মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ্, যুগবিচিত্রা, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ ঃ ২৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

periodicals, became a columnist, a reporter and subsequently a full fledged journalist".[৪৮]

মাওলানা ইসলামাবাদী অন্যান্য যেসব পত্র-পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন, সেগুলো হচ্ছে দৈনিক কৃষক, দৈনিক নবযুগ, বাসনা, কোহিনূর, ইসলাম প্রচারক, মিহির ও সুধাকর, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা ইত্যাদি। তাছাড়া মিশরের আল্ মিনার, আল্ এহরাম প্রভৃতি পত্রিকায়ও তিনি প্রবন্ধ এবং সংবাদাদি পাঠাতেন। সেসব পত্রিকার সংবাদাদিও আল্ এছলাম ও অন্যান্য পত্রিকায় পরিবেশন করতেন। যেমন– মিশরে আরবীতে গীতাঞ্জলির অনুবাদের সংবাদ।[৪৯] চট্টগ্রামেও তিনি হিন্দু ও মুসলিমের প্রকাশিত বহু পত্রিকার সাথে নানাভাবে জড়িত ছিলেন। যেমন– সত্যবার্তা। ১৯৩৪ সালে তিনি সত্যবার্তার পরিচালনা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৫০]

মাওলানা ইসলামাবাদী যে উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র পরিচালনা করেন, তা ছিল অতি মহৎ, সে দায়িত্ব ছিল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরু দায়িত্ব পালনে তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার কোন ঘাটতি ছিলনা। সে সময় পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতার জন্য নবাব, জমিদার ও ব্যবসায়ীদের দ্বারস্থ হতে হতো। ইসলামাবাদীও অনেক ক্ষেত্রে তা-ই করেছেন, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিয়ে নয়। সত্যিই সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মাওলানা ইসলামাবাদী এক কিংবদন্তিস্বরূপ। মুসলিমদের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশের এক ব্যাপক আন্দোলন তিনি গড়ে তোলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই পরবর্তীকালে তবলীগ (১৯২৭), মুয়াজ্জিন (১৯৩০), আল্-ইসলাম (১৯৩২), রওশন হেদায়েত, আলোক প্রভৃতি সাময়িকীর উদ্ভব ঘটে। পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, বাঙালী মুসলিমদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও জাতি হিসাবে তার হৃত-গৌরব ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে তাঁর যে স্বপ্ন ও স্বাদ ছিল, তাকে যথারীতি প্রতিষ্ঠা করার সাধ্য হয়তো তাঁর ছিলনা, কিন্তু তাঁর সে বলিষ্ঠ

---

৪৮ Essays in Memory of Momtazur Rahman Tarafdar, op. cit., P. 361.
৪৯ আল্-এছলাম, পৌষ, ১৩২৬।
৫০ ছৈয়দ মোস্তফা জামাল, মওলানা ইসলামাবাদী, দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৭ই কার্ত্তিক, ১৩৭২।

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তা-চেতনা তাঁর কীর্তিলতার মধ্যে আজও ভাস্বর হয়ে আছে। এখানেই মাওলানা ইসলামাবাদীর সার্থকতা।

২. **ইসলাম প্রচারে মাওলানা ইসলামাবাদীঃ** মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ছিলেন প্রকৃত অর্থেই ইসলামের একজন নিবেদিত খাদেম। মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ ও মুন্‌শী জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ উনিশ শতকের শেষপাদে গ্রামে গ্রামে মুসলিমদের আত্মসচেতন করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে পরবর্তীতে ইসলামাবাদীও এ কাজে উদ্বুদ্ধ হন। তিনি চেয়েছিলেন মুসলিমদের মধ্যে চেতনা জাগ্রত হোক এবং পরস্পরের মধ্যে ঐক্য, সদ্ভাব ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠুক। বিশেষ করে বাংলার আলিম সমাজ একই মঞ্চে একত্রিত হবেন, এ স্বপ্ন তিনি সব সময়ই দেখতেন। তিনি সকল সময় উন্মুখ হয়ে থাকতেন ইসলামের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্যে। আর যখন আবদুর রহিমের মত বিদগ্ধজনদের আহবান পেলেন, তখনই তিনি আপন কর্তব্যকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ প্রসঙ্গে 'মিহির ও সুধাকরে' বলা হয়েছেঃ '... আমাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে, আমাদের অন্যতম প্রিয় সুহৃদ কুমেদপুর মাদ্রাসার হেড মৌলভী বঙ্গীয় মুসলমানদিগের সুপরিচিত উৎসাহের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি মাননীয় শ্রীযুক্ত মৌলভী মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী সাহেব ধর্ম্ম প্রচার ব্রতে ব্রতী হইবার জন্য দৃঢ় সংকল্পরূপ হইয়াছেন'।[৫১]

এর পরই তিনি প্রকৃত অর্থে ইসলাম প্রচারের কাজে নিরলসভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এই কাজের জন্য তিনি সমগ্র উত্তর বঙ্গ, আসাম ও উত্তর ভারতসহ ছুটে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন অঞ্চল ও জনপদে। এসব এলাকায় তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিলেন। সেই সাথে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামের পক্ষে ব্যাপক গণজোয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে তাঁর পরিশ্রম অনেকাংশেই সফল ও সার্থক হয়েছিল।

---

[৫১] মিহির ও সুধাকর, ৮ই পৌষ, ১৩০৬; আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন ধর্ম-সভায় তিনি উপস্থিত হওয়ার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন এবং তাতে সারগর্ভ উপদেশ মালায় একদিকে যেমন জাতীয়ভাব ও চেতনা প্রবলতর করতে চেষ্টা করতেন, অন্যদিকে তেমনি সমাজের মধ্যে ঐক্যভাব জাগিয়ে গৃহবিবাদ ও সাম্প্রদায়িক চিন্তা পরিত্যাগে প্রয়াসী হতেন। তাঁর আন্তরিকতা যেমন ছিল অসামান্য, তেমনি তার চিন্তাধারা এবং কর্মপদ্ধতিও ছিল বৈজ্ঞানিক ও প্রগতি সম্পন্ন।[৫২] এ প্রসঙ্গে আবুল ফজল বলেন যে, কোন ব্যাপারেই তিনি ধর্মান্ধ বা গোঁড়া ছিলেন না। তাঁর ধর্ম প্রচারের মূলকথা এবং সফলতার দিকদর্শনও ছিল তাই। এজন্য তিনি সংস্কারবাদীদের মনে আঘাত হানতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। তিনি যখন সবুজ পাগড়ী ও আচকানে সুশোভিত হয়ে আসরে দাঁড়াতেন তখন তাঁর দীপ্ত মুখমন্ডলের দিকে কারো তাকাবার সাহসই হতোনা।[৫৩]

অতিসুন্দর ও আকর্ষণীয় বাংলায় তিনি বক্তৃতা দিতেন। তাঁর কথা কখনও একঘেঁয়ে মনে হতো না; বরং উপস্থাপনার দিক থেকে তা হতো নাটকীয় এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। তিনি নিজেই বিতর্ক উপস্থিত করতেন এবং নিজেই তার ধর্মীয় যুক্তি প্রদর্শন করে সন্দেহ দূর করে দিতেন। সেই সময় উত্তর বঙ্গে হানাফী ও মোহাম্মদীদের মধ্যে কলহ কোন্দল লেগেই থাকত। এতে তিনি (ইসলামাবাদী) যোগদান করে নিরপেক্ষ মতামত প্রদান করে সকলকে স্তম্ভিত করে দিতেন।[৫৪] এ সময় তাঁকে তাঁর তীব্র ভাষণাদির জন্য এবং সমালোচনামূলক রচনাদির জন্য 'লা-মজহাবী-অরি মওলানা মুহম্মদ মনিরুজ্জমান'- এই ভাবে পরিচয় দেওয়া হতো।[৫৫]

তিনি কেবল মঞ্চ-কথাতেই তাঁর বক্তব্য শেষ করতেন না, প্রবন্ধাকারেও আরও বহু পাঠকের কাছে তা নিবেদন করতেন। তৎকালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাদি এবং পুস্তক-পুস্তিকাসমূহে সেই প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানেই তাঁর প্রকৃত সমাজ হিতৈষী ও ইসলামী চেতনার স্বরূপ ধরা পড়ে। জাতির সমূহ

---

৫২ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১।

৫৩ আবুল ফজল, রেখাচিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩২৮; ৬৬-৬৯।

৫৪ এম. এ. কুদ্দুস, দৈনিক আজাদী, ৮ কার্তিক, ১৩৬৮।

৫৫ প্রচারক, মাঘ-ফাল্গুন, ১৩০৬; মওলানা ইসলামাবাদী স্মৃতি বার্ষিকী, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৬; ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিপদের দিনে সকল সংকীর্ণতাকে জাতির মন থেকে মুছে দেয়াই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। ইসলাম মিশনের জন্য তাঁর প্রতিটি কাজ ও সহযোগিতার উদ্দেশ্য এ ভিন্ন আর কিছু ছিলনা। গঠনমূলক চিন্তা আর কাজের মাধ্যমেই তিনি জাতির ও ধর্মের সংস্কার ও সেবা করে গেছেন। সমাজের মঙ্গল চিন্তাই ছিল ইসলামাবাদীর ধ্যানজ্ঞান।[৫৬] উত্তর ভারতে যেমন স্যার সৈয়দ জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে কাজ করেছেন, বাঙলায় তেমনি কাজ করবার চেষ্টা করেছেন ইসলামাবাদী।[৫৭] বস্তুত ইসলামাবাদীর সমাজ হিতৈষণা, শিক্ষানুরাগ ও মুসলিম সমাজের মধ্যে নবজাগৃতি আনয়নে সার্বিক প্রয়াসের কোন তুলনা হয় না।

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে আসামে নিম্নশ্রেণীর মুসলিম ও সাঁওতালদের মধ্যে অনেক দিন অতিবাহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি ইংরেজী দৈনিকে বলা হয়েছেঃ "Being a religious leader, he (Maulana Islamabadi) toured Assam and preached Islam among the under developed hill tribes".[৫৮] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ১৯১১ সালে তিনি বসির হাটে ছিলেন। সে সময়ে মাওলানা ইসলামাবাদী আঞ্জুমানে ওলামার কার্য উপলক্ষে আসাম ভ্রমণ করেন। তিনি খাসিয়া জাতির মধ্যে খৃষ্টান মিশনারীদের কার্যের সফলতা দেখে সেখানে একটি ইসলাম মিশন কায়েম করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তাঁকে (ড. মু. শহীদুল্লাহ্) এ কার্যভার গ্রহণ করতে পত্র লিখেছিলেন।[৫৯] ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁর আসাম ভ্রমণের কথা 'আল্-এছলাম' পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে।[৬০]

মাওলানা ইসলামাবাদী উত্তর ভারতেও ইসলাম প্রচার ও মুসলিমদের ধর্মত্যাগ রোধকল্পে মিশন পাঠানোর কথা চিন্তা করেছিলেন এবং সে লক্ষ্যে তিনি ড.

---

৫৬ আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩২৫।
৫৭ হাবীবুল্লাহ্ বাহার, মৌলানা ইসলামাবাদী (বেতার ভাষণ), দৈনিক ইনসাফ, ঢাকা, ১৬ই কার্তিক, ১৩৫৭।
৫৮ The Eastern Examiner, Nov. 1, 1967.
৫৯ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, 'মওলানা ইসলামাবাদী', মওলানা ইসলামাবাদী স্মৃতি বার্ষিকী, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৬।
৬০ আল্-এছলাম, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে প্রেরণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বিবরণ এ রকম যে, ১৯২৩ সালে উত্তর ভারতে শুদ্ধি আন্দোলন হয়। ফলে কয়েক হাজার মুসলিম হিন্দু হয়ে যায়। তিনি (ইসলামাবাদী) এ শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইসলাম প্রচারের জন্য তাঁকে (ড. মু. শহীদুল্লাহ্‌) মনোনীত করে আগ্রায় পাঠান।[৬১] এতদ্ব্যতীত তিনি ইসলাম প্রচার ও আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্রহ্মদেশও পরিভ্রমণ করেন। তিনি ব্রহ্মদেশের বিভিন্নস্থানে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করে প্রচারক সংগ্রহকার্যে আত্মনিয়োগ করেন ও তাঁদের যথোপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য 'মিশনারী ট্রেনিং কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আহবানে রেঙ্গুনী মুসলিমদের সমাজকর্মের উৎসাহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইসলামাবাদীও পরে জমিয়তে উলামায়ে বাঙ্গালা থেকে এসলাম মিশনকে পৃথক করে ব্রহ্মদেশের মুসলিমদের সহযোগে তাকে সম্পূর্ণ নবরূপ দান করেন।

৩. রাজনীতি: মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ছিলেন মানুষের অধিকারের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। সাধারণ মানুষের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা তাঁকে কষ্ট দিত, ভাবিয়ে তুলতো। তিনি মানুষের মৌলিক অধিকার এবং তাদের জীবনের সুখ-শান্তি, স্বাধীনতা, আদর্শ, ঐতিহ্য তথা সার্বিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক সংগ্রামী পুরুষ। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি কখনো অন্যায়ের সাথে আপোস করেননি। তাঁর বর্ণাঢ্য সংগ্রামী জীবন থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

বস্তুত: ধর্মপ্রচার ও সমাজ-সংস্কারকর্মের আবেগ ও অভিজ্ঞতা থেকেই মাওলানা ইসলামাবাদীর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। তবে এ মনীষীর রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শন কেমন ছিল এবং তিনি পরাধীনতার গ্লানি ও হতভাগ্য মুসলিমদের দুর্দশায় কীভাবে পীড়িত হতেন এবং এর ফলে তিনি কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন– সে বিষয়ে বিচ্ছিন্ন কিছু আলোচনা ছাড়া এর ইতিহাস কোথাও সামগ্রিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। তাই বিষয়টি আজ নূতন করে ভাবার ক্ষেত্রে

[৬১] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বের দাবী রাখে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংবাদিক তাঁর জীবনের এ দিকটি সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন, এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে নিচে তার কিছু অংশ তুলে ধরা হল। এতে বুঝা যাবে, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা মুসলিম সমাজের সামগ্রিক পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন ও ধ্যানে এবং স্বীয় বৈশিষ্ট্যে কতটা উদ্ভাসিত ছিল।

১৩০৬ সালে 'মিহির ও সুধাকর' তাঁকে প্রথম 'ধর্ম প্রচার ব্রতে ব্রতী' করান এবং পন্ডিত মেরাজ উদ্দীন ও পন্ডিত রিয়াজ উদ্দীন মাশহাদীই তাঁকে রাজনীতির ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন। কার্যতঃ তখন থেকেই তিনি স্বদেশের মুসলিমদের, বিশেষতঃ কৃষক-প্রজার দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার কল্পে নানা পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী বলেন যে, মাওলানা ইসলামাবাদী যখন প্রথম রাজনৈতিক আসরে নেমেছিলেন, তখন 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' মৃত প্রায়। মওলবী মেরাজ উদ্দীন ও পন্ডিত মাশহাদী তখন কৃষক আন্দোলনকে গড়ে তুলেছেন। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মিহির ও সুধাকরে এ আন্দোলনের রিপোর্ট প্রকাশিত হত 'ঘুড়ির সূতা' নামে। কোন হিন্দু পত্রিকাতেই এ আন্দোলনের কথা ছাপা হতোনা। কারণ তাদের ধারণা ছিল যে, কৃষক আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে জমিদার, গাঁতীদার ও দর-গাঁতীদারদের ক্ষতি হবে।[৬২] মুহম্মদ আবদুল হাই-এর বক্তব্য হতেও প্রতীয়মান হয় যে, মাওলানা ইসলামাবাদী কৃষক-প্রজা আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[৬৩] তিনি ১৯৩৭ সালে কৃষক-প্রজা পার্টির টিকিটে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কৃষকের উন্নতি ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয় এবং বাংলার অধিকাংশ কৃষকই মুসলিম। সুতরাং তিনি কৃষক-প্রজা কর্মী হিসাবে বহু কাজ করেন।[৬৪] হাকিম আলতাফুর রহমানের বক্তব্য হতেও তা প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন যে, বাংলার কৃষকগণ

---

[৬২] ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত।

[৬৩] মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৮।

[৬৪] মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ঢাকা-১৯৬৫; দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ১৯ জুন, ১৯৫০; উদ্ধৃতঃ মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

জমিদারের অত্যাচারের শোষণে– যাঁতাকলে নিষ্পেষিত। তিনি আজীবন এ কৃষককুলের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন এবং তাদের ওপর অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে চির জীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাদের শিক্ষিত স্বাবলম্বী ও রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে, বিশেষ করে আত্মসচেতন হতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি বরকল গ্রামে এক বিরাট কৃষক সম্মেলন আহবান করেন। ঐ সম্মেলনে মৌলানা আহমদ আলী ও মৌলভী ছৈয়দ নওশের আলী যোগদান করেছিলেন। মাওলানা ইসলামাবাদী তাঁর অভিভাষণে কৃষকদের দুরবস্থা ও তার প্রতিকারের উপায়সমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। কুষ্টিয়ায়ও অনুরূপভাবে এক কৃষক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন।[৬৫]

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ১৮৯৯ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি কংগ্রেসের মাধ্যমে মুসলিমদের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি তৎকালীন ভারতীয় মুসলিমদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ'-এর ভিত্তি স্থাপন করেন।[৬৬] তিনি ১৯৪৬ সালে 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-'এর প্রার্থী হিসেবে চট্টগ্রাম থেকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থী হন। কিন্তু মুসলিম লীগ প্রার্থী আলী আহমদ চৌধুরীর নিকট তিনি কয়েক হাজার ভোটে পরাজিত হন।[৬৭] মুহম্মদ আবদুল হাই-এর বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কংগ্রেসের সভ্য হিসেবে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেছিলেন।[৬৮] এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে একজন উৎসাহী কর্মী হিসেবে কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং আমরণ কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন। তিনি অবিভক্ত বাংলায় কংগ্রেসের একজন সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং কংগ্রেস কর্মী হিসেবে অনগ্রসর মুসলিম সমাজের নিকট বহু লাঞ্ছিত হন। এমনকি কংগ্রেস কর্মী হিসেবে

---

৬৫ হাকিম আলতাফুর রহমান, 'মওলানা ইসলামবাদী', ছৈয়দ মোস্তফা জামাল (সম্পাদিত), মওলানা ইসলামাবাদী, চট্টগ্রাম, ১৯৮০, পৃ ঃ ৬১-৬২।
৬৬ হাকিম আলতাফুর রহমান, প্রাগুক্ত।
৬৭ মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ্, যুগ বিচিত্রা, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ ঃ ২৭৫।
৬৮ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁকে কারাবরণও করতে হয়। তিনি এতেও দমে যাননি বরং কারামুক্তির পর অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করতে থাকেন।[৬৯]

মাওলানা ইসলামাবাদী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেও যোগদান করেন। তবে সে সম্পর্কে বিস্তৃত তেমন কিছুই জানা যায়না। ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকীর বক্তব্য হতে জানা যায় যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ হলে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।[৭০] মুহম্মদ আবদুল হাই বলেন যে, বঙ্গভঙ্গ যেন রদ না হয় সেজন্য সেকালের কিছু সংখ্যক বাঙালী মুসলিমের মধ্যে যে একটা সচেতনতা ছিল, ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ সাহিত্যিকের রচনায় তার কিছু আভাসও পাওয়া যায়।[৭১] উপরোক্ত বক্তব্য হতে ধারণা করা যায় যে, তিনি বঙ্গভঙ্গ রদের বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌র বিবরণ হতে জানা যায় যে, তিনি কংগ্রেসী ভাবাপন্ন জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তাই তিনি সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী পরিচালিত বঙ্গবিভাগ রদ-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং নিজের সম্পাদিত 'ছোলতান' পত্রিকায় ঐ আন্দোলনের সমর্থনে বহু প্রবন্ধ ও মন্তব্য লিখেন।[৭২]

মাওলানা ইসলামাবাদী ছিলেন প্যান-ইসলামবাদী। কী করলে মুসলিম জাতি আবার হৃত-গৌরব ফিরে পাবে সে চিন্তাই তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল।[৭৩] ত্রিপলী ও বলকান যুদ্ধের সময় (১৯১১-১৩) সমগ্র বাংলা ব্যাপী যে প্যান-ইসলাম আন্দোলন চলে, তাতে তিনি সক্রিয় নেতৃত্ব দেন। খিলাফতের ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন বলে তিনি তুরস্ক-সুলতানের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ইরান থেকে বিতাড়িত হয়ে কলকাতায় আগত (১৮৯০ খ্রীঃ) প্যান-ইসলামপন্থী নেতা আগা মুঈদুল ইসলাম ত্রিপলী ও বলকান যুদ্ধের সময় তাঁর ফার্সী সাপ্তাহিক 'হাবলুল মতীন' এর সাপ্তাহিক ইংরেজি সংস্করণ, সাপ্তাহিক বাংলা সংস্করণ

---

৬৯ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, প্রাগুক্ত।
৭০ ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত।
৭১ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৭৩।
৭২ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৭৩; সওগাত, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৩/১৯২৬, পৃ ঃ ১২০।
৭৩ মুহাম্মদ আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

ও দৈনিক বাংলা সংস্করণ কলকাতা থেকে বের করেছিলেন। বাংলা দৈনিকের সম্পাদনা করতেন মাওলানা ইসলামাবাদী। সাপ্তাহিক ইংরেজি সংস্করণের সম্পাদনা করতেন ড. আবদুল্লাহ্ সুহরাওয়ার্দী। মূল ফার্সী পত্রিকার সম্পাদক আগা মুঈদুল ইসলামের ন্যায় মাওলানা ইসলামাবাদী এবং ড. আবদুল্লাহ্ সুহরাওয়ার্দীও ছিলেন প্যান-ইসলামবাদী। তাঁরা পত্রিকা চতুষ্টয়ে প্যান-ইসলামী ভাবধারা প্রকাশে ত্রুটি করেননি।[৭৪]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই শুরু হয় খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন। এই আন্দোলন মাওলানা ইসলামাবাদীর জীবনে বয়ে আনে এক নবচেতনার জোয়ার। মুহূর্তেই তিনি জেগে উঠলেন। সকল বাধা উপেক্ষা করে ক্রমাগত সামনে এগিয়ে চললেন। তিনি ইসলাম ও মুসলিমদের চরম দুশমন ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং মুসলিম ঐক্য ও সংহতি জোরদার করার লক্ষ্যে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ইস্পাত-কঠিন নেতা। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী তাঁদের সাথে ১৯২০ সালে এই আন্দোলনে যোগ দেন।

'অসহযোগিতা ও আমাদের কর্তব্য' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেন যে, এ অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য দুইটি– প্রথমত: খিলাফত সমস্যার সমাধান। তুরস্ক-সুলতানের হৃতরাজ্যসমূহের পুনরুদ্ধার ও ইসলাম জগতের খলিফার পদমর্যাদা রক্ষা করা। দ্বিতীয়টি ভারতের স্বরাজ লাভ। তাঁর মতে, খিলাফত রক্ষা না হলে নিঃসন্দেহে মুসলিম জাতির চরম সর্বনাশ হবে।[৭৫] তাঁর বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, সহযোগিতা বর্জন বিধির মধ্যে কয়েকটি বিষয় আছে: ক) সরকারী উপাধি পরিত্যাগ করা, খ) সরকারী অফিস আদালত ছেড়ে জাতীয় আদালত স্থাপন করা, গ) সরকারী ও সরকার সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করা।[৭৬] তাঁর এসব

[৭৪] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৭৪।
[৭৫] মোশাররফ হোসেন খান, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৬৪।
[৭৬] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

লেখায় সাধারণ পাঠকরাও অনুপ্রাণিত হতো। তারাও জেগে ওঠার সাহস সঞ্চয় করতো।

খিলাফত আন্দোলনের সময় তাঁর যে আত্মত্যাগ এবং সংগ্রামী মনোভাব ফুটে উঠেছিল, বিপ্লবী হিসেবে তখনই তিনি সবার সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। মাওলানা ইসলামাবাদী স্বয়ং ঢাকা এবং চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে বহু সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করেছিলেন।[৭৭] ঐ আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন। তাই অনেকে খদ্দর প্রস্তুত ও ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। স্বতন্ত্রভাবে বা যৌথ উদ্যোগে বা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে বিভিন্ন স্থানে খদ্দর বিক্রির জন্য বহু স্টোর খোলা হয়। কলকাতার চিৎপুর রোডে 'শাহজাহান স্টোর' নামে একটি স্টোর ছিল। মাওলানা ইসলামাবাদী ছিলেন তার প্রধান পরিচালক।[৭৮]

খিলাফত আন্দোলন চলাকালে টাংগাইলের চাঁদ মিঞা সাহেবের আহবানে করটিয়ায় এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা ইসলামাবাদী ঐ সভায় খিলাফতের সমর্থনে ভাষণ দেন।[৭৯] ১৯২০ সালের ৩ মার্চ নওয়াব হাবীবুল্লাহ্‌র উদ্যোগে ঢাকার আহসান মঞ্জিলে খিলাফত সংক্রান্ত এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মাওলানা শওকত আলী ভাষণ দেন এবং মাওলানা ইসলামাবাদী খিলাফত আন্দোলনের ব্যয় নির্বাহের জন্য জনগণের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন।[৮০]

১৯২৩ সালের সাপ্তাহিক 'ছোলতান' ছিল খিলাফত-স্বরাজ-অসহযোগ আন্দোলনের মুখপত্র। এটি ছিল মুসলিম জাগরণের প্রয়াসী ও হিন্দু-মুসলিম মিলনপন্থী। পত্রিকাটি বাঙালী মুসলিমদের জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

---

৭৭ 'আঞ্জুমন সংক্রান্ত সংবাদ', আল এছলাম, পৌষ, ১৩৭২।
৭৮ মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ্‌, যুগ বিচিত্রা, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১১৩।
৭৯ প্রিন্সিপাল ইবরাহিম খাঁ, বাতায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩৬৪।
৮০ ঢাকা প্রকাশ, ১ চৈত্র, ১৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

করে।[৮১] মাওলানা ইসলামাবাদী ছিলেন এ পত্রিকাটির সম্পাদক। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সহ-সভাপতি এবং বঙ্গীয় খিলাফত কমিটিরও প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি ছিলেন।

খিলাফত আন্দোলন উপলক্ষে আল-এছলাম ও ইসলাম মিশনের বহু কাজ মাওলানা ইসলামাবাদী স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। বিশেষতঃ প্রচার পুস্তিকাদি, প্যাম্পলেট ইত্যাদি প্রকাশের জরুরী অবস্থার জন্য প্রেসের অবসর না থাকাতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাতেও সব কাজ ব্যাহত হতে থাকে বলে তিনি দুঃখিত হয়ে 'আল-এছলামে' কৈফিয়ৎ প্রদান করেন।[৮২] যাহোক, নিজের দিকে মনোযোগ দিতে না পারলেও খিলাফত আন্দোলনের জন্য সমাজগত অন্যান্য কাজ ও প্রকাশনার সাথে তিনি সর্বক্ষণ জড়িত থাকতেন। সংগ্রামী তুর্কীদের সাহায্যের জন্য ও তৎসংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্য 'মোহাম্মদী আখবার' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। মাওলানা ইসলামাবাদীও নানা পত্রিকায় এ বিষয়ে লিখতে থাকেন। কোনও কোনও পত্রিকা ইসলামাবাদী ও অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের রচনাসহ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতো। এ প্রসঙ্গে ড. আনিসুজ্জামান উল্লেখ করেন যে, তুরস্কের সুলতানের (দ্বিতীয় আবদুল হামিদ) সিংহাসনারোহনের রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে 'ইসলাম প্রচারক' ও 'লহরী' প্রচার করেন বিশেষ সংখ্যা, 'প্রচারক' প্রকাশ করে বিশেষ প্রবন্ধ ও কবিতা এবং মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন 'তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদ খানের পঞ্চবিংশতি বাৎসরিক কার্য বিবরণী'।[৮৩]

তুরস্কের সুলতান দামেস্ক থেকে হেজাজ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই রেলপথ নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে কলকাতায় 'হেজাজ ফান্ড কমিটি' গঠিত হয়। তাছাড়া কোনও কোনও পত্রিকা থেকে

---

৮১ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৪৪১।

৮২ দ্রষ্টব্য ঃ আল-এছলাম, আষাঢ়, ১৩২৭।

৮৩ ড. আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃ ঃ ২৯; সহ দ্রষ্টব্যঃ ড. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ উদ্যোগও নেওয়া হয়। উক্ত সময়কার একটি সংবাদ থেকে জানা যায় যে, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর উদ্যোগে রেঙ্গুন শহর হতে হেজাজ রেলওয়ের জন্য প্রায় এক লক্ষ টাকা চাঁদা প্রেরণ করা হয়েছে।[৮৪]

মাওলানা ইসলামাবাদী তুরস্কের খলিফা ও ঐতিহ্যের এত বেশী ভক্ত ছিলেন যে, তাঁর প্রথম পত্রিকার নামকরণ (সোলতান) থেকে খিলাফত আন্দোলন পরিচালনাকালীন প্রায় প্রতিটি কাজ সেই উদ্দেশ্যেই নিবেদিত ছিল। তুরস্ক মিত্রশক্তিবর্গের হাতে লাঞ্ছিত হলেও এবং তুরস্ক সুলতানের সমালোচনা করলেও এ ভক্তিমূলে কখনও ভাঙ্গন ধরেনি। এখানে উল্লেখ্য যে, মাওলানা ইসলামাবাদী খিলাফত আন্দোলনের নেতা হলেও এবং তুরস্কের সাথে এদেশের মুসলিমদের ভাগ্য জড়িত বলে বিশ্বাস করলেও আরও অনেকের মত তিনিও উপলব্ধি করলেন যে, সুলতান ও তাঁর মন্ত্রীসভা অত্যন্ত দুর্বল এবং সার্বভৌম নয়।[৮৫] এ প্রসঙ্গে মাওলানা ইসলামাবাদী 'খেলাফৎ' প্রবন্ধে লিখেন যে, কনষ্টান্টিনোপলের মন্ত্রীসভা মিত্রশক্তিবর্গের ইচ্ছানুসারে গঠিত। সুলতান এবং তাঁর নামমাত্র গভর্নমেন্টের কোন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা – প্রতিপত্তি নেই। তাদৃশ ক্ষমতাহীন লোক ইসলাম জগতের খলিফা হতে পারেনা।[৮৬]

তখনকার দিনে লেখকগণ লেখার বিনিময়ে পারিশ্রমিক পেতেন না। মাওলানা ইসলামাবাদী এ ব্যবস্থার অবসানকল্পে এবং লেখকদের অর্থ সহায়তা প্রদানকল্পে যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, সেখানেও আমরা তাঁর রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ পাই। তিনি এতদুদ্দেশ্যে যে স্টোর ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেন, তার নাম ছিল 'খেলাফৎ স্টোর'। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন:

---

৮৪ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।

৮৫ ড. আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃ ঃ ২৮।

৮৬ আল-এসলাম, বৈশাখ, ১৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

"খেলাফৎ রক্ষা ও খলিফার পদমর্যাদা এবং তাঁহার রাজ্য সংরক্ষণকল্পে মোছলমানগণ সর্বপ্রকার আবেদন নিবেদন ও আন্দোলন আলোচনায় কোনরূপ ফলোদয় হইলনা দেখিয়া তাহারা হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। দুর্বলের অস্ত্র বিলাতী বর্জ্জন, স্বদেশী গ্রহণ, বৃটিশ আদালত বর্জ্জন করিয়া জাতীয় আদালত স্থাপনপূর্বক মামলা-মোকদ্দমার পরস্পর নিস্পন্ন করা, রাজকীয় উপাধি ও সৈনিকবৃত্তি বর্জ্জন করা, সরকারকে কোন বিষয়ে সাহায্য না করা- এ সকল উপায় অবলম্বনে অগ্রসর হইয়াছে। ইহাতে যে খেলাফতের প্রতিকার সাধিত হইবে তাহা বলা যায়না, তবে জাতীয় স্বার্থ ও ধর্ম রক্ষার জন্য শেষ অবলম্বন যাহা দুর্বলের পক্ষে সম্ভব তাহাই ধারণ করা হইতেছে। বিভিন্ন প্রদেশে স্বদেশী খেলাফৎ স্টোর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কলিকাতায়ও একটি স্বদেশী খেলাফৎ স্টোর স্থাপিত হইতে চলিয়াছে... ।"[৮৭]

কারও কারও মতে, মুসলিমদের ব্যবসায়-বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তিনি 'খেলাফৎ স্টোর'-এর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে Eastern Examiner, 1960-তেও একই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।[৮৮]

খিলাফত আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ও তদ্জাত মানসিকতা থেকে যে সব গ্রন্থ তিনি রচনা করেন, তার মধ্যে 'তুরস্কের সুলতান', 'কনষ্টান্টিনোপল' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মাওলানা ইসলামাবাদী এভাবেই ইসলামমুখী গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে বাঙালী মুসলিমদের ঐতিহ্য সচেতন ও মুসলিম দেশসমূহ, বিশেষত: তুরস্কের প্রতি আগ্রহী ও একাত্ম করে তোলার প্রয়াস পান। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, পরাধীনতার অস্বীকৃতি এবং জাতীয়তাবোধের স্পৃহাই তাঁকে এ অগ্রপথিকের নিরঙ্কুশ সম্মানে ভূষিত করেছে। মাওলানা ইসলামাবাদীর রাজনৈতিক জীবনে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, কৃষক প্রজা আন্দোলন, কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান প্রভৃতি বিশিষ্ট অধ্যায় রচনা করেছে। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়: "He was a front liner throughout long 50 years of close touch with all the social and political

---

৮৭ এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৬৫-৬৬ ।

৮৮ Eastern Examiner, 1960.

Dhaka University Institutional Repository

upsurge in Bengal and always was opposed to dogma and superstition".[৮৯]

মাওলানা ইসলামাবাদী তাঁর জীবনের শেষপাদে মুসলিম লীগেও যোগদান করেন। তবে কখন যোগদান করেন, তা জানা যায়নি। অবশ্য এতটুকু জানা যায় যে, তিনি মুসলিম লীগের চট্রগ্রাম জেলা শাখার প্রথম সভাপতি ছিলেন। পরে তিনি উক্ত পদে ইস্তফা দেন। ছৈয়দ মোস্তফা জামালের বিবরণে তার সততা পরিলক্ষিত হয়।[৯০] আনন্দ বাজার পত্রিকায় তাঁর মৃত্যুর যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়, তাতে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের আরও কিছু তথ্য জানা যায়। আর তা হচ্ছে এই যে, তিনি দেশ প্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের অন্তরঙ্গ সহকর্মীরূপে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২০ সালে তিনি গান্ধীজী প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি গান্ধীজীর নীতি ও আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।[৯১] চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার মুসলিমগণ যখন মুনশী শেখ আখতার হোসেনের নেতৃত্বে স্বজাতি আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, তখন তিনি তাতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। কোন্ উপায় অবলম্বন করলে সিলহট কাছাড়া ও পূর্ণিয়া জেলাকে বাংলার অন্তর্ভূক্ত করা যাবে, এ স্বপ্নে তিনি দিন-রাত বিভোর ছিলেন। 'মীর্জাপুর পলিটিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন' গঠনকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।[৯২]

তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে মন্তব্য করে এ কথা বলা যায় যে, সমগ্র বাংলা ও বহির্বাংলার মুসলিমদের সমস্যা নিয়ে তাঁর মত খুব কমসংখ্যক লোকই এত তীব্রভাবে জ্বালা অনুভব করতেন এবং বিশ শতকের গোড়ায় ও মধ্যভাগে বাঙালী মুসলিমদের জীবনের প্রতিটি দিকেই তাঁর চিন্তা ও কর্মের ছাপ বিদ্যমান। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌র বর্ণনা হতে জানা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে (১৯৩৯-

---

৮৯ Ibid.
৯০ ছৈয়দ মোস্তফা জামাল (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত।
৯১ আনন্দ বাজার, ২৭ অক্টোবর, ১৯৫০।
৯২ দেখুন, ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫ খ্রীঃ) কংগ্রেস নীতির প্রতি মাওলানা ইসলামাবাদী আস্থা হারান এবং সুভাষ বসুর রাজনৈতিক আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এ যোগদান করেন। তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে যোগদান (১৯৪২ খ্রীঃ) এবং ১৯৪২ সালের অক্টোবরে সুভাস বসু কর্তৃক গঠিত 'আযাদ হিন্দ্ ফৌজ'-এর কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সুযোগে তিনি 'আযাদ হিন্দ্ ফৌজ'কে সক্রিয় সহযোগিতা করতে মনস্থ করেন এবং দেশের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঢাকা-চট্টগ্রামে গোপন বিপ্লবী দল গঠন করেন।[৯৩] ঐ দল গঠনের দায়ে তাঁকে ১৯৪৪ সালের ১৩ অক্টোবর গ্রেফতার করা হয়।[৯৪] মিঃ গান্ধী, জওহর লাল নেহ্রু প্রমুখ নেতার সাথে তাঁকে দিল্লীর লাল কিল্লায় আটক রাখা হয়। তারপর সেখান থেকে পাঞ্জাবের মিঞাওয়ালীর কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়।[৯৫] ১৯৪৫ সালে তিনি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।[৯৬] মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ্ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মাওলানা ইসলামাবাদীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবগণের কেহ কেহ বলতেন, তাঁর জেলভীতি ছিল। বলা নিস্প্রয়োজন, এ কারণে তিনি কোন কোন মহলে বিশেষ সমালোচনার পাত্রও হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাসমরে জাপানের যোগদানের পর একদিন তিনি হাসতে হাসতে বলেন যে, প্রস্তাব পাশ নয়, বৃটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারনের সময় সমুপস্থিত। অস্ত্র কোথায় পাওয়া যাবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দেন যে, সেই ভাবনা তিনিই করবেন। এর মাত্র কিছুদিন পর জাপানীদের সাথে যোগসাজসের সন্দেহে বৃটিশ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করেন।[৯৭]

মাওলানা ইসলামাবাদীর শেষ জীবনের করুণ ও মর্মান্তিক দিক সম্পর্কে হাকিম আলতাফুর রহমান বলেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মাওলানাকে 'আযাদ হিন্দু ফৌজের' প্রধান মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর দলের অন্যতম প্রেরণাদাতা

---

৯৩ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৭৮; আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের চরিতাভিধান, চট্টগ্রাম, ১৯৭৯, পৃ ঃ ৬৯।

৯৪ ছৈয়দ মোস্তফা জামাল (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৮৫।

৯৫ আবদুল হক চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৬৯।

৯৬ ছৈয়দ মোস্তফা জামাল (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৮৫।

৯৭ মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ্, যুগ বিচিত্রা, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

সন্দেহে গ্রেফতার করে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে আটক করা হয়। ১৯৪৫ সনে জেলের নির্জন কুঠুরিতে গোপন তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে মাওলানার উপর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বেতনভোগী কর্মচারীরা নির্মম ও অকথ্য নির্যাতন চালায়।[৯৮] অপর এক লেখক সৈয়দ আলী আযম এ প্রসঙ্গে বলেন যে, এ বিপ্লবী নেতার পশ্চাতে সি. আই. ডি. -গণ সর্বদাই লেগে থাকত। বিগত ১৯৪৫ সালে ভারত গভর্নমেন্টের আদেশে তাঁকে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী করে রাখা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর তথা জাপানীদের 'চর' হিসেবে কাজ করছেন। যিনি বৃটিশ ভারতের সিংহাসন উল্টানোর জন্য বদ্ধপরিকর, যিনি জাপানীদের সহযোগিতায় বৃটিশ রাজত্বের অবসান ঘটাতে ইচ্ছুক– এতাদৃশ একজন তীক্ষ্ণধী পুরুষকে দেখতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল গমন করেছিলেন।[৯৯]

পাকিস্তান আন্দোলনকে মাওলানা ইসলামাবাদী মনে করতেন মুসলিমদের জন্য একটি আত্মঘাতী পরিকল্পনা। তিনি বলতেন, ভারত দ্বিখন্ডিত হলে মুসলিমরাই অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা মুসলিমরা সেই অবস্থায় ত্রিধা-বিভক্ত হয়ে এক অংশ ভারতে, এক অংশ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এবং অপর অংশ দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে থাকবে বলে সংহতি হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হবে।[১০০] তাই ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি নিজ মাতৃভূমি পূর্ববঙ্গে না এসে কলকাতায় থেকে যান। সেখানে প্রায় দু'বছর থাকার পর তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। ভক্ত ও বন্ধু-বান্ধবের পীড়াপীড়িতে তিনি অবশেষে চট্রগ্রামে আসেন এবং প্রায় ৭৫ বছর বয়সে ১৯৫০ সালের ২৪শে অক্টোবর পরলোকগমন করেন। তাঁকে কদম মোবারকে নওয়াব ইয়াসিন খাঁর মসজিদ প্রাঙ্গনে সমাধিস্থ করা হয়।[১০১]

---

৯৮ এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, পৃ ঃ ৬৪।

৯৯ সৈয়দ আলী আজম, 'মরহুম মাওলানা ইসলামাবাদীর শেষ সংকলন' (৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রকাশিত), দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ১৯৫৪; সহদ্রঃ এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৬৪; এতদ্ব্যতীত মাওলানা ইসলামাবাদীর 'কারা কাহিনী' গ্রন্থে (অপ্রকাশিত) এতদ্ সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা আছে।

১০০ মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৭৫।

১০১ আবদুল হক চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভবতঃ মাওলানা ইসলামাবাদীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী মুসলিম সমাজের উন্নতি-অগ্রগতি তথা স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গে তার আবশ্যকীয় উপাদান হিসাবে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের নীতির মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছিল। 'ছোলতান', 'আল-এছলাম' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশের পেছনে তাঁর সেই মনোভাবই কাজ করেছিল। এ প্রসঙ্গে কাজী আবদুল মান্নান বলেন যে, আল্-এসলাম পত্রিকার লেখকবৃন্দ ও পরিচালকগণ বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যে মুসলিমদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা হিন্দু ও মুসলিমদের 'ভারত মাতার যুগল সন্তান' বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং উভয়ের সম্প্রীতি কামনা করেছেন।[১০২]

প্রকৃত পক্ষে মাওলানা ইসলামাবাদী দেশ সেবা ও রাজনীতি চর্চাকে কখনও পৃথক করে ভাবেননি। গঠনমূলক সকল কাজকেই তিনি দেশ সেবা মনে করতেন এবং এই ধ্যানজ্ঞানেই তিনি সারাজীবনের কর্মী ছিলেন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা-চেতনা সমাজের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত স্পর্শ করেছিল। উপর্যুক্ত বিবরণ ইসলামাবাদীর রাজনৈতিক মত ও কর্ম ধারাকে উপলব্ধি করতে যথেষ্ট সহায়তা করে। জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর পদচারণা ছিল। মুসলিম জাহানের প্রতি কর্তব্য বোধের সাথে সাথে বাঙালী মুসলিমের সর্ববিধ উন্নতির স্বপ্নই ছিল তাঁর সকল কর্মোদ্যমের মূল চালিকা শক্তি।

---

[১০২] কাজী আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩০২-৩০৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪. মাওলানা ইসলামাবাদীর সম্পূরক সমাজসেবা

মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০ খ্রীঃ) ছিলেন একজন মহান ইসলামী চিন্তাবিদ্, প্রখ্যাত সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ্, পথিকৃৎ ঐতিহাসিক এবং সমাজ সংস্কারক ও সমাজ সেবক। নিঃস্বার্থভাবে সমাজসেবা করাই ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত। প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজসেবা ও রাজনীতি-চর্চাকে তিনি কখনও পৃথক মনে করেননি। গঠনমূলক সব কাজকেই তিনি দেশসেবা তথা সমাজসেবা মনে করতেন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা-চেতনা সমাজের সর্ব নিম্ন স্তর পর্যন্ত স্পর্শ করেছিল।[১]

প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপী মাওলানা ইসলামাবাদী ছিলেন সমাজসেবার ক্ষেত্রে আমাদের পথ প্রদর্শক।[২] সমাজসেবক ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে তিনি বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহন করেছিলেন। এর মধ্যে স্কুল-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা আন্দোলন ও কন্‌ফারেন্স, সামাজিক আন্দোলন ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, নারী কল্যাণমূলক উদ্যোগ, মানব সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও এতিমখানা নির্মাণ প্রভৃতি ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৩] তিনি সমাজ সেবার মহৎ উদ্দেশ্যে একটি সুদীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন, যদিও তিনি সর্বক্ষেত্রে পূর্নমাত্রায় সফলতা অর্জন করতে পারেননি। তাঁর 'আত্মজীবন' থেকে আমরা তাঁর সমাজ সেবামূলক বিস্তৃত পরিকল্পনার বিষয়টি জান্‌তে পারি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

"নিম্নকর্ম সম্পাদিব ইহাই বাসনা
শুনিয়া রাখ হে ভাই, করিব বর্ণনা।
আল্লা-সকাশে সবিনয় করি প্রার্থনা
পূরন করিয়া দাও মনের বাসনা।
কারকর্ণের দীঘির পংক উদ্ধারিব,

---

[১] মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮।
[২] জাফর আলম, স্মরণীয় বরণীয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ৩৯।
[৩] মোশাররফ হোসেন খান, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

চারি-পাড়ে ঘাট চারি নির্মিত করিব,
দক্ষিণের ঘাট হবে বৃহৎ দ্বিতল,
তাতে হবে পাঠাগার সংকল্প-অটল
পূর্ব পশ্চিমে হল কামরা, উত্তর দক্ষিণে
চারি প্রকৌষ্ঠ ও বারান্দা
শীতল স্বাস্থ্যকর, মিষ্ট পানীয় জল,
দেশবাসী করিবে পান, সেই সলিল

১। সেখানে গড়িব এক জামে মসজিদ
শত শত লোক পড়িবে জুমা ও ঈদ
২। ঈদগাহের পূর্বদিকে, সমস্ত জমি
খরিদ করিয়া কাজে লাগাইব ভূমি
৩। উহার পাশে হইবে, এতিমখানা
দ্বিতল সুরম্য হর্ম অতি সুশোভনা
৪/৫। অদূরে হবে, ডাক্তার মুসাফের খানা,
দূর দেশের লোক পাইবে খানাপিনা
সাধনায় সিদ্ধি দাও ইহাই প্রার্থনা।
৬। বরকলের খ্যাত ফতে খাঁর জাদ্দীন,
পূর্বে লেক পশ্চিমে কর্ণফুলী খাল
ষোল হাত পাশ, মাইল অন্তে সবিল
সেখানে থাকিবে সদা পানীয় সলিল
৭। চাঁদখালী নদীতে, পুল হবে নির্মিত
গাড়ী ঘোড়া লোকজন, পার হইবে যত,
৮। চাঁদখালী নদী হইতে হারালার বিলে,
নহর এক, মিশিবে বৈগুনী সলিলে,
রবি শস্যের তাহাতে, হইবে উপকার,
কৃষকের হবে সুখ যাবে হাহাকার,
৯। দেয়াঙ্গ পাহাড়ে, উচ্চ বিস্তৃত চূড়ায়
স্থাপিত হইবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সকলকাজে, বহু লক্ষ হইবে ব্যয়
আল্লার ভান্ডার তাহাতে হইবে না ক্ষয় ।
স্বপ্নে দেখিয়াছি, দুই কোটি টাকার কথা
উহার ভেদ জানেন সর্বসিদ্ধি দাতা ।[৪]

মাওলানা ইসলামাবাদী সমাজ সংস্কার ও সমাজসেবার ব্রত নিয়ে দেশের প্রায় সর্বত্র ধর্ম প্রচারে আত্ম নিয়োগ করেন, যা ইতোপুর্বে উল্লেখ করা হয়েছে । তিনি পীর পূজা, কবর পূজা, কবরে বাতি জ্বালানো ও বাল্যবিবাহের চরম বিরোধী ছিলেন । নারী নির্যাতন এবং আশরাফ-আতরাফ বৈষম্যেরও তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন । মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য তিনি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে কিছু সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন । তিনি সেকালের বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন কর্মকান্ডের গঠনমূলক সমালোচনা করেন । এতে তাঁর যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় । নিম্নে এ সম্পর্কে তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক কিছু আলোচনা উপস্থাপন করা হল ঃ

মাওলানা ইসলামাবাদীর বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, বহু মুসলিম আল্লাহ্‌র উপর ভরসা না করে তাদের কামনা-বাসনা হাসিলের জন্য পীরের শরণাপন্ন হচ্ছে । কোন কোন স্থানে পীরের মজলিশে পর্দাহীনতা, গান-বাদ্য, সেজদাহ্‌, এমনকি কবরে বাতি জ্বালানোও হয়ে থাকে । তিনি এগুলোর তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং বলেন যে, খোদা প্রাপ্তির জন্য পীর-মুর্শিদের মুখাপেক্ষী হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই ।[৫] এ প্রসঙ্গে 'আল্‌-এসলাম' পত্রিকায় তাঁর বক্তব্যকে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

> "...কবরে সেজদা করা, কবরে সমাহিত মৃত ব্যক্তির নিকট বরপ্রার্থনা, পীরের নামে মানৎ করা, পীরের দরগাহে নজর নেয়াজ ছড়ান ইহা অপেক্ষা পৌত্তলিকতা আর অধিক কি হইতে পারে? ... এসলাম ধর্মে পৌরহিত্য প্রথা নাই । ...প্রত্যেক মোছলমান কোরআন পাঠ করিতে, নামাজ রোজা করিতে, তছবিহ্‌ তেলাওৎ করিতে

---

৪ মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী, আত্মজীবন, শামসুজ্জামান খান (ভূমিকা ও সম্পাদনা), পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃঃ ১১১-১৩, (পরিশিষ্ট-১, পদ্যে আত্মজীবনী, শেষ জীবনের সংকল্প-১ ।

৫ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্রে ধর্ম ও সমাজচিন্তা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ৭৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

পারে, প্রত্যেক মোছলমান খোদার নিকট যে কোন বিষয় মোনাজাৎ করিতে পারে। তজ্জন্য পীর মোর্শেদের মুখাপেক্ষী হইবার কোন প্রয়োজন নাই। ... আজকাল কেবল পুরুষ নহে, বরং পীরের দরগাহে শিন্নী ও নেয়াজ ছড়াইবার জন্য, পীরের কবরে বর প্রার্থনা করিবার জন্য হাজার হাজার স্ত্রীলোক যাইয়া থাকে।...এখন এই বেদআতী দলের বিরুদ্ধে, এই গোরপূজক, পীরপূজক, দূর্গাপূজক দলের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদ করা ফরজ হইয়া গিয়াছে।"[৬]

বাল্য বিবাহ, বিবাহে সাধ্যাতীত অংকের মোহর নির্ধারণ ও বিবাহোৎসবে অতিরিক্ত ব্যয়ের কুফল সম্পর্কে মাওলানা ইসলামাবাদী আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাল্যবিবাহ বালক-বালিকাদের পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকর এবং তা স্বাস্থ্যনীতি ও অর্থনীতির দিক থেকে সম্পূর্ণ বর্জনীয়।[৭] ছেলে যখন স্বয়ং অর্থোপার্জন করতে সক্ষম হবে, স্বোপার্জিত অর্থ দ্বারা বিবাহ করতে পারবে, তখন ছেলের বিবাহ দেয়া কর্তব্য। অতিরিক্ত ও সাধ্যাতীত পরিমান মোহর নির্ধারণের ফলে বিবাহের সূত্রপাতেই পাত্রপক্ষ ঋনজালে জড়িয়ে পড়ে। এই ঋনের দায়ে অনেক সময় জমিদারী, তালুকদারী সমস্তই রসাতলে যায়। অতএব ধর্মপ্রচারক ও সমাজের আলিম-ফাজিলগনের পক্ষে এ সকল কুপ্রথার মূলোচ্ছেদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা একান্ত কর্তব্য। বিবাহোৎসবে ঢোল, বাদ্যবাজনা, নাচ, গান, বাজী পোড়ান ইত্যাদি কুপ্রথা বঙ্গের অধিকাংশ স্থানে প্রচলিত আছে। বড়লোকেরা এ খাতে হাযার হাযার টাকা ব্যয় করে থাকেন, মধ্যম শ্রেনীর লোকেরাও যে ২/৪ শত টাকার শ্রাদ্ধ করেন না এমন নয়, এমনকি অনেক গরীব পরিবারকেও ঈদৃশ ধর্ম-বিরুদ্ধ মহাপাপ কার্যে কিছু কিছু অর্থ ব্যয় করতে দেখা যায়। এ কুপ্রথা ইসলাম ধর্মে হারাম, মহাপাপ, তদুপরি অপব্যয়জনিত সর্বনাশকর ব্যাপার।[৮] অতএব, এসব কুপ্রথা সামাজিক শাসন দ্বারা রহিত করা আবশ্যক।

---

৬ মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী, 'সমাজ সংস্কার', আল্-এসলাম, ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩২৫ (১৯১৮), পৃঃ ৫৪৫-৫৫০।

৭ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, মুসলিম সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্রে ধর্ম ও সমাজ চিন্তা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩।

৮ মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী, 'সমাজ সংস্কার', আল্-এসলাম, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩২৬ (১৯১৯), পৃঃ ২৯৯ - ৩০৪.

Dhaka University Institutional Repository

নারী নির্যাতন ও এর প্রতিকার প্রসঙ্গে তাঁর মতামত প্রনিধান যোগ্য । তাঁর বর্ননা মোতাবেক, বর্তমান যুগে পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার অবিচার করে থাকে । তরকারীতে লবনের পরিমান ন্যূনাধিক হলেও মারধর করা, জ্বালা-যন্ত্রনা দেয়াতো সাধারণ কথা, এমনকি সামান্য কথায় তালাক দিতেও কুণ্ঠিত হয়না । আজকাল সামান্য কারনে স্ত্রী বর্জনের প্রথা ক্রমান্বয়ে প্রবল ও বিস্তৃত হচ্ছে । কাজেই সমাজের সরদার-প্রধানদের দায়িত্ব হল স্বামী-স্ত্রী উভয়ের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে বিবাহ বন্ধন কার্য সমাধা করা । অতিরিক্ত মোহরের চাপে স্বামী যাতে সর্বস্বান্ত না হয় তৎপ্রতি যেমন লক্ষ্য রাখতে হবে, অন্যদিকে স্ত্রীলোকেরাও যাতে অত্যাচারিতা, উৎপীড়িতা ও সহজে বর্জিতা না হয়, তৎপ্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখতে হবে । [৯]

মাওলানা ইসলামাবাদী আশ্‌রাফ-আত্‌রাফ বৈষম্যেরও তীব্র বিরোধিতা করেন । তাঁর বিবরণ হতে জানা যায় যে, তাঁর সমসাময়িক কালে শরীফ-রজিল বা আশরাফ-আত্‌রাফের পার্থক্য বঙ্গদেশীয় মুসলিম সমাজে অত্যন্ত প্রবল ছিল । পূর্ববঙ্গের মধ্যে চট্রগ্রামে কেবলমাত্র বরাতের মজলিসে শরিফ-অশরিফ হিসেবে পার্থক্য করা হয় । এমনকি আসন গ্রহণের মতভেদ ও উচ্চ-নীচ আসনের তারতম্য হেতু সময় সময় ২/১ দিন কেবল তর্ক-বিতর্কেই অতিবাহিত হয়ে যায় । স্থান বিশেষে এ আসন গ্রহণের তর্কে আহার করাতো হয়ইনা, উপরন্তু বিবাহ পর্যন্ত পন্ড হয়ে যায় । শরাফতের বাড়াবাড়িতে লোকদেরকে ২/১ দিবসের ক্ষুধা-তৃঞ্চায় ব্যাকুল হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে হয় । তবে এতদঞ্চলে বিবাহের মজলিস ছাড়া অন্য কোন প্রকার খানা-জেয়াফতে ঐরূপ শরাফতের ব্যবসায় চলতে দেখা যায়না । পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের অংশবিশেষে শরাফতের দাবী খুব বেশী । সেসব স্থানে তথাকথিত শরিফগন অশরিফদেরকে কুকুর, শৃগাল হতেও অধম বলে মনে করে । ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে যে উচ্চ-নীচ ভাব, এসব অঞ্চলেও শরিফ-অশরিফদের মধ্যে সেই হিন্দুয়ানী রীতি প্রচলিত আছে । উত্তর বঙ্গে 'বাদিয়া','নিকারী' ও আসামের 'মাটারা' উপাধি বিশিষ্ট মুসলিমগণ একসঙ্গে অন্য

---

[৯] মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী, পূর্বোক্ত.

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিমের সাথে বসে আহার করা দূরে থাকুক, এক মসজিদ, এক ঈদগাহ বা মাঠে নামাজও পড়তে পারেনা এবং সালামও আদান প্রদান করতে পারেনা। জুমার জামাতেও তারা শরিক হতে পারেনা। মধ্যবঙ্গে নদীয়া, ২৪ পরগনা অঞ্চলে কোন নীচ জাতীয় হিন্দু মুসলিম হলে তাকে সমাজে গ্রহণ করা হয় না, জুমার জামাতেও শামিল করা হয়না। যে সব মুসলিম কোন যুগে খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিল, তারা এখন সাগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলেও স্থানীয় মুসলিমগণ কিছুতেই তাদেরকে সমাজে গ্রহণ করবেনা। এসব কারনে মুসলিম জাতি বর্তমানে অভিশপ্ত জাতিতে পরিনত হয়েছে। কাজেই এসব বৈষম ও দেশাচার সম্পূর্নরূপে রহিত করা আবশ্যক।[১০]

সমাজ সংস্কারে উলামার দায়িত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আলিমদেরকে নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করে সমাজ সংস্কারে অগ্রসর হতে হবে। মুসলিম সমাজে একতা, সম্প্রীতি ও সহানুভূতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানে স্থানে ঈদ ও জুমুআর ছোট ছোট জামাআত না করে এগুলোর জন্য বড় বড় জামাআতের ব্যবস্থা করা উচিৎ। অযথা মামলা-মোকদ্দমায় ও পুত্র-কণ্যার অকাল বিবাহে সুদী-কর্জ নিয়ে মুসলিমরা যেন সর্বস্ব না হারায়, সেদিকে আলিম সমাজ ও নেতৃস্থানীয় লোকদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আলিমগন কেবল মুসলিম মহাজনদের শাসন করে ক্ষান্ত হন। ফলে মুসলিম সুদ গ্রহীতারা হিন্দু মহাজনদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং তাদের বিষয়-সম্পত্তি হিন্দু মহাজনদের করায়ত্ত হয়। কাজেই সুদী কর্জ হতে মুসলিমদের বাঁচাতে হলে সমাজে 'ধর্ম গোলা' বা 'বায়তুল মাল' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[১১]

মাওলানা ইসলামাবাদী অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কোন মুসলিম যাতে মামলা-মোকদ্দমা, ছেলে মেয়ের বিবাহ, অনাবশ্যক বাড়ীঘর নির্মাণ, বিলাস দ্রব্য ক্রয়

---

১০ 'আঞ্জুমান-এ-উলামা-এ-বাঙ্গালা' কর্তৃক সমাজ সংস্কার সংক্রান্ত কতগুলো প্রস্তাব গৃহীত হয়। আঞ্জুমানের জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা ইসলামাবাদী সেগুলো 'আল্-এসলাম' পত্রিকায় স্বীয় বক্তব্যসহ প্রকাশ করেন। আল্-এছলাম, ৫ম ভাগ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ন ১৩২৬(১৯১৯), পৃঃ ৪২৫/ ৯ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৮৮.

১১ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, মুসলিম সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্রে ধর্ম ও সমাজ চিন্তা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭; বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ আল্-এসলাম, ৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২৫ (১৯১৯), পৃঃ ১৫৭-৬১; ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩২৬, পৃঃ ২৯৯; ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ন, ১৩২৬, পৃঃ ৪২৫; ৯ম সংখ্যা, পৌষ ১৩২৬, পৃঃ ৪৮৮.

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি অনর্থক বিষয়ে টাকা কর্জ করতে না পারে, তজ্জন্য কঠোর শাসন চালাতে হবে। শরিয়ত মতে সুদ আদান-প্রদান যেহেতু সমান পাপ এবং উভয়ই গুনাহে কবিরাহ, কাজেই সুদগ্রহীতাদের শাসন করা হবে, আর সুদ দাতাদের বেকসুর খালাস দেয়া হবে- এটা মোটেও ঠিক নয়। সুদ প্রথা সমাজ হতে একেবারে উঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, সুদদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের প্রতি সমানভাবে সামাজিক শাসন চালাতে হবে। আয় বুঝে ব্যয় করতে হবে; তবে বিশেষ ঠেকাবশতঃ এবং অনিবার্য্য কারণে দেনা করতে হলে সমাজের 'বায়তুল মাল' হতে বিনাসুদে কর্জ নিতে হবে। স্থানে স্থানে, সম্ভব হলে প্রত্যেক গ্রামে 'বায়তুল মাল' বা ধর্মগোলা স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে।[১২]

সুদ ও এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে মাওলানা ইসলামাবাদী তাঁর 'আত্মজীবন'-এ 'মুসলমান ও অর্থনীতি' শিরোনামে বলেনঃ

> "বাঙ্গালার মুসলমানগন প্রায় সকলেই ঋণ গ্রস্থ। জমিদার, জোতদার, তালুকদার ও ব্যবসায়ীগণ ঋণের দায় হইতে কেহই মুক্ত নহে। ...মুসলমানেরা বিবাহ-শাদী, মামলা-মোকদ্দমা ও বিলাসিতায় অপব্যয় করিয়া সচরাচর ঋন গ্রস্ত হয় এবং ঋনদায়ে যথা সর্ব্বস্ব হারাইয়া ফেলে। হিন্দু সমাজে যাহারা ঋনগ্রস্ত হয় তাহারা স্বজাতীয় মহাজনের নিকট ঋন গ্রহন করে বলিয়া তাহাদের সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইলেও তাহাতে ব্যক্তিগত ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু জাতিগত ক্ষতি হয়না। ইসলাম ধর্মে সুদ খাওয়া যেমন হারাম, সুদ দেওয়া, সুদের দলিল লেখা, সুদের দলিলের স্বাক্ষী হওয়া তেমনি হারাম ও মহাপাপ। কিন্তু সামাজিক প্রথা অনুসারে সুদ খাওয়া যেমন নিন্দনীয়, সুদ দেওয়াটা আদৌ নিন্দনীয় নহে। আলেম উলেমাগন সুদখোরকে নানা প্রকারে দমন করিতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু সুদ দাতা ও সুদের সহায়তা কারীদিগকে কিছু মাত্র শাসন করেন না। ইহার ফলে সমাজে দিন দিন সুদ দেওয়ার অভ্যাস বৃদ্ধি পাইতেছে। ঋণের দায়ে মুসলমানের বিষয় সম্পত্তি বন্যার স্রোতের ন্যায় ভাসিয়া অন্যজাতির হস্তগত হইতেছে"।[১৩]

মাওলানা ইসলামাবাদীর মতে, এর প্রতিকারের দুটো উপায় হতে পারে। (এক) অপব্যয় নিবারণ পূর্বক দেনার দায় হতে অব্যাহতি লাভ করা। ঋণ গ্রহীতা ও সুদ দাতাদের কঠোরভাবে শাসন করা। সুদখোরের বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া ও বিবাহ-

---

[১২] মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী, 'সুদ প্রসঙ্গ', ছোলতান, ৫ পৌষ, ১৩৩০/২১শে ডিসেম্বর, ১৯২৩, পৃঃ ৬০৯.

Dhaka University Institutional Repository

শাদী বন্ধ করে দেয়া। তবে এটি মোটেও সহজসাধ্য নয়। (দুই) অমুসলিম মহাজন হতে কর্জ গ্রহণ বন্ধ করা। এরূপ করতে গেলে মুসলিম মহাজনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক হবে। কিন্তু এতে ধর্মের বাধা আছে। ইসলাম ধর্ম সুদ খাওয়া অনুমোদন করেনা। এ সব জটিল সমস্যার সমাধানকল্পে ইসলামে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুযোগ রয়েছে এবং সাথে সাথে কো-অপারেটিভ অর্থাৎ পরস্পর সাহায্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করে ঋণ আদান প্রদানের ব্যবস্থা করলে জাতিকে রক্ষা করার একটা পথ আবিস্কৃত হতে পারে।[১৪]

মাওলানা ইসলামাবাদীর জীবনের অনন্যসাধারণ সমাজ-উন্নয়ণমূলক উদ্যোগ হচ্ছে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা এবং এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজের খেদমত বা সেবা করা। বহুদিন ধরেই তিনি এরূপ একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে আসছিলেন, কিন্তু মুসলিম সমাজে তখন ব্যাংক ব্যবসায় এবং ব্যাংকের সুদনীতির প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়া চলছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি 'ইসলামাবাদ টাউন কো-অপারেটিভ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করেন। মাওলানা ইসলামাবাদী সুস্পষ্টরূপে বলেছেন যে, শরীয়াহ্ নিষিদ্ধ 'রিবা' এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রচলিত সাধারণ সুদ এক নয়। বরং এটা অন্ততঃ মন্দের ভাল হিসেবে বিবেচিত। এতে তদানীন্তন সমাজের আলিমগন তাঁকে কাফির হিসেবে ফাত্ওয়া দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এতে দমে যাননি। তিনি এ সহজাত দু:সাহসে ভর করেই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভার গ্রহণ করেছিলেন।[১৫]

হানাফী-মোহাম্মদী বিবাদ তথা সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ও হিন্দু-মুসলিম বিবাদ তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল এবং এগুলোর নিরসনকল্পে তিনি প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন– আত্ম-কলহ জাতি- ধবংসের পূর্ব লক্ষণ এবং দেশকে গৃহ বিবাদের দাবানল থেকে রক্ষা করার জন্য দেশ-হিতৈষী ও দেশের মুক্তিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই চিন্তা করা কর্তব্য। তাঁর বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে,

---

[১৩] মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী, আত্মজীবন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫-৯৬.

[১৪] পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৬.

[১৫] মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭-৭৯; ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত; আবুল ফজল, রেখাচিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৮; মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, 'সুদ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', সওগাত, ৫ম বর্ষ, ১১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৫.

Dhaka University Institutional Repository

হানাফী ও মোহাম্মদীর আচার- অনুষ্ঠানের বৈষম্যকে পুঁজি করে যাঁরা মুসলিমদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে তোলেন, তাঁরা ইসলামের শত্রু ।[১৬]

বিশ শতকের গোড়ার দিকে হিন্দু-মুসলিম বিবাদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ভারতের হিন্দু-মুসলিমদের একতা ও সম্প্রীতি সংস্থাপনের উপর যে দেশের সর্ববিধ মঙ্গল নির্ভর করে, একথা সর্ববাদী স্বীকার্য । বিগত ২/৩ বছরের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী ও আলী ভ্রাতৃদ্বয় এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় এ শুভ ও সাধু সংকল্প অনেকটা সফলতার পথে অগ্রসর হয়েছিল । কিন্তু বিগত কয়েক মাসের মধ্যে মালব্যজীর হিন্দু সংগঠন, হিন্দু মহাসভা এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দের ভারত শুদ্ধি সমিতির ফলে যুগ ব্যাপী সাধনার ফল পন্ড হওয়ার উপক্রম । এবার আজমীর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, সাহারানপুর, মিরাট, এলাহাবাদ, মুরাদাবাদ, পানিপথ, অমৃতসর, লাহোর প্রভৃতি স্থানে হিন্দু-মুসলিমদের যে সব দাঙ্গাহাঙ্গামা, খুন-জখম হয়ে গেল, তৎসমস্তের না হোক, অধিকাংশ দুর্ঘটনার কারণ যে মালব্যজী ও স্বামীজীর ঐ সব নবানুষ্ঠান, তা অস্বীকার করার উপায় নেই । এখন এর প্রতিকারের উপায় কি? দেশকে এরূপ গৃহ-বিবাদের দাবানল হতে রক্ষা করার পন্থা কি, তদ্বিষয়ে চিন্তা করা দেশহিতৈষী ও দেশের মুক্তিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য ।[১৭]

বিলাতী চাল-চলনের অনুকরণ যে মুসলিমদের জাতিসত্তার অন্তরায় এবং চরম ক্ষতিকর, এ বিষয়টিও মাওলানা ইসলামাবাদীর দৃষ্টি এড়ায়নি । তাই তিনি চরম সমাজ হিতৈষণামূলক মনোভাব নিয়ে বিলাতী চালচলনের ক্ষতিকর দিকগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং সাথে সাথে মুসলিমদের অনুকরণের প্রাসঙ্গিক দিকগুলোও উপস্থাপন করেছেন । এ প্রসঙ্গে 'ছোলতান' পত্রিকায় তাঁর বক্তব্যকে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে:

> "বিলাতী রোগটা যেন আমাদের হাড়ে মাংসে জড়িত হইয়া পড়িতেছে । ...কোট-পাতলুন অনেকেরই প্রিয় পোষাক । ন্যাক-টাই এর বাহারই বা কত । অনেকে হ্যাট

---

[১৬] দেখুন : মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী, 'হানিফী-মোহাম্মদী', সম্পাদকীয়, ছোলতান, ১৭শ সংখ্যা, ২১ ভাদ্র, শুক্রবার ১৩৩০/৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৩, পৃঃ ৬.

[১৭] মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী, 'হিন্দু-মুসলমান', ছোলতান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬.

Dhaka University Institutional Repository

মাথায় দিয়া ট্যাস ফিরিঙ্গি সাজিতে ভালবাসে। এমন জুতা ও ফুট পায়ে দেয়, যাহা খুলিয়া কোন ফর্শের মজলেছে বসা যায়না। আবার সর্বত্র চেয়ার বা বেঞ্চাদির ব্যবস্থা থাকাও সম্ভবপর নয়। ভূমি-শয্যা হইলেই সাহেব-মিঞাদের মহাবিপদ। এই জুতার খাতিরে অজু করা অসম্ভব হয়। কাজেই কেহ কেহ নামাজ পড়িতে ইচ্ছা করিলেও অজুর জন্য, জুতা খুলিবার অসুবিধার জন্য তাহা ঘটিয়া উঠেনা। তাহাদের দাঁত মাজিতে বিলাতী টুথ-পাউডার ও টুথ-ব্রাস চাই। দেশী নানা প্রকার উপকারী মাজন এবং এছলামের প্রিয় মেছওয়াক (দাঁতন, যদ্দারা দাঁত পরিষ্কার করা ছুন্নত) তাহাদের নিকট পছন্দ হয়না। ...পথে ঘাটে এস্তেঞ্জা (পেসাব) করিতে হইলে পাতলুনের খাতিরে ইহাদিগকে দাঁড়াইয়া কাজ সারিতে হয়। ইহারা কুলুখ বা পানি গ্রহণ আবশ্যক বোধ করেনা। সুতরাং ইহাদিগকে সর্বদাই নাপাক (অপবিত্র) অবস্থায় থাকিতে হয়। সুরাসার মিশ্রিত নানা প্রকার এসেন্স ইহাদের প্রিয় সুগন্ধ। কাপড়ে ও রুমালে তাহাই ব্যবহৃত হয়। উহাও নাপাক। আতর-গোলাব প্রভৃতি দেশী সুগন্ধ তাহারা পছন্দ করেনা। মহিলাদিগের মধ্যে নানা বিলাতী রোগ প্রবেশ করিতেছে। এছলামী পর্দা রক্ষায় অনেকেই নারাজ। ...আমরা ফিরিঙ্গি অনুকরণের একান্ত পক্ষপাতী।" [১৮]

মাওলানা ইসলামাবাদী সমাজ সেবার মহান ব্রত নিয়ে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। এ প্রসঙ্গে উত্তর বঙ্গ, আসাম ও উত্তর ভারতে তাঁর ইসলাম প্রচারের দিকটি নিয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। [১৯] সমাজ সংস্কারক মাওলানা ইসলামাবাদী অন্ধকারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজ থেকে কুপমন্ডুকতা ও কুসংস্কার, স্থবিরতা ও জড়তা দূর করে সত্য ও ন্যায়ের পথে, উদার মানবতামুখী শিক্ষার পথে বাংলার মুসলিমকে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে নানাভাবে সংস্কার মুক্তির আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি তাদের জাগরণের জন্য গ্রামে-বন্দরে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন 'দেওবন্দ পন্থী'। স্থানে স্থানে মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা স্থাপন করে তিনি মুসলিম সমাজকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট হন।

---

[১৮] মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী, 'বিলাতী রোগ', ছোলতান, ১৯শ সংখ্যা, ৪ আশ্বিন, ১৩৩০/২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৩, পৃঃ ৩৬৫.

[১৯] আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্যঃ 'মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ছিলেন এক বিরল প্রতিভার অধিকারী' শীর্ষক আলোচনা, দৈনিক সংগ্রাম, ১৭/১১/১৯৯৯, পৃঃ ৮; এ.এম.এম. সাহাবুদ্দীন, 'স্মৃতি-চারণঃ মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী', দৈনিক সংগ্রাম, ২৬/১০/২০০০, পৃঃ ৭ ও ৯;ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, 'মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীঃ ইসলামী রেনেসাঁর অন্যতম পথিকৃৎ', ইনকিলাব সাহিত্য, দৈনিক ইনকিলাব, ১০/১২/১৯৯৯, পৃঃ ১২.

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের নানাবিধ দুরবস্থা, দেশের নানাবিধ দুর্দশা তাঁর অন্তরকে করেছিল ব্যথিত। তাই তা দূরীভূত করে মুসলিম সমাজকে কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁর চিন্তার অবধি ছিলনা। এক্ষেত্রে তাঁকে আমরা একজন নি:স্বার্থ সমাজ সেবক হিসেবে পাই।[২০]

স্কুল-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা: মাওলানা ইসলামাবাদী প্রথম জীবন থেকেই সমাজের বিভিন্নমুখী কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। উত্তর বঙ্গ ও আসামে তিনি মূলত: ইসলামের যথার্থ শিক্ষা প্রচারে ব্যস্ত থাকলেও স্থানে স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব ও স্কুল প্রতিষ্ঠায় সকলকে উৎসাহিত করতেন। সীতাকুন্ডে অবস্থানকালে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠায় অধিক মনোযোগ দেন। এসব প্রতিষ্ঠানের কাজে তাঁর অবদান কতটুকু ছিল তা সীতাকুন্ডের মাওলানা ওবায়দুল হক প্রসঙ্গে সমালোচক ফকির আহম্মদের বক্তব্য হতে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠে। ফকির আহম্মদের বর্ননা মোতাবেক, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে 'খড়ের ছাউনী' একখানা গৃহে মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেব অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। নানা বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে একে সিনিয়ার মাদ্রাসায় পরিণত করা হল। এটা শত্রুদের চক্ষুশূল হিসেবে বিবেচিত হল। একদা অমাবস্যা রাত্রির ঘোর অন্ধকারে কে বা কারা মাদ্রাসা গৃহে অগ্নিসংযোগ করল। তিনি এর প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করেননি কিংবা নিরুৎসাহিতও হননি। বিপুল অর্থব্যয়ে মাদ্রাসা গৃহ ক্রমান্বয়ে দালানে পরিনত হল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসার ইমারত নির্মাণ শুরু হয়ে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হল। এ সময় চট্রগ্রামের দীপ্ত প্রদীপ মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী মাওলানা ওবায়দুল হকের দক্ষিন হস্তের ন্যায় কার্য করেছিলেন। তাঁর সাহচর্য ব্যতিরেকে এ মহৎ কর্ম সফল হতো না।[২১]

মোল্লা-মৌলবীগণ যে কেবলমাত্র খয়রাতি হবেন, সমাজের ভার হিসাবেই তাঁদের একমাত্র অপাংক্তেয় পরিচয় হবে, সমাজের কোন হিতে এঁদের অবদান থাকবেনা —— এরকম চিন্তা মাওলানা ইসলামাবাদী ও তাঁর সমকালীন বহু আলিমকে

---

[২০] ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, পূর্বোক্ত, দৈনিক ইনকিলাব, পৃঃ ১২.
[২১] নবনূর, ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩১২.

Dhaka University Institutional Repository

পীড়িত করতো। এ প্রসঙ্গে আবুল ফজল বলেন যে, অনেকের ধারণা, আলিমরা শুধু চাঁদা ও দান-খয়রাত গ্রহণেই অভ্যস্ত, দেওয়ার বেলায় তাঁরা অনুপস্থিত। এ ধারণাও ভুল। অনেক আলিম বহু স্কুল-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নিজেরা সর্বহারা হয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত কিছুমাত্র বিরল নয়। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এঁদের অন্যতম।[২২] মাওলানা ইসলামাবাদী সুদীর্ঘ জীবন ধরে দেশের ও সমাজের সেবা করে গেছেন। কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছেন কপর্দকশূন্য অবস্থায়। জীবনের শেষ সময়েও নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য কিছু না করে তিনি যথাসর্বস্ব ব্যয় করে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত কদম মোবারক এতিমখানা। এ বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে। শেষ জীবনেও তিনি স্বগ্রামে নিজের ছেলের নামে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং এর নাম রাখেন 'সামসুল ইসলাম মাদ্রাসা'।[২৩]

'চট্টগ্রাম ভিক্টোরিয়া ইসলাম হোস্টেল' শিরোনামে মাওলানা ইসলামাবাদী তাঁর 'আত্মজীবন'- এ উল্লেখ করেন, তিনি মোল্লাগিরিকে সব সময় ঘৃণা করতেন। বাড়ীতে বসে গ্রাম্য কোন্দল কলহে ও মোল্লাদের আত্মকলহের মধ্যে থেকে সময় হরণ করার পরিবর্তে টাউনে ভদ্র সমাজে মিলে মিশে সমাজ হিতকর প্রতিষ্ঠানে বেগার খাটাই ভাল জ্ঞান করে তিনি বোর্ডিং- এর সংস্রবে থাকতে স্বীকৃত হলেন এবং ৫/৬ মাস বোর্ডিং-এ সুপারিন্টেন্ডেন্টরূপে কার্য পরিচালনা করলেন। ইতোমধ্যে টাউনের ও চট্টগ্রামের নানা অংশের ভদ্র লোকের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেলেন। তন্মধ্যে সীতাকুন্ড মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সমাজগত প্রাণ মৌলানা ওবায়দুল হক সাহেবের সাথে পরিচয় লাভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি যে বোর্ডিং হাউসে প্রবেশ করেছিলেন তার একটি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল কতগুলি ছাত্রকে নিজ কর্তৃত্বাধীনে পেলে তিনি তাদেরকে স্বদেশ বৎসল, সমাজ হিতৈষী ও ধর্মগত প্রাণ অর্থাৎ মানুষের মত মানুষ রূপে গড়ে তুলতে পারবেন। এ আশায় বুক বেঁধে তিনি এক প্রকার অবৈতনিক ভাবে ছাত্রদের চরিত্র গঠনের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। নিয়মিত জামে মসজিদের জামাতে যোগদান, প্রত্যুষে গাত্রোত্থান,

---

[২২] আবুল ফজল, রেখাচিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯.
[২৩] মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯.

Dhaka University Institutional Repository

স্বাস্থ্যনীতি প্রতিপালন ও জাতীয় জীবন গঠনের প্রতি তিনি ছাত্রদের সর্বদাই উপদেশ দিতেন। এ সময় কাট্টলী গ্রামের নূরুল হক মিয়া, ফেনী কাজী বাড়ীর আমিনুদ্দিন মিয়া, কাট্টলীর ছিদ্দিক চৌধুরী, জমির আহমদ চৌধুরী, ফররোখ আহমদ, জহুর আহমদ চৌধুরী প্রমুখ বোর্ডিং-এর ছাত্র ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সীতাকুন্ড থানার কাঠগড় বা মাহমুদাবাদের জমিদার আব্দুল কুদ্দুছ চৌধুরী সাহেবের পুত্র আওরঙ্গজেব অন্যতম ছাত্র।[২৪]

<u>শিক্ষা আন্দোলন ও কনফারেন্স</u> ঃ মাওলানা ইসলামাবাদী 'দ্বীনি শিক্ষা'র জন্য স্বতন্ত্র কারিকুলাম প্রণয়ন করেন এবং জাতীয় আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও আজীবন সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। এ বিষয়ে যথাস্থানে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপণ করে প্রদেশের সকল আধুনিক ও প্রাচীন পদ্ধতির মাদ্রাসাকে এর অধীনে আনার জন্য তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ওল্ড স্কীম মাদ্রাসায় ব্যবহারিক শিক্ষার প্রচলনসহ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা যাচাইয়ের জন্য তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক কর্তৃক গঠিত মওলা বক্শ কমিটি (২৭ জুলাই, ১৯৩৮)-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন মাওলানা ইসলামাবাদী। অপর সদস্যগণের মধ্যে ছিলেন মাওলানা আকরম খাঁ এবং সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী।[২৫] বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান চর্চার তিনি ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ইসলাম ধর্মের মূলভিত্তি হচ্ছে 'কুরআন' ও 'হাদিস'। কুরআন শরীফের কোন সূরা, কোন আয়াত, কোন শব্দ, কোন বর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তিতর্কের প্রতিকূল নয়।[২৬] এছাড়া 'কোরআন ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধেও তিনি কুরআন শরীফের পরোক্ষ বৈজ্ঞানিক রহস্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, কুরআন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ নয় কিন্তু এর অন্তর্গত শিল্প বিন্যাস ও ধর্মাদেশ, নীতি, চরিতালোচনা প্রভৃতি সকল

---

[২৪] মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী, আত্মজীবনী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০-৮১।
[২৫] মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯-৭০.
[২৬] মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী, 'ধর্ম ও বিজ্ঞান', নবনূর, ভাদ্র ১৩১২.

Dhaka University Institutional Repository

কিছুর মধ্যে একটা প্রমাণ, একটা নৈসর্গিক বর্ননা এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বৈজ্ঞানিক গুপ্ত রহস্য দৃশ্যমান আছে ।[২৭]

এ বিশ্বাস থেকেই তিনি বৈপ্লবিক চিন্তাধারার অধিকারী হন এবং সমাজ সংস্কারে ঝাঁপিয়ে পড়েন । তিনি ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার মধ্যে শিক্ষা বিষয়ের পরিবর্তন আনা এবং নূতন ও যুগোপযোগী বিষয় প্রবর্তন করা প্রয়োজন মনে করেন ।[২৮] এ প্রসঙ্গে লোকমান খান শেরওয়ানীর বিবরণ প্রণিধান যোগ্য । তাঁর বর্ননা মতে, আরবী মাদ্রাসাসমূহে যে বহু যুগের বাণী, হেকমত, মন্তেক ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হতো, সে সমস্ত বস্তাপচা বাতিল জ্ঞান শেখা যে আজকের যুগে সময়ের অপব্যবহার ও পন্ডশ্রম, তা মাওলানা ইসলামাবাদী নির্ভিক হৃদয়ে ঘোষণা করতেন । ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা শিক্ষাদান পদ্ধতি তাঁর মন:পুত ছিলনা । তাঁর মতে, ওল্ড স্কীম মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগন যেমন সত্যিকার মাস্টার হতে পারেনা, তেমনি সম্পূর্ন আলিমও হতে পারেনা । ওল্ড ও নিউ স্কীমের এবং সরকারী আওতার বাইরে থেকে যে সমস্ত মাদ্রাসা নিজেদের মনোনীত নিছাব অনুযায়ী আরবী শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল, সেগুলিকে একটি কেন্দ্রীয় বোর্ডের অধীনে এনে সর্ববাদী ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নিছাব অনুযায়ী শিক্ষাদানের মাধ্যমে আধুনিক যুগোপযোগী আলিম তৈরী করার প্রচেষ্টায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন ।[২৯]

বাংলায় মাদ্রাসা শিক্ষার গোড়ার দিকে বিজ্ঞান, দর্শন, ভূগোল, নৃ-তত্ত, ইতিহাস, ইংরেজী প্রভৃতি আধুনিক বিষয়সমূহ মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত ছিলনা । মাওলানা ইসলামাবাদী প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমকে অসম্পূর্ণ বলে ঘোষণা করেন এবং উক্ত ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার পরিসরকে বর্ধিত করে বাস্ত বমুখী করার আহবান জানান ।[৩০] তিনি নানাভাবে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রচলিত শিক্ষণীয় বিষয়ের পাশে প্রাচীন ও আধুনিক জাতির ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি,

---

[২৭] মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী, 'কোরআন ও বিজ্ঞান', আল্ এসলাম, ভাদ্র ১৩২৩ ।
[২৮] দৈনিক আজাদী, ৭ কার্ত্তিক, ১৩৭২.
[২৯] এছলামাবাদী রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০.
[৩০] মোহাম্মদ শাহ্, 'মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীঃ সমাজ চিন্তা ও ইতিহাস চর্চা', ইতিহাস (বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা), ষড়বিংশতি বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ১৩৯৯, পৃঃ ৬৫-৬৬.

Dhaka University Institutional Repository

দর্শন, রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, ভূগোল, খগোল, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ও ইতিহাসতত্ত্ব এবং সেই সাথে ব্যায়াম, কৃষি, ব্যবসায় নীতি প্রভৃতি বিষয় প্রবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রগতির যুগেও মৌলবীরা উক্ত অসম্পূর্ন মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন এবং জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হন। উর্দু, আরবী এবং ফার্সী জ্ঞান তাদের রুটি রুজির গ্যারান্টি দিতে পারেনি। যে সকল মৌলবী ইসলামকে তার প্রগতিশীল ভূমিকায় তুলে না ধরে মুসলিম সমাজকে পশ্চাদ্পদ রাখতে সহায়তা করেছেন, তিনি কঠোর ভাষায় তাদের তিরস্কার করেন।[৩১]

শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়নের ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা সম্পন্ন করার জন্য পরবর্তী ধাপ হিসাবে মাওলানা ইসলামাবাদী প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময় শিক্ষা সম্মেলন বা কনফারেন্স আহবান করেন। এসব সম্মেলনের মধ্যে ১৯০৩ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন, ১৯১৮, ১৯২২ ও ১৯৩০ সালে জাঁকজমকভাবে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানে ওলামা ও জমিয়তে ওলামার ধর্ম ও রাজনৈতিক কনফারেন্সের শেষে সাহিত্য সম্মেল ও শিক্ষা সম্মেলনসমূহের উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব সম্মেলন জাতীয় জীবনে নানাভাবে তাৎপর্যপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছিল। এছাড়া 'যুক্ত মুসলিম সম্মেলন' আহবান করে তথায় রাজনৈতিক অধিবেশন এবং উলামা ও যুব সম্মেলন ছাড়া শিক্ষা বিষয়েও একটি স্বতন্ত্র অধিবেশন করেন। এ অধিবেশনে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ শিক্ষাবিদগণকে দিয়ে শিক্ষা বিষয়ে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রচার করেন। শিক্ষা আন্দেলনে তাঁর অপর সহযোগিদের মধ্যে ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী ও জনাব আহবাব চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর শিক্ষা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ দিক জাতীয় আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্কীম ও শিক্ষা সমস্যামূলক অন্যান্য চিন্তা-চেতনার কথা

---

[৩১] 'আরবী বিশ্ববিদ্যালয়', আল্-এসলাম, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়-১৩২৭.

Dhaka University Institutional Repository

কল্পনা করলে এই ভেবে অবাক হতে হয় যে, জাতির এক অন্ধকারময় দুর্দিনে তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও কি করে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন ।[৩২]

<u>ইসলাম মিশন</u>: মাওলানা ইসলামাবাদী ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় আলীগড়ে স্থাপিত ভারতীয় মোছলেম শিক্ষা সমিতির অনুকরণে বাংলাদেশে প্রাদেশিক মোছলেম শিক্ষা সমিতি স্থাপনের আবশ্যকতা জ্ঞাপণ পূর্বক এক জ্বালাময়ী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন । ইত্যবসরে কলকাতা হাইকোর্টের সমাজবৎসল এডভোকেট মৌলভী ওয়াজেদ হোছায়েন বি. এল. সাহেব তাঁর প্রাণের ডাকে সাড়া দিয়ে বঙ্গীয় মোছলেম শিক্ষা সমিতি গঠনের লক্ষ্যে অগ্রসর হন । রাজশাহীর মহাপ্রাণ কর্মা 'কিমিয়া ছাআদত'- এর বঙ্গানুবাদকারী মৌলভী মির্জা ইউছুফ আলী সাহেব রাজশাহী জেলা সদরে মোছলেম শিক্ষা কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশনের ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত হন । এই কনফারেন্সের সফলতার জন্য মাওলানা ইসলামাবাদী কলকাতা ও রাজশাহী হতে পুন:পুন অনুরুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মদেশ হতে ৯ মাস ভ্রমনান্তে চট্রগ্রামে এসে উপস্থিত হন । এ কনফারেন্সের সঙ্গে সঙ্গে যাতে এছলাম মিশনের কার্য সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য তিনি সংবাদ পত্রের মধ্যস্থতায় বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি করেন । এর ফলে বিহারের প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ মাওলানা ক্বারী ছোলেমান ফুলওয়ারী, মাওলানা আবদুল কাদের শাহ সারাসী, বাগ্মী প্রবর মুন্সী মেহের উল্লাহ্, কবি প্রবর সমাজগতপ্রাণ বাগ্মী কুল তিলক মৌলভী ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেব প্রমুখ বহু গন্যমান্য ও প্রসিদ্ধ বক্তাবর্গ সভায় আহূত হয়েছিলেন । তাঁদের দ্বারা ইসলামের মাহাত্ম্য, সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সভায় বক্তৃতা করানো হয় । ফলে এখান থেকেই ইসলাম মিশনের সূত্রপাত হয় ।[৩৩]

মাওলানা ইসলামাবাদী শিক্ষা সমিতি ও জাতীয় মহাসমিতির সঙ্গে ইসলাম মিশনকে যুক্ত করেছিলেন । অত:পর আঞ্জুমানে ওলামার সাথে এ মিশন যুক্ত হয় । এ প্রসঙ্গে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন এভাবে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে যখন তাঁর এবং অন্যান্য কতিপয় আলিমের চেষ্টায় আঞ্জুমানে ওলামার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন

---

[৩২] এছলামাবাদী রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১.
[৩৩] এছলামাবাদী রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭-৪৮.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম মিশনের কার্য শিক্ষা সমিতির পরিবর্তে উক্ত আঞ্জুমানের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। ১৯১৪ হতে ১৯১৯ পর্যন্ত আঞ্জুমানে ওলামার তত্ত্বাবধানে ইসলাম মিশনের কার্য প্রবল ও বিস্তৃতভাবে সম্পাদিত হতে থাকে। এ সময় মিশনের প্রচারক সংখ্যা ৬০ জনে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সত্যকথা বলতে কি, আঞ্জুমানে ওলামা ও তদধীন ইসলাম মিশনের দ্বারা সমাজের যে জাগরণ সঞ্চার হয়েছিল, বাংলার মুসলিম সমাজের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে সেরূপ আর কখনও হয়েছিল কিনা সন্দেহ।[৩৪]

ইসলাম মিশনের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য ও বাইরের জগতে এর উদ্দেশ্য সুপরিজ্ঞাত করার জন্য এ সময়ই তিনি 'আল্-এসলাম' ও 'দৈনিক আমীর' প্রকাশ করেন। ইসলাম মিশন সংগঠন উপলক্ষে তিনি পাক-ভারতের প্রায় সর্বত্র এবং বহির্ভারতে ব্রহ্মদেশেও অর্থ সংগ্রহ ও সহানুভূতি লাভের জন্য গমন করেন। বস্তুত: ব্যাপক ভ্রমন ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও আলিমগনের সাহচর্যে আসার ফলে তাঁর পরিকল্পনা ক্রমেই একটা সুষ্ঠুরূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেন:

> "Travelling made him (Maulana Islamabadi) more acquainted with the development of other countries and that inspired him for social service. Maulana Islamabadi toured the sub-continent and middle eastern countries. Al-Azhar University of Cairo in Egypt drew his attention."[৩৫]

এই আল্-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শেই তিনি ইসলাম মিশনের কার্যক্রম পরিচালনাকল্পে একটি মহাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহন করেন। এ বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম মিশন পরবর্তীকালে 'বেঙ্গল-বার্মা এছলাম মিশন'-এ পরিণত হয় এবং ১৯৩০ সালের ১৮-২২ এপ্রিল

---

[৩৪] পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৮.
[৩৫] Eastern Examiner, 1960.

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম প্যারেড ময়দানে যে 'যুক্ত মোছলেম কনফারেন্স' হয় তার শেষ দিবসে বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিদের সম্মেলনে ইসলাম মিশন স্বতন্ত্র আকার ধারণ করে।

<u>জাতীয় আরবী বিশ্ববিদ্যালয় :</u> ইসলাম মিশনের কার্যাবলী এবং মাওলানা ইসলামাবাদীর সমাজ-চিন্তা ও কর্মজীবনের সম্যক ধারণা পেতে হলে তাঁর জাতীয় আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার কথা স্বভাবতঃই এসে পড়ে। সমাজের পরিচয়বর্ধক ও পথপরিচালক কিংবা বিজাতি-বিধর্মীর সমালোচনা ও প্রচারণা প্রতিহতকরণে সমর্থ এমন কোনও প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে ছিলনা যেখান থেকে যুক্তিতর্ক ও শাস্ত্রগত প্রমাণে ইসলাম ধর্মের ও অনুশাসনসমূহের মাহাত্ম প্রচার ও তার প্রাধান্য বিস্তার করা সম্ভব হতে পারে বা ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবন এমন কি রাজনৈতিক জীবনকে নতুনভাবে যুগের প্রয়োজনে নবরূপে সাজানো যেতে পারে। ইসলামাবাদী এ অভাবটা মর্মে মর্মে অনুভব করে ১৯১৫ সাল থেকেই আরবী বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, বিশেষতঃ মোহাম্মদীতে লিখতে শুরু করেন। বিশেষ করে মিশরের আল্-মিনার ও আল্-এহ্রাম পত্রিকায় অজস্র প্রবন্ধ প্রকাশ করে বিশ্বের মুসলিমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৩৬] আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পেছনে মাওলানা ইসলামাবাদীর চিন্তা-চেতনা ছিল এরূপ ঃ

১. দেশ-বিদেশের গুনী-জ্ঞানীর সম্মেলনে একটি পূর্ণাবয়ব ও উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেইসব শিক্ষকমন্ডলীর সাহায্যে দেশে রেনেসাঁর সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করা।

২. ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তার ও যুক্তিবাদের প্রসারণের সাথে সাথে তাদের পরিশ্রমী, সংযমী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও স্বাধীনতাকামী করে গড়ে তোলা এবং এভাবে সমাজ ও দেশের বৃহত্তর কর্তব্যের দ্বারে তাদের পৌঁছিয়ে দেয়া।

৩. পাঠ্য বই (প্রচলিত সরকারী বা বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান মাধ্যম)-এর বাইরে ছাত্রদের চিত্তবৃত্তি বিকাশের উপযোগী যথার্থ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষাটিকে চিহ্নিত করা ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরবীতে শিক্ষা দেয়া।

---

[৩৬] S. M. Ali, History of Chittagong, Chittagong, 1964, P. 162.

Dhaka University Institutional Repository

৪. স্বজাতি বৎসল, সমাজ হিতৈষী, দেশগত প্রাণ, ধার্মিক, চরিত্রবান লোক তৈরি করা, অর্থাৎ মানুষের মত মানুষ গড়া ।

৫. বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণে ছাত্রবৃন্দ যাতে সক্ষম হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা ।

এ প্রসঙ্গে হাকীম আলতাফুর রহমান বলেন, অমুসলিমদের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করতে হলে, খৃষ্টান পাদ্রী ও আর্য-মিশনারীদের হামলা হতে ইসলাম ও মুসলিমকে বাঁচাতে হলে, বিজাতি ও বিধর্মীদের মধ্যে ইসলামের পবিত্র আলো বিকীর্ণ করতে হলে আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন পূর্বক নূতন ছাঁচে সময়োপযোগী আলিম বা প্রচারক গঠন করা ব্যতীত যে গত্যন্তর নেই, তা মাওলানা ইসলামাবাদী তাঁর সূক্ষ্ম চিন্তার দ্বারা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন ।[৩৭]

বস্তুতঃ মাওলানা ইসলামাবাদী আমৃত্যু এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করে গেছেন । এ ইচ্ছা নিয়েই তিনি ব্রহ্মদেশে ও অন্যত্র মিশনারী ট্রেনিং সেন্টার ও কদম মোবারক এতিমখানা প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেছিলেন এবং সক্ষমও হয়েছিলেন । তিনি পাক-ভারতের যাবতীয় হিন্দু মিশনারী কেন্দ্রগুলিতে ঘুরে ঘুরে সেখানকার জীবনযাত্রা প্রণালী ও শিক্ষা পদ্ধতি, আয়-ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণ করেন । ১৯১৯ সালে মৌলানা হছরত মোহানীর সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে তিনি আরো তথ্য ও জ্ঞান লাভ করেন এবং তাঁর পরামর্শ অনুসারে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন ও সেখানে কিছু দিন অবস্থান করেন । এ প্রসঙ্গে হাকীম আলতাফুর রহমান বলেন, মাওলানা ইসলামাবাদী হরিদ্বার হয়ে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনার্থে গমন করেন । গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্য সমাজের উচ্চ চিন্তাপ্রসূত শিক্ষা প্রণালী, জাতীয় জীবন ও চরিত্র গঠন প্রণালী, শারীরিক ব্যায়াম চর্চা ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম ইত্যাদি দেখে তিনি স্তম্ভিত হন । তিনি যে ধারণা নিয়ে আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করছিলেন, তখন তার গুরুত্ব আরো অধিক পরিমানে হৃদয়ঙ্গম করেন ।[৩৮]

---

[৩৭] হাকীম আলতাফুর রহমান, মওলানা ইসলামাবাদীর আরবী বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পণা, চট্টগ্রাম, তাঃ বিঃ ।

[৩৮] পূর্বোক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি পাক-ভারতের দেওবন্দ, দিল্লী, লক্ষ্মৌ, রায়বেরেলী প্রভৃতি স্থানের আরবী শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ এবং ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (হায়দরাবাদ) সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে সংগ্রহ করেন। সর্বশেষে তিনি মিশরের আল্-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এ প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেন ঃ

> "Al-Azhar University of Cairo in Egypt drew his (Maulana Islamabadi's) attention. He was charmed by its structure, teaching staff and teaching ideals and the glories of Islam. Inspired by this noble mission he tried to set up an Arabic University on the basis of Al-Azhar at the Deyang Hill"[৩৯]

দেয়াং পাহাড় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত স্থানটি চট্টগ্রাম থেকে সোজা ৭ মাইল দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর ও কর্নফুলির মোহনার পূর্বতীরে বদরপুরায় অবস্থিত। উক্ত অঞ্চলের জমিদার জনাব আনোয়ার আলী খাঁ চৌধুরী রেজিস্ট্রিযোগে সেখানে প্রায় ৫০০ বিঘা জমি এতদুদ্দেশ্যে দান করেন। এছাড়া মাওলানা ইসলামাবাদী তৎকালীন বঙ্গ সরকারের নিকট থেকে আরো প্রায় ৬০০ বিঘা জমি খাস বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলেন। এই দেয়াং-এ প্রাথমিক কাজ হিসাবে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং মাছ, ভেড়া ও মুরগি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। সামগ্রিক সহানুভূতি ও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে বাকী কাজ সমাপ্ত হয়নি। দেয়াং পাহাড়ে স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে মাওলানা ইসলামাবাদীর একক কোন মত বা প্রভাব ছিলনা। এ বিষয়ে তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থানের বিশিষ্ট আলিম, বুদ্ধিজীবী ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের সুচিন্তিত অভিমত ও পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। অধিকন্তু তিনি সর্বভারতীয় ওলামায়ে কিরামের অনুমোদন লাভের জন্য চট্টগ্রামে ৭ দিন ব্যাপী 'নিখিল ভারত আঞ্জুমানে ওলামা'র এক মহাসম্মেলন আহ্বান করেন। পাক-ভারতের সকল পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কিরাম, যথাঃ মাওলানা হুসায়ন আহ্মদ মাদানী, মাওলানা সুলায়মান ফুল্ওয়ারী, মাওলানা সুলায়মান নদ্ভী, মুফ্তী কেফায়েত উল্লাহ্, হাকিম আজমল খান, ফুরফুরা-শর্ষিনা-ফিরিঙ্গি মহলের পীর সাহেবগন প্রমুখ মনীষীবৃন্দ উক্ত

[৩৯] Eastern Examiner, 1960.

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।[৪০] এতে ইসলামাবাদ জাতীয় আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এক সর্বসম্মত প্রস্তাব বিপুল প্রাণ চাঞ্চল্য ও 'নারায়ে তকবীর' ধ্বনির মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়।[৪১]

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা আকরম খাঁ, মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আহমদ, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী প্রমুখ মনীষী এর গঠনতন্ত্র ও অনুশাসন সম্পর্কিত পদ্ধতি ও পরিকল্পনাদি লিপিবদ্ধ করার পরামর্শ দেন। শেরে হিন্দ মাওলানা শওকত আলী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপনের পর বিভিন্ন পত্রিকায় এ সংবাদ প্রচারিত হলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে মোবারকবাদ আসতে থাকে। সুদূর মিশরেও এজন্য আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল। এ আরবী বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলে এটি হত মাওলানা ইসলামাবাদীর জীবনের ও পাক-ভারতের মুসলিমদের শ্রেষ্ঠকীর্তি। অবশ্য এ পদক্ষেপ গ্রহণের কারনে তিনি অগনিত মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেন।[৪২]

আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠাঃ মাওলানা ইসলামাবাদী ইসলাম মিশনের বিভিন্ন কার্যোপলক্ষে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আঞ্জুমানের সাথে জড়িত হন। তিনি ১৯১১ সালে যেমন বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন, পরবর্তী শিক্ষা সম্মেলনসমূহেও তাঁর অবদান ছিল তেমনি উল্লেখযোগ্য। এসব কাজে আলিম সমাজের এবং তৎকালীন মুসলিম সমাজের সার্বিক দায়িত্ব ক্রমশ তাঁর ওপর এসে বর্তালে তিনি আঞ্জুমানে ওলামা, জমিয়তে ওলামা প্রভৃতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং বঙ্গীয় মোছলেম শিক্ষা সমিতি ও বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য

---

[৪০] লোকমান খান শেরওয়ানী, 'স্মৃতির পাতা থেকে আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ও মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী', দৈনিক আজাদী, ২৪ অক্টোবর, ১৯৬১.

[৪১] হাকীম আলতাফুর রহমান, প্রাগুক্ত.

[৪২] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ মোশাররফ হোসেন খান, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫-৭৮; মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫১-৫৫; মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, 'ইসলামাবাদী ও জাতীয় আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প', ইনকিলাব সাহিত্য, দৈনিক ইনকিলাব, ২৭ অক্টোবর ২০০০, পৃঃ১২.

Dhaka University Institutional Repository

সমিতির অধিবেশনের জন্যও উদ্যোগী হন।[৪৩] এসব আঞ্জুমান গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার। প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতি করে খিলাফত আন্দোলনকে জোরদার করা, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করা এবং জাতীয় আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে প্রচার করাই ছিল তখন আঞ্জুমানের স্থির লক্ষ্য ও নির্দিষ্ট দায়িত্ব।[৪৪]

মাওলানা ইসলামাবাদীর কালে ধর্মীয় নেতা হিসাবে আলিমদের সামাজিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল অসীম। তাই মুসলিম সমাজের সমূহ বিপর্যয় ও সম্মুখ অন্ধকারকে সমূলে উৎখাতের জন্য সেই শক্তিকেই যথোপযুক্তভাবে পরিচালনার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা–এ চিন্তায় তিনি বিভোর ছিলেন। সম্ভবত: রংপুরেই প্রথম মুসলিম সমাজের দুর্দশাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেন এবং এর মুক্তির উপায় ভাবতে থাকেন। আর এ কারণেই তিনি একটি নির্দিষ্ট কার্যক্রম ও সংকল্প নিয়ে মুসলিম সমাজের পতন ও বিপর্যস্ত রূপের সাথে সংগ্রামে অবতীর্ন হয়েছিলেন। তবে আলিম সমাজকে ঐক্য-বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য একটা অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন ছিল। তৎকালে উত্তর বঙ্গ, পূর্ববাংলা, পূর্নিয়া, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে যেসব আলিম সম্মেলনী হতো এবং আলিম-সমাজ সমাজের গৃহবিবাদ নিবারণের যে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন, তার ফলেই ১৯১৯ সালে এই আঞ্জুমান বা আলিম সমিতি গঠন করতে তিনি উৎসাহ পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাড়াও পেলেন সর্বত্র।

সমাজ সংস্কার আন্দোলনে তিনি মাওলানা আকরম খাঁ ও সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর দোসর ছিলেন। কর্মজীবনের গোঁড়া থেকেই তাঁরা একসাথে মিলে বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, চালিয়েছেন এক জোটে। আঞ্জুমানে উলামা-এ বাঙালা, আল্ এছলাম, ইসলাম মিশন ইত্যাদি পরিচালিত হতো উভয়ের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। রাজনীতি ক্ষেত্রেও উভয়ে দীর্ঘকাল ধরে সম-মতাবলম্বী ও একই

---

[৪৩] 'আঞ্জুমানে ওলামার তৃতীয় অধিবেশন সংক্রান্ত সংবাদ', আল-এসলাম, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২৫.

[৪৪] 'আঞ্জমন সংক্রান্ত সংবাদ,' আল-এসলাম, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ ১৩২৭.

Dhaka University Institutional Repository

পথের পথিক ছিলেন।[৪৫] জানা যায়, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে বগুড়া বানিয়া পাড়ায় এক আনুষ্ঠানিক অধিবেশনে মাওলানা আকরম খাঁর সভাপতিত্বে সমগ্র বঙ্গদেশের আলিম সমাজের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান আঞ্জুমানে ওলামার উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। এই আঞ্জুমানই 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আমাদের জাতীয় জীবনের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ভূমিকা নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগানোর ক্ষেত্রে এ আঞ্জুমানের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'আল্-এসলাম' এ প্রতিষ্ঠানেরই মুখপত্র হিসেবে দীর্ঘকাল জাতির খিদমতে রত থেকেছে।

বাংলার আলিমদের স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ ঘটে এই আঞ্জুমানে। পরবর্তীকালে এর কাজ ও দায়িত্ব প্রসারিত হওয়ার ফলে এর নামও পরিবর্তিত হয়ে 'জমিয়তে ওলামায়ে বাঙালা' হয়। আরবী বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পণাটি পত্রিকা মারফত জনগণের সামনে উপস্থাপন করে যখন মাওলানা ইসলামাবাদী জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন, সেই সময় জমিয়তে ওলামায়ে বাঙালার তত্ত্বাবধানে তিনি একটি স্কীম ও পাঠ্য তালিকা প্রনয়ণ করেন এবং তা বিবেচনার জন্য সুধীজনের কাছে পেশ করেন। এই জমিয়তে ওলামায়ে বাঙালার এক প্রস্তাবেই ১৯৩০ সনে চট্টগ্রামে এতিমখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৬]

সামাজিক আন্দোলন ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ: জাতীয় মহাসমিতি, খাদেমুল ইসলাম, ইসলাম মিশন, আঞ্জুমান প্রভৃতি ছাড়াও মাওলানা ইসলামাবাদী সমগ্র বঙ্গদেশের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের ও সম্মেলন পরিষদের সাথে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন । সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে এবং গঠনমূলক পরিকল্পনা অন্তরে বাসনা করেই তিনি এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে নিজেকে জড়িত করতেন। তাঁর সামাজিক ভূমিকা এতদূর বিস্তৃত ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যে, ইসলামাবাদীর দশম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে Eastern Examiner- এ বলা হয়েছে :

---

[৪৫] আবুল ফজল, রেখাচিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৩.
[৪৬] মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০.

Dhaka University Institutional Repository

"Baitul Mall Fund, eremation of dead bodies, Mosques, Vocational Educational Institutions and Khademul Islam Organisation, Aiding pilgrims to Macca, helping the disabled and needy, introduction of 'Muslati chal', opening of night schools, Curb on early marriage & elimination of extravagance in marriages were a few of his (Maulana Islamabadi's) works. In social sphere, his policy was that of liberal....Maulana Islamabadi was a pioneer social reformer."[৪৭]

এম. সিরাজুল হক ইসলামাবাদীর ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক পত্রিকায় তাঁর সামাজিক অবদানের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন, মাওলানা ইসলামাবাদী ছিলেন গাঠনিক প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী। সমাজ সংগঠন, শিক্ষা সংস্কার, মসজিদ সংগঠন, বায়তুল মাল ফান্ড প্রতিষ্ঠা, লাইব্রেরী সংগঠন, সংবাদ পত্রের প্রচার, নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, অপব্যয় নিবারণ, সালিশ মীমাংসা বোর্ড– এসব ছিল তাঁর কার্যক্রম। তিনি ঈদগাহ প্রতিষ্ঠা, গোরস্থান কমিটি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অর্থকরী বিদ্যাপীঠ, লা-ওয়ারিশ গোর দেয়া প্রভৃতি সেবাকার্যের অগ্রনায়ক ছিলেন।[৪৮]

কৃষক-প্রজাদের উন্নয়নকল্পে মাওলানা ইসলামাবাদীর পরিকল্পনাসমূহের কথা তাঁর রাজনীতি বিষয়ক আলোচনায় স্থান পেয়েছে। বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের সেবার জন্য এবং জাতির ব্যবসায়িক উন্নতির লক্ষ্যে তিনি স্বদেশী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 'খেলাফৎ স্টোর' প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যবসায়ী চেতনা বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে পূর্বে সামান্যই ছিল। খেলাফৎ স্টোর ব্যতীত তাঁর অপর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'শাহজাহান এন্ড কোং'। খেলাফৎ স্টোরের ম্যানেজিং এজেন্টও ছিল এ কোম্পানী। এই কোম্পানী মূলতঃ মুসলিম সাহিত্যিকদের বই-পুস্তক প্রকাশনার নিমিত্ত গঠিত হয়। অপর এক বিবরন হতে জানা যায় যে, তিনি চট্টগ্রাম শহরের আন্দর কিল্লায় 'শাহজাহান লাইব্রেরী' নামক একটি পুস্তক ব্যবসায়ের দোকান খুলেছিলেন। কিন্তু

---

৪৭ Eastarn Examiner, 1960

৪৮ এম. সিরাজুল হক, 'মওলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী', দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম, ২৪ অক্টোবর, ১৯৫৮.

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসায়ের প্রতি তিনি মনোযোগ দিতে না পারায় কাঙ্খিত সফলতা অর্জন করতে পারেননি।[৪৯] পুস্তক সরবরাহ কেন্দ্র ব্যতীত নৌ-পরিবহন সংক্রান্ত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানও তিনি স্থাপন করেন এবং পরবর্তীকালে আনসার গঠনেও মনোযোগী হয়েছিলেন।[৫০]

নারী কল্যাণ: নারী কল্যাণ ও সমাজে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মাওলানা ইসলামাবাদী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি তাঁর সমসাময়িককালে বাংলার মুসলিম মেয়েদের কল্যাণের প্রায় সকল পথই রুদ্ধপ্রায় দেখেছিলেন। সমাজে নানা সমস্যা নারীদের কুক্ষিগত করে রাখতো। তাঁদের আত্মচেতনা থাকা দূরের কথা, তাঁদের প্রতি সামাজিক শ্রদ্ধা যথেষ্ট ছিল কিনা সন্দেহ। বেগম রোকেয়া প্রমুখের আন্দোলন এ কারণেই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে। এসময় মাওলানা ইসলামাবাদীর পত্রিকা 'আল্-এসলাম' নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বাস্তব ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এছাড়া বিভিন্ন রচনায় তিনি এ বিষয়ে নারী সমাজকে সচেতন করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে মনসুর উদ্দীন বলেন, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী মুসলিম সমাজকে সামগ্রিকরূপে পূনরুজ্জীবিত করার অভিপ্রায় নিয়েই বঙ্গ সাহিত্য সেবায় আত্ম নিয়োগ করেন। তিনি মুসলিম বীরাঙ্গনাদের জীবনী বাংলা ভাষায় আলোচনা করেছেন। এর জন্য বঙ্গ ললনাগণ আত্মচেতনা লাভে সমর্থ হয়েছে।[৫১]

মুসলিম ললনাকুলের গৌরবময় ইতিহাস মাওলানা ইসলামাবাদীর মত অন্যকেহ তুলে ধরতে সক্ষম হননি। হযরত মুহাম্মদ (স) এর সমসাময়িক কালে এবং তাঁর পরেও মুসলিম বীরাঙ্গনাগণ কীভাবে যুদ্ধ বিগ্রহে অংশ গ্রহন করেছেন এবং পুরুষদের সুখ দুঃখের অংশীদার হয়েছেন, তার বর্ননা করে বাঙালী মুসলিম মহিলারাও যাতে সেভাবে অনুপ্রাণিত হন, তার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন তাঁর 'মোসলেম বীরাঙ্গনা' বইটিতে। এ প্রসঙ্গে ড. কাজী দীন মুহাম্মদের বিবরন

---

[৪৯] দেওয়ান আবদুল হামিদ, 'মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী', দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ২৪ অক্টোবর, ১৯৫৫.

[৫০] ড. আঃ গফুর সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত.

[৫১] এছলামাবাদী রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪.

Dhaka University Institutional Repository

প্রনিধানযোগ্য। তাঁর বর্ননা মোতাবেক, মুসলিম বীরাঙ্গনা গ্রন্থখানিতে মুসলিম শাসকদের মধ্যে মহিলাদের অবদান, তাঁদের ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্য, সাহসিকতার অকপট ইতিহাস উজ্জল হয়ে ফুটে আছে। এমনকি ধর্ম চর্চায় মুসলিম মহিলারা কতখানি অগ্রসর ছিলেন তার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায় এ গ্রন্থখানিতে। ধর্মরাজ্য সাধক মহাপুরুষদের সাথে সাথে মহিলাদের জীবনী ও সাধনার বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আদর্শ জীবন ধারার পরিচয় তুলে ধরেছেন মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী তাঁর স্বভাব সুলভ ভাষায়।[৫২]

মানবতার সেবাঃ মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ছিলেন মানবতার সেবায় নিবেদিত প্রাণ ও নিরলস কর্মী। মানবতার কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত। এ প্রসঙ্গে এম. সিরাজুল হক বলেন, সেবা প্রবৃত্তিই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। রাজশাহীর জলপ্লাবন, সান্তাহারের বন্যা, আরা শাহবাদের দাঙ্গা, কানপুর মসজিদ হাঙ্গামা, তুর্কীর বলকান যুদ্ধ, হেজাজ রেলওয়ে এবং দেশের দুর্ভিক্ষ মহামারীতে ও মানবতার বিপদে তিনি আপ্রাণ খেটেছেন।[৫৩]

মাওলানা ইসলামাবাদীর রংপুর জীবন ও ধর্ম প্রচারের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের এ দিকটার কথা যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। মানবতার সেবাই যে তাঁর জীবনের শেষদিন অবধি লক্ষ্য ছিল, সেকথা তাঁর নিম্নোক্ত কবিতা ছত্রগুলোতেও মূর্ত হয়ে উঠে :

“ষাটের উপর, আরও দশ বছর,
বৃথা কাটিয়া গিয়াছে আমার ওমর
দেশ-বিদেশ ভ্রমণে, সমাজ সেবায়,
রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য চর্চায়
ধর্ম-প্রচার কাজে, আর শিক্ষা বিস্তার
সময় এসব কাজে কেটেছে আমার।

---

[৫২] ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, ‘মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীঃ ইসলামী রেনেসাঁর অন্যতম পথিকৃৎ’, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২.
[৫৩] এম. সিরাজুল হক, প্রাগুক্ত.

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু হায়! জন্মস্থান নিজ বাসভূমে,
সৎকর্ম করিনাই নিজ পল্লী ধামে,
সংকল্প করিয়াছি জীবন সন্ধ্যায়,
অবশিষ্ঠ জীবন করব এখানে ব্যয়
কোরানের শিক্ষা দিব জনসাধারণে,
আধ্যাত্মিক-দীক্ষা দিব জনগণে,
দেশ বিদেশের রোগাক্রান্ত লোকজন
আল্লাহ্‌র আদেশে করবে আরোগ্য অর্জন ।
সুফী দরবেশ মোরশেদ কিছুই নাই,
বহু দরবেশের মাজারে গেছি মুই ।"[৫৪]

কদম মোবারক এতিমখানা: মাওলানা ইসলামাবাদী ছিলেন আজীবন সমাজ কর্মী ও সমাজ সংগঠক। তিনি বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পরিষদ ও আঞ্জুমানে ওলামাসহ যত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, জীবনে যত মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা, পাঠাগার এবং অন্যান্য শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, তার মধ্যে তাঁর অক্ষয় কীর্তি হচ্ছে তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম কদম মোবারক এতিমখানা। সত্যিই এটি তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং সমাজ সেবার জ্বলন্ত নিদর্শন।[৫৫] এ এতিমখানা ছিল তাঁর আরবী বিশ্ববিদ্যালয়'-এর মতই আর একটি প্রাণ প্রিয় প্রতিষ্ঠান, এটি ছিল তাঁর অতি প্রিয় স্বপ্ন। এখানেই তিনি সমাহিতও হয়েছিলেন তাঁর অন্তিম বাসনা অনুযায়ী। ১৯১৮ সালে এক সম্মেলনে তিনি এ এতিমখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত প্রথম প্রস্তাবাকারে ঘোষণা করেন।[৫৬] কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করে জাতিসেবামূলক এ কেন্দ্রটি স্থাপন করা তখন সম্ভব হয়ে

---

[৫৪] মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী, 'পদ্যে আত্মজীবনী, জীবন সন্ধ্যায়-২', আত্মজীবন, শামসুজ্জামান খান (ভূমিকা ও সম্পাদনা), পাঠক সমাবেশদ, ঢাকা, ২০০৪, পৃঃ ১২১.

[৫৫] ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২; মুহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৮; জাফর আলম, স্মরনীয় বরনীয়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০.

[৫৬] Dr. A.M. Serajuddin, 'Nature of the Rights of the Zamindars and Ryots of Bengal in Land Prior to the Permanent Settlement of 1793', Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol.XVI, No. 2, August, 1971.

Dhaka University Institutional Repository

উঠেনি। অবশেষে এ প্রতিষ্ঠানটির স্থাপন সম্ভব হয় ১৯৩১ সনের ১৮ জানুয়ারী (মতান্তরে জুন)। প্রথমে তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'ইসলাম মিশন এতিমখানা'। অবশ্য মাওলানা ইসলামাবাদী তাঁর 'আত্মজীবন'- এ জানান :

> "১৯৩০ অব্দে চট্টগ্রাম টাউনে জয়েন্ট মোছলেম কনফারেন্স জমিয়তে ওলামার সভায়ও এছলাম মিশন কনফারেন্সের একটী এতিমখানা স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। দেয়াঙ্গ পাহাড়ে আমার সংকল্পিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবও সমর্থিত হয়। ১৯৩০ অব্দে শেষভাগে চট্টগ্রাম শহরে কদম মোবারক স্থানে এতিমখানা স্থাপন করি।"[৫৭]

মাওলানা ইসলামাবাদী প্রতিষ্ঠিত এ এতিমখানা আশ্রম হিসাবে একটি আদর্শস্থান। শিক্ষার্থীদের আধুনিক জীবন-যুদ্ধের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য যেমন লেখা পড়ার সকল সুযোগ-সুবিধাকে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে, তেমনি এতিমদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলারও সকল আয়োজন এখানে রাখা হয়েছে। সেলাই, বই বাঁধাই, সুতা কাটা, কাপড় বোনা, আসবাবপত্র নির্মাণ প্রভৃতি পেশাগত শিক্ষা এখানে আবশ্যিক বলে গন্য। এছাড়া স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত খেলাধূলার ও শরীর চর্চার এবং ট্রেনিং-এর সুবন্দোবস্ত সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ এতিমখানার বহু ছাত্র আজ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। এ এতিমখানা শুধু এতিমদের আশ্রয় কেন্দ্রই নয়; দুস্থ এক সমাজ, প্রাচীন অথর্ব এক জীবন যেন আশ্রয় পেয়ে এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। আর এখানেই নিঃস্বার্থ সমাজ সেবক মাওলানা ইসলামাবাদীর সার্থকতা।

---

[৫৭] মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী, আত্মজীবন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৮.

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাওলানা ইসলামাবাদীর ঐতিহ্য চেতনা এবং ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনা

ক) মাওলানা ইসলামাবাদীর ঐতিহ্য চেতনা

যে জাতির ইতিহাস নেই, তার ঐতিহ্যও নেই। যাঁরা কর্মবীর, আত্মত্যাগী, দেশপ্রেমিক এবং সাহিত্যে যাঁদের জয়গাথা কীর্তিত তাঁরাই অমর, তাঁরাই ইতিহাসের দৃষ্টান্তস্থল। জাতি বড় হয় তার অতীতকে জেনেই, আর অতীত জাগ্রত হয় ইতিহাসে স্বকীর্তিধন্য সেই কিংবদন্তী পুরুষদের স্মরণপথে।[১] আমাদের জাতীয় জীবনে আজ যেসব স্মরণীয় পুরুষ বিস্মৃতির উত্তাল তমসাকে বিদীর্ন করে আপন কীর্তির মহিমায় দ্যুতিভাস্বর, মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী তাঁদেরই একজন। উনিশ শতকের শেষপাদে জন্মগ্রহণ করে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে জীবন যাপন করেন। ঐতিহ্য চেতনায়, ইতিহাস সাধনায়, সাহিত্য চর্চায়, পত্রিকা সম্পাদনায়, শিক্ষা আন্দোলনে ও সমাজকর্মে কিংবা রাজনীতিতে এবং ধর্ম প্রচারমূলক কর্মধারায় বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এ ব্যক্তিটি তাঁর স্বকীয় অনন্যতার যে প্রমাণ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা ভাবলে আজও বিস্মিত হতে হয়। তাঁর এই অবদানের কথা বাংলার বাইরেও অর্থাৎ ভারতের আসাম থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত এবং ব্রহ্মদেশ থেকে সুদূর মিশর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বস্তুত:পক্ষে তাঁর সমকালে জাতির উন্নতির লক্ষ্যে এমন নিবেদিত প্রাণ, এমন ইতিহাস-ঐতিহ্য সচেতন, এমন সাহসী ও অতুলনীয় বাগ্মী ও চিন্তাবিদ, এমন একনিষ্ঠ সমাজকর্মী, ধর্ম প্রচারক এবং আপোসহীন রাজনীতিবিদ খুব অল্প সংখ্যাক ব্যক্তিই ছিলেন।

মাওলানা ইসলামাবাদী ইসলাম ধর্ম, মুসলিম শাসন এবং বাঙ্গালী মুসলিমদের বিভিন্ন সমস্যা ও সেগুলোর সমাধান বিষয়ক বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। এসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধের ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্ট। আর এগুলো নিঃসন্দেহে

---

১ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), মৌলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ ঃ ৯ 'নিবেদন' অংশ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর ঐতিহ্য চেতনার প্রমাণ বহন করে। এগুলোর মধ্য দিয়ে তাঁর সমাজসেবা, ধর্ম-প্রচার, ইতিহাস চর্চা, শিক্ষা বিস্তার ও আযাদী সংগ্রাম বিষয়ক চিন্তাধারা ও কার্যাবলী পরিস্ফূট হয়ে উঠেছে। তাঁর লেখাগুলো ভাবাবেগ ও প্রতিক্রিয়াশীলতার দোষ থেকে মুক্ত এবং প্রগতি ও যুক্তিবাদের মহিমায় ভাস্বর। তিনি তাঁর সমসাময়িক বহু আলিমের তুলনায় অনেক বেশী ঐতিহ্য সচেতন, উদারচেতা, প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী ছিলেন।[২]

মাওলানা ইসলামাবাদী মুসলিম সমাজের অর্থ-সম্পদ ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তির অভাবকে গভীর উদ্বেগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেন। মুসলিমদের জাতীয় স্কুল-কলেজ, ব্যবসায়-বাণিজ্যের কোম্পানী এবং সংবাদপত্রের অভাব প্রত্যক্ষ করে তিনি খুবই মর্মাহত হন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, মুসলিমদের জাতীয় মাদ্রাসা, প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের জাতীয় অগ্রগতি সাধিত হবে।[৩] তাই তিনি মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে কিছু সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন।[৪] বাঙালী মুসলিমদের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য তিনি মূল্যবান অবদান রেখেছেন। মুসলিম জাতির অতীত গৌরবের কথা শুনিয়ে তাদের অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যেই তিনি তাঁর লিখনী পরিচালনা করেছেন। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান সম্পর্কে বাঙালী মুসলিমদের অবহিত করে তাদের উজ্জীবিত করাই ছিল তাঁর এসব লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য।[৫]

---

২ দেখুন: শাহেদ আলী, বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান, জিলা কাউন্সিল, চট্টগ্রাম, ১৯৬৫, পৃঃ ২০১-২০২।

৩ এসলামাবাদী, 'ইসলাম-মিশন', ইসলাম প্রচারক, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১১ সাল।

৪ এ বিষয়ে বর্তমান অভিসন্দর্ভে ইসলামাবাদীর 'সমাজ সেবা' বিষয়ক আলোচনাতে বিস্তারিত জানা যাবে। এতদ্‌সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, এসলামাবাদী, 'সমাজ সংস্কার', আল্‌-এসলাম, ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩২৫; ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩২৬; ৫ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ন ১৩২৬।

৫ M. Enamul Huq, 'Muslim Contribution to the Development of Bengali Language and Literature' in Syed Sajjad Husain (ed.), East Pakistan: A Profile, Dhaka, 1962, P. 122.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের আদর্শ প্রচার ও মর্যাদা বৃদ্ধি তাঁর জীবনের ব্রত ছিল সত্য, কিন্তু তিনি কখনও ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও ব্যাখ্যার উপর ইসলামের প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। 'ইসলাম ও বিজ্ঞান' (প্রচারক, মাঘ ১৩০৭), 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' (নবনূর, ভাদ্র ১৩১২) প্রভৃতি প্রবন্ধে তার প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়।[৬] এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন যে, মাওলানা ইসলামাবাদী ছিলেন আলিম কিন্তু অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষপাতী। নানা অর্থকষ্টের মধ্যেও তিনি সাহিত্য সাধনা ও সমাজসেবা করে গেছেন।[৭]

মাওলানা ইসলামাবাদীর লিখনীতে তাঁর প্যান-ইসলামী চিন্তা-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্বের মুসলিমদের কাছে তুরস্কের সুলতান 'খলিফা' বা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে পরিগনিত হতেন। প্যান-ইসলামী ভাবধারার প্রভাবে ভারতের মুসলিমদের চক্ষে তাঁর সম্মান সমুন্নত ছিল। ১৮৭৭ সালে রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের সময় নবাব আবদুল লতিফ সভা করে তুরস্কের আহত সৈন্যদের সেবা ও নিহত সৈন্যদের পরিবারের সাহায্যের জন্য চাঁদা তুলেছিলেন।[৮] তখন থেকে শুরু করে ১৯২১ সালে 'খিলাফত আন্দোলন' পর্যন্ত ভারতবর্ষের মুসলিমগণ তুরস্ক সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতুহল পোষণ করেছেন। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের 'গ্রীস-তুরস্ক' (১৮৯৯), মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর 'তুরস্কের সুলতান', সৈয়দ রওশন আলীর 'তুরস্ক বিগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনার মৌলিক প্রেরণা ছিল প্যান-ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ। দামেশ্‌ক-হেজাজ রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হলে (১৯০০) ঐ একই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে মাওলানা ইসলামাবাদী চাঁদা সংগ্রহের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। হাবীবুল্লাহ্ বাহার বলেছেন: "মনিরুজ্জামানের উপর শিবলী নোমানীর (১৮৫৭-১৯১৪) বেশী প্রভাব পড়েছিল; উভয়ে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মধ্যে জাতীয় জাগরণের উৎস খুঁজেছিলেন"।[৯]

---

৬ ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩৫৪।

৭ মওলানা ইসলামাবাদী স্মৃতি বার্ষিকী, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ ঃ ৬।

৮ Enamul Huq (ed.), Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings and Related Documents, Dacca, 1968, P. 185.

৯ হাবীবুল্লাহ্ বাহার রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৪৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এমন কিছু ঘটনা ঘটল যাতে ইসলামাবাদীর প্যান-ইসলামী চিন্তা-চেতনায় ভাটা পড়ে এবং তিনি ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে নিশ্চুপ থেকে ভৌগোলিক জাতীয়াবাদের প্রবক্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।[১০] মোস্তফা কামাল পাশা কর্তৃক খিলাফতের অবসান ঘোষণা, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন থেমে যাওয়া, ইউরোপে লুজান চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া এবং সে সময় ওহাবীদের দ্বারা মক্কা শরীফ অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে মুসলিমদের মধ্যে ঘরোয়া বিবাদ বৃদ্ধি পেলে প্যান-ইসলামী চিন্তা-চেতনা থেকে মুসলিমদের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট থেকে তাদের দৃষ্টি ঘুরে এসে নিজ এলাকার মুসলিমদের সমস্যাবলীর উপর কেন্দ্রীভূত হয়।[১১] খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময়ের ঐক্যে ফাটল ধরে এবং হিন্দু-মুসলিমের পারস্পরিক অবিশ্বাস ঘনীভূত হয়। এতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট ও হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। সেই সংকটজনক মূহুর্তে হিন্দু-মুসলিমের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের বাণী নিয়ে এগিয়ে এলেন মাওলানা ইসলামাবাদী। এখন থেকে তিনি হলেন একজন খাঁটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বার্থেই তিনি হিন্দু-মুসলিমের স্থায়ী ঐক্য, বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক সহযোগিতা কামনা করেন। হিন্দু-মুসলিমের সংঘাতকে তিনি 'মহাপাপ' বলে ঘোষণা করেন।[১২]

মাওলানা ইসলামাবাদী গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে, পাশ্চাত্যের বহু ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুসলিম সমাজ ও শাসকদের বিকৃত ইতিহাস রচনা করে মুসলিমদের তুলনায় ইংরেজদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন।[১৩] তাঁরা ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম জাতিকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পরম শত্রু এবং তাদের প্রতি নিতান্ত অনুদার বলে বর্ণনা করেন। তাঁদের বিবরণে দেখা যায় যে, মুসলিম শাসকগণ ভিন্ন জাতীয় প্রজা সাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন, বল

---

১০ মোহাম্মদ শাহ, 'মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী: সমাজ চিন্তা ও ইতিহাস চর্চা,' ইতিহাস (ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা), ষড় বিংশতি বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৯৯ বাংলা, পৃ ঃ ৬৬।

১১ Bengal Administration Report, 1924-25, Calcutta, 1926, P. 15.

১২ ইসলামাবাদী, 'ঈদ-উল-আযহা', আল্-এসলাম, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৩২৬ সাল।

১৩ মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী, ভারতে মুসলমান সভ্যতা, কলিকাতা, ১৯১৪, পৃ ঃ ১৪২; মোহাম্মদ শাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োগে বা তরবারির ভয় প্রদর্শনে এবং জিজিয়া আরোপের মাধ্যমে তাদের ইসলামে দীক্ষিত করতেন, তাদের দেব মন্দির ও ভজনালয়সমূহ ধ্বংস করতেন এবং সরকারী উচ্চ পদ থেকে তাদের বঞ্চিত করতেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের আদর্শ অনুসরণ করে 'এতদ্দেশীয় অনুকরণ প্রিয় লেখকগণ' উক্ত 'কল্পিত' ও 'মিথ্যা' ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাস এবং বহু নাটক উপন্যাস রচনা করেন। যেমন– টড তাঁর 'রাজস্থান' উপন্যাসে মুসলিম শাসকদের বিকৃতরূপ তুলে ধরেন। তাঁর এই বিকৃত ইতিহাসকে ভিত্তি করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'দুর্গাদাস' নামক উপন্যাস লিখেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর উপন্যাসের মুখবন্ধেই স্বীকার করেন যে, টডের 'রাজস্থান' থেকেই তিনি তাঁর উপন্যাসের প্লট খুঁজে নেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর 'দুর্গাদাস'-এ বাদশাহ্ আওরঙ্গযিবকে অত্যন্ত চরিত্রহীন ও মানসিক ভারসাম্যহীন একজন শাসক হিসাবে চিত্রায়িত করেন।[১৪] এসব লেখকের বিবরণে আরও প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম শাসকগণ একমাত্র বাহুবল এবং তরবারীর সাহায্যেই ভারতের রাজদন্ড পরিচালনা করেন। তাঁরা বিলাস-ব্যসন ও সুখ-সম্পদে নিজেদের চিত্তবিনোদন ব্যতীত দেশের ও দশের সুখ-সুবিধা এবং জনহিতকর কর্মকান্ডের প্রতি আদৌ মনোনিবেশ করেননি। দেশময় সর্বদা হাহাকার ও অশান্তি বিরাজিত ছিল, লোকের ধন-প্রাণ ও মান-সম্মান নিরাপদ ছিলনা, দস্যু-তস্করের ভয় সর্বদা লেগেই ছিল, নির্বিঘ্নে লোকের আহার-নিদ্রা হতনা, দেশের রাস্তা-ঘাট ও গমনাগমনের সুবিধা ছিলনা এবং দেশের পথ-ঘাট নির্মাণ, কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন, শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানে মুসলিম শাসকগণ সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। বৃটিশ শাসনামলে এসব অভাব-অভিযোগ তিরোহিত হয় এবং জনগণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপদে কাল কাটায়।[১৫] মাওলানা ইসলামাবাদী নিশ্চিতভাবে মনে করেন যে, এ

---

১৪ 'Theatres in Calcutta' (Editorial), The Mussalman, 18 June, 1909.

১৫ এ ধরনের লেখার প্রকৃষ্ট উদাহরণ যদুনাথ সরকারের Aurangzeb (5 vols.), Fall of the Mughal Empire, Shivaji and His Times ইত্যাদি গ্রন্থ। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ Mohammad Shah, 'Jadunath Sarkar's Interpretation of Aurangzeb's Reign', Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, vol. 28, No. 2, Dhaka, December 1983.

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের একপেশে বিবরণই ভারতের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হয়েছে এবং হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে কলহ-বিবাদ সৃষ্টির ইন্ধন যুগিয়েছে।[১৬]

স্কুলের পাঠ্য-পুস্তকেও এরূপ ঘৃণা-বিদ্বেষের ভাব তুলে ধরা হয়েছে। এ ধরনের বিকৃত বিবরণ পাঠ করে কোমলমতি বালকগণ শৈশবকাল থেকেই স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় শাসন পদ্ধতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিদ্বেষপরায়ণ হতে অভ্যস্ত হয়।[১৭] উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমপাদে শিক্ষা-দীক্ষা ও সাংবাদিকতায় মুসলিমগণ ইউরোপীদের ও হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও সে সময় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনেক মুসলমানের আগ্রহ প্রকাশ পায়। কিন্তু পাঠ্য-পুস্তক, ইতিহাস-সাহিত্য ও নাটক-উপন্যাসে মুসলিম সমাজ ও শাসকদের বিকৃত রূপ দেখে তাদের আত্ম-সম্মানবোধে আঘাত লাগে। একজন সুশিক্ষিত, সচেতন ও দায়িত্বশীল মুসলিম হিসাবে মাওলানা ইসলামাবাদী এ আঘাত মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন এবং দেশবাসীর কাছে অতীতের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার তাগিদেই তিনি একজন ঐতিহাসিকের ভূমিকায় অবতীর্ন হন।[১৮] 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত সিরাজগঞ্জের কিশোর সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর একখানা পত্র তাঁকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট উজ্জীবিত করে বলে তিনি তাঁর 'আত্মজীবন'-এ উল্লেখ করেন।[১৯]

মাওলানা ইসলামাবাদী লিখেন, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রংপুর সদর মাদ্রাসা থেকে ডেলিগেট হিসেবে তিনি কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য এক শিক্ষা সম্মেলনে এসে ১৫/১৬ বছর বয়সের এক তেজোদ্দীপ্ত বালক-প্রতিভার সাথে তাঁর মত বিনিময় হয়।

---

১৬ মাওলানা এসলামাবাদী, 'মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার', আল্-এসলাম, ১ম ভাগ, ষষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩২২ সাল।

১৭ ইসলামাবাদী, মুসলমান সভ্যতা, 'নিবেদন', পৃ ঃ ১-২।

১৮ মোহাম্মদ শাহ, 'মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীঃ সমাজ চিন্তা ও ইতিহাস চর্চা,' প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৬৮।

১৯ 'আত্মজীবন' (এ পাণ্ডুলিপি খানা জনাব শামসুজ্জামান খানের নিকট সংরক্ষিত আছে। পরে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে, এ কথা যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছেন।); শামসুজ্জামান খান, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ ঃ ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

আলাপকালে 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় তাঁর লেখার প্রসঙ্গ উঠলে মাওলানা ইসলামাবাদী অত্যন্ত মর্মাহত হন।[২০] বালক সিরাজীর পত্রের অংশবিশেষ এ রকম–

"আমরা স্কুলে পড়িতে গেলে হিন্দু মাষ্টারগণ আমাদিগকে মুছলমান শাসনের মুছলমান বাদশাহ্গণের কুৎসিৎ কলঙ্ক কাহিনী শুনাইয়া মর্ম পীড়া দিয়া থাকেন। ইতিহাসে মুছলমান রাজাদের কলঙ্ক কাহিনী ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাই না। এই সকল অবস্থার ভিতর দিয়া মনে হয় আমরা মোছলেমকুলে জন্মগ্রহণ না করিলেই ভাল হইত। তাহা হইলে আমাদিগকে এত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত না"।[২১]

মাওলানা ইসলমাবাদী লিখেন:

"এই প্রবন্ধ পড়িয়া বাস্তবিকই আমি অতিশয় মর্মাহত হইয়াছিলাম। এই সময় হইতে ইতিহাস পড়িতে আমার বিশেষ ঝোঁক পড়িয়াছিল। আমি যে পরবর্তী যুগে 'ভারতে মুছলমান সভ্যতা' নামক পুস্তক লিখিয়া মোছলেম শাসন যুগের কলঙ্কমোচন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম, তাহার প্রধান কারণ এই পত্রখানি উল্লিখিত বালক ছৈয়দ ইছমাইল হোসেন শিরাজীরই লিখিত ছিল"।[২২]

মাওলানা ইসলামাবাদীর এ বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, 'মোছলেম শাসনযুগের কলঙ্কমোচন' করার লক্ষ্যেই মূলত: তিনি ইতিহাস রচনায় হাত দিয়েছেন। এছাড়া মুসলিম সমাজে দক্ষ লেখক ও সমালোচকের অভাব পূরণে নিজের দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই তিনি ঐতিহাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।[২৩] ড. আনিসুজ্জামান 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' গ্রন্থের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে মাওলানা ইসলামাবাদী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, তাতেও তাঁর ঐতিহ্য চেতনা ও ইতিহাস সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ড. আনিসুজ্জামান বলেন যে, 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' (১৯১৪) সম্ভবত: তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এর 'অবতরণিকা'য় তিনি কতিপয় ইংরেজ ঐতিহাসিকের বিরুদ্ধে সত্য বিকৃতির এবং উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার অভিযোগ করেছেন। তিনি

---

২০ পূর্বোক্ত।

২১ উদ্ধৃত: মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৯০; মোহাম্মদ শাহ, 'মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী: সমাজ চিন্তা ও ইতিহাস চর্চা,' প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৬৮।

২২ পূর্বোক্ত (উভয় সূত্র); 'আত্মজীবন' (পান্ডুলিপি), উদ্ধৃত: শামসুজ্জামান খান, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩৯।

২৩ ইসলামাবাদী, মুসলমান সভ্যতা, পৃ ঃ ১৮১-৮২।

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন যে, বৈদেশিক ঐতিহাসিকদের এরূপ ন্যায়-ধর্মের মস্তকে পদাঘাত করে অলীক ও ভিত্তিহীন ইতিহাস রচনা করার উদ্দেশ্য কি, তার তত্ত্বানুসন্ধান করলে কয়েকটি কারণ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমত, মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে তাদের চিরন্তন ধর্ম ও জাতিগত বিদ্বেষ, দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক অভিসন্ধি সাধন। এসব কারণ মুসলিমদের প্রকৃত জাতীয় গৌরবের কাহিনী এবং সভ্যতার মূলীভূত উপকরণসমূহের আলোচনা হতে বিরত থাকার পক্ষে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।[২৪]

মাওলানা ইসলামাবাদীর 'কনষ্টান্টিনোপল' গ্রন্থের শেষে প্রচারিত বিজ্ঞাপণ 'ভারতে মুসলিম সভ্যতা' হতেও তাঁর ইতিহাস সচেতনতার দিকটি প্রতিভাত হয়ে উঠে। বিজ্ঞাপণে বলা হয়েছে যে, এ পুস্তকখানি ভারতে মুসলিম-সভ্যতার এক উজ্জ্বল চিত্র, বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য ভান্ডারের অমূল্য সম্পত্তি বিশেষ। প্রচলিত ভারতের ইতিহাসে ও পাঠ্যপুস্তকে মুসলিম আমলের ভিত্তিহীন কলঙ্ক-কাহিনী ব্যতীত গৌরবের কথা কিছুই নেই। এ পুস্তকে মুসলিম শাসনামলের সভ্যতার সমস্ত বিভাগ তন্ন তন্ন করে দেখানো হয়েছে এবং ভারতের প্রাচীন কীর্তিসমূহের অতি বিস্তৃত চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে। এ সকল বিবরণ সম্বলিত কোন পুস্তক এ যাবৎ ইংরেজি কিংবা বাংলা ভাষাতে প্রণীত হয়নি।[২৫]

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী নিজের প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতেন তাঁর দেশকে, জাতিকে, মানুষকে এবং ইসলামকে। মুসলিমদের প্রতি তাঁর ভালবাসার কোন সীমা-পরিসীমা ছিলনা। মুসলিমদের ব্যথায় তিনি কাঁদতেন, তাঁদের সুখে তিনি সুখী হতেন। তিনি সর্বদা ভাবতেন কিসে তাঁদের কল্যাণ হবে, কিসে এ জাতি আবার সগৌরবে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াবে, কিসে তাঁরা ঐতিহ্যবাহী ও গৌরবময় অতীতকে ফিরে পাবে। ভাবতে ভাবতে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। তাঁর বক্তৃতা, অভিভাষণ, পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা এবং লেখনীতে আমরা জাতির এই

---

২৪ ড. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ ঃ ২৯১।
২৫ মৌলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

জাগ্রত বিবেকের আর্তচিৎকারের ধ্বনি শুনতে পাই। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত 'ইসলামে ভ্রাতৃত্বভাব' শীর্ষক প্রবন্ধে মাওলানা ইসলামাবাদী মুসলিমদের করুন অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন:

> "আমরা সংকীর্ণ নীতির পক্ষপাতী নই। কিন্তু মানুষ হিসাবেও দুর্বল ও বিপক্ষের সাহায্য করা কি কর্তব্য নহে? মুসলমান আজ যত্রতত্র হইতে কুকুর-বেড়ালের ন্যায় বিতাড়িত হইতেছে। অথচ মুসলমানগণের আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্ম-নির্ভরতার কোন আয়োজনই দেখা যায় না। ... ইসলাম-মুসলমানের অস্তিত্ব ভূ-পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি আদাজল খাইয়া লাগিয়াছে। তাহাদের জনবল, ধনবল, বুদ্ধিবল সবই অধিক; তাহারা ছলে বলে কৌশলে মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করিতে লালায়িত। কিন্তু মুসলমানের সে ভাবনা নাই– তাহারা এখন ভূমির আইল ... হানাফী-মোহাম্মদী ঝগড়ার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত। এ দিকে যে ইসলামের ভিত্তি উৎপাটিত হইতেছে, ভারতের ৮ কোটি ও বাংলার ৩ কোটি (তৎকালীন মুসলিম জনসংখ্যা) মুসলমানের অস্তিত্ব লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে সে ভাবনা নাই; মুসলিম আত্মবিস্মৃত হইয়া এখনো ঘরোয়া বিবাদে মত্ত।"[২৬]

অন্যদিকে 'ভারতে মুসলিম স্থাপত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে মাওলানা ইসলমাবাদী মুসলিমদের স্বর্ণোজ্জ্বল অতীত ইতিহাসের কাহিনী তুলে ধরে বলেন যে, মুসলিমগণ স্বীয় উন্নতির যুগে স্থাপত্য-বিদ্যায় যে অসাধারণ উন্নতি লাভ করেছিলেন এবং তাঁরা কর্ডোভা, গ্রানাডা, দামেশ্‌ক, সমরকন্দ, বোখারা, দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্মৌ, এলাহাবাদ, গৌড় প্রভৃতি স্থানে স্থাপত্য কীর্তির যে সব অলৌকিক নিদর্শন এবং অতুলনীয় আদর্শ রেখে গেছেন, বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির চরম যুগে ভূ-পৃষ্ঠে তার তুলনা দুষ্প্রাপ্য। বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকা সমৃদ্ধি, গৌরব, শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে অতীত কালকে অনেকাংশে অতিক্রম করেছে সত্য কিন্তু স্থাপত্য বিদ্যায় এখনও পাশ্চাত্য জাতি মুসলিমদের উন্নতির যুগের সমকক্ষতা লাভ করা দূরে থাকুক তার নিকটবর্তীও হতে পারেনি। স্পেনে মুসলিম আমলের কর্ডোভা জামে মসজিদ, বাগদাদের খলীফা হারুন-আল্‌-রশীদ নির্মিত রাজপ্রাসাদ, দিল্লীর

---

২৬ উদ্ধৃত: মোশাররফ হোসেন খান, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

কুতুব মিনার, জামে মসজিদ, দরবারে আম, দরবারে খাস, মতি মসজিদ, এতেমাদ্‌দৌলার রওজা, সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি ভবন, ফতেহ্‌পুর সিক্রির প্রাসাদমালা, লক্ষ্ণৌস্থ আসদদ্দৌলার ইমাম বাড়ি, হোসেনাবাদের ইমাম বাড়ি, গৌড়ের সোনা মসজিদ ও দুর্গাভ্যন্তরস্থ প্রাসাদমালা ইত্যাদি স্থাপত্য-কীর্তির তুলনা জগতের স্থাপত্য শিল্পে নাই বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবেনা। ইউরোপীয় পর্যটকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, মুসলিমদের প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তিরাশির তুলনা জগতে নাই।[২৭]

এভাবে মুসলিমদের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি সারা জীবন তাঁদেরকে নানাভাবে জাগ্রত ও সচেতন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর জীবন-প্রাণ দেশ ও জাতির জন্যে উৎসর্গীকৃত ছিল। কিসে মুসলিমদের ভাল হবে, মঙ্গল হবে, কল্যাণ হবে, কিসে তাঁদের উন্নতি হবে, কিভাবে তাঁদের মুক্তি আসবে– সর্বক্ষণ তিনি সেই ভাবনাতেই মশগুল থাকতেন। তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন যে, মুসলিমদের এখন মূল সমস্যা হচ্ছে শিক্ষা, সচেতনতা ও সাহসের অভাব। তাই তিনি এসব সমস্যা দূর করার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। এ প্রসঙ্গে আবুল ফজলের অভিমতটি স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন যে, যুগের প্রয়োজন আর গতিধারা তিনি বুঝতেন। তাই তিনি চেয়েছিলেন মুসলিম সমাজকে সবদিকে জীবন সংগ্রামের উপযোগী করে গড়ে তুলতে। তিনি নিজেও খয়রাতি আলিম ছিলেন না– অন্য আলিমদেরও তা করতে চাননি। আলিমরাও স্বাধীন আর স্বাবলম্বী হোক এটাই তিনি চেয়েছিলেন।[২৮] কাজেই তিনি দাওয়াত, মিলাদ, খতম, শাদি পড়ানো প্রভৃতি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনার পেশাগত কাজ ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে ইসলামের মর্মবাণী ও গৌরবময় অতীতকে সর্বমহলে পৌঁছিয়ে দেয়ার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। এজন্য দেখা যায়, এক সময় তিনি উত্তর বঙ্গ ও আসামে ধর্ম প্রচার ও শিক্ষাবিস্তারে লিপ্ত ছিলেন।

---

[২৭] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৬২।
[২৮] আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩২৮।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ইসলামাবাদীর স্বপ্ন ছিল সত্যকার মানুষ। সুন্দর, শিক্ষিত, মার্জিত, উজ্জীবিত, কুসংস্কারমুক্ত এক স্বাধীন সত্য মানুষ। সেই অনাগত মানুষের স্বপ্নে তিনি বিভোর থাকতেন। তার জন্য কেবলমাত্র বিতর্ক, বক্তৃতা ও প্রচার মিশনের কাজ করেই তিনি ক্ষান্ত হতেন না। আদর্শ প্রতিষ্ঠান ও তার মধ্যে সুষ্ঠু পরিবেশ যাতে গড়ে উঠে, সেজন্যও তিনি চেষ্টিত থাকতেন। তাঁর চেষ্টা ও প্রেরণায় উত্তরবঙ্গে কয়েকটি স্কুল, মাদ্রাসা প্রভৃতি গড়ে উঠে। শিক্ষাও যাতে বৈজ্ঞানিক তথা ব্যবহারিক জ্ঞানের ভিত্তিতে হতে পারে, সেজন্যও তিনি নানা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার উদ্ভাবন করে তাকে কার্যকরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মাওলানা ইসলামাবাদী রংপুর থাকা কালেই মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজী, বাংলা, অংক, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোলের প্রয়োজনীয় দিকগুলো অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে সোচ্চার ছিলেন। পরবর্তীকালে 'আঞ্জুমান' প্রতিষ্ঠার পেছনে এ যুক্তি অনেকখানি কার্যকর ছিল।

মাওলানা ইসলামাবাদী তাঁর রংপুর জীবনে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছিলেন রাজশাহীর প্রাতস্মরণীয় কীর্তিমান পুরুষ মৌলভী মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর সাথে পরিচিত হয়ে। তিনি জাতীয় ইতিহাস সংগ্রহ ও অনুবাদের দিকে আকৃষ্ট হন প্রধানত: তাঁরই উৎসাহ-উদ্দীপনায়। সম্ভবত: মির্জা ইউসুফ আলীর 'কিমিয়ায়ে সায়াদাত'-এর অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি আংশিক সহযোগিতা করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাবলী (ভারতে মুসলিম সভ্যতা, খগোল শাস্ত্রে মুসলিম, আওরঙ্গজেব প্রভৃতি) এ সময়েই রচিত। তাই অনেকে অনুমান করেন যে, সম্ভবত: এর পেছনে মির্জা সাহেবের প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতা বর্তমান ছিল। মুসলিম সমাজকে উন্নতির সাথে এগিয়ে নিতে অত্যাবশ্যকীয় 'চতুর্বিধ কার্যের' দিকে সমাজের মনোযোগ কোন্ পর্যায়ে আছে সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মির্জা ইউসুফ আলী তাঁর 'দুগ্ধ সরোবর' গ্রন্থের ভূমিকায় ইসলামাবাদীর শিক্ষা-সমিতি ও ইসলাম-মিশন গঠন, চট্টগ্রামের স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী গঠন প্রভৃতি কার্যের এবং সাংবাদিকতার উন্নয়ণে তাঁর 'আপ্রাণ পরিশ্রমের' উল্লেখ করেছেন– তাতে তাঁর সন্তোষই প্রকাশ পেয়েছে। পরে

Dhaka University Institutional Repository

রেয়াজুদ্দীন আহমদের পরামর্শে সাপ্তাহিক সোলতান প্রকাশ করলে মির্জা ইউসুফ আলী মাওলানা ইসলামাবাদীকেই এর সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করেন।[২৯]

মাওলানা ইসলামাবাদী মুসলিম জাতিকে ঐতিহ্য সচেতন করে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন, এ কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।[৩০] এ প্রসঙ্গে আবুল ফজল অভিমত ব্যক্ত করেন এভাবে যে, এর প্রতিটি ভূমিকা ছিল মুসলিম জাগরণ, মুসলিমের মনে জাতীয় চেতনা সঞ্চারিত করে দেয়া, আর সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর দেশের স্বাধীনতার বাণী প্রচার করা।[৩১] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, 'ছোলতান'-এর সম্পাদক থাকা কালেই তিনি ইতিহাস চর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং ইসলামের অতীত ঐতিহ্য সন্ধানে ব্যাপক অনুসন্ধান করেন। 'ছোলতান'-এ প্রকাশিত কবিতা, প্রবন্ধাদি জাতীয় জীবনে অপূর্ব উন্মাদনা জাগাতে এবং মুসলিম জাতিকে ঐতিহ্য সচেতন করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এক কথায় বলতে গেলে, বাঙালী মুসলিমদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও জাতি হিসাবে তার হৃত গৌরব ফিরে পাওয়ার জন্য তাঁর যে স্বপ্ন ও সাধ ছিল, তাকে যথারীতি প্রতিষ্ঠা করার সাধ্য হয়ত তাঁর ছিলনা– কিন্তু তাঁর সে বলিষ্ঠ চিন্তা তাঁর কীর্তিলতার মধ্যে আজও সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। আর এখানেই মাওলানা ইসলামাবাদীর সার্থকতা।

মাওলানা আকরম খাঁ ও মাওলানা ইসলামাবাদী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে 'আঞ্জুমান-এ-উলামা-এ-বাঙ্গালা', 'ইসলাম মিশন', 'খাদিমুল ইসলাম', 'বঙ্গীয় মুসলসান শিক্ষা সমিতি', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা নিঃসন্দেহে মাওলানা ইসলামাবাদীর বড় অবদান। ১৩২২ সনের বৈশাখ মুতাবিক

---

২৯ আবু তালিব, 'মির্জা ইউসুফ আলী', বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১১ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭৪, পৃঃ ১৪।

৩০ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য বর্তমান অভিসন্দর্ভের 'মাওলানা ইসলামাবাদীর সাংবাদিকতা প্রসঙ্গ' দেখা যেতে পারে; সহ দ্রষ্টব্য : মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, সাংবাদিকতায় মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর অবদান', প্রবন্ধাবলী-২০০৫, উ.সা.গ.কে., ঢা.বি., ২০০৫।

৩১ আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৫ সালের এপ্রিল-মে মাসে 'আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙ্গালা'-এর মাসিক মুখপত্র 'আল্-এসলাম' প্রকাশিত হয়। মাওলানা ইসলামাবাদী দীর্ঘদিন এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন এবং মুসলিম লেখকগোষ্ঠী সৃজনে ও ইসলামী সাহিত্য প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।[৩২]

বঙ্গীয় মুসলিম শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মাওলানা ইসলামাবাদীর প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে 'মিহির ও সুধাকর'-এ লেখা হয়েছে – অধঃপতিত, দারিদ্র্য-নিপীড়িত, কুসংস্কার বিজড়িত ভ্রাতৃগণের উন্নতির জন্য মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এ শিক্ষা সমিতির উদ্দেশ্য জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কর্মশীল ও সক্ষম যুবকের সাহায্য প্রার্থনা করেও তা তিনি পাননি।[৩৩] মাওলানা ইসলামাবাদী 'মিহির ও সুধাকরে' এবং 'ইসলাম প্রচারকে' যথাক্রমে 'বঙ্গীয় মুসলমানদের জাতীয় মহাসমিতি' ও 'ইসলাম ও মিশন' নামে দু'টি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখেন। তিনি সমাজ উন্নয়নের কাজে 'যুক্ত শক্তি'র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে 'জাতীয় মহাসমিতি' গঠনের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন:

> "বলিতে গেলে এখন না আছে আমাদের জাতীয় স্কুল-কলেজ, না আছে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কোম্পানী, না আছে সমাজের দুর্দশা নিবারণ সভা-সমিতি, না আছে আমাদের সংবাদ-পত্রিকা এবং সুলেখক ও সুকবি, আর না আছে অর্থ সম্বল, না আছে রাজদরবারে অধিকার। ... এসো ভাই। যুক্তশক্তি দ্বারা সমাজের জীবন রক্ষা করিতে আত্মবলিদান করি। ঐ এসো। জাতীয় মহাসমিতি স্থাপণপূর্বক শিক্ষা বিস্তার, যৌথ বাণিজ্য কারবার, সমাজের দোষ সংস্কার, উন্নতস্থান পুনঃ অধিকার করার প্রতি ধাবিত হই।"[৩৪]

---

৩২ ইসলাম প্রচারক, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১/১৯০৪; আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের চরিতাভিধান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮।

৩৩ মিহির ও সুধাকর, ১ শ্রাবণ, ১৩১০।

৩৪ মিহির ও সুধাকর, ৫ অগ্রহায়ণ, ১৩০১।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ইসলামাবাদীর ধারণা, সমাজের উন্নতি সাধন করতে হলে, সর্বপ্রথম সমাজে যে উন্নতির প্রতিবন্ধকতামূলক দোষ প্রবেশ করেছে সমাজদেহ হতে সেসব বিতাড়িত ও দূরীভূত করতে হবে। তাঁর জিজ্ঞাসা- সমাজের কুসংস্কার দূরীভূত করা, কুরীতি-নীতি ও অন্যায় প্রথা-পদ্ধতির বিনাশ সাধন ইত্যাদি কার্যাবলী নির্বাহ করার গুরুতর ভার গ্রহণ করবে কে? এর জবাবে তিনি বলেন যে, তাঁর বিবেচনায় 'মিশন' শব্দ ব্যতীত এ প্রশ্নে উন্নতির আর কোন উপযুক্ত উত্তর নেই।[৩৫] এরপর তিনি ইসলাম মিশনের গঠন পদ্ধতি ও কর্মপদ্ধতির পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করেছেন। ইসলামাবাদির প্রবন্ধ দু'টি সমাজের বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও নওশের আলী খাঁন ইউসুফজায়ী পত্রিকায় পত্র পাঠিয়ে ইসলামাবাদীর প্রস্তাব সমর্থন করেন।[৩৬] পরবর্তীকালে জাতীয় শিক্ষা সমিতি ও ইসলাম মিশন গঠিত হলে তাঁর চিন্তাধারা ও প্রস্তাবাদির অধিকাংশই গৃহীত হয়। এভাবে আমরা দেখতে পাই- ইসলামের গৌরবময় অতীতকে জনসমক্ষে প্রকাশ করার লক্ষ্যে মাওলানা ইসলামাবাদী বিভিন্ন কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন। এর প্রতিটি কর্মকান্ডই তাঁর ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতনতার প্রমাণ বহন করে।

---

[৩৫] ইসলাম প্রচারক, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১১।

[৩৬] আবদুল কাদির, 'নওশের আলী খাঁ ইউসুফজায়ী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

খ) মাওলানা ইসলামাবাদীর ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনা

মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ছিলেন একজন অনন্য সাধারণ কীর্তিমান পুরুষ। তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে বাংলায় মুসলিম জাগরণের প্রাণ পুরুষ এবং অন্যতম দিশারী। তিনি ছিলেন একাধারে একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, আযাদী আন্দোলনের অগ্রপথিক, শ্রেষ্ঠ আলিম ও পন্ডিত, বিশিষ্ট সাংবাদিক, ধর্ম প্রচারক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, বিখ্যাত বাগ্মী, বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও সমাজ সংস্কারক এবং পথিকৃৎ ঐতিহাসিক। তাঁর অধিকাংশ রচনাই সাহিত্য ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক। ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ঠ পান্ডিত্য ছিল। নিম্নে এতদ্‌সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলোঃ

মাওলানা ইসলামাবাদী স্বীয় প্রতিভা বলে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এবং উন্নতি ও অগ্রগতিতে যে অতুলনীয় অবদান রেখে গেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। পুস্তক ও কলম ছিল তাঁর সাথী। তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপী লিখনী পরিচালনা করেন, যেগুলোতে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং সাহিত্য বিষয়ক মাল-মসলা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাঁর ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চার মূল কারণ বা উদ্দেশ্য ছিল পশ্চাদ্‌পদ মুসলিম জাতির মধ্যে চেতনার সঞ্চার করা এবং স্বীয় ঐতিহ্য তথা গৌরবময় অতীত সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলা। এক কথায় উপমহাদেশের ঘুমন্ত ও অচেতন মুসলিমদের জাগ্রত ও সচেতন করাই ছিল তাঁর ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চার অন্যতম ব্রত।

মাওলানা ইসলামাবাদী ইসলাম ধর্ম, মুসলিম শাসন এবং উপমহাদেশের মুসলিমদের বিভিন্ন সমস্যা ও সেগুলোর সমাধান বিষয়ক বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন, যার তালিকা নিম্নরূপ ঃ [১]

---

১ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১০২-১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর রচনাবলী

১. প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১.১ । তুরস্কের সুলতান, রংপুর, বৈশাখ- ১৩০৮ (১৯০১)

১.২ । তুরস্কের মহামান্য সুলতান আবদুল হামিদ খানের পঞ্চবিংশতি বাৎসরিক কার্য বিবরণী (সংকলিত, ১৯০১) ।

১.৩ । মুসলমানদের সুদ সমস্যা ও অর্থনীতির মৌলিক সমাধান, ১৩১৫ (১৯০৮)

১.৪ । ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান (১৯১১-১২) ।

১.৫ । খগোল শাস্ত্রে মুসলমান (১৯১১-১২)

১.৬ । কনষ্টান্টিনোপল, ১ম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৯ (১৯১২)

১.৭ । ভারতে মুসলমান সভ্যতা (কলিকাতা, ১৯১৪)

১.৮ । ভারতে এছলাম প্রচার (কলিকাতা, ১৯১৫)

১.৯ । মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার, ১৯১৫ ।

১.১০ । মোসলেম বীরাঙ্গনা, ১৯১৫ ।

১.১১ । শিল্পক্ষেত্রে মুসলমান, ১৯১৫ ।

১.১২ । খাজা নেজামুদ্দিন আওলিয়া, কলিকাতা, ১৩২৩ (১৯১৬)

১.১৩ । কোরআন ও বিজ্ঞান (ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত ১৩২৩/ ১৯১৬)

১.১৪ । তুরস্কের বৃহৎ ইতিহাস, ১৯১৮

১.১৫ । সমাজ সংস্কার, ১৩২৬/ ১৯১৯ (অন্যমতে ১৯২১)

১.১৬ । ইসলাম জগতের অভ্যুদয় (১ম ভাগ), ১৯২৫

১.১৭ । অভিভাষণ (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন), বসির হাট, ১৩৩৪ (১৯২৮)

১.১৮ । কোরআনে স্বাধীনতার বাণী, কলিকাতা, ১৯৩৯ (দ্বিতীয় মুদ্রণ, চট্টগ্রাম-১৯৮০)

১.১৯ । অভিভাষণ, চট্টগ্রাম দক্ষিন সদর মহকুমা ওলামা ও কৃষক কনফারেন্স, ১৯৩৯

১.২০ । নিম্নশিক্ষা ও শিক্ষা কর (কলিকাতা ও চট্টগ্রাম, ১৯৪০)

১.২১ । ইসলামের শিক্ষা (সূত্রঃ ইসলামাবাদী স্মৃতি সমিতি স্মরণিকা, ১৯৬৬)

১.২২ । ভারতের মুক্তি সংগ্রামে মুসলমান (সূত্রঃ ই. স্মৃতি সমিতি স্মরণিকা, ১৯৬৬)

১.২৩ । আওরঙ্গজেব (তথ্য অস্পষ্ট)

১.২৪ । এছলামের শিক্ষা (সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম), তা.বি. ।

Dhaka University Institutional Repository

১.২৫। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের জাতীয় উন্নতির উপায় (হ্যারিসন রোড, কলিকাতা), তা.বি.।

১.২৬। আত্মজীবন, (শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত), পাঠক সমাবেশ, ঢাকা-২০০৪।

২. অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিঃ

২.১। আইন সভার আমলনামা।

২.২। আওলিয়া-দরবেশ কাহিনী।

২.৩। আত্মজীবনঃ পরিশিষ্ট।

২.৪। আসাম ভ্রমণ।

২.৫। ইসলাম ও জেহাদ।

২.৬। ইসলাম ও স্বাধীনতা।

২.৭। ইসলাম প্রচার।

২.৮। ইসলামের উপদেশ।

২.৯। ইসলামের নব জাগরণ।

২.১০। ইসলামের নীতি কথা।

২.১১। ইসলামের পুণ্য কথা।

২.১২। ওলি কাহিনী।

২.১৩। কারাকাহিনী (পাণ্ডুলিপি আকারে হারানো যায় অথবা বাড়ীতে আগুন লেগে পুড়ে যায়)।

২.১৪। কোরআন ও রাজনীতি।

২.১৫। বাংলার ওলি কাহিনী।

২.১৬। বাংলার মুসলমান সমাজ ও উন্নতির উপায়।

২.১৭। ভারত-আরব সম্পর্ক।

২.১৮। ভারত-বার্মা ভ্রমণ কাহিনী।

২.১৯। ভারতের সহিত আরবগণের প্রাচীন সম্বন্ধ (১ম ও ২য় খন্ড)।

২.২০। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম।

২.২১। মুসলমানের অভ্যুত্থান।

২.২২। রাজনীতি ক্ষেত্রে আলেম সমাজের দান।

Dhaka University Institutional Repository

২.২৩। শেষ নবী।

২.২৪। স্পেনের ইতিহাস।

২.২৫। হতাশ জীবন।

৩. বাংলা একাডেমীতে জমাকৃত পান্ডুলিপিঃ

৩.১। আত্মজীবন, (গ্রন্থখানা ২০০৪ সালে শামসুজ্জামান খানের সম্পাদনায় পাঠক সমাবেশ, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে)।

৩.২। ইবনে বতুতার বাংলা ভ্রমণ,

৩.৩। এছলাম ও রাজনীতি,

৩.৪। এছলামের প্রচার নীতি,

৩.৫। জীবন চরিত, (১ম ও ২য় খন্ড),

৩.৬। তাপস কাহিনী,

৩.৭। তুরস্কের ইতিহাস (১ম খন্ড),

৩.৮। পৌরাণিক ও বৈদিক যুগ, (১ম ও ২য় খন্ড),

৩.৯। প্রবন্ধ সংকলন,

৩.১০। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অংশগ্রহণ (১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড),

৩.১১। রোজ নামচা,

৩.১২। শুভ সমাচার,

৩.১৩। হজরতের (দঃ) জীবনী/হযরতের জীবনের আদর্শ।

৪. অন্যান্য রচনাবলীঃ

১। মীর্জা মোহাম্মদ ইউছুফ আলীর সাথে 'কিমিয়া সায়াদাত'-এর অনুবাদ (সৌভাগ্য স্পর্শমনি)।

২। মোহাম্মদ ছমিরুদ্দিন আহমদের 'মোহাম্মদীয় ধর্ম সোপান', ১৯০৩ (১ম বর্ষ নবনূর-এ সমালোচিত)।

Dhaka University Institutional Repository

৫. পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহঃ

ক. ইসলাম প্রচারক, ১৮৯৪-৯৫

(প্রথম দিকে 'এছলাম প্রচারক' নামে প্রচারিত। সম্পাদকঃ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ)

১। এছলাম মিশন, ১৮৯৫

খ। ইসলাম প্রচারক, নবপর্যায়, ১৮৯৭-১৯০৫

(সম্পাদকঃ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ)

১. প্যারিসে বিশ্ব প্রদর্শনী (৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আগষ্ট, ১৮৯৯)

২. মুসলমান শিক্ষার পূর্বতন নির্দশন (৩য় বর্ষ, ৯ম-১০ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, ১৯০০)

৩. ইতিহাস ক্ষেত্রে মুসলমান (৫ম বর্ষ, ১ম, ২য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯০৩)

৪. নহরে জোবেদার সংক্ষিপ্ত বিবরন (৫ম বর্ষ, ৩য়-৪র্থ যুক্ত সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, ১৯০৩)

৫. ইসলাম ও মিশন (৫ম বর্ষ, ৭ম-৮ম যুক্ত সংখ্যা, জুলাই-আগষ্ট, ১৯০৩)

৬. বাণিজ্য ক্ষেত্রে আরবজাতি (৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, মার্চ, ১৯০৫)

৭. ইংরেজী ও আরবী শিক্ষার পরিণাম (৭ম বর্ষ, ভাদ্র সংখ্যা/মে, ১৯০৫)

গ। প্রচারক, ১৮৯৯-১৯০০

(সম্পাদকঃ সূফী মধু মিয়া, অর্থাৎ মুন্সী (ডাক্তার) ময়েজউদ্দীন আহমদ)

১। লা-মযহাবিগনের ধর্ম রহস্যভেদ (মাঘ, ১৩০৬/১৮৯৯)

২। ইসলাম ও বিজ্ঞান (২য় বর্ষ, ১৯০০)

৩। তফসীর আজিজিয়ার বঙ্গানুবাদ (২য় বর্ষ, ১৯০০)

৪। স্পেনের ইতিহাস (২য় বর্ষ, ১৯০০)

৫। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনী (২য় বর্ষ, ১৯০০)

ঘ। মিহির ও সুধাকার, ১৯০২

(সম্পাদক ঃ শেখ আবদুর রহিম)

Dhaka University Institutional Repository

১। বাংলাদেশে প্রাদেশিক মোছলেম শিক্ষা সমিতি স্থাপনের আবশ্যকতা (অগ্রহায়ন, ১৩০৯/১৯০২)।

ঙ।। নবনূর, ১৯০৫

১। ধর্ম ও বিজ্ঞান (৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩১২/১৯০৫)।

চ।। বাসনা (কাকিনা, রংপুর) ১৩১৫/১৯০৮

(সম্পাদক ঃ শেখ ফজলুল করিম)

১। খগোল শাস্ত্রে মুসলমান (১ম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, ১৩১৫/১৯০৮)।

ছ।। আল-এসলাম (১৩২২-১৩২৭) (ভাদ্র, ১৩২৬ থেকে 'আল এছলাম') (আঞ্জুমানে ওলামার তত্ত্বধানে প্রকাশিত, সম্পাদকঃ মাওলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী)।

১. এসলাম প্রচার (১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২২) [অতঃপর ১.১ বৈশাখ-১.৩ আষাঢ় এভাবে লিখিত হবে]।
২. শিল্পক্ষেত্রে মুসলমান (১.৩ আষাঢ়, ১৩২২/১.৭ কার্তিক, ১৩২২)
৩. অস্ত্র চিকিৎসায় মুসলমান (১.৪ শ্রাবণ, ১৩২২)
৪. কোরআনের আদর্শ (১.৬ আশ্বিন, ১৩২২)
৫. মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার (১.৬, আশ্বিন, ১৩২২-১.১১ ফাল্গুন, ১৩২২)
৬. মোসলেম বীরাঙ্গনা (১.৬ আশ্বিন, ১৩২২-১.১১ ফাল্গুন, ১৩২২ এবং ৩.৪ শ্রাবন, ১৩২৪-৩.৫ ভাদ্র, ১৩২৪-৩.৯ পৌষ ১৩২৪-৩.১০ মাঘ, ১৩২৪)
৭. কোরআনই উন্নতির সোপান (১.৯ পৌষ, ১৩২২)
৮. কোরআন ও বিজ্ঞান (২.৫ ভাদ্র, ১৩২৩/২.৭ সংখ্যা ১৩২৩)
৯. আওরঙ্গজেব (২.৮ অগ্র-২. ১১-১২ ফা-চৈ ১৩২৩, ৩.৩ আষাঢ়, ১৩২৪-৩.৫, ভাদ্র ১৩২৪)
১০. বঙ্গীয় মুসলমান ও উর্দু সমস্যা (৩.৬ আশ্বিন, ১৩২৪)
১১. শাহ ওলিওল্লাহ্‌ সাহেবের অন্তিম উপদেশ (৩.৯ পৌষ, ১৩২৪)।
১২. আসাম ভ্রমণ (৪.৬ আশ্বিন, ১৩২৫-৫.১১ ফাল্গুন, ১৩২৬)
১৩. সমাজ সংস্কার (৪.১০ মাঘ, ১৩২৫/৫.৯ পৌষ, ১৩২৬)
১৪. আঞ্জুমনে-ওলামা ও সমাজ-সংস্কার (৫.৩ আষাঢ়, ১৩২৬)

Dhaka University Institutional Repository

১৫. ঈদের জমায়াত-ধর্মের ব্যবস্থা (৫.৪ শ্রাবন, ১৩২৬)

১৬. ঈদুল আজহা (৫.৫ ভাদ্র, ১৩২৬)

১৭. অনুরোধ পত্র (৫.৫ ভাদ্র, ১৩২৬)

১৮. আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা (৫.১০ মাঘ, ১৩২৬)

১৯. ঈমানের তেজ (৫.১২ চৈত্র, ১৩২৬-৬.৩ আষাঢ়, ১৩২৭)

২০. আলোচনা (৬.১ বৈশাখ, ১৩২৭)

২১. খেলাফৎ (৬.১ বৈশাখ, ১৩২৭)

২২. রোজা (৬.২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭)

২৩. আরবী বিশ্ববিদ্যালয় (৬.৩ আষাঢ়, ১৩২৭)

২৪. কোরবানীর বিধান (৬.৩ আষাঢ়, ১৩২৭)

২৫. কৈফিয়ত, (৬.৩ আষাঢ়, ১৩২৭)

২৬. জাতীয় শিক্ষা (৬.৫ ভাদ্র + ৬.৬ আশ্বিন, ১৩২৭)

২৭. মোছলমান নিম্নশিক্ষার উন্নতিবিধানের প্রস্তাব (৬.৬ আশ্বিন, ১৩২৭)

২৮. এছলামাবাদ জাতীয় উচ্চবিদ্যালয় (৬.৯ পৌষ, ১৩২৭)

২৯. অসহযোগিতা ও আমাদের কর্তব্য (৬.১০ মাঘ, ১৩২৭)

৩০. নিম্নোক্ত বিবিধ প্রসঙ্গ, সম্পাদকীয় প্রভৃতি ।

১। কলিকাতায় উর্দু সাহিত্যের পরিনাম, আঞ্জুমানে ওলামা ৩য় অধিবেশন (শ্রাবন, ১৩২৫)

২। মোহাম্মদ আশরাফ আলীর 'এছলাম' শীর্ষক প্রবন্ধের আপত্তিকর দিকগুলি সম্পর্কে আলোচনা (আষাঢ়, ১৩২৬)

৩। গিতাঞ্জলীর আরবী অনুবাদ ও মিসরে আরবী সাহিত্যের প্রভাব প্রসঙ্গ (পৌষ, ১৩২৬)

৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে ও সিন্ডিকেটে মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে (মাঘ, ১৩২৬)

৫। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা নূর পত্রিকার সমালোচনা (মাঘ, ১৩২৬)

৬। 'অনধিকার চর্চাকারী সাহিত্যিক', 'মোছলমান বাংলা সাহিত্যের দুর্বল ভিত্তির কারণ' প্রভৃতি প্রসঙ্গ (বৈশাখ, ১৩২৭)

৭। আঞ্জুমানে ওলামা সম্বন্ধে সিরাজী সাহেবের অভিযোগের জবাব (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭)

৮। আঞ্জুমান সংক্রান্ত সংবাদ (পৌষ, ১৩২৭) ।

Dhaka University Institutional Repository

জ।। তবলীগ, ১৩৩৪

১। তবলীগুল এছলাম (১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ)

২। ধর্মের আবশ্যকতা কি? (১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ভাদ্র)

ঝ।। মাসিক মোহাম্মদী, ১৩৩৪

১। এসলাম ও শাসন অধিকার (কার্তিক ১৩৩৪-পৌষ ১৩৩৪ সংখ্যা)

এ ছাড়া 'মাহেনও' পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি অপ্রকাশিত রচনাও মুদ্রিত হয়।

এসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধের ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্ট। এগুলোর মধ্যদিয়ে তাঁর ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চা বিষয়ক চিন্তাধারা পরিস্ফূট হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে তিনি যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

ড. আনিসুজ্জামান ও মোহাম্মদ শাহ-এর বিবরণ হতে জানা যায় যে, মাওলানা ইসলামাবাদী অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক ভারতের মুসলিম শাসনামলের মলিন চিত্রাঙ্কনের চারটি কারণ উদ্‌ঘাটন করেন। সেগুলো হচ্ছে–

(১) মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে অমুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্ম ও জাতিগত চিরন্তন বিদ্বেষ;

(২) রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি; অর্থাৎ মুসলিম শাসনামলের মিথ্যা দুর্নাম ও কলঙ্ক রচনা এবং বৃটিশ শাসনামলের গুণ-গরিমা প্রচার করে প্রাক্-বৃটিশ তথা মুসলিম শাসনামলের প্রতি জনগণের মনে বিরাগ উৎপাদন করা এবং বৃটিশ শাসনের প্রতি অনুরাগ বর্ধন ও ভক্তি আকর্ষণ করা।

(৩) মুসলিমদের প্রকৃত জাতীয় গৌরবের কাহিনী এবং সভ্যতার মূল উপকরণসমূহের আলোচনায় পূর্ববর্তী মুসলিম ঐতিহাসিকগণ অনেকটাই উদাসীন ছিলেন। এর ফলে বিজাতীয় লেখক ও ঐতিহাসিকগণ মুসলিম শাসনামলের গৌরব-কীর্তির আলোচনা থেকে বিরত থাকার সুযোগ পান। পূর্ববর্তী মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিকগণ মুসলিম শাসকদের শৌর্য-বীর্য ও যুদ্ধ জয়ের ঘটনাবলী অতি যত্নসহকারে বর্ণনা করেন; কিন্তু শিক্ষা বিস্তার, বিদ্যালয় ও লাইব্রেরী স্থাপন, সেতু নির্মাণ, পান্থশালা, অনাথাশ্রম, ধর্মশালা ও চিকিৎসালয় স্থাপন, দীঘি, জলাশয়, প্রনালী ও খাল খনন, ডাক বিভাগের সুবন্দোবস্ত, ভূ-সম্পত্তি দান, অন্যান্য দান-দক্ষিণা, কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনে মুসলিম শাসকগণ কতদূর যত্নশীল ও অনুরাগী ছিলেন, সে সম্পর্কে স্বতন্ত্র ও বিশেষভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করেননি। কারণ তাঁরা হয়তঃ ভেবেছিলেন অনুরূপ সৎ ও মহৎ কার্যাদি সম্পন্ন করা শাসকদের অপিরহার্য কর্তব্য। ফলে সকল শাসকই তেমনটি করে থাকেন। কাজেই সেগুলি এমন বিশেষ কি কাজ যে তাদের বিশেষ বিবরণ তুলে ধরতে হবে? মুসলিম ঐতিহাসিকগণই যখন তা করলেন না, তখন বিজাতীয় ঐতিহাহিসকদের কাছে এটা আশা করা দুরাশার শামিল যে, তাঁরা পুরাতন ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত মুসলিম সভ্যতার নিদর্শনকে যবনিকার অন্তরাল থেকে উদ্ধার করে মুসলিম শাসক ও শাসনের গৌরবের কাহিনী লিখবেন।

(৪) ভারতে মুসলিম শাসনের উপর লিখিত মূল ও প্রাথমিক ইতিহাস গ্রন্থগুলোর প্রায় সবগুলোই ফার্সী ভাষায় লিখিত থাকার কারণে পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ ফার্সী ভাষা থেকে এগুলোর মর্মোদ্ধারের ক্ষেত্রে বহু ভুল-ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন।[২]

মাওলানা ইসলামবাদী উপলব্ধি করেন যে, অমুসলিম তথা বিজাতীয় ঐতিহাসিকদের ধর্ম ও জাতিগত বিদ্বেষ, রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি, মুসলিমগণের প্রকৃত জাতীয় গৌরবের কাহিনী ও সভ্যতার মূল উপকরণসমূহের আলোচনায় পূর্ববর্তী মুসলিম ঐতিহাসিকদের উদাসীনতা এবং মুসলিম আমলের ইতিহাস বেত্তাদের মূল ফার্সী ভাষার গ্রন্থানুসন্ধানে অমুসলিম ঐতিহাসিকদের ক্রুটি ও তাদের 'ভ্রমজনিত উদাসীনতা'-এর কারণে ভারতে মুসলিম সভ্যতার ও গৌরব-গরিমার

---

২ ড. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৯১; মোহাম্মদ শাহ, 'মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীঃ সমাজ চিন্তা ও ইতিহাস চর্চা', প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৬৮-৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক অমূল্য রত্ন-রাজি অযত্নে ও অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। ফার্সী ভাষায় লিখিত সেই ঐতিহাসিক সূত্রসমূহ অনুসন্ধান করে ভারতের মুসলিম সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা সম্ভব বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।[৩] সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বহু উপেক্ষিত মুসলিম শাসনামলের ও মুসলিম সভ্যতার নিদর্শন তুলে ধরে মুসলিম শাসকদের সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝির নিরসন করাই ছিল মাওলানা ইসলামাবাদীর ইতিহাস চর্চার মূল উদ্দেশ্য।

মাওলানা ইসলামাবাদী বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তথ্যবহুল এবং গবেষণামূলক গ্রন্থ রেখে গেছেন। তিনি দেশের শিক্ষা পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে স্বল্প আয়তনের গ্রন্থেও যে তথ্য উপস্থিত করেছেন এবং সেই সাথে তার যে যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ যুক্ত করেছেন তা রীতিমত বিস্ময়কর। তাছাড়া বিভিন্ন রচনায় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষানীতি, শিক্ষাদান প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সমালোচনা ও সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর সূক্ষ্ম চিন্তা ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর ফল। তিনি পৃথিবীর ও গ্রহ-নক্ষত্রপুঞ্জের যে সব তথ্য উপস্থিত করেছেন এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভূ-গোল ও খগোল শাস্ত্র তথা জ্যোতির্বিদ্যা ও নগরতত্ত্বের খুঁটিনাটি বিবরণসহ মধ্যযুগীয় মহান ব্যক্তিবর্গের অবদানের কথা যে প্রণালীতে ও যথাপ্রয়োজনানুযায়ী উল্লেখ করেছেন, তা এ যুগেও শ্লাঘার বিষয়। এখন আমরা তাঁর রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলীর আলোকে তাঁর ইতিহাস সাধনার দিকটি তুলে ধরবো। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর সাহিত্যচর্চার দিকটিও আলোচনায় স্থান পাবে।

(১) **ভারতে মুসলমান সভ্যতা:** গ্রন্থখানা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতার শাহজাহান কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৮৯৬ সালে কলকাতার এক শিক্ষা সম্মেলনে ডেলিগেট হিসেবে উপস্থিত হওয়ার পর একজন তেজোদ্দীপ্ত বালক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সাথে আলাপ এবং 'মিহির ও সুধাকর'-এ প্রকাশিত উক্ত

---

৩ মাওলানা ইসলামাবাদী, ভারতে মুসলমান সভ্যতা, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৪-৫। 'নিবেদন' অংশ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

বালকের একটি পত্রের কারণে মাওলানা ইসলামাবাদী পরবর্তী সময়ে 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' নামক পুস্তক লিখে মুসলিম শাসন যুগের কলঙ্ক মোচনের প্রয়াস পেয়েছিলেন, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। মাওলানা ইসলামাবাদীর আরবী, ফার্সী ও উর্দু জ্ঞান উক্ত সব ভাষায় লিখিত মূল ঐতিহাসিক সূত্রগুলিকে তাঁর গ্রন্থে ব্যবহারে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। আকবর নামা, আইন-ই-আকবরী, মোন্তাখাব-উত-তাওয়ারিখ, মোন্তাখাব-উল্-লোবাব, তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী, সিয়ারুল মোতাখ্খিরীন ও তারিখ-ই-ফিরিশ্তাসহ মোট ৩২টি ফার্সী ও উর্দু গ্রন্থ ব্যবহার করে তিনি 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' গ্রন্থখানা রচনা করেন। তাই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য ও মৌলিকত্ব যথেষ্ট। মাওলানা ইসলামাবাদী তাঁর এ গ্রন্থের আলোচ্যসূচীর অন্তর্গত প্রধান প্রধান প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি ও শিল্পকর্মের চিত্র সংযোজনে অপারগতার কারণে গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এটাই তাঁর ইতিহাস সচেতনতা ও সৃজনশীল মননশীলতার বড় প্রমাণ।

মাওলানা ইসলামাবাদীর এ গ্রন্থে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে, যার ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশী। যেমন– (১) পূর্ত্ত বিভাগ, (২) লঙ্গর খানা ও খয়রাত খানা, (৩) ভারতে মুসলিম আমলের রাজকীয় চিকিৎসালয়, (৪) ভারতে মুসলিম শাসনামলের বিদ্যালয়সমূহ, (৫) শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণের নাম, (৬) বিভিন্ন পুস্তকালয়, (৭) মুসলিম সভ্যতার বিবিধ নিদর্শন, (৮) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মুসলিমদের সদ্ব্যবহার, (৯) জিযিয়া এবং (১০) ভারতে মুসলিম স্থাপত্য বিদ্যার প্রভাব।[৪]

ছৈয়দ মোস্তফা জামাল গ্রন্থখানার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন যে, ভারতে মুসলিম আমলে শিক্ষা, সভ্যতা, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, পূর্তবিভাগ,

৪ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, 'মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীঃ ১৮৭৪-১৯৫০', দৈনিক আজাদ, ঢাকা, জুন-১৯, ১৯৫০; মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ঢাকা, ১৯৬৫, সহদ্রষ্টব্যঃ গ্রন্থ সমালোচনা (ভারতে মুসলমান সভ্যতা), এলান, ডিসেম্বর-২য় পক্ষ, ঢাকা, ১৯৫৫; মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চট্রগ্রাম, ১৯৬৯ এবং ড. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯১।

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপত্য কীর্তি, শিল্পকলা, পান্থশালা, চিকিৎসালয়, পুস্তকালয়, বনস্পতি বিদ্যা, জীবতত্ত্ব, সাম্যবাদ, সাহিত্য চর্চা, বিদ্যালয় ইত্যাদি সম্বন্ধে কিরূপ উন্নতি সাধিত হয়েছিল, সে যুগে মুসলিম বাদশাহ্দের শাসন ও বিচার বিভাগ কিরূপ আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থল ছিল, সেসব গৌরবমন্ডিত ইতিবৃত্ত জানার জন্য বাংলা ভাষায় এটাই একমাত্র পুস্তক ।[৫]

গ্রন্থখানার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ড. আনিসুজ্জামান অভিমত ব্যক্ত করেন এভাবে, 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' (১৯১৪) সম্ভবতঃ তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা । এর 'অবতরণিকা'য় তিনি কতিপয় ইংরেজ ঐতিহাসিকের বিরুদ্ধে সত্য বিকৃতির এবং উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার অভিযোগ করেছেন । লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কেবল মুসলিমদের কীর্তি কাহিনী বিবৃত করে তিনি সন্তুষ্ট থাকেননি, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির ইতিহাসও উদ্ঘাটন করেছেন । ভারতের ইতিহাসের দিকে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি তাকিয়েছেন, তাকে আমরা জাতীয়তাবাদী মুসলিমের দৃষ্টিভঙ্গী বলতে পারি । কংগ্রেস সমর্থক জাতীয়তাবাদী মুসলিমগণ যেমন নিজেদের ধর্ম ও ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্বিত হয়েও স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীও তেমনি হিন্দু-মুসলিম বিভেদ নয়, মিলন কামনা করেছেন এবং ইতিহাসের মধ্যে এই মিলনের সূত্র সন্ধান করেছেন ।[৬]

মাওলানা ইসলামাবাদীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ভারতে মুসলিম শাসনামলে সুলতান ও বাদশাহগণ বিভিন্ন জনহিতকর কার্যাবলী সম্পাদন করতেন, দেশের খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ রাজকোষ থেকে বৃত্তি পেতেন, বিনামূল্যে গরীব ও দুঃখীরা চিকিৎসা পেত, প্রধান প্রধান নগর ও জনপদে রাজকীয় হাসপাতাল ও ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম শাসকগণ ধনী-দরিদ্র ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান করতেন, চিকিৎসকদের মোটা বেতন ও

---

৫ ছৈয়দ মোস্তফা জামাল, দৈনিক আজাদী, ৭ কার্ত্তিক, ১৩৭৯; সহ দ্রষ্টব্য: আনোয়ার পাশা, এলান, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ ।

৬ ড. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৯১ ।

Dhaka University Institutional Repository

জায়গীর প্রদান করতেন। তিনি দুঃখ করে বলেন যে, এসব সত্য ও জ্বলন্ত প্রমাণ থাকতেও আধুনিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মুসলিমগণ কামুক, বিলাসী, অলস, অত্যাচারী, দেশের ও দশের হিতকল্পে উদাসীন, নিষ্ঠুর, নির্দয়, শাসন ক্ষমতা শূন্য ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হচ্ছে যার কোন ভিত্তি নেই।[৭]

শিক্ষা, স্থাপত্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারতের মুসলিম শাসকদের অবদান তুলে ধরতে গিয়ে মাওলানা ইসলামাবাদী উল্লেখ করেন যে, তাঁরা পাঠাগার স্থাপন এবং বিভিন্ন ভাষা থেকে নানাবিধ পুস্তক ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করার ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন এবং দেশের খ্যাতনামা আলিম ও পন্ডিতদের সাহায্যে অসংখ্য মূল্যবান পুস্তক রচনা করে পুস্তকাগারে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে অজস্র অর্থ ব্যয় করেন। বাদশাহী আমলে নির্মিত অসংখ্য 'রাজকীয় বিদ্যালয়'-এ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সরকারী ব্যয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ পেত। মুসলিম বাদশাহগণ ঐ সকল বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য বহু ভূ-সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেন। তাঁরা স্থাপত্য বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন, উন্নততর জরিপ পদ্ধতির উদ্ভাবন, মাইল স্তম্ভের ব্যবহার, টাট্‌কা ফল দীর্ঘস্থায়ী রাখা, পানি শীতল ও পরিস্কার করা, পায়রাকে পত্রবাহনের কাজে লাগানোর কৌশল উদ্ভাবন, কামান আবিষ্কার প্রভৃতি বিভিন্ন প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[৮]

মাওলানা ইসলামাবাদীর বিবরণ হতে জানা যায় যে, ভারতের মুসলিম শাসকগণ হিন্দুদের যথেষ্ট সম্মান ও স্বাধীনতা প্রদান করতে কুণ্ঠিত হননি। তাঁরা হিন্দুদের 'মহারাজা', 'রাজা', 'রাণী', 'রায় বাহাদুর', 'রায় সাহেব', 'মহা মহোপাধ্যায়' প্রভৃতি সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করতেন, হিন্দু রাজকর্মচারীদের জায়গীর ও জমিদারী প্রদান করতেন, শাসন বিভাগের উচ্চতর পদে নিযুক্ত করতেন, প্রাদেশিক গভর্ণর, বিভাগীয় কমিশনার, সেনাপতি, এমনকি মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী পদে

---

৭ ইসলামাবাদী, ভারতে মুসলমান সভ্যতা, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৫৭।
৮ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৮-৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত হিন্দুদের নিযুক্ত করতেন। রাজস্ব বিভাগটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের হাতে ন্যস্ত ছিল। বাদশাহ্গণ হিন্দু দেবালয়ের জন্য নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি দান করতেন, দেবালয়ের পুরোহিতদের রাজকোষ থেকে বৃত্তি প্রদান করতেন। তাঁরা নিঃসংকোচে হিন্দুদের সৈনিক শ্রেণীতেও ভর্তি করতেন। তাঁরা হিন্দুদের উচ্চ সম্মান ও উচ্চাধিকার থেকে বঞ্চিত করতেন না।[৯]

মোহাম্মদ ঘোরী, সুলতান মাহমুদ গজনবী ও আওরঙ্গযিবকে অন্যায়ভাবে মন্দির ও প্রতিমা ভাঙ্গার দায় থেকে অব্যাহতি দিয়ে মাওলানা ইসলামাবাদী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, তাঁদের কেউই শান্তির সময় নিছক হিংসা-বিদ্বেষ বা গোঁড়ামীর বশীভূত হয়ে দেব মন্দির ভাঙ্গেননি। শুধুমাত্র যুদ্ধের সময়, রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় বিদ্রোহীগণ যখন দেবালয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তখন হয়ত: কিছু দেব মন্দির ও ভজনালয় বিনষ্ট হয়ে থাকতে পারে। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, ঐরূপ অবস্থায় মুসলিমগণ যেমন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় ভেঙ্গেছিলেন, তদ্রুপ শিবাজী, সম্ভুজী, শাহ্জী, রনজিৎ সিংহ প্রমুখ হিন্দু রাজাগণও মুসলিমদের মসজিদ, মাদ্রাসা, দরগাহ, সমাধি প্রভৃতি ধূলিসাৎ করে দেন। আওরঙ্গযিবের বানারস ফরমানে হিন্দু দেবালয়ের জন্য মুঘল বাদশাহ্র নিষ্কর ভূমিদানের সনদ প্রদানের ঘটনা উল্লেখ করে তাঁকে হিন্দু বিদ্বেষী বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা থেকে অব্যাহতি দেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন যে, সম্রাট আওরঙ্গযিব হিন্দু ও মুসলিমদের একই চোখে দেখতেন, তাঁর রাজদরবারে ও সাম্রাজ্যে বহু উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মকর্তা নিযুক্ত ছিলেন এবং হিন্দু পন্ডিতগণ তাঁর কাছ থেকে জায়গীর ও বৃত্তি পেতেন।[১০]

মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিজাতীয় ঐতিহাসিকদের আর একটি বড় অভিযোগ ছিল এই যে, তাঁরা অমুসলিম প্রজাদের উপর জিযিয়া নামক একটি

৯ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৬১-৬২।
১০ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

বৈষম্যমূলক কর আরোপ করে তাদের ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতেন। জিযিয়া আরোপের ব্যাপারে যুক্তি প্রদর্শন করতে যেয়ে মাওলানা ইসলামাবাদী বলেন যে, যেহেতু ইসলাম অন্যের উপর বল প্রয়োগ করা বা অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা আদৌ অনুমোদন করেনা, তাই মুসলিম শাসকগণ সামরিক বিধানকে স্বধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের বাধ্যতামূলক সামরিক বিধি থেকে অব্যাহতি দিতে ধর্মত: ও নীতিগতভাবে বাধ্য ছিলেন। মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিমগণ ধর্মত: ও আইনত: সামরিক দায়িত্ব পালনে বাধ্য। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রজাসাধারণ উক্ত নিয়ম পালনে বাধ্য না থাকায় তাদের মধ্যে যারা সামরিক বিভাগে কর্মরত ছিলনা, তাদের ধন-প্রাণ, মান-সম্মান রক্ষার ব্যয় নির্বাহার্থে তাদের উপর জিযিয়া বা প্রতিরক্ষা কর আরোপ করা হয়। এটা যে কোন বিদ্বেষমূলক কর ছিলনা তার প্রমাণ এই যে, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ করতো তারা অবশ্যই মুসলিমদের ন্যায় জিযিয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পেত। এছাড়াও স্ত্রীলোক, শিশু, বিকলাঙ্গ, অন্ধ, উন্মাদ ও দরিদ্র লোককে জিযিয়া প্রদান করতে হত না। এতদ্ব্যতীত জিযিয়া মুসলিম শাসকদের নিজস্ব আবিষ্কারও নয়। প্রাক্ ইসলাম যুগে প্রখ্যাত পারস্য বাদশাহ্ নওশেরওয়ান অসৈনিকদের নিরাপত্তা কর হিসাবে তাঁর রাজ্যে জিযিয়া আরোপ করেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) যখন পারস্য জয় করেন তখন তিনি বাদশাহ্ নওশেরওয়ানের প্রবর্তিত 'জিযিয়া' প্রথা গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষে আফঘান শাসনামলে হিন্দুরা ব্যাপকভাবে সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেনি। সেজন্য তাদের উপর জিযিয়া আরোপিত হয়। বাদশাহ্ বাবর ও হুমায়ূনের সময় এ প্রথা চালু ছিল। বাদশাহ্ আকবর পাঠানদের দুর্বল করার লক্ষ্যে রাজপুতদের সহানুভূতি কামনা করেন এবং তাদেরকে সামরিক বিভাগের অন্তর্ভূক্ত করেন। মহারাষ্ট্রীয়গণও ক্রমান্বয়ে রাজপুতদের অনুসরণ করে। এই ভাবে অধিকাংশ হিন্দু সামরিক বিভাগে প্রবেশ করায় বাদশাহ্ আকবর তাদের উপর থেকে জিযিয়া প্রত্যাহার করেন। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান বাদশাহ্ আকবরের এই নিয়ম অব্যাহত রাখেন। বাদশাহ্

Dhaka University Institutional Repository

আওরঙ্গযিবের সময় রাজপুতদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি পাঠানদের চেয়েও বেড়ে যায় এবং তারা মোঘল শাসকদের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করতেও কুণ্ঠিত হতো না। এমনকি তারা পিতৃপুরুষদের হৃত রাজ-ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মুসলিম শাসনের সমূহ বিপদ আঁচ করতে পেরে আওরঙ্গযিব রাজপুতদের ক্ষমতা দুর্বল করতে, মহারাষ্ট্রীয়দের দমন করতে এবং তাদের সামরিক ক্ষমতা খর্ব করতে সচেষ্ট হন; সামরিক বাহিনী থেকে তাদের ক্রমান্বয়ে সরিয়ে দেন। এইভাবে সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত রাজপুত ও মারাঠাদের উপর তিনি জিযিয়া আরোপ করেন।[১১]

উপর্যুক্ত বিবরণ হতে প্রতীয়মান হয় যে, মাওলানা ইসলামাবাদীর এ গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য ও মৌলিকত্ব যথেষ্ট । আরও লক্ষণীয় যে, অভিযোগ খন্ডনের জন্য মাওলানার দেয়া বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হলেও তা ছিল যথাযথ এবং এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তিনি যে একজন সচেতন ঐতিহাসিক ছিলেন, এগুলো তার প্রমাণ বহন করে।

(২) ভারতে ইসলাম প্রচার: গ্রন্থটির প্রকাশক, প্রকাশের স্থান ও প্রকাশ কাল অজ্ঞাত। তবে যে প্রেক্ষাপট সামনে রেখে মাওলানা ইসলামাবাদী 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' গ্রন্থখানা রচনা করেন, এ গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রেও সেই অনুভূতিই কাজ করেছিল। বিভিন্ন লেখকের বিবরণ হতে জানা যায় যে, T. W. Arnold-এর 'The Preaching of Islam' গ্রন্থের আদর্শে ও অনুসরণে তিনি এ গ্রন্থখানা রচনা করেন এবং ইসলাম প্রচার সম্পর্কিত বিষয়ে হিন্দুরা যেভাবে ইসলাম বিরোধী মনোভাব ও আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে, তিনি এ বইতে তা খন্ডন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। ভারতে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে হিন্দুদের প্রতিকূল মনোভাবকে যুক্তির সাহায্যে খন্ডন করে মাওলানা ইসলামাবাদী নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে ভারতে ইসলাম প্রচারের সঠিক তথ্য এতে প্রকাশ

---

[১১] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৮১-২।

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছে এবং মুসলিমদের বৃহৎ উপকার সাধিত হয়েছে। গ্রন্থখানার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে দ্বিমত নেই।[১২] ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মুসলিম শাসকদের ব্যবহার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ইসলাম তরবারীর সাহায্যে বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার অভিযোগ খন্ডন করেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বল প্রয়োগের মাধ্যমে বা তরবারীর সাহায্যে নিজস্ব মতাদর্শ চাপিয়ে দেয়াকে আদৌ অনুমোদন করেনা। বরং উপদেশ ও যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে লোকদের বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্তে যে বিধান রয়েছে, তিনি তা সবিস্তারে তুলে ধরেন। তাঁর যুক্তির সমর্থনে তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, ইসলাম একমাত্র সাধুসিদ্ধ পুরুষ এবং পবিত্রাত্মা ধর্ম প্রচারকদের প্রচার মাহাত্ম্যেই সমগ্র জগতে বিস্তার লাভ করেছে। কখন, কোথায়, কীভাবে এবং কোন্ পবিত্রাত্মার প্রচার মাহাত্ম্যে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল, তিনি তার বিবরণও প্রকাশ করেন।[১৩] প্রসঙ্গক্রমে তিনি যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন যে, যাভা, সুমাত্রা, মালয় দ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি অঞ্চলের বিশাল মুসলিম সমাজ কোন মুসলিম রাজা-বাদশাহের তরবারীর জোরে সৃষ্ট নয়।[১৪] এমনকি তাঁর মতে, ধর্ম প্রচারের জন্য জিহাদেরও প্রয়োজন হয়না। যুদ্ধ বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের বিধি ইসলামে নেই, বরং তার প্রতি নিষেধ রয়েছে বলেই তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন।[১৫] ইসলামের এ নীতি অনুসরণ করেই মুসলিম শাসকগণ অমুসলিম প্রজা-সাধারণকে ধর্ম-কর্ম ও রাজ্য-শাসন বিষয়ে স্বাধীনতা ও উচ্চাধিকার প্রদানের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এমনকি তাদের বিভিন্ন রকমের সম্মান ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকগণ কোন রকমের হীনমন্যতা প্রদর্শন করেননি।

---

১২ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রাগুক্ত; মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, প্রাগুক্ত; আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত; ইজাব উদ্দীন আহমেদ, মাওলানা ইসলামাবাদীর ১৬-তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনির, ঢাকা, ১৯৬৬।

১৩ মোহাম্মদ শাহ, 'মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীঃ সমাজ চিন্তা ও ইতিহাস চর্চা', প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৭০।

১৪ মাওলানা ইসলামাবাদী, ভারতে ইসলাম প্রচার, পৃ ঃ ১৪৪-৪৫।

১৫ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) তুরস্কের সুলতানঃ গ্রন্থখানা রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস, কলকাতা থেকে ১৯০১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থখানা রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মাওলানা ইসলামাবাদী বলেন যে, ইউরোপের খৃষ্টান শক্তিসমূহের নিকট তুরস্ক এতকাল 'রুগ্ন' নামে অভিহিত ছিল; কিন্তু ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধে তুর্কী জাতির অদ্ভুত বীরত্ব, অসাধারণ শৌর্য-বীর্য ও রণ-পান্ডিত্য দর্শনে ইউরোপীয়দের সে ভ্রম বিদূরিত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এ তুরস্কই মুসলিম জগতের একমাত্র আশা, ভরসা ও গৌরবের স্থল। তুরস্কের সাথে সমগ্র পৃথিবীর মুসলিমদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কারণ তুরস্কের সুলতান পবিত্র স্থান 'মক্কা আল মোআজ্জমা' ও 'মদিনা আল্ মনোওয়ারা'র রক্ষক। তিনিই ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলিমদের তীর্থ স্থান জেরুজালেম বা 'বায়তুল মোকাদ্দাস'-এর তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর নামেই পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম 'খোতবা' পাঠ করে থাকেন। তিনিই সমগ্র পৃথিবীর মুসলিমদের আধ্যাত্মিক নেতা। এজন্যই তিনি 'আমিরুল মু'মিনীন' বা 'খলিফাতুল মুসলিমীন'-এ মহা সম্মানিত ও গৌরবান্বিত উপাধিতে বিভূষিত। এহেন সৌভাগ্যবান মহাপুরুষের অতুলনীয় উন্নতি ও প্রতিভা সমন্বিত অদ্ভুত জীবনবৃত্তান্ত শুনতে কার না হৃদয়ে উৎসাহ স্রোত প্রবাহিত হয়? কাজেই বঙ্গীয় মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের কৌতুহল নিবারণের উদ্দেশ্যে মাওলানা ইসলামাবাদী তুরস্কের মহামান্য সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ খানের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশে কৃত সংকল্প হলেন।[১৬]

'ইসলাম প্রচারক'-এ 'তুরস্কের সুলতান' গ্রন্থের সমালোচনা করে বলা হয়, এ পুস্তকে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী তুরস্কের সুলতানুল আজমের শাসনকালীন সর্ববিষয়ক উন্নতির জ্বলন্ত চিত্র প্রদর্শন করেছেন। এতে তিনি তুরস্কের শিক্ষা ও সামরিক উন্নতি, কৃষি ও বাণিজ্যবিষয়ক উন্নতি, রেল, টেলিগ্রাফ, ডাক, বন বিভাগ, খনি বিভাগ, পূর্ত বিভাগ প্রভৃতি সর্ববিষয়ক উন্নতির বিষয় বিশদভাবে

---

১৬ মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী, তুরস্কের সুলতান, রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৯০১, পৃঃ 10-10 (ভূমিকা)।

Dhaka University Institutional Repository

লিপিবদ্ধ করেছেন। এতদ্ব্যতীত সুলতানুল আজমের ধর্ম পরায়নতা, স্বজাতি বৎসলতা, স্বদেশ হিতৈষণা, সরলতা, উদারতা, মহানুভবতা, রাজনীতি কুশলতা, দয়া ও সৌজন্য, বিলাস পরিশূন্যতা, আহার-বিহারে আড়ম্বরহীনতা, দূরদর্শিতা, সাহস, উদ্যম, কার্যকুশলতা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপন করেছেন।[১৭]

বিষয়বস্তুর আলোকে নিঃসন্দেহে এটিকে একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।[১৮] বস্তুত:পক্ষে খিলাফত আন্দোলনের পটভূমিতে গ্রন্থখানা রচিত হয়েছে। মুসলিম দেশ হিসেবে তুরস্কের প্রতি মাওলানা ইসলামাবাদীর স্বাভাবিক আকর্ষণ থেকেই তুরস্কের গৌরবময় অতীত ও ক্রান্তিকালীন সংকটের বর্ণনা করে তিনি সুলতানকে মুসলিম বিশ্বের শক্তির হেতু ও জাগরণ ক্ষেত্রে খলিফাস্বরূপে উপস্থিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তুরস্কের সুলতানের প্রতি তাঁর এত শ্রদ্ধার মূল কারণ এই যে, সুন্নী মুসলিমগণ সাধারণত: তাঁকেই ধর্মজগতের প্রধান বলে গণ্য করে থাকেন। দ্বিতীয়ত: এ তুরস্কই মুসলিম জগতের একমাত্র আশা, ভরসা ও গৌরবের স্থল। ফলে তুরস্কের স্বার্থকে সব সময়েই তিনি নিখিল জগতের মুসলিমদের স্বার্থরূপে দেখেছেন ।[১৯]

আনোয়ার পাশার বক্তব্য হতে জানা যায় যে, তৎকালীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তুরস্কই ছিল প্রধান এবং পরাধীন ভারতের মুসলিমদের জন্য ছিল আশা ও মর্যাদার প্রতীক। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ এই তুরস্ক গ্রাস করতে উদ্যত হলে সেটা মুসলিমদের মনে তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। খিলাফত আন্দোলন ছিল এই প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত একটা রাজনৈতিক আন্দোলন। ইসলামাবাদী এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কর্মক্ষেত্রে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তুরস্কের গুণমুগ্ধ একজন লেখক যিনি ‘তুরস্কের সুলতান’ লিখেছিলেন। তুরস্কের সুলতান

---

১৭ ইসলাম প্রচারক, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩০৮।
১৮ আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৪৪৫-৪৬।
১৯ ড. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামাবাদীর দৃষ্টিতে মুসলিম জগতের খলিফা এবং একজন মহান আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন, যদিও তুরস্কের অভ্যন্তরেই তখন খলিফার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধুমায়িত হচ্ছিল।[২০]

গ্রন্থখানা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তুরস্কের ভৌ-গোলিক বিবরণ, তুরস্ক সুলতানদের আদি পুরুষ হতে সুলতান আবদুল হামিদ পর্যন্ত ৩৫ জন সুলতানের ইতিবৃত্ত ও মহামান্য তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদ খানের পঞ্চবিংশতি বাৎসরিক রাজ্য শাসন বিষয়ক কার্যবিবরণী, নব্যতুর্কীর অভ্যুদয়, তুরস্কের প্রত্যেক বিভাগের উন্নতির বিস্তারিত বিবরণ ইত্যাদি সমুদয় তত্ত্ব এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। কাজেই গ্রন্থখানার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

(৪) তুরস্কের সুলতান মহামান্য আবদুল হামীদ খানের পঞ্চ বিংশতি বাৎসরিক কার্য বিবরণীঃ গ্রন্থখানা মূলতঃ ১৯০১ সালে সংকলিত হয়েছে। এটা আসলে আলাদা কোন গ্রন্থ নয়; বরং 'তুরস্কের সুলতান' গ্রন্থেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে সুলতান আবদুল হামীদ খানের জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকের বিস্তারিত ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থখানা সংকলনের ক্ষেত্রে মাওলানা ইসলামাবাদীর ঐতিহ্য চেতনা ও ইতিহাস সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৫) আওরঙ্গজেবঃ গ্রন্থখানার প্রকাশনাগত তথ্য পাওয়া দুষ্কর হলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' (১৯১৪) এবং 'আওরঙ্গজেব' প্রায় একই উদ্দেশ্যে রচিত। এতে তিনি বাদশাহ্ আওরঙ্গযিবের সুকীর্তি বর্ণনার পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির ইতিহাস উদ্ঘাটনেরও চেষ্টা করেন। মাওলানা ইসলামাবাদী হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে মিলনের কামনা থেকে ও পরস্পরের ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে বাদশাহ আওরঙ্গযিবের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ খন্ডনের চেষ্টা করেন।[২১] এ প্রসঙ্গে ড. আনিসুজ্জামান বলেন,

---

২০ আনোয়ার পাশা, এলান, ফেব্রুয়ারী ২য় পক্ষ, ১৯৭১।
২১ আনোয়ার পাশা, পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী হিন্দু-মুসলিমের বিভেদ নয়, মিলন কামনা করেছেন এবং ইতিহাসের মধ্যে এই মিলনের সূত্র সন্ধান করেছেন। আওরঙ্গযিব সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্কভঞ্জনের চেষ্টা করে তিনি বলেছেন, যে আওরঙ্গযিবের প্রতি ইউরোপীয় ও হিন্দু ঐতিহাসিকগণ অসংখ্য কলঙ্কের বোঝা আরোপ করেছেন, সেই আওরঙ্গযিব অসংখ্য হিন্দু দেবালয়ের জন্য নিষ্কর ভূমি বরাদ্দপূর্বক সনদ প্রদান করে গেছেন। কাজেই কোন্ অভিপ্রায়ের বশবর্তী হয়ে তিনি মুসলিম শাসিত ভারতবর্ষের পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে বসেছেন, তা স্পষ্ট ধারণা করা যায়।[২২]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, মাওলানা ইসলামাবাদী তাঁর 'আওরঙ্গজেব' গ্রন্থে বৃটিশ ঐতিহাসিক Mountstuart Elphinstone এবং Stanley Lane Poole-এর অভিযোগ খন্ডন করেন। তাঁদের বিবরণে দেখা যায় যে, বাদশাহ্ আওরঙ্গযিব মারাঠাদের দমন করতে ব্যর্থ হয়ে তাদের 'চৌথ' দিতে বাধ্য হন এবং তাঁর রাজত্বকালে মারাঠাদের উপদ্রব ও অত্যাচার প্রশমিত হওয়ার পরিবর্তে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। অতএব, তাঁদের মতে, মোঘল রাজত্ব ধ্বংসের জন্য প্রধানত: অযোগ্য ও দুর্বল বাদশাহ্ আওরঙ্গযিবই দায়ী ছিলেন।[২৩] মাওলানা ইসলামাবাদীর মতে প্রকৃত ঘটনা ছিল এই যে, বাদশাহ্ আওরঙ্গযিবের মৃত্যুর দুই বছর পূর্বে তিনি মারাঠাদের সকল আশ্রয় কেন্দ্র ও দুর্গ অধিকার করেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই শিবাজীর মৃত্যু হয়, সম্ভুজীর হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় এবং রামাজে বনবিহার অবস্থায় প্রাণ হারায়। এসব ঘটনা মারাঠা নেতৃবৃন্দের দুর্দশা ও শোচনীয় অবস্থার পরিচয় বহন করে। রাজ্য ও নেতৃত্ব হারা মারাঠাগণ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দস্যুবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। মারাঠাদের দমন ও বিজিত রাজ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য বাদশাহ্ আওরঙ্গযিব হোসেন কুলী খানকে নিযুক্ত করেন। বাদশাহ্ আওরঙ্গযিব অবশ্য মারাঠাদের অস্তিত্বকে সমূলে উৎখাত করেননি; কারণ মাওলানা ইসলামাবাদীর অভিমত অনুসারে, সেটা রাজধর্ম

---

২২ ড. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত; মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী ও ন্যায়-বিগর্হিত কাজ। বাদশাহ্ আওরঙ্গযিবের সমালোচকগণ এই দিকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি। মাওলানা ইসলামাবাদী যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, মারাঠাদের অত্যাচার উপদ্রব দমনে বাদশাহ্ আওরঙ্গযিবের পরবর্তী বাদশাহ্গণের ব্যর্থতার জন্য ন্যায় সঙ্গতভাবে বাদশাহ্ আওরঙ্গযিবকে দায়ী করা যায় না; কিংবা তাঁকে দুর্বল শাসক হিসেবেও অভিহিত করা যায় না।[২৪]

হিন্দু-মুসলিমের সম্পর্ক ও আওরঙ্গযিবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিচার প্রসঙ্গে মাওলানা ইসলামাবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে মুহম্মদ আবদুল হাই যে অভিমত ব্যক্ত করেন তা প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে পার্থক্য ও বিরোধ তার মূর্ত ও জীবন্তরূপ লক্ষ্য করা যায় শিবাজী ও আওরঙ্গযিবের মধ্যে। মাওলানা ইসলামাবাদী তাঁর 'আওরঙ্গজেব' গ্রন্থে এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে হিন্দু-মুসলিমের সম্পর্ক এবং আওরঙ্গযিবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিচার করেছেন।[২৫] এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন অভিমত ব্যক্ত করেন এভাবে যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে শিবাজী ও আওরঙ্গযিবকে নিয়ে ব্যাপক বাক্-বিতন্ডা চলছে। প্রকৃতপক্ষে এ স্থানে পাক-ভারত দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শিবাজী ভারতীয় হিন্দুদের পরম স্বাদেশিকতার চরম আদর্শ এবং আওরঙ্গযিব ইসলামের প্রতীক স্বরূপ ।[২৬]

(৬) **কনষ্টান্টিনোপল:** মাওলানা ইসলামাবাদী কর্তৃক ১৩১৯/১৯১২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত এ গ্রন্থটিতে তুরস্কের তদানীন্তন রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলের ইতিহাস ও বিস্তৃত বিবরণ স্থান পেয়েছে। তুরস্ক প্রসঙ্গে তাঁর একাধিক গ্রন্থের মধ্যে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভূমিকায় ইস্তাম্বুলকে তিনি 'বর্ত্তমান সময় মুসলমানগণের একমাত্র জাতীয় গৌরবের কেন্দ্রভূমি এবং ইসলাম জগতের আশা-ভরসার পূণ্যক্ষেত্র' এবং 'বীর ভূমি' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

---

২৩ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Mountstuart Elphinstone, The History of India, Allahabad, 1966; Stanley Lane Poole, Aurangzeb and the Decay of the Mughal Empire, Bombay, 193.

২৪ মাওলানা এসলামাবাদী, 'আওরঙ্গজেব', আল্-এসলাম, ৩য় ভাগ, আষাঢ় ১৩২৪; পৃ ঃ ১৩৭।

২৫ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'এ মহানগরী পৃথিবীর অপূর্ব লীলাক্ষেত্র'।[২৭] এ মহানগরীর প্রতি মুসলিমদের স্বাভাবিক আকর্ষণ– 'সেই আগ্রহাতিশয্য ও কৌতূহল প্রাবল্য'-ই এ গ্রন্থ রচনায় লেখককে প্রবৃত্ত করেছে। তাই তিনি বলেন যে, এ পুস্তক পাঠে যদি একজন পাঠকের অন্তরেও জাতীয়ভাবের উদ্রেক হয়, একটি হৃদয়তন্ত্রীও যদি স্বজাতি বাৎসল্যের গৌরবতানে বেজে উঠে, তা হলেই তাঁর পরিশ্রম সফল হয়েছে বলে তিনি মনে করবেন।[২৮] এ বক্তব্য হতে তাঁর ঐতিহ্য চেতনা ও ইতিহাস সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গ্রন্থটিতে মোট চারটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের 'প্রাথমিক ইতিহাস' অংশে স্তাম্বুল ও গল্‌তা টুইন-সিটির বিবরণ, শহরের নাগরিক সুবিধাদি, স্নানাগার– আশ্রম- পান্থশালা, হোটেল, যানবাহন, দর্শনীয় স্থান, কেল্লা, সমাধি, মন্দির, উদ্যান, রাজ প্রাসাদ, শিক্ষালয়, গ্রন্থাগার, যাদুঘর ও মসজিদসমূহের বিবরণ এবং বিশেষ উৎসব, যথা– মহামান্য সুলতানের জুমাবারে মসজিদে গমন উপলক্ষে শোভা-যাত্রা বা শোভা মিছিল বা 'সলা মলক', মহররম উৎসব ইত্যাদির বিশদ বিবরণ রয়েছে।[২৯] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, কনষ্টান্টিনোপলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, কনষ্টান্টিনোপল মুসলিমদের অধিকারভূক্ত হবার পর হতে 'স্তাম্বুল', 'দারুসসায়াদ' ইত্যাদি গৌরবান্বিত বিশেষণে বিভূষিত হয়েছে। এ শহরটি ইউরোপ ও এশিয়ার এরূপ সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত যে, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক হিসাবে পৃথিবীর সমুদয় শহর হতে এর মর্যাদা ও বিশেষত্ব অত্যধিক বলে খ্যাত। এ জন্যই ফ্রান্সের জগৎ প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী সম্রাট মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট অনেক সময় বলতেন– যিনি সমগ্র পৃথিবীর একচ্ছত্র অধীশ্বর হবেন তাঁর জন্য রাজধানী

---

২৬ দৈনিক আজাদ, জুন ১৯, ১৯৫৫।

২৭ কনষ্টান্টিনোপল, মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৮৫ এবং ১৫৪।

২৮ কনষ্টান্টিনোপল, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮৫ এবং ১৫৪।

২৯ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: কনষ্টান্টিনোপল, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৫৬-১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে কনষ্টান্টিনোপল অপেক্ষা সুবিধাজনক ও উপযুক্ত স্থান পৃথিবীতে আর নেই ।[৩০]

ইতিহাস আলোচনার পাশাপাশি এর গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক 'মনুমেন্ট'-এর আলোচনাও তিনি করেছেন । এটিও তাঁর ঐতিহ্য চেতনা ও ইতিহাস সচেতনতার প্রমাণ বহন করে । যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন, কনষ্টান্টিনোপলের 'পায়রা' নামক পাহাড়ের শিখর দেশে একটি প্রাচীন 'মনুমেন্ট' আছে । এ মনুমেন্টে আরোহণ করলে কনষ্টান্টিনোপল মহানগরীর সম্পূর্ণ দৃশ্য অতি সুন্দররূপে দেখতে পাওয়া যায় । এ 'মিনারার' শীর্ষ-ভাগে আরোহণ করলে রাজকীয় প্রাসাদাবলী, নগরের বিবিধ প্রকারের বিভিন্ন অংশসমূহ, রাজকীয় উদ্যানমালা, নানা প্রকার কল-কারখানা, সমুদ্র গর্ভস্থ ষ্টিমার ও সামরিক অস্ত্রশালা ইত্যাদির বিচিত্র দৃশ্যাবলী যুগপৎ পরিদৃষ্ট হয় । এর ঠিক বিপরীত দিকে, আদ্রিয়ানোপল রেলওয়ের প্রারম্ভ ভাগে আর একটি সুবৃহৎ ও অত্যুচ্চ মনুমেন্ট ছিল । এই উভয় মনুমেন্টের মধ্যে একখন্ড লৌহ-শিকল সংযোজিত ছিল । তদ্বারা বৈদেশিক রণ-তরীসমূহের আক্রমণ হতে রাজধানীর রক্ষণাবেক্ষণের কার্য্য সম্পাদন করা হত এবং এ প্রণালীতে 'ইনফুরস' ও 'মিডল-টাওয়ারে'র মধ্যে জিঞ্জির ঝুলিয়ে বসফর্স নদীর রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য সম্পন্ন করা হত কিন্তু বর্তমানে দেশ ও নগর রক্ষার জন্য 'তর্পেডো' ও 'মাইন' প্রথা প্রচলিত হওয়ায় সে সকল প্রাচীন প্রথার আবশ্যকতা এখন আর অনুভূত হয়না ।[৩১]

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তুর্কীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক এবং ডাক, গণ মাধ্যম ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যা ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচিত ।[৩২] তুর্কী জাতির স্বভাব-চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে মাওলানা ইসলামাবাদী তাঁর এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে জনৈক ভ্রমণকারীর বক্তব্যকে তুলে ধরেন এভাবে:

---

৩০ কনষ্টান্টিনোপল, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৫৭ ।
৩১ কনষ্টান্টিনোপল, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৫৯ ।
৩২ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: কনষ্টান্টিনোপল, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৭৬-১৮৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

"আমি তুর্কীদিগের সহিত মিলামিশা করিয়া তাঁহাদের বিনম্র স্বভাব, আতিথ্য তৎপরতা এবং অতিমাত্রায় ভদ্রতা দর্শনে বিমুগ্ধ এবং আশাতীতরূপে প্রীত হইয়াছিলাম। আমি প্রথম প্রথম যখন পথঘাট চিনিতে পারিতামনা, তখন যে কোন তুর্কীর নিকট পথের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি অতি ভদ্রতার সহিত আমাকে পথের তত্ত্ব বলিয়া দিতেন এবং অনেক সময় গন্তব্য স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। ২/৩ বার স্থানান্তরে যাতায়াত উপলক্ষে কুলিদিগের সঙ্গে পারিশ্রমিক লইয়া তর্ক-বিতর্ক হওয়াতে উপস্থিত তুর্কী ভদ্রলোকগণ কুলিদিগকে সাবধান করিয়া অতিরিক্ত পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে বারণ করেন।"[৩৩]

তুর্কীদের স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে তিনি লিখেন, কোন কোন তুর্কী রমনী লেখাপড়ায় এত উন্নতি লাভ করেছেন যে, তাঁরা সংবাদ-পত্রিকাসমূহে অতি দক্ষতার সাথে লেখনী চালনা করে থাকেন এবং জায়গা-জমিদারী ও কারবারের হিসাব-নিকাশ এবং তত্ত্বাবধান সুন্দররূপে করতে সক্ষম। তুর্কী গভর্ণমেন্ট স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য যেরূপ সুবন্দোবস্ত করেছেন, তাতে বড় ঘরের মেয়েরাও অবাধে বিদ্যালয়ে গমনপূর্বক শিক্ষালাভ করতে কোনরূপ সংকোচ মনে করেন না। ইউরোপীয় সভ্যতা ও রীতি-নীতি দিন দিন তুর্কী মহিলাকুলের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করছে। তৎসঙ্গে গৃহশাসন ও সন্তান প্রতিপালন নীতিও তাঁরা শিক্ষা লাভ করছেন। তুর্কী মহিলাবৃন্দ শিক্ষা ও গৃহশাসন নীতি সম্বন্ধে মিশরীয় রমনীগনাপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।[৩৪]

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এতে প্রাচীন রাজভবন ও তাতে সংরক্ষিত ভান্ডারের ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদির বিবরণ এবং যাদুঘর ও কয়েকটি ঐতিহাসিক মসজিদ ও প্রাচীন দেবালয়ের তথ্য দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন সম্রাটগণের দরবার প্রথা ও শিক্ষা চর্চার দিকগুলিও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য ও গুরুত্ব অত্যধিক এবং তা অনস্বীকার্য।

---

৩৩ উদ্ধৃত, কনষ্টান্টিনোপল, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৭৬।
৩৪ কনষ্টান্টিনোপল, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৭৯-৮০।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়টির শিরোনাম 'মসজেদ সমূহের বিশেষ বিবরণ'। এতে কনষ্টান্টিনোপল, পিরা, গলতা ও অন্যান্য স্থানের মসজিদ কীর্তিসমূহের প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ স্থান পেয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি তুরস্ক-ভ্রমণকারী হাফেজ আবদুর রহমান, মাওলানা শিবলী ও মৌলবী মাহবুবে আলমের বৃত্তান্ত এবং লেডী ম্যাক্সমুলারের ভ্রমণ কাহিনীকে আকর হিসাবে গ্রহণ করেছেন।[৩৫] মাওলানা ইসলামাবাদী 'জামে ছোলেমানিয়া' মসজিদের বিবরণ দিতে যেয়ে বলেন:

> "এই মসজেদ সোলেমানে আজমের আদেশ অনুসারে সাময়ক প্রধান শিল্পী নেহান পাশার তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার ন্যায় পারদর্শী অদ্বিতীয় শিল্পী এই পর্য্যন্ত তুর্কীদিগের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন কিনা সন্দেহ। এ মস্‌জেদ কনষ্টান্টিনোপলের যাবতীয় মস্‌জেদাপেক্ষা সৌন্দর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা রাজধানীর তৃতীয় পাহাড়ের উচ্চ দেশে স্থাপিত। তাহার লোহিত বর্ণের রোখাম প্রস্তর নির্ম্মিত গুম্বজ চারিটী খিলানাকারের স্তম্ভাবলম্বনে স্থাপিত, প্রাচীরসমূহ বিভিন্ন বর্ণের মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা বিনির্ম্মিত। মস্‌জেদের মেহরাব বা বেদী ও সোল্‌তানের নমাজ পড়িবার জালিদার যবনিকাকক্ষ অপূর্ব্ব কারুকার্য্য বিখচিত ও রমনীয় চাতুর্য্যবিমন্ডিত পত্র পল্লব বিশিষ্ট অত্যুজ্জ্বল মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা গঠিত। ... জামে ছোলেমানিয়া সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয় বটে, কিন্তু তাহার সংলগ্ন উদ্যানস্থিত দুইটী সমাধি সৌধ তদপেক্ষাধিক সৌন্দর্য্যযুক্ত, দুইটি সমাধির মধ্যে একটীতে স্বয়ং সোল্‌তান সোলেমান সমাহিত। অন্যটীতে তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিনী রোকছলনা বা রওশনক কিংবা খোররম সমাধিস্থ। উভয় সমাধিসৌধ অষ্ট ভুজ্জাকারে নির্ম্মিত। উভয়েতে এরূপ সুকৌশলে কৃষ্ণ ও শ্বেত বর্ণের তেল মর্দ্দিত চৈনিক অনুকরণে কারুকার্য্যাদি বিখচিত রহিয়াছে যে ভাষায় তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করা অসম্ভব। ... সমাধিসমূহে বহু মূল্যের হীরকাদি মন্ডিত উষ্ণীষ বা অন্য প্রকার অলঙ্কার বিশেষ সযত্নে রক্ষিত আছে।"[৩৬]

মাওলানা ইসলামাবাদীর উপর্যুক্ত বিবরণ প্রত্নতত্ত্বের প্রতি তাঁর আকর্ষণেরই বহিঃপ্রকাশ। এটি নিঃসন্দেহে তাঁর ইতিহাস সচেতনতার প্রমাণ বহন করে। এতদ্ব্যতীত এ গ্রন্থের অন্যান্য বিবরণগুলোও একই ধারার ইঙ্গিত দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

(৭) খাজা নেজামুদ্দীন আওলিয়াঃ ১৩২৩/১৯১৬ সালে কলকাতা হতে প্রকাশিত এ গ্রন্থখানা 'ভারতের প্রসিদ্ধ ওলীর বিস্তৃত জীবনী ও অলৌকিক ঘটনাবলীপূর্ণ অপূর্ব ঐতিহাসিক গ্রন্থ'।[৩৭] পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বালক ইসমাইল হোসেন সিরাজীর তেজস্বী উক্তি ও প্রশ্নবান একদা মাওলানা ইসলামাবাদীকে ভারতের মুসলিম শাসন ও কীর্তি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সম্ভবত: একই উদ্দেশ্য মহান সাধকের চরিত সন্ধানেও তাঁকে প্রবৃত্ত করে থাকবে। কারণ এ গ্রন্থের ভূমিকায় অনুরূপ বক্তব্যেরই বলিষ্ঠ প্রকাশ লক্ষনীয়। মাওলানা ইসলামাবাদী এ গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেন যে, দুর্দ্দম্য তেজে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হলে শিক্ষা সভ্যতার হৃদয়োন্মাদিনী গৌরব কাহিনী এবং তৎ সমাজের বিশ্ববরেণ্য আদর্শ পুরুষগণের পবিত্র চরিতমালা প্রকাশ পূর্বক সেই জাতির নয়ন সমক্ষে স্থাপন করতে হয়। ফলত: অধঃপতিত সুপ্তমুগ্ধ আত্মবিস্মৃত সমাজের জনমন্ডলিকে সেই পবিত্র স্মৃতির উদ্দীপনায় উদ্বোধিত করে তাদেরকে জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত করতে প্রয়াসী হওয়াই সাধনায় সিদ্ধি লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।[৩৮]

মাওলানা ইসলামাবাদী মনে করেন, তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাবলীসহ এ গ্রন্থখানা 'মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের অকিঞ্চিৎকর চেষ্টার প্রতিবিম্ব মাত্র'।[৩৯] 'খাজা নেজামুদ্দীন আওলিয়া' মাওলানা ইসলামাবাদীর ইতিহাস ও চরিত গ্রন্থাদির মধ্যে প্রধান। বস্তুত গ্রন্থটিতে তিনি চরিত সন্ধানের একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঘটনার কালানুক্রমিক বর্ণনা উপস্থাপন কালে ইতিহাস থেকে বিচ্যুত না হয়েও বর্ণনা বৈশিষ্ট্যে এবং কাহিনী সমন্বয়ে উপস্থাপনার আকর্ষণীয় কৌশল ব্যবহারের কারণে জীবনী গ্রন্থখানা সরস ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এ সাধু পুরুষের প্রসঙ্গটি নির্বাচনের মূলে তাঁর চিন্তা-চেতনা ছিল এরূপ, যে সকল ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধু পুরুষের সাধনার ফলে ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম বিস্তৃত এবং মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ়

---

৩৭ বিজ্ঞাপন, সাপ্তাহিক 'ছোলতান', নব পর্য্যায়, পৌষ ১৩৩০।

৩৮ মাওলানা এছলামাবাদী, খাজা নেজামুদ্দীন আওলিয়া, কলিকাতা, ১৩২৩/১৯১৬, পৃ ঃ ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩৯ পূর্বোক্ত, ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল, তাদের মধ্যে মহাত্মা সুল্‌তানুল্‌ মাশায়েখ খাজা নেজামুদ্দীন আওলিয়া অন্যতম। আধ্যাত্মিক শক্তি, ত্যাগ স্বীকার, চরিত্রবল ও একনিষ্ঠ সাধনার প্রভাবে মানুষ কতদূর সফলতা লাভ করতে পারে, দুঃখ দারিদ্র্যের ভীষণ নিষ্পেষনে ও প্রতিবন্ধকতার ভিতর দিয়ে মানুষ দৃঢ়তা, একাগ্রতা, অটল বিশ্বাস ও অটুট সাধনার বলে কিরূপে সিদ্ধি লাভ করতে পারে, তিনি জগতের ইতিহাস বক্ষে তার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। এ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সেই মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হয়েছে।[৪০]

সুফীতত্ত্বের প্রভাবে ধর্ম সাধকগণের জীবন মাহাত্ম বর্ণনার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জন থাকা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। মাওলানা ইসলামাবদীও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। এ প্রসঙ্গে ড. আনিসুজ্জামানের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর বর্ণনা মোতাবেক, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর শিক্ষাদীক্ষা হয়েছিল প্রাচীনপন্থী পরিবেশে, মূলতঃ ধর্মতত্ত্বকে কেন্দ্র করে। সুতরাং এটা খুব স্বাভাবিক যে, সুফী পন্থা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পীরদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ভারতীয় মুসলিমদের ধর্ম সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এরই পরিচয় আছে তাঁর 'খাজা নেজামুদ্দীন আওলিয়া' (১৯১৬) গ্রন্থে। বইটি নিজামুদ্দীনের বংশ, জীবন কাহিনী ও অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয়। কোন কোন অলৌকিক ঘটনার বিবরণ সম্পর্কে তাঁর মনেও সন্দেহ জেগেছে, তবুও বৈজ্ঞানিক হিন্দু ধর্মের প্রচারকদের মতো তিনি এগুলোকে বৈজ্ঞানিক রহস্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন এভাবে যে, এ বিষয়টি অতিরঞ্জিত হতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তির অলৌকিক প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নাই। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও ইউরোপ ও আমেরিকাতে 'মেস্‌মেরেজম' ও 'হিপ্‌নটিজম'-এর উন্নতির সঙ্গে অলৌকিক ঘটনাবলীর সত্যতা ক্রমে সকলের নিকট সমর্থিত হচ্ছে। অলৌকিকতায় সত্যতা প্রমাণের এই চেষ্টা দুর্বল হলেও এর তাৎপর্য এই যে, অলৌকিক ঘটনামাত্রই যে প্রামাণ্য নয়– তারও যে প্রমাণ আবশ্যক– এ কথাটি এখানে পরোক্ষে স্বীকৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ কথা বলা দরকার যে, ইসলামাবাদী সংস্কারাচ্ছন্ন পীরবাদী

---

৪০ পূর্বোক্ত, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন না, বরঞ্চ তার ভয়ংকর বিরোধিতা করেছেন। দু'বছর পর প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে তিনি বলেন যে, দেশের যে স্থানে স্ত্রী পুরুষেরা পীরের দর্গাহে যেয়ে ও জীবিত পীরের কাছে যেয়ে শির্‌ক বিদ্‌আৎরূপ মহাপাপ অর্জন করছে, তাদেরকে ঐ কুপথ হতে ফেরানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। কবরে, দর্গাহে, মাজারে বাতি জ্বালানো ও মানত চড়ানো সমূলে বিনাশ করা দরকার।[৪১]

মাওলানা ইসলামাবাদী এ গ্রন্থে খাজা নিজামুদ্দীনের জীবনের বিভিন্ন দিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ও চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। ফলে গ্রন্থখানা একই সাথে ইতিহাস ও জীবন চরিত-এর মর্যাদা পেয়েছে। মাওলানা ইসলামাবাদী খাজা নিজামুদ্দীনের চরিত্র-মাধুর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসাধারণ স্মরণশক্তি ও স্বাভাবিক প্রতিভার প্রশংসাবাদ চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ল। সকলেই তাঁকে তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি বিশেষত: তাঁর উন্নত চরিত্র ও আদর্শ চালচলনের জন্য ভক্তি ও স্নেহের চক্ষে দর্শন করতেন। ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট সমাদর ছিল। তাঁর বিনয় ব্যবহার ও অমায়িক আপ্যায়নে কেহ মুগ্ধ না হয়ে পারত না। তিনি নিতান্ত তর্ক প্রিয় ছিলেন। সহপাঠী ও শিক্ষকমন্ডলীর সাথে নানা জটিল বিষয়ে তর্ক করতে নিতান্তই কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে থাকতেন। এজন্য সকলেই তাঁকে 'নিজামুদ্দীন বহ্‌হাছ' অর্থাৎ তার্কিক নিজামুদ্দীন নামে অভিহিত করতেন।[৪২]

গ্রন্থের অন্যত্র তিনি খাজা নিজামুদ্দীনের আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া যেমন পুস্তকগত শিক্ষায় পারদর্শী ছিলেন এবং প্রত্যহ শিষ্যদেরকে পবিত্র কুরআন, হাদিস ও দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করতেন, অন্যদিকে জনসাধারণের মধ্যে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা বিস্তারেও

---

[৪১] দেখুন : মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৮৭।

[৪২] মাওলানা এছলামাবাদী, খাজা নেজামুদ্দীন আওলিয়া, মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২১৬-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

সবিশেষ মনোযোগী ছিলেন। যাঁরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন তাঁরা আর ইহ জীবনে অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পরের অনিষ্ট কামনা, পরনিন্দা ও গ্লানি ইত্যাদি পাপ-তাপজনিত ঘৃণিত কার্যে কখনও লিপ্ত হতেন না। তাঁরা সর্বদা ধর্ম-কর্ম, ধ্যান–ধারণা, দান-দক্ষিণা ও পরোপকারে ব্রতী হতেন। তাঁর শিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যগণ দেশে বিদেশে গমন পূর্বক আধ্যাত্মিক শক্তি ও শিক্ষা বিস্তারে তৎপর হতেন।[৪৩] খাজা নিজামুদ্দীনের আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক ক্ষমতা এবং সমাজে এর প্রভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে মাওলানা ইসলামাবাদী লিখেন, হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়ার সুখ্যাতি ও অলৌকিক শক্তি সামর্থ্যের কথা দেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়লো। চতুর্দিক হতে বিশেষভাবে পূর্বাপেক্ষা অধিক লোক দলে দলে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে লাগল। তিনি জনসমাজের মধ্যে 'জাহেরী' ও 'বাতেনী' সর্ববিধ শিক্ষা বিস্তার করতে লাগলেন। এ সময় ধর্ম-কর্মের দিকে লোকের এরূপ আসক্তি ও অনুরক্তি জন্মেছিল যে বেনামাজী ও বেশরা লোক দিল্লীর চতুস্পার্শ্বে বহুদূর ব্যাপি ছিলনা বললেও অত্যুক্তি হবেনা। নামাজের জন্য পথে ঘাটে নানাস্থানে মস্‌জিদ এবং প্রস্তর গ্রথিত 'চবুতরা' নির্মিত হয়েছিল। কোরআন পাঠ, নামাজ-রোজা, দান-ধ্যান আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের নিত্য কর্তব্য কর্মের মধ্যে গণ্য হয়েছিল। তখন চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি, ব্যভিচার, পাপাচার ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তিসমূহ জনসাধারণের মধ্যে কুচিৎ দৃষ্টিগোচর হত। খাজা সাহেবের এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ও অলৌকিক শক্তি দর্শনে প্রত্যহ অসংখ্য হিন্দু তাঁর নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে লাগল। লোকের চরিত্রবল অনেকাংশে উন্নতি লাভ করেছিল। বলা বাহুল্য যে, শত শত আইন কানুন, রাজবিধান, রাজশক্তি প্রয়োগে দেশের ও দেশবাসীর নৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা যতটা সম্ভবপর নয়, একজন সাধুপুরুষের আধ্যাত্মিক শক্তি ও শিক্ষা দ্বারা তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক উপকার সাধন করা সম্ভব। যারা আধ্যাত্মিক শক্তির গুরুত্ব ও ক্ষমতা অনুভব করতে

---

৪৩ খাজা নেজামুদ্দীন আওলিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ২৩২।

Dhaka University Institutional Repository

অসমর্থ তারা প্রকৃত সাধুপুরুষগণের চরিত্রবল পরীক্ষা করলে সহজেই দ্বিধাশূন্য হতে পারেন ।[৪৪]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, অলৌকিক ঘটনাকে অস্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক বিধানের বিপরীত কার্য্য বলে বিশ্বাস করা অবশ্যই ভ্রমাত্মক ধারণা । প্রাকৃতিক বিধান বা 'কানুনে কুদরত' কিম্বা ঐশ্বরিক স্বভাব ধর্মের বিরুদ্ধে কোন কাজ হয় না । খোদা তাআলার 'কানুনে কুদরত' অপরিবর্তনশীল, ইহা স্থির নিশ্চিত । কুরআন শরীফ দ্বারা তা প্রমাণীত ।[৪৫]

উপর্যুক্ত বক্তব্য হতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি আধ্যাত্মিকতা ও অলৌকিক ক্ষমতাকে ইতিহাসের অনুসঙ্গী হিসেবে বিবেচনা করেছেন । অন্য কথায় ইতিহাস ও আধ্যাত্মিকতা বা অলৌকিকতার মধ্যে যে মূলত: কোন দ্বন্দ্ব নেই, তাঁর বক্তব্য হতে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে ।

(৮) এছলাম জগতের অভ্যুত্থান (প্রথম ভাগ): আলী আহমদ ওলী এছলামাবাদী কর্তৃক কলকাতা হতে প্রকাশিত এ গ্রন্থখানার প্রকাশ কাল অজ্ঞাত । বি. এ. আজাদ ইসলামাবাদী তাঁর 'চট্টগ্রাম স্মরণী' গ্রন্থে মাওলানা ইসলামাবাদীর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের প্রকাশ কাল উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এই গ্রন্থের সঠিক প্রকাশ কাল উল্লেখ করতে পারেননি । তাঁর বিবরণ হতে জানা যায়, 'এছলাম জগতের অভ্যুত্থান'এর প্রকাশ কাল ১৯২৪-১৯২৮ এর মধ্যে, সম্ভবত: ১৯২৪-২৬' ।[৪৬]

পারস্য ও রোমানদের দর্প চূর্ণ করার পর মুসলিম বীর সেনাপতিগণ দিকে দিকে ইসলামের বিজয় মশাল জ্বালাতে সক্ষম হয়েছিলেন । ইসলামের এ গৌরব সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল । কিন্তু ক্রমে তা খ্রীষ্টান শক্তির করতলগত হতে থাকে । যে স্পেন মুসলিমদের লীলাকেন্দ্র ছিল, যে ইতালী ও অষ্ট্রিয়া রাজ্যের

---

[৪৪] খাজা নেজামুদ্দীন আওলিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ২২৮ ।
[৪৫] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ২২৮ ।
[৪৬] বি. এ. আজাদ ইসলামাবাদী, চট্টগ্রাম স্মরণী, প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ জনপদ তুর্কীদের শাসনাধীন ছিল, যে রুশ সাম্রাজ্যের প্রধান অংশসমূহ এবং কৃষ্ণ সাগরের চতুষ্পার্শ্বের বন্দর ও জনপদ এবং আলবেনিয়া ও গ্রীক মুসলিম শাসন দন্ড শিরোধার্য করেছিল, আজ সেগুলি 'জাতীয়তার আকর্ষণে' স্বাধীনতা লাভ করেছে অথবা 'স্বাধীনতার রত্ন হারিয়ে পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে গেছে'। একইভাবে আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলি এবং লঙ্কাদ্বীপ, সিংগাপুর, মরিশাস, জাভা, বোর্নিজ, সুমাত্রা, ফিলিপাইন প্রভৃতি মুসলিম অধ্যুষিত ও মুসলিম শাসিত দেশসমূহ আজ খ্রীস্টান শক্তিসমূহের ভাগ-বাটোয়ারার সম্পত্তি বিশেষ। মুসলিমদের শেষ ভরসাস্থল তুরস্কও (কনষ্টান্টিনোপল ও দার্দ্দানেলিজ) 'পরক্ষমতাগত'। ফলে মুসলিমদের মধ্যে চারিদিকে একটা হতাশা এবং অবিশ্বাস দেখা দিতে শুরু করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষত বাংলার মুসলিমদের মধ্যে পুনর্জাগরণের আশার বারি সিঞ্চনে ও তাদেরকে কুফরের সীমা হতে ইসলামের গন্ডিতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যেই মাওলানা ইসলামাবাদী এ গ্রন্থখানা রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি প্রতিটি মুসলিম দেশের শাসকগণের, সাধারণ মানুষের ও নারীদের অবস্থা এবং বর্তমান সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য তাঁদের তীব্র সংকল্প ও তদনুযায়ী কর্মবৃত্তি অনুসরণের কথা অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাগুণে তা স্থানে স্থানে ঐতিহাসিক রোমান্স বিশেষ হয়ে উঠেছে। তথ্য আহরণ ও তথ্যকে চিত্তহারী করে পরিবেশনের যে আশ্চর্য ক্ষমতা ধারণ করতেন ইসলামাবাদী, এ গ্রন্থটি তার প্রমাণ। শেষের অধ্যায় ক'টিতে তৎকালীন ভারতবর্ষের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এটি সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও বিষদ বিবরণ বিশেষ।[৪৭]

মাওলানা ইসলামাবাদী 'তুরস্কের কথা' শিরোনামে তুর্কীজাতি ও কামাল পাশার পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন, তুর্কী জাতি নিজেদের উন্নতির যুগে অসাধারণ বীরত্ব ও রণকৌশলের পরিচয় দিয়েছিল। সত্যিই তাঁরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা-জাতি হিসেবে পরিচিত। কিন্তু এরূপ মরিয়া পুনঃজীবনী শক্তির পরিচয় তাঁরা পূর্বে কখনও দেয়নি। ঘরে বাইরে শত্রু, শত্রুর প্রবল বাহিনী, মিত্র শক্তিপুঞ্জ ও গ্রীসের নৌ-বাহিনী ও

---

৪৭ এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

রণতরীসমূহ ভূমধ্যসাগরে, ইজিয়ান সাগরে, স্মার্নায় ও দার্দ্দানেলিজের খাড়িতে মর্ম্মরা সাগরে ও বসফরাসে, অন্যদিকে বৃটিশ ও গ্রীস ক্রুজারসমূহ কৃষ্ণসাগরের বন্দরে বন্দরে, বৃটিশ সৈন্য বাকু ও ককোসাস এলাকার চতুর্দিক হতে বিজিত, বিধ্বস্ত ও শতধা বিচ্ছিন্ন, সামর্থহীন দুর্বল তুর্কীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিল। গ্রীসকে সমগ্র এশিয়া মাইনর ও তুর্কী জাতির মূল জন্মভূমি আনাতুলিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য লেলিয়ে দেয়া হল। গ্রীসের মহা সমরায়োজন ও বিরাট ষড়যন্ত্র দেখে প্রত্যেকের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তুর্কীদের ক্ষুদ্র শক্তি বিচূর্ণ হয়ে যাবে, যে কোন দিন গ্রীসের শেষ বিজয় সংবাদ পৃথিবীময় ঘোষিত হবে। এরূপ চরম সংকটকালে আল্লাহ্ তাআলার করুণা-সিন্ধু উথলে উঠল, ইসলাম জগতের কোটি কোটি নর-নারীর বছর ব্যাপি প্রার্থনা ও আহাজারী তাঁর দরবারে স্থান পেল, আল্লাহ্ তাআলা ইসলামের সম্মান বজায় রাখলেন। তুর্কীরা সৈন্য সংখ্যায় কম এবং অস্ত্র-শস্ত্রে হীন হলেও মোস্তফা কামাল পাশার নেতৃত্বে তাঁরা এরূপ অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্য ও রণ-কৌশল এবং ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলো যে, দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই গ্রীসের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন ফুঁৎকারে উড়ে গেল। তাদের ৫০/৬০ খানা আকশ-যান ভূমিসাৎ ও তুর্কীদের হস্তগত হল। লক্ষাধিক সৈন্য হতাহত ও বন্দী হল। প্রধান সেনাপতি বন্দী হলেন। ছোট বড় চারি হাযার কামান তুর্কীরা লুটে নিল।[৪৮]

মাওলানা ইসলামাবাদী গ্রীসের মোকাবেলায় তুর্কীদের বিজয়ের যে ঐতিহাসিক বর্ণনা প্রদান করেন, তা সম্ভব হয়েছিল মোস্তফা কামাল পাশার যোগ্য নেতৃত্ব এবং তুর্কীদের স্বদেশ প্রেম ও জাতীয় গৌরব এবং ইসলাম রক্ষার দৃঢ় আত্ম প্রত্যয়ের কারণে। উপরের বক্তব্য হতে তা প্রতীয়মান হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, মোস্তফা কামাল পাশা ও তাঁর সহকারীবর্গের দৃঢ়তা, সাহস, ধৈর্য্য এবং মনের বল দেখে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হল। তুর্কীরা এমনই নির্ভীক ও বেপরোয়াভাবে মিত্র

---

[৪৮] এছলাম জগতের অভ্যুত্থান (প্রথম ভাগ), মৌলানা এছলামাবাদী রচনাবলী,১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৫-৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিকে উত্তর দিতে ছিলেন যে, তা দেখে মনে হচ্ছিল এ সব কি স্বপ্নের কাহিনী, না জগতের বাস্তব ঘটনা![৪৯]

'তুর্কী নারী জাতির কৃতিত্ব' প্রসঙ্গে তিনি যে চিত্তাকর্ষক বিবরণ প্রদান করেন তা এরকম– তুর্কী জাতির অভ্যুত্থান যুগের ইতিহাসে তুর্কী নারী জাতির জাগরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উক্ত নারী সমাজ চিরকালই বীরাঙ্গনা। আমির তৈমুর ও সুলতান বায়েজীদের মধ্যে যখন ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং বায়েজীদ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বন্দী হন তখন 'আমাতুল হাবিব' নামক পুরুষ বেশধারী এক নবীনা নারী সেনা নায়িকারূপে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন এবং সেই যুদ্ধে অশ্ব-ধাবনে ও অস্ত্র-সঞ্চালনে তিনি এরূপ অসাধারণ বীরত্ব ও রণ-কৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন যে, তদ্দর্শনে তৈমুর বাহিনী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এ নারী সদলে বন্দী হওয়ার পর যখন প্রাণদন্ডের আদেশ প্রাপ্ত হলেন তখন স্বীয় পুরুষ বেশ ত্যাগ করে নিজে স্বাভাবিক রূপ ধারণপূর্বক আমির তৈমুরের সম্মুখে এমনই তেজবীর্য্যপূর্ণ জ্বালাময়ী বক্তৃতা করলেন যে, তা শুনে তৈমুরের মত দুর্দ্ধর্ষ নিষ্ঠুর ও ক্ষমতা গর্বিত বিজয়ী আমিরও স্ত ম্ভিত হতে ও দমে যেতে বাধ্য হলেন। তাঁর নির্ভীক ও বীরত্ব ব্যঞ্জক বক্তৃতা এবং রণক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন হেতু তুর্কী পক্ষের সমুদয় ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল। এই বীরাঙ্গনার অন্য নাম হামিদা বেগম। এতদ্ব্যতীত তুরস্কের নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রণালী ও পার্লামেন্ট স্থাপনের ব্যাপারে নারীরা যে অসাধারণ কর্মশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা তুর্কীদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে উজ্জ্বল ঘটনারূপে বিদ্যমান থাকবে। বলকান যুদ্ধের সময় তুর্কী নারীরা কেবল যে অর্থ ও অলংকার দানে জাতীয় সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছিলেন তা নয়, বরং তাঁরা পুরুষদের যুদ্ধে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে এবং অপমানজনক সন্ধি স্থাপনে ঘোর বাধা দিতেও কুণ্ঠিত হননি।[৫০] মাওলানা ইসলামাবাদীর এ বিবরণ তাঁর ঐতিহ্য চেতনা ও ইতিহাস সচেতনতার প্রমাণ বহন

---

[৪৯] এছলাম জগতের অভ্যুত্থান (প্রথম ভাগ), পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ২৬৭।
[৫০] এছলাম জগতের অভ্যুত্থান (প্রথম ভাগ), পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ২৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

করে এবং আমরা আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি।

এরপর মাওলানা ইসলামাবাদী পারস্যের স্বাধীনতা, তুর্কীস্থানের স্বাধীনতা, আন্ওয়ার পাশা, মিশরের জাগরণ, আরব জাতির দেশাত্মবোধ, আফগানিস্থানের জাগরণ, মুসলিম ভারতে নব-জাগরণ ইত্যাদিসহ অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে যে মনোমুগ্ধকর আলোচনা করেন, এগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

(৯) ভূ-গোল শাস্ত্রে মুসলমানঃ ১৯১২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ইহা প্রথমে 'মিহির ও সুধাকরে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। মাওলানা ইসলামাবাদী এ গ্রন্থের 'সূচনা' অংশে গ্রন্থখানা রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন যে, ভূগোল শাস্ত্রে পূর্ববর্তী মুসলিমগণ কোনরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন কিনা এবং তাঁরা সভ্যতার এ চরম উন্নতির ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হয়েছেন, তার পরিচয় প্রদান করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। অধুনা নব্য শিক্ষিত যুবকদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভূগোল শাস্ত্র ও ভূবিদ্যা প্রভৃতি জনহিতকর বিষয়সমূহ ইউরোপীয় পন্ডিতমন্ডলীরই মস্তিষ্ক প্রসূত এবং তাঁদের দ্বারাই উদ্ভাবিত ও প্রচারিত। মুসলিম শাসনামলে এসব বিষয়ের কোন চর্চাই ছিলনা। পূর্ববর্তী মুসলিম পন্ডিতগণ এসব বিষয়ের কোন ধার ধারতেন না। ধর্ম পুস্তক রচনা ও ধর্মালোচনা ব্যতীত তাঁরা সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করেননি। বর্তমান মৌলবী-মৌলানাগণের অসম্পূর্ণ সর্বনাশকারী শিক্ষা প্রণালী দর্শনে তাদের অন্তরে এ ভ্রমবিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হয়ে আছে। বর্তমান মৌলবীসমাজ ভূগোল শাস্ত্রের নাম পর্যন্ত অবগত আছেন কিনা সন্দেহ এবং তাঁদের পূর্বপুরুষগণ যে কত অমূল্য রত্নরাজি সংগ্রহ করে গেছেন, ভূগোল ও ইতিহাস ক্ষেত্রে তাঁরা যে কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, সে সব তত্ত্বানুসন্ধান করার ক্ষমতাও বর্তমান মৌলবী সম্প্রদায়ের নেই বললে অত্যুক্তি হয়না। তাই বর্তমান মুসলিম সমাজ নিজেদের হীনাবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে মনে এ অন্ধ বিশ্বাসকে স্থান দিয়েছেন যে, তাদের ন্যায় তাদের পূর্বপুরুষগণও ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

ও সভ্যতার উপকরণ লাভে উদাসীন ও বঞ্চিত ছিলেন। নব্য শিক্ষিত যুবকদের পক্ষেও ঐ সব প্রাচীন তত্ত্বাবগত হওয়ার বিশেষ কোন সুযোগ নেই। তাই তিনি বর্তমান শিক্ষিত সমাজের অন্ধ বিশ্বাস ও ভ্রম প্রমাদ অপনোদনের উদ্দেশ্যে মুসলিমদের পূর্ব গৌরব ক্রমশঃ প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যামিতি, পরিমিতি, গণিত, চিত্র বিদ্যা, ভাস্কর বিদ্যা, খগোল তত্ত্ব, ভূবিদ্যা, খনিজতত্ত্ব, শিল্প-বাণিজ্য, আবিষ্কার-উদ্ভাবন, যন্ত্র বিজ্ঞান, স্থাপত্যবিদ্যা, বনস্পতিবিদ্যা ইত্যাদি প্রত্যেক বিভাগে তাঁরা কি কি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, সে সব সমাজ সকাশে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছেন। সাথে সাথে বর্তমান ইউরোপীয় পন্ডিতমন্ডলী যে মুসলিমদের পূর্ব পুরুষদের উপার্জিত ও সঞ্চিত শিক্ষা ভান্ডারকে হস্তগত করেই আজ এত গৌরবান্বিত তা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর বিবরণ হতে জানা যায় যে, এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে মুসলমানদের ভৌগোলিক অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য।[৫১]

মুসলিমদের ভৌগোলিক অভিজ্ঞতার পরিচয় সম্বলিত এ গ্রন্থটিতে তিনি উপক্রমনিকা (সূচনা) এবং ভূমিকা (আরবগণের প্রাচীন ভৌগোলিক অবস্থা) ছাড়াও কয়েকজন প্রখ্যাত মুসলিম ভূগোলবিদ্ (হিজরী চতুর্থ শতকের ইমাম মাসউদী, ইমাম ফররাজী, ইমাম আবু ইসহাক, ইবনে হায়কল, শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ্, আবু রায়হান ইবনে আলবেরুণী, ইবনে খোরদাদবিহ্, আল-ইদ্রিসী), ভূগোল অভিধানকার ইয়াকুতি হোমবী, আরব ভ্রমণকারী বা পর্যটক আবু হাসান নূরদ্দীন আলী ইবনে মুসা, ইবনে বতুতা, ইবনে জোবের, সোলেমান প্রমুখের বিস্তারিত পরিচয় প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে ছৈয়দ মোস্তফা জামাল বলেন যে, এক কালে মুসলিমগণ ভূগোল শাস্ত্রে কিরূপ উন্নতির পরিচয় দিয়েছেন এবং ভৌগোলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে কি কি বিষয় তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, সব চিত্তাকর্ষক ঐতিহাসিক বিবরণ এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[৫২] কাজেই গ্রন্থখানার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট।

---

৫১ 'ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান', মৌলানা এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১১৮।

৫২ ছৈয়দ মোস্তফা জামাল, 'মওলানা ইসলামাবাদী', দৈনিক আজাদ, ঢাকা, রবিবার ৭ই কার্ত্তিক, ১৩৭২।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ইসলামাবাদী ইতিহাসকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং ইতিহাসের সাথে ভূগোলের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। ইতিহাস ও ভূগোল যে একে অন্যের পরিপূরক এবং একটি ছাড়া যে অপরটি অসম্পূর্ণ, তা তাঁর আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয়। তিনি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, জগতের যাবতীয় অতীত কাহিনী, পৃথিবীর বিবিধ জাতির উত্থান-পতনের কারণ, জগতের রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতির সবিশেষ বিবরণ অবগত হওয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ইতিহাস শাস্ত্রের ওপর । যে শাস্ত্র চর্চা মানবজাতির ভবিষ্যৎ জ্ঞানলাভ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রধান সহায়, সেই ইতিহাসের সাথে ভূগোল শাস্ত্রের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিজড়িত। ভূগোল ইতিহাসের প্রথম ভাগ বা উপক্রমণিকাস্বরূপ। ভূগোল বিদ্যার অভাবে ইতিহাস পাঠে কোন ফল লাভ করা যায়না। ভূ-প্রদক্ষিণ, দেশ পরিভ্রমণ, প্রবাস যাত্রা ও ব্যবসায়-বাণিজ্য, রেল বিস্তার এবং সমুদ্র পথে বাষ্পযান পরিচালনা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই ভূগোল শাস্ত্রের সাহায্য সাপেক্ষ। এর অভাবে সমস্তই নিষ্ফল ও বিশৃঙ্খল।[৫৩]

গ্রন্থের উপসংহারে মাওলানা ইসলামাবাদীর বক্তব্যে পূর্ব পুরুষগণের ঐতিহ্য স্মরণ ও তার চর্চায় কুসংস্কারের পথ বিসর্জনের আহবান স্পষ্ট। সর্বশেষে তিনি বলেন: "যে পর্য্যন্ত আমরা জাতীয় ইতিহাস সমালোচনা না করিব, যে পর্য্যন্ত ভূগোল, বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষি প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজনীয় ও উন্নতি বিধায়ক বিদ্যাসমূহ উপার্জ্জন করতে যত্ন না লইব, তাবৎ আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ও উন্নতির আশা সুদূর পরাহত।"[৫৪]

(১০) খগোল শাস্ত্রে মুসলমান: ১৯১২ সালে বা তৎপূর্বে প্রকাশিত এ গ্রন্থখানা প্রথমে সাময়িকপত্র 'বাসনা'র প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ একত্রে, ১৩১৫) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।[৫৫]

---

৫৩ 'ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান', প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১১৭।
৫৪ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৩১।
৫৫ মৌলানা এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৪২৫।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ইসলামাবাদী প্রায় ১২টি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত করে বিশেষত আব্বাসী যুগে এবং ভারতের মুঘল যুগে পৃথিবীসহ আকাশ মার্গে অবস্থিত জ্যোতিষ্কমন্ডলীর অবস্থান, পরিধি, গতিবিধি, কক্ষপথ, কক্ষপথে আবর্তন রহস্য এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক-খগৌলিক তত্ত্বসমূহের ও আবিস্কৃত যন্ত্রাদির এবং ২৩টি মানমন্দিরের ইতিহাস উল্লেখসহ এসব যন্ত্রাগারে কৃত অনুসন্ধান-কীর্তিসমূহের যে বিপুল তথ্যগত বিবরণ মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ রেখে গেছেন, সেগুলোর একটি চমৎকার অথচ বিশেষজ্ঞ-জনোচিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত বহু দুস্প্রাপ্য ও আরবি ভাষায় লিখিত নক্ষত্রমন্ডলীয় তথ্যজ্ঞাপক প্রামাণ্য গন্থাদি ব্যবহার করে এবং সেই সাথে জীবনী ও ইতিহাসের সূত্র উল্লেখ করেও তিনি তাঁর বক্তব্যকে প্রামাণ্য করার চেষ্টা করেছেন। এ জন্য সৈয়দ মুর্তাজা আলী এ গ্রন্থটিকে একটি 'Painstaking Original research' বলে বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:

> "His (Islamabadi's) books like Khogol Shastre Musalman (Muslim Contribution to Astronomy), Bharate Muslim Sabhyata (Muslim Civilization in India) show painstaking original research".[৫৬]

ছৈয়দ মোস্তফা জামাল গ্রন্থটির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেন যে, মুসলিমদের স্বর্ণ যুগে মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রে কিরূপ উন্নতি লাভ করেছিলেন, গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রমালার গতিবিধি নির্ণয় এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি নির্মাণে তাঁরা কিরূপ বুদ্ধি-প্রাখর্য গবেষণার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই অভিনব ও চিত্তাকর্ষক তত্ত্ব এতে স্থান পেয়েছে।[৫৭]

মাওলানা ইসলামাবাদী বহু পরিভাষা নিজে সৃষ্টি করেছেন এবং আরবি নামসমূহের যথাযথ পরিচিতি প্রদান করেছেন; যথা– জোহরা (শুক্রগ্রহ), গুতারদ

---

৫৬ সৈয়দ মুর্তাজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৬২।

৫৭ ছৈয়দ মোস্তফা জামাল, 'মওলানা ইসলামাবাদী', দৈনিক আজাদ, ঢাকা, রবিবার ৭ই কার্ত্তিক, ১৩৭২।

Dhaka University Institutional Repository

(বুধ), মোশ্‌তরী (বৃহস্পতি), বতলেমুস (টলেমী/ ptolemy) প্রভৃতি। তিনি বিষয়টিকে এভাবে প্রাঞ্জল ও সর্বজনবোধ্য করেছেন। ভাষাও এখানে সাবলীল ও বিষয়ানুগ। তাই বলা যায়, কোন বিষয়কে সূক্ষ্মভাবে দেখা ও যথাযথ উপস্থাপনার ক্ষমতা মাওলানা ইসলামাবাদীর বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাবলীতেও সমভাবেই উপস্থিত। আর এখানেই তাঁর সার্থকতা।

দিন-রাত সমান হওয়ার তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনাতে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, এটি আধুনিক বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বে মুসলিম পন্ডিতগণই আবিষ্কার করেছেন। ফলে এটি নিঃসন্দেহে মুসলিমদেরই অবদান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, পৃথিবী স্বীয় বৃত্ত কক্ষের উপর বার্ষিক গতিকালীন একটা নির্দিষ্ট সময় তার মেরুদন্ড ও কক্ষে সমকোন উৎপন্ন করে এবং যে সময় সূর্যকিরণ ঠিক লম্বভাবে বিষুব রেখার উপর পতিত হয়, সে সময় যে পৃথিবীতে দিবা-রাত্রি সমান হয় তাও মুসলিমগণ আবিষ্কার করেছিলেন। আধুনিক পন্ডিতমন্ডলী যে ২৩শে সেপ্টেম্বর ও ২১শে মার্চ তারিখে দিবা-রাত্রি সমান হওয়ার বিষয় আবিষ্কার করেছেন তা বহু পূর্বেই খগোল শাস্ত্রবিদ্ আরব পন্ডিতগণ আবিষ্কার করেছেন। আরবীতে একে 'নোক্‌তায় মাদলন্নেহার' অর্থাৎ 'দিবা-রাত্রি সমান হওয়ার কক্ষবিন্দু' নামে অভিহিত করা হয়। তদ্দারা তাঁরা বৎসরের দিনের সংখ্যাও সুন্দরভাবে নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আরব পন্ডিতগণ ভূগোল শাস্ত্রের দ্রাঘিমা রেখার ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ নির্ণয়তত্ত্বও উদ্ভাবন করেছিলেন। আধুনিক পন্ডিতমন্ডলীর মধ্যে তা সহস্র বছর পর স্থিরীকৃত হয়েছে।[৫৮]

'মুসলিম প্রতিষ্ঠিত 'মানমন্দির' শীর্ষক আলোচনায় যে ২৩টি মানমন্দিরের চিত্তাকর্ষক ও প্রামাণ্য ইতিহাস তিনি আলোচনা করেছেন, তা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রতি তাঁর আগ্রহেরই বহিঃপ্রকাশ। এ প্রসঙ্গে 'আবু আলী সিনার মানমন্দির'-এর আলোচনায় তিনি উল্লেখ করেন যে, আবু আলী সিনা (ইবনে সিনা)

---

৫৮ 'খগোল শাস্ত্রে মুসলমান', এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিমগণের মধ্যে একজন অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক পন্ডিত হিসেবে খ্যাত। তিনি যেমন ভূগোল, খগোল ও রসায়ন শাস্ত্রে পান্ডিত্য প্রদর্শন করেছেন, চিকিৎসা শাস্ত্রে তদপেক্ষাও খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি বাদশাহ্ আলাউদ্দৌলাহ্ কাকুয়ার প্রধানমন্ত্রী পদে অবস্থান কালে এ মানমন্দির স্থাপন করেন। তিনি ৮ বছর ব্যাপী এ মন্দিরে গ্রহাদির পরীক্ষা কার্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্তের বহু বিষয়কে ভুল প্রতিপন্ন করেন। সূর্যমন্ডল, ওতারদ (বুধ) ও জোহরা (শুক্র) গ্রহের অবস্থান ও গতি সম্বন্ধে যে মতভেদ ছিল তা তিনি দূরীভূত করেন। বিজ্ঞান জগতে তিনি সর্বাগ্রে এ তত্ত্বোদ্ঘাটিত করেন যে, সূর্যমন্ডলের সম্মুখে শুক্র ও বুধ গ্রহ দুইটি কৃষ্ণবর্ণ তিলবিন্দু সদৃশ পরিদৃষ্ট হয়। এই আবিষ্কার দ্বারা তিনি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। যথা– (ক) জোহরা (শুক্র) ও ওতারদ (বুধ) গ্রহ সূর্যের নিম্নভাগে অবস্থিত। (খ) শুক্র ও বুধ গ্রহ স্বয়ং জ্যোতির্ময় নয়, কারণ তাদের নিজস্ব জ্যোতি থাকলে তাদেরকে এক এক সময় অন্ধকারময় দেখা যেত না। (গ) চন্দ্রের ন্যায় শুক্র ও বুধ গ্রহের জ্যোতিহ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে।[৫৯]

খগোল তত্ত্ব বিষয়ক মুসলিমগণের আবিস্কৃত যন্ত্রাদির বিবরণ প্রদানের পর তিনি গ্রন্থমধ্যে এগুলোর চিত্র সংযোজন করতে পারেননি বিধায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন।[৬০] এটি নিঃসন্দেহে তাঁর ঐতিহ্য চেতনা ও ইতিহাস সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ। অতঃপর তিনি খগোল শাস্ত্রে মুসলিমগণের আবিষ্কার ও সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করে এ বিষয়ে মুসলিমদের পারদর্শিতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পন্ডিতমন্ডলীর সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, যা তাঁকে একজন উচুঁমানের ঐতিহাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

(১১) সমাজ সংস্কার: ইজাব উদ্দীন আহমদের বিবরণ হতে জানা যায় যে, গ্রন্থখানা কলকাতা হতে 'মিশন পুস্তক' রূপে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ কর্তৃক ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৩২৫ সালের ২৩শে ও ২৪শে চৈত্র চট্রগ্রাম জেলার

---

[৫৯] 'খগোল শাস্ত্রে মুসলমান', পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৩৭-৩৮।
[৬০] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

পটিয়া থানায় এবং ৩০শে চৈত্র ও ১লা বৈশাখ (১৩২৬) সাতকানিয়া থানায় আঞ্জুমানে ওলামার থানা কনফারেন্সের অধিবেশনে গৃহীত সমাজ সংস্কারমূলক প্রস্তাবাবলী এ পুস্তকে স্থান পেয়েছে।[৬১] আল্ এসলাম পত্রিকায় গ্রন্থখানা ১৩২৫-১৩২৬ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এতে তাঁর হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের মনোভাবটি আন্তরিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেন: "ভারতের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিয়া জাতীয় সৎসাহিত্য ও মাতৃভাষার সাহায্যে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃভাব বর্ধনের চেষ্টা করাই দেশবাসী ও সাহিত্য সেবকগনের প্রধান কর্তব্য।"[৬২]

গ্রন্থখানা সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ইতিহাসের অনেক তথ্য-উপাত্ত ও মাল-মসলা এতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। গ্রন্থখানার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ড. কাজী দীন মুহম্মদ বলেন, 'সমাজ সংস্কার' তাঁর রচিত একক বই। এ গ্রন্থে সমাজের দুর্নীতি, অশিক্ষা, কুসংস্কার, আচার-অনুষ্ঠানে অমিতব্যয়িতা ও বাহুল্য সম্পর্কে মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়ে তিনি সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, যে পর্যন্ত মানুষ নিজেকে না চিনবে, যে পর্যন্ত নিজের উন্নতি নিজে না করবে, সে পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত ও সমাজগত উন্নতির আশা করা যায়না। ধর্ম মানুষের দেহ ও আত্মার বল সঞ্চার করে, ধর্মহীনতা মনুষ্যত্ববোধের পরিপন্থী। কিন্তু ধর্মের নামে কুসংস্কার, সামাাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে জীবনকে বিচ্যুত করে মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে দেয়। এ মহান সমাজকর্মী আমাদের সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে যে অমর অবদান ও আদর্শের প্রভাব রেখে গেছেন তার নজির বিরল।[৬৩]

---

৬১ ছৈয়দ মোস্তফা জামাল (সম্পাদিত), ১৬-তম স্মৃতি বার্ষিকী, ইসলামাবাদী স্মৃতি সমিতি, ১৯৬৬।

৬২ মাওলানা এসলামাবাদী, সমাজ সংস্কার, এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৯৫।

৬৩ ড. কাজী দীন মুহম্মদ, 'সামাজিক বিবর্ত্তনে মাওলানা মনিরুজ্জামান', দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ১৭ জানুয়ারী, ১৯৭১ এবং 'মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীঃ ইসলামী রেনেসাঁর অন্যতম পথিকৃৎ', দৈনিক ইন্‌কিলাব, ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯৯, পৃ ঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

(১২) মোসলেম বীরাঙ্গনা: সম্ভবত: ১৯১৫ সালে প্রকাশিত এ গ্রন্থখানা আল্ এসলাম, ১৩২২ ও পরে অন্যান্য পত্রিকায়ও পুনর্মুদ্রিত হয়।[৬৪] ড. কাজী দীন মুহম্মদের বিবরণ হতে জানা যায় যে, 'মোসলেম বীরাঙ্গনা' গ্রন্থখানিতে মুসলিম শাসকদের মধ্যে মহিলাদের অবদান, তাঁদের ঐতিহ্য ও সাহসিকতার অকপট ইতিহাস উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে। এমনকি ধর্ম চর্চায় মুসলিম মহিলারা কতখানি অগ্রসর ছিলেন তার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায় এ গ্রন্থখানিতে। ধর্মরাজ্য সাধক মহাপুরুষদের সাথে সাথে মহিলাদের জীবনী ও সাধনার বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আদর্শ জীবনধারার পরিচয় তুলে ধরেছেন মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী তাঁর স্বভাবসুলভ ভাষায়। ফলে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বেড়ে যায়।[৬৫]

(১৩) এসলামের শিক্ষা (প্রথম ভাগ): ছুফী আহমদ আজাদ এসলামাবাদী কর্তৃক চট্টগ্রাম হতে ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত এ গ্রন্থখানা মূলত: ধর্ম ও ইতিহাস বিষয়ক আলোচনায় সমৃদ্ধ। এ গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশে মাওলানা ইসলামাবাদী উল্লেখ করেন যে, এ গ্রন্থ পাঠে মুসলিম পাঠকগণ বুঝতে পারবেন, বিভিন্ন ধর্ম-গোত্র ও সম্প্রদায়-বহুল দেশে সংসার যাত্রা নির্বাহ ক্ষেত্রে কিরূপ বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়; হযরত নবী করিম (দঃ) স্বীয় কর্মজীবনে ঐরূপ অবস্থায় কি প্রণালীতে কাল যাপন করেছেন এবং কি উপায়ে ভিন্ন ধর্মের লক্ষ লক্ষ লোক ইসলামের সুশীতল শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়েছেন।[৬৬]

তিনি প্রসঙ্গত: রসূলে করীমের (সা:) জীবনের নানা ঘটনা ও বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁর প্রদত্ত সন্ধি-শর্তসমূহ বিশ্লেষণ করে তাঁর জীবনের আদর্শ আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। ফলে গ্রন্থখানার ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রতিভাত হয়ে উঠে। এ গ্রন্থের অপর বৈশিষ্ট্যটি সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। মাওলানা ইসলামাবাদীর

---

৬৪ এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১০৪।

৬৫ ড. কাজী দীন মুহম্মদ, 'মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীঃ ইসলামী রেনেসাঁর অন্যতম পথিকৃৎ', দৈনিক ইন্‌কিলাব, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৯।

৬৬ মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এস্‌লামাবাদী, 'এস্‌লামের শিক্ষা', এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা মোতাবেক, অমুসলিমগণ এ পুস্তিকা পাঠে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন যে, ইসলামের শিক্ষা কত উন্নত! এর নীতি কত উদার!! ধর্মজগতে ও মানুষের কর্মজীবনে এর তুলনা কোথায়? ইসলামের বাস্তব সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পরিচয় পেলে তাদের হিংসাজনিত মনোবৃত্তির উপশম ঘটবে। তাতে সাম্প্রদায়িক কলহ-বিবাদ অনেকাংশে প্রদমিত হবে। প্রতিবেশী মুসলিমদের সাথে তাদের মৈত্রী-বন্ধন ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠবে।[৬৭]

তিনি উল্লেখ করেন, এই উপমহাদেশে মুসলিম ও হিন্দুগণ দীর্ঘকাল প্রতিবেশী হিসাবে বাস করে আস্ছে। এতে পরস্পরের মধ্যে হিংসা-দ্বেষ ও সংঘর্ষ দেখা দিলেও আন্তঃসমাজের কলহও কম উপস্থিত ছিল না। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম ও অমুসলিম সংঘর্ষে উভয় সম্প্রদায়ের যে পরিমাণ প্রাণহানী ও সম্পত্তি নাশ ঘটছে, অতীত ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়না।[৬৮] তিনি আফসোস করে বলেন, এতে উভয় সম্প্রদায়ের যে ক্ষতি হচ্ছে- তা কি কখনও পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে?[৬৯]

মাওলানা ইসলামাবাদী সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে এর ব্যাখ্যা উপস্থিত করে পরস্পরের প্রতি সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণের আহবান জানান। বিশেষতঃ মুসলিমদের তিনি ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণের নির্দেশ দেন। তাঁর 'সমাজ সংস্কার' গ্রন্থে এ বিষয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।[৭০] হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সম্প্রীতি কামনাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। মুসলিমদের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তার ও তাদের উন্নতিকল্পে ইসলামের নীতিসমূহ ও তার মানবিক প্রসঙ্গগুলির কথা সবিস্তারে প্রচার করাই তাঁর কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

---

৬৭ 'এস্লামের শিক্ষা',পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩৯৩।

৬৮ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩৯৪।

৬৯ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩৯৪।

৭০ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ 'আঞ্জুমান ওলামা ও সমাজ সংস্কার', আল্-এস্লাম, ৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২৬/১৯১৯ সাল, পৃ ঃ ১৫৭-৫৮, ১৫৯-৬১; মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্রে ধর্ম ও সমাজ-চিন্তাঃ ১৯০১-১৯৪৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ ঃ ১৬৭-৭০।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থখানার সিংহ ভাগ জুড়েই ইতিহাস বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে; যথা– হযরত মুহাম্মদের (দঃ) জীবনের আদর্শ, মদীনার প্রথম সন্ধি পত্র, হুদায়বিয়ার সন্ধি, হযরতের (দঃ) দয়া ও উদারতা, ওহুদের যুদ্ধ, মক্কা বিজয়ের ঘটনা ইত্যাদি। 'হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনের আদর্শ' 'শিরোনামে তিনি বলেন যে, দুনিয়াতে বিভিন্ন লোক, বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়বহুল দেশে আমাদের কিভাবে বসবাস করতে হবে এবং পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করতে হবে; আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবন কি প্রণালীতে নির্বাহ করতে হবে, তা জানার ও বুঝার জন্য সর্বশেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) জীবনের আদর্শই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।[৭১] অতঃপর তিনি সিরাতে ইবনে হিশামের বরাতে মদীনা সনদের ১২টি শর্ত ও এর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন, যার ঐতিহাসিক মূল্য ও গুরুত্ব ইসলামের ইতিহাসে অনেক বেশী।

হুদায়বিয়ার সন্ধির গুরুত্ব আলোচনা করতে যেয়ে তিনি মন্তব্য করেন যে, মুসলিম ও অমুসলিম পাঠকবর্গ এ সন্ধিপত্রের শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন হযরত নবী করিম (দঃ) অমুসলিমদের প্রতি কতটা উদারতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। বলা বাহুল্য যে, ঐ সময় প্রায় দেড় হাযার মুসলিম হুদায়বিয়া নামক স্থানে উপস্থিত ছিলেন। ইতোপূর্বে 'বদর', 'খন্দক' প্রভৃতি যুদ্ধে মুসলিমগণ জয়লাভ করে মদীনার রাজ শক্তিকে তাঁরা যথেষ্টরূপে পুষ্ট ও প্রবল করে তুলেছিলেন। সুতরাং ঐ সময় কুরাইশদের সাথে হীনতা স্বীকারপূর্বক সন্ধি স্থাপনের কোনই প্রয়োজন ছিলনা। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) শুধু শান্তির উদ্দেশ্যে, উদারতার বশীভূত হয়ে এবং ইসলামের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার স্বাভাবিক গুরুত্বের পরিচয় দেয়ার লক্ষ্যে এরূপ সন্ধি স্থাপন করেছিলেন।[৭২]

'ওহুদের যুদ্ধ' আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এ যুদ্ধে কোরেশ পক্ষে ৫০০০ (পাঁচ সহস্র) সৈন্য উপস্থিত ছিল। তন্মধ্যে ৩০০০ ছিল উষ্ট্রবাহী, ২০০

---

[৭১] 'এস্লামের শিক্ষা', প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৪০০।

[৭২] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪০৫।

Dhaka University Institutional Repository

অশ্বারোহী ও ৭০০ বর্মাবৃত পদাতিক। হযরতের (দঃ) পক্ষে মুসলিম যোদ্ধা ছিলেন সর্বসমেত ১০০।[৭৩] তাঁর দেয়া এ তথ্য সঠিক নয়। কারণ কোরেশপক্ষে সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাযার, পাঁচ হাজার নয় এবং মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল এক হাযার (পরবর্তীতে ৭০০), ১০০ নয়। সম্ভবতঃ মুদ্রণজনিত কারণেও এক হাযারের পরিবর্তে একটি শূন্য বাদ পড়ে ১০০ হয়ে যেতে পারে।

মক্কা বিজয় সুসম্পন্ন করার পর প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে 'ঘোষণা পত্র' প্রচার করেন, তার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

> "পাঠক এই ঘোষণা পত্রের ভাষা ও বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করবেন। 'হে মক্কা বাসী! তোমরা যাও, স্বাধীনভাবে বিচরণ কর, তোমরা আজ মুক্ত। তোমরা নিজেদের পূর্ব্বদোষের জন্য অভিযুক্ত হইবেনা'– বর্ত্তমান সভ্যজগতের কোন দেশ বিজয়ী সম্রাট বা সেনাপতির পক্ষে এইরূপ উদারতাপূর্ণ ক্ষমাশীল ঘোষণা পত্র প্রচার করা, কেহ কি কল্পনাতেও আনিতে পারেন? জার্ম্মান ও জার্ম্মানীর মিত্র রাজ্য বিজয়ী, রুশ, ইংল্যান্ড, ফরাসী প্রভৃতি মিত্র পক্ষীয় সেনাপতিগণ বিজিত রাজ্যসমূহের অধিবাসী ও তত্রত্য মন্ত্রী এবং সমর বিশারদগণের প্রতি কিরূপ কঠোর ও অমানুষিক দন্ড ব্যবস্থা প্রয়োগ করিয়াছিলেন?"[৭৪]

এভাবে তিনি ইতিহাসের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিক জনসমক্ষে তুলে ধরেন।

(১৪) আত্মজীবনঃ মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচিত 'আত্মজীবন' শীর্ষক পান্ডুলিপিখানা বহু বছর যাবৎ বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খানের নিকট অপ্রকাশিত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। সম্প্রতি (ফেব্রুয়ারী-২০০৪) তা শামসুজ্জামান খানের সম্পাদনায় পাঠক সমাবেশ, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে ১৮৭৫-এ তাঁর জন্ম থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তাঁর জীবনের ঘটনা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এর পর অবশ্য তিনি আরো পনের বছর বেঁচে ছিলেন কিন্তু তবু কেন এ 'আত্মজীবন' গ্রন্থটি

---

[৭৩] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪০৭-০৮।
[৭৪] পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪১১।

Dhaka University Institutional Repository

শেষ করেননি বা প্রকাশ করেননি, তা বলা দুষ্কর। তবে একটি পূর্ণ আত্মজীবনী লেখার পরিকল্পনা সম্ভবতঃ তাঁর ছিল বলে মনে হয়। আর সেজন্যই বর্তমান গ্রন্থের পান্ডুলিপির শুরুতে তিনি 'প্রথম ভাগ' কথাটি ব্যবহার করেছেন। এ প্রথম ভাগে তিনি প্রধানতঃ তাঁর বাল্যকাল, পরিবার, শিক্ষাজীবন, বাংলা লেখার চর্চা, মাদ্রাসায় শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা এবং শিক্ষা সমিতি ও ইসলাম মিশন কার্যক্রমের আকর্ষণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা দিয়েছেন। তবে আমরা তাঁর ১৯৩৫-পরবর্তী রাজনৈতিক জীবন, বিশেষ করে বঙ্গীয় বিধান সভায় সদস্য হিসাবে তাঁর ভূমিকা এবং ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেস, কৃষক-প্রজা পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতা হিসাবে তাঁর কর্মকান্ড ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে নিজ জবানীতে তাঁর কাছ থেকে বিস্তৃত ও পর্যায়ক্রমিকভাবে কিছু জানতে পারি না। তাছাড়া ১৯৪৬ সালের নির্বাচন এবং পাকিস্তান আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মতামতও এ বইয়ে নেই। এ গ্রন্থের 'দ্বিতীয় ভাগ' লিখিত হলে (লিখিত হয়েছে কি-না জানা নেই, হয়ে থাকলেও কারো কাছে পৌঁছেনি) হয়তো বা এসব বিষয় তাতে অন্তর্ভূক্ত হতো।

মাওলানা ইসলামাবাদীর 'আত্মজীবন' গ্রন্থখানা সুলিখিত, চিন্তা উদ্দীপক ও আকর্ষণীয়। লেখকের রসবোধ নিঃসন্দেহে তাঁর এ রচনাকে মনোজ্ঞ করেছে। তাই গ্রন্থখানা সাহিত্যিক মানোত্তীর্ণ হয়েছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও অনস্বীকার্য। কারণ আত্মজীবনী মূলতঃ ইতিহাসেরই অনুসঙ্গী হিসেবে বিবেচিত। তাছাড়া তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল হচ্ছে এ আত্মজীবন। কাজেই এর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। 'আত্মজীবন' গ্রন্থের পান্ডুলিপির সূচনা-পৃষ্ঠার ওপরের মার্জিনে লেখক রচনাকালের তারিখ, সময় এবং স্থান সম্পর্কে লিখে রেখে বেশ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে পান্ডুলিপির প্রথমেই আমরা ওই জরুরী তথ্যগুলো পেয়ে যাই। যেমনঃ ৯-১০-১৯৩১ সালের শুক্রবার দিন বাদ আছর বার্মার রেঙ্গুন (বর্তমান মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুন) শহরে ১নং স্ট্রান্ড রোডে তিনি ওই 'আত্মজীবন' রচনা শুরু করেন। শুধু সূচনা-পৃষ্ঠা নয়, পান্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠায়ও তিনি

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন রচনাকাল লিখেছেন, তাঁর এ সময়-সচেতনতা লক্ষনীয় । লেখক কর্তৃক উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী এ পাণ্ডুলিপিখানা রচনার সময়সীমা হচ্ছে ৯-১০-৩১ থেকে ৪-১০-৩৫ ।

তিনি যে একজন সচেতন ঐতিহাসিক ছিলেন এবং ইতিহাস রচনার নিয়ম-নীতি মেনে চলতেন, তার প্রমাণ হচ্ছে উপর্যুক্ত বিবরণ । তাই তাঁর 'আত্মজীবন' গ্রন্থখানা আমাদের বর্তমান সমাজ-বাস্তবতা ও তাঁর চিন্তা-ধারার প্রেক্ষাপটে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে । এখানেই এ গ্রন্থের বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিহিত আছে । নিঃসন্দেহে এটি এতদঞ্চলের সমসাময়িক সামাজিক ইতিহাসের একটি আকর গ্রন্থ ।

(১৫) অভিভাষণ: মাওলানা ইসলামাবাদী বহু স্থানে বহু সম্মেলনে সভাপতির ভাষণাদি লিখিতভাবেই উপস্থাপন করেন । এ সব অভিভাষণের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বিশেষ লক্ষনীয় । তন্মধ্যে কয়েকটি অভিভাষণ হচ্ছে–

(ক) চট্টগ্রাম মোছলেম যুব-সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ: এটি ১৯৩০ সালের ২১শে এপ্রিল প্রদত্ত । অভিভাষণটিতে চট্টগ্রামের স্থানীয় ইতিহাস, পরিবেশ ও নৈসর্গিক ভূগোল, শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক বহু মূল্যবান তথ্য ও সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবরণ তুলে ধরে তিনি 'যুব জীবনের কর্তব্য' বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । তিনি এতে জন সেবা, ধর্ম কর্ম, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও স্বদেশানুরাগের পাশাপাশি মুসলিম যুবাদের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কর্মকান্ড তথা রাজনৈতিক বিশেষত: স্বরাজ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আপন কর্তব্য স্থির করণের প্রতিও আহবান জানান । ফলে অভিভাষণটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য ।[৭৫]

(খ) চট্টগ্রামের বসির হাটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনের ৪র্থ অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ: এটি ২৬শে চৈত্র ১৯৩৪ সালে প্রদত্ত । অভিভাষণটি মূলত: বাংলা সাহিত্য ও এর বৈশিষ্ট্য বিষয়ক হলেও এখানে বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের ইতিহাস তিনি তুলে ধরেছেন। ফলে ইহা একাধারে সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ক অভিভাষণে রূপান্তরিত হয়েছে। অভিভাষণের এক পর্যায়ে তিনি উল্লেখ করেন:

> "এছলাম জগতের ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ঐ সকল ইতিহাসের মধ্যস্থতায় জাতীয় গৌরব, মোছলমানের শিক্ষা-সভ্যতা, শাসন-নৈপুণ্য, আবিষ্কার-উদ্ভাবণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ইত্যাদির চিত্র এরূপ উজ্জ্বলভাবে অংকিত করিতে হইবে যে, তৎপাঠে যেন নব্য যুবকদলের হৃদয়ে আত্ম-বিশ্বাস ও আত্ম-সম্মান-জ্ঞান জাগিয়া উঠে। মোছলমান যে আধুনিক সভ্যজগতের শিক্ষা গুরু-তাহা যেন তাহাদের মানস-পটে অঙ্কিত হইয়া থাকে।"[৭৬]

তাঁর এ বক্তব্য হতে তাঁর ঐতিহ্য চেতনা ও ইতিহাস সচেতনতার দিকটি প্রতিভাত হয়ে উঠে। অন্যত্র তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন এভাবে যে, বাংলা-সাহিত্যের উন্নতি করতে হলে প্রত্যেক জেলায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতির শাখা-সভা গঠিত হওয়া এবং প্রত্যেক শাখার অধীনে পুস্তকালয় ও পাঠাগার স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। জেলার ইতিহাস, প্রাচীন কীর্তির তত্ত্ব সংগ্রহ ও ওলী কাহিনী এবং সাহিত্যিকবর্গের জীবনী সংগ্রহের ব্যাপারে স্থানীয় সমিতি সমূহের সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও ফলপ্রদ হবে।[৭৭]

(গ) কোরআনে স্বাধীনতার বাণী: পুস্তিকাটি মূলতঃ একটি অভিভাষণ। ১৯৩৯ সালের ১১ এপ্রিল কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে আহুত নিখিল বঙ্গ মৌলবী এসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে মাওলানা ইসলামাবাদী এটি উপস্থাপন করেন। এতে তিনি শিক্ষা, স্বাধীনতা ও সামাজিক কর্তব্য বিষয়গুলির উপর জোর দেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আলিমগণ হবেন সর্বজ্ঞানের অধিকারী, ঈমানদার ও স্বাধীন চেতা। কোরআনে সেই নির্দেশ স্পষ্টভাবে আছে। দৈনন্দিন জীবনে, রাজনীতিতে, এমনকি যুদ্ধেও আলিমদের সেই

---

৭৫ পরিপূর্ণ অভিভাষণটির জন্য দ্রষ্টব্যঃ এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩০২-২৫।
৭৬ অভিভাষণ 'সাহিত্য চিন্তা', এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩৪১।
৭৭ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩৪২।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান আহরণ করা, চর্চা করা এবং জীবনে প্রয়োগ থেকে বিরত না থাকার আহবান জানিয়েছেন তিনি। সাহিত্যে, সাংবাদিকতায়, শিক্ষা বিস্তারে ও রাজনীতিতে– এক কথায় জাতীয় উন্নতিতে যথার্থ আলিমদের বহু সুকীর্তি তথা অবদানের প্রসঙ্গগুলি এ গ্রন্থের মূল আকর্ষণ। ফলে এটি ইতিহাস গ্রন্থ না হলেও ইতিহাসের বহু মাল-মসলা এতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।[৭৮]

পুস্তিকাটির মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে আশরাফ ফারুকী বলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মুসলিম সমাজ পাক-ভারত উপমহাদেশে স্বাধীনতার জন্যে দীর্ঘ গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম পরিচালনা করেন। বৃটিশ বাংলার আলিম সমাজই সর্বপ্রথম স্বাধীনতার বাণী মুসলিম জনগণের প্রাণে সঞ্চারিত করতে সক্ষম হন। মাওলানা সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী, মাওলানা ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা নেছারউদ্দীন (তিতুমীর), মাওলানা শরীয়তুল্লাহ্‌র আন্দোলনের নিশান বরদার মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী, মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সিপাহ্‌সালারদের যোগ্য সহকর্মী মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী তৎকালীন মুসলিম স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার করার জন্যে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন, 'কোরআনে স্বাধীনতার বাণী' পুস্তিকাটির মারফতে তারই পরিচয় ভাস্বর হয়ে উঠেছে।[৭৯]

উপরোক্ত গ্রন্থাবলী ছাড়াও মাওলানা ইসলামাবাদীর আরও কতিপয় অপ্রকাশিত গ্রন্থ এবং কিছু রচনা ও প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক তথ্য-উপাত্ত ও ইতিবৃত্ত স্থান পেয়েছে। অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে আওলিয়া-দরবেশ কাহিনী, ওলি কাহিনী, কারা কাহিনী, বাংলার ওলি কাহিনী, বাংলার মুসলমান সমাজ ও উন্নতির উপায়, ভারত-আরব সম্পর্ক, আসাম ভ্রমণ, ভারত-বার্মা ভ্রমণ কাহিনী, ভারতের

---

৭৮ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ 'কোরআনে স্বাধীনতার বাণী', এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬৭-৯২।

৭৯ আশ্‌রাফ ফারুকী, 'আমাদের কথা', কোরআনে স্বাধীনতার বাণী, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ১৯৮০, পৃ ঃ পরিচালকের বক্তব্য 'আমাদের কথা'।

Dhaka University Institutional Repository

সহিত আরবগণের প্রাচীন সম্বন্ধ (১ম ও ২য় খন্ড), ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্পেনের ইতিহাস প্রভৃতির মধ্যে ইতিহাস বিষয়ক আলোচনা ও তথ্য-উপাত্ত স্থান পেয়েছে।[৮০] গ্রন্থগুলোর সন্ধান পাওয়া না গেলেও নামকরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এগুলো তাঁর ইতিহাস ও সাহিত্যকর্মের অন্তর্ভূক্ত।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা ও প্রবন্ধের মধ্যে ইতিহাস ক্ষেত্রে মুসলমান (ইসলাম প্রচারক, ৫ম বর্ষ, ১ম, ২য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯০৩), নহরে জোবেদার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (ইসলাম প্রচারক, ৫ম বর্ষ, ৩য়-৪র্থ যুক্ত সংখ্যা, ১৯০৩), বাণিজ্য ক্ষেত্রে আরব জাতি (ইসলাম প্রচারক, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১৯০৫), স্পেনের ইতিহাস (প্রচারক, ২য় বর্ষ, ১৯০০), হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনী (প্রচারক, ২য় বর্ষ, ১৯০০), খগোল শাস্ত্রে মুসলমান (বাসনা, ১ম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, ১৩১৫/১৯০৮), এসলাম প্রচার (আল্-এসলাম, ১ম বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ১৩২২), শিল্প ক্ষেত্রে মুসলমান (আল্-এসলাম, ১ম বর্ষ, ৩য় ও ৭ম সংখ্যা, ১৩২২), মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার (আল্-এসলাম, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ-১১শ সংখ্যা, ১৩২২), মোসলেম বীরাঙ্গনা (আল্-এসলাম, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ-১১শ সংখ্যা, ১৩২২; ৩য় বর্ষ, ৪র্থ, ৫ম, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা, ১৩২৪), আওরঙ্গজেব (আল্-এসলাম, ২য় বর্ষ, ৮ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা, ১৩২৩; ৩য় বর্ষ, ৩য়-৫ম সংখ্যা, ১৩২৪), আসাম ভ্রমণ (আল্ এসলাম, ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩২৫ ৫ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা, ১৩২৬), সমাজ সংস্কার (আল্-এসলাম, ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩২৫/৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১৩২৬), আঞ্জমনে ওলামা ও সমাজ সংস্কার (আল্ এসলাম, ৫ম বষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৬), খেলাফত (আল্ এসলাম, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩২৭), আরবী বিশ্ববিদ্যালয় (আল্ এসলাম, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৭), অসহযোগিতা ও

---

[৮০] গ্রন্থ তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য: মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২-১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের কর্তব্য (আল্ এসলাম, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩২৭) প্রভৃতি ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনায় সমৃদ্ধ।[৮১]

উপর্যুক্ত রচনা ও প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশই পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এতসব আলোচনার ভেতরে মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। তিনি যে মুসলিম হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে তথা মুসলিম জাগরণের উদ্দেশ্যে ইতিহাস ও সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন, তা আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

পরিশেষে এ বিষয়ে আমরা দু'টি প্রসঙ্গের অবতারণা করতে পারি। প্রথমত: অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ যখন ভারতের মুসলিম শাসকদের ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটি, চারিত্রিক দুর্বলতা প্রভৃতিকে মুসলিম শাসনের পতনের কারণ বলে মনে করেন, সেক্ষেত্রে মাওলানা ইসলামাবাদী যুক্তি-তর্ক ও অকাট্য প্রমাণাদি সরবরাহ করে দেখিয়েছেন যে, তাঁদের উক্তসব অভিযোগ সঠিক নয়। বহু উপেক্ষিত মুসলিম শাসকদের গঠনমূলক, জনহিতকর ও গৌরবোজ্জ্বল কার্যাবলী যত্নের সঙ্গে তুলে ধরে তিনি পাঠক মনের বিভ্রান্তি দূর করে মুসলিমদের আত্ম-সম্মানবোধ পুনর্জিবিত করতে যত্নবান হন। তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল ইরান, তুরস্ক ও আরব বিশ্বের দিকে। তবে তাঁর দৃষ্টি বাংলা-ভারতের বাইরের ঘটনাবলীর উপর যতটুকু ছিল, তার চেয়েও বেশী ছিল স্বদেশ ও স্বজাতির সমস্যাবলীর উপর। এখানেই তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে; আর এটাই তাঁর সার্থকতা। ফলে ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব ও অবদান ছিল অপরিসীম। তবে তিনি যদি মাওলানা আকরম খাঁর মত পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের বক্তব্যগুলো মাঝে মধ্যে উদ্ধৃত করে তার সমালোচনামূলক জবাব দিতেন, তাহলে আমরা আরও বেশী উপকৃত হতাম।

---

৮১ প্রবন্ধ তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য: পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১০৫-১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়তঃ ধর্ম ও নৈতিকতাবোধ মানুষের দেহ ও আত্মায় বল সঞ্চার করে। ধর্মহীনতা মনুষ্যত্ববোধের পরিপন্থী। মনুষ্যত্বহীনতা ও পাশবিকতার উৎস অজ্ঞতা ও মূর্খতা। কিন্তু ধর্ম ও শিক্ষার নামে প্রচলিত কুসংস্কার সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ থেকে জীবনকে বিচ্যুত করে। মনুষ্যত্বকে করে দেয় হেয় ও পঙ্গু। যে উদার শিক্ষা মনুষ্যত্ববোধ বিকাশের সুযোগ এনে দেয়, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় যার মূল প্রোথিত, সে উদার শিক্ষাই প্রকৃত সংগ্রামী নেতা তথা প্রকৃত নাগরিক তৈরীতে সহায়ক হয়। আর এ আদর্শেরই শিক্ষা ও প্রচার ছিল মাওলানা ইসলামাবাদীর একান্ত কাম্য। বাঙালী তথা ভারতীয় মুসলিম জাগরণের ইতিহাসে ধর্মীয় আদর্শের অনুসরণে এবং তার সম্যক মূল্যবোধের যে বিশেষ ধারায় মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর লেখনী ধারা প্রবাহিত হয়েছিল, তা একক না হলেও অতি দুর্লভ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এ মহান ঐতিহাসিক আমাদের সমাজের ধর্মীয় ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে যে অমর অবদান ও আদর্শের প্রভাব রেখে যেতে সমর্থ হয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে ও সমাজে বিরল।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

হাকিম হাবিবুর রহমান (১৮৮১-১৯৪৭খ্রীঃ)

ক: জন্ম পরিচয় ও শিক্ষা-দীক্ষা :

বিশ শতকের প্রথমার্ধে পূর্ব-বাংলার শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম ছিলেন হাকিম হাবিবুর রহমান (১৮৮১-১৯৪৭ খ্রীঃ)। বাংলায় মুসলিম জাগরণ তথা 'মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলন'-এ তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ্‌র রাজনীতি ও শিক্ষা-আন্দোলনের সাথে তিনি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পূর্ব-বাংলায় ইউনানী তথা হাকীমী চিকিৎসা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী। তিনি বংগদেশে রচিত আরবী, ফার্সী ও উর্দু গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করে একটি বিশাল গ্রন্থাগার সৃষ্টি করেন। মুসলিম ঐতিহ্য বিজড়িত অনেক প্রাচীন মুদ্রা ও শিলালিপি সংগ্রহ করে তিনি আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের এ দিকটি জিইয়ে রাখার প্রয়াস পান।[১] ঢাকায় উর্দু ভাষা ও সাহিত্য বিস্তারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি বাংলাদেশের উর্দু-ফার্সী সাহিত্যচর্চার ইতিহাস তুলে ধরার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।[২] এ প্রসঙ্গে ১৯৩১ সালে ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর এক সভায় সভাপতিরূপে প্রদত্ত তাঁর লিখিত উর্দু ভাষণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাষণটির বংগানুবাদ মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩]

---

১ ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা, জুন ১৯৯১, পৃঃ ১১৫; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌, রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, মে ১৯৯৫, পৃঃ ১৬৩।

২ এ, কে, এম, আমিনুল হক, ঢাকায় উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চা (১৯০১-১৯৭১), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম,ফিল ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ-২০০০ (অপ্রকাশিত ও ঢাঃ বিঃ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত), পৃঃ ৩৯।

৩ মাসিক মোহাম্মদী, চতুর্থ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৩৮, পৃঃ ৬৪১-৪৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

হাকিম হাবিবুর রহমানের পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ইয়াগিস্তানের ঐতিহ্যবাহী 'ইউসুফজাই' পরিবারের অধঃস্তন পুরুষ। 'ইউসুফজাই' পরিবার ছিল ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর বংশধর। হাকিম হাবিবুর রহমানের পিতার নাম মাওলানা মুহাম্মদ শাহ্ আখুন্‌জাদা।[৪] তিনি ছিলেন সুন্নী মতাদর্শে বিশ্বাসী একজন শীর্ষস্থানীয় আলিম এবং আল্লাহ্‌ওয়ালা ব্যক্তি। তিনি নিজ এলাকায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে আলীগড়ে এসে মুফ্‌তী লুৎফুল্লাহ্‌র নিকট এবং লখ্‌নৌতে মাওলানা আবদুল হাই ফিরিংগী মহল্লীর নিকট ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।[৫] তিনি জীবিকার উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ঢাকায় আগমন করেন এবং নওয়াব স্যার আহ্‌সান উল্লাহ্‌র (১৮৪৬-১৯০১ খ্রীঃ) অধীনে নওয়াবী এস্টেটে চাকুরি গ্রহণ করেন।[৬] তিনি ১৯১৩ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর ঢাকায় ইন্তেকাল করেন এবং ঢাকাস্থ আজিমপুর দায়রা শরীফে সমাহিত হন। তার দুই সন্তান ছিল : কাজী আজিজুর রহমান ও হাকিম হাবিবুর রহমান।[৭]

বাংলায় মুসলিম জাগরণের অন্যতম দিশারী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হাকিম হাবিবুর রহমান ১৮৮১ সালের ২৩শে মার্চ ঢাকার ছোট কাটরায় জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং তখন থেকেই পারিবারিক ঐতিহ্য ধারণ করে নিজেকে গড়ে তুলেন। তিনি কিছুদিন পিতার নিকট ও পরে ঢাকা সরকারী মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।[৮] তাঁর বয়স যখন তের বছর, তখন তিনি ধর্মীয় শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ভারতের কানপুরে গমন করেন। সেখানে ভারতের বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও ধর্মপ্রচারক মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী (রঃ) (১৮৬৩-১৯৪৩ খ্রীঃ)-এর নিকট তিনি আরবী ব্যাকরণসহ ইসলামের

---

৪ 'আখুন্‌জাদা' যুক্ত শব্দটি 'আখুন্দ' এবং 'জাদাহ্‌'-এ দুটি শব্দ যোগে গঠিত, যাদের অর্থ যথাক্রমে শিক্ষক এবং সন্তান। সুতরাং যুক্ত শব্দটির আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় শিক্ষকের সন্তান। এখানে 'আখুন্‌জাদা' বলতে একটি বিশেষ বংশকে বুঝানো হয়েছে।

৫ হাকিম হাবিবুর রহমান, আসূদেগান-এ-ঢাকা, ঢাকা, ১৯৪৬, পৃঃ ৯২।

৬ ইকবাল আযীম, মাশ্‌রিক্বী বাংগাল-মে-উর্দু, মাশরিক কো-অপারেটিভ পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৫৪, পৃঃ ১১১।

৭ আসূদেগান-এ-ঢাকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩।

৮ আবুয্‌যোহা নূর আহমদ, উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য দিক সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে মাওলানা ইস্হাক বর্ধমানী, মাওলানা আহমদ হাসান কান্‌পুরী, মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব বিহারী ও মাওলানা মুফতী লুৎফুল্লাহ্ আলীগড়ীর নিকট তিনি ইসলাম বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং বিশাল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। অতঃপর তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষাদানের অনুমতি প্রাপ্ত হন তথা 'মুহাদ্দীস' উপাধিতে ভূষিত হন বলে সৈয়দ সুলায়মান নদ্‌ভী উল্লেখ করেছেন।[৯] আবুল লায়েছ আনসারীর বর্ণনা সূত্রে ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ উল্লেখ করেন যে, তিব্বে ইউনানী শিক্ষার জন্য হাবিবুর রহমান প্রথমে লখ্‌নৌ ও পরে দিল্লী গমন করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছেন। এসময় উপমহাদেশের খ্যাতনামা ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানী লখ্‌নৌর হাকিম আগা হাসান ও দিল্লীর হাকিম আবদুল মজীদ খানসহ অন্যান্যদের নিকট হাকীমী শাস্ত্র অধ্যয়ন করে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[১০] অতঃপর ১৮৯৯ সালে আগ্রায় যান এবং সেখানে 'তিব্বে ইসলামী' শিক্ষা সমাপ্ত করেন।[১১]

কর্মজীবনঃ

১। চিকিৎসা সেবা :

সুদীর্ঘ প্রায় এগার বছর ধরে কান্‌পুর, লখনৌ, দিল্লী ও আগ্রায় ইসলামের বিভিন্ন দিক ও ইউনানী চিকিৎসা বিদ্যায় অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করে ১৯০৪ সালে তিনি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং চিকিৎসা কার্যের মাধ্যমে দেশ, সমাজ ও আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। স্বল্প পরিসরে তিনি একজন পারদর্শী ও যশস্বী ইউনানী চিকিৎসক রূপে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ্‌র সুনজর তাঁর উপর পড়ায় তিনি নওয়াব পরিবারের 'পারিবারিক চিকিৎসক' নিযুক্ত হন। এতে নওয়াব সলীমুল্লাহ্ ও তাঁর পরিবারের সাথে হাকিম হাবিবুর রহমানের

---

৯ সৈয়দ সুলায়মান নদভী, মাসিক মাআরিফ, আযমগড়, এপ্রিল, ১৯৪৭, পৃঃ ৩১৩।

১০ আবু তোহা, 'হাকিম হাবিবুর রহমান', দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ৩ মার্চ, ২০০০।

১১ ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, হাকীম হাবীবুর রহমান, ঢাকা, জুন ১৯৮১, পৃঃ ৩; আবুল লায়েছ আনসারী, আল্-হাকীম, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। সে সময় তিনি ঢাকার বড় বড় জমিদার পরিবারেরও চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে সমাজসেবা বিষয়ক আলোচনাতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে। নওয়াব পরিবারের সাথে সম্পর্কের সূত্র ধরে তিনি নওয়াবের রাজনীতি ও শিক্ষা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হন এবং এই সুবাদে আজীবন চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি সাংবাদিকতা, রাজনীতি, শিক্ষা আন্দোলন, পূরাকীর্তি ও মুদ্রা সংগ্রহ, ইতিহাস–ঐতিহ্য ও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা এবং সমাজ সেবায় নিয়োজিত থাকেন।

<u>২. উর্দু প্রীতি ও উর্দু চর্চা:</u> হাকিম হাবিবুর রহমান পেশাগতভাবে একজন সফল ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ্ ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক হলেও উর্দুভাষায় রচিত তাঁর গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধসমূহ তাঁকে একজন উঁচুমানের সাহিত্যিক ও ইতিহাসবিদ হিসেবে সমাজে পরিচিত করে তুলে। তিনি ব্যতীত অন্যকোন উর্দু লেখক ও সাহিত্যিক ঢাকার ইতিকথা ও তাহযীব-তামাদ্দূন নিয়ে এতবেশী মসি চালনা করেননি।[১২] পূর্ব বঙ্গীয় উর্দু সাহিত্যের সকল ইতিহাস গ্রন্থে তাঁর নাম স্থান পেয়েছে। তাঁকে বাদ দিয়ে বঙ্গ ও আসামের উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস লেখা অসম্ভব। হাকিম হাবিবুর রহমানের যাবতীয় রচনাই ছিল উর্দু ভাষায় রচিত। তিনি শিক্ষাদীক্ষাও লাভ করেন উর্দু ভাষার মাধ্যমে। তাছাড়া তাঁর পারিবারিক ভাষাও ছিল উর্দু। তিনি ছিলেন কবি মানসের অধিকারী। তাঁর কাব্য নাম ছিল 'আহ্সান' (অধিকা সুন্দর)। অল্প বয়সেই তিনি নওয়াব স্যার আহ্সান উল্লাহ্র মৃত্যুতে একটি উর্দু মর্সিয়া কবিতা রচনা করেন। ইন্ডিয়া ইউ.পি.তে অবস্থানকালে তিনি উর্দু কাব্য চর্চায় অনুপ্রাণিত হয়ে গোলাবখানার (লখ্নৌ) 'মুশাআরা'য় (কাব্য সম্মেলনে) যোগদান করতেন এবং যথারীতি স্বরচিত গজল-কবিতা আবৃত্তি করতেন।[১৩] তাঁর কাব্য চর্চা সম্পর্কে খাজা নাযিমুদ্দীন উল্লেখ করেন যে, কবিতা এবং কবিদের ব্যাপারে তিনি বিশেষ অনুরাগী

---

[১২] এ, কে, এম, আমিনুল হক, ঢাকায় উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চা (১৯০১-১৯৭১), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯।

[১৩] মাশ্রিকী পাকিস্তান-কে-উর্দু আদীব, পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, করাচী, ১৯৫১, পৃঃ ৬৯-৭০।

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন এবং বাংলার প্রাচীন উর্দু কবিদের বাণী তাঁর অনেক স্মরণে ছিল এবং ঐ ব্যাপারে তিনি বিস্তৃত জ্ঞান রাখতেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, তিনি এবং খাজা নাযিমুদ্দীনের খালাতো ভাই খাজা মুহাম্মদ আদিল সম্মিলিতভাবে ঢাকা থেকে 'জাদু' নামে একটি উর্দু পত্রিকা বের করেছেন, যেখানে বাংলার বিভিন্ন কবিদের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। যখন এ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তিনি 'মুশাআরা' বা কাব্য-সভা আয়োজন শুরু করেন। প্রত্যেক মাসে তাঁর বাড়ীতে একবার মুশাআরা অনুষ্ঠিত হতো এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের চা-নাশ্‌তা তিনি নিজেই খাওয়াতেন। হাকিম আজীজুল ইসলাম ১৯৪৩ সালে তাঁর ছেলেবেলায় হাকিম সাহেব কর্তৃক ঢাকার ছোট কাটারায় তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ ভবনে আয়োজিত এ ধরনের একটি মুশাআরা অনুষ্ঠান তৎকালীন 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'-এর ঢাকা কেন্দ্র থেকে সরাসরি সম্প্রচার হতে দেখেছেন। তাঁর বিবরণ হতে জানা যায় যে, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও হাকিম সাহেব কর্তৃক আয়োজিত একটি কবি-আসরে এসে শ্রোতাদের মোহিত করেন। [১৪] তিনি নিজে কোন গজল আবৃত্তি করতেন না এবং কবি হিসেবে নিজের পরিচয়ও দিতেন না। কিন্তু কখনও কখনও তিনি ফার্সীতে কবিতার কয়েকটি লাইন লিখে কোন যুবককে দিয়ে আবৃত্তি করাতেন। তিনি উর্দুর একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং সর্বদা এর উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করতেন। [১৫]

<u>৩. উর্দু সাংবাদিকতা:</u> হাকিম হাবিবুর রহমান পূর্ব-বাংলা ও আসামের 'আঞ্জুমান-এ-উর্দু'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন। ১৯০৬ সালের কাগজ-পত্রেও তাঁকে উক্ত সমিতির সেক্রেটারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।[১৬] খাজা ইসমাইল ছিলেন সহকারী সেক্রেটারী। এ আঞ্জুমানের উদ্যোগে ঢাকায় ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত মাসিক উর্দু মুশাআরা অনুষ্ঠিত হত।[১৭] তিনি কেবল উঁচু মানের একজন কবি-সাহিত্যিকই ছিলেন না, বরং একজন সফল সাংবাদিকও ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম

---

[১৪] হাকীম হাবিবুর রহমান জন্মবার্ষিকী স্মারক-২০০৪, পৃঃ ৫।

[১৫] ঢাকা ঃ পচাস্ বরস্ পহ্‌লে, কিতাব মঞ্জিল, লাহোর, ১৯৪৯, পৃঃ ৭; মোঃ রেজাউল করিম অনূদিত, ঢাকা ঃ পঞ্চাশ বছর আগে, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃঃ বাইশ, খাজা নাজিম উদ্দীনের ভূমিকা।

[১৬] মাসিক 'আল্-মাশরিক', ঢাকা, নভেম্বর, ১৯০৬, পাদটীকা।

[১৭] ঢাকায় উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চা (১৯০১-১৯৭১), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকা থেকে 'আল্ মাশরিক' (প্রাচ্য) নামক একটি মাসিক উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করে পূর্ব-বঙ্গ ও আসামে উর্দু সাংবাদিকতার সূচনা করেন।[১৮] তিনি এ পত্রিকার মাধ্যমে পূর্ববাংলা ও আসামের মুসলিমদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয় প্রেরনা সৃষ্টির চেষ্টা করেন এবং তাদের অধিকার সচেতন করে তোলেন। এর বিভিন্ন সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি মুসলিমদের দৈন্য দশা তুলে ধরেন এবং তা থেকে উত্তরণের পরামর্শ দেন। আগাগোড়া তিনিই ছিলেন এ পত্রিকার সম্পাদক এবং এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ। এটা ছিল তদানীন্তন পূর্ব-বাংলা ও আসাম প্রদেশের মুসলিমদের একমাত্র উর্দু জাতীয় পত্রিকা। এ পত্রিকাটি কিছুকাল মাসিক থাকার পর সাপ্তাহিকীতে পরিণত হয় এবং কিছু দিন সাপ্তাহিকী থাকার পর বন্ধ হয়ে যায়। তবে বন্ধ হওয়ার সঠিক সময় ও কারণ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এর কয়েকটি মাসিক সংখ্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসে হাকিম হাবিবুর রহমান খাজা আদিলের সহযোগিতায় (উভয়ের যুগ্ম সম্পাদনায়) ঢাকা থেকে 'জাদু' নামক আরও একটি মাসিক উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি ছিল পূর্ব-বাংলার দ্বিতীয় উর্দু পত্রিকা, যা খাজা মুহাম্মদ মুআজ্জম কর্তৃক ঢাকার দিল্‌কুশা থেকে প্রকাশিত হত। পত্রিকার নাম-পত্র (Title-page)-এ সাধারণতঃ সম্পাদক হিসেবে খাজা আদিলের নামই ব্যবহৃত হত। তবে কোন কোন সংখ্যায় উভয়ের নামই সম্পাদকরূপে দেখা যায়।[১৯] পত্রিকাটি অল্প সময়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে এবং মুসলিম জাগরণে ভূমিকা রাখে কিন্তু কয়েক বছর পর বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটি কখন বন্ধ হয়েছিল, সে সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে হাকিম হাবিবুর রহমানের পুত্র হাকিম ইরতিযাউর রহমান ও হাকিম হোসামুর রহমানের ভাষ্য অনুসারে পত্রিকাটি ১৯৩০

---

[১৮] সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), তৃতীয় খন্ড, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃঃ ৪০৭।

[১৯] জাদু, মার্চ ১৯২৬ সংখ্যায় সম্পাদক হিসেবে উভয়ের নামই ছিল। প্রথম নামটি হাকিম হাবিবুর রহমান এবং দ্বিতীয় নামটি খাজা মুহাম্মদ আদিল।

Dhaka University Institutional Repository

সালের কাছাকাছি কোন এক সময় বন্ধ হয়েছিল। [২০] 'জাদু' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী এবং চট্টগ্রাম হাজী মহসিন কলেজ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। এ. কে.এম. আমিনুল হকের বর্ণনা অনুসারে, খাজা মুহাম্মদ আদিলের প্রচেষ্টায় পত্রিকাটি ১৯৪৩ সালে পুনঃপ্রকাশিত হয় এবং ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয় দফা 'জাদু প্রকাশিত হলে খাজা মুহাম্মদ আদিল তাতে ধারাবাহিকভাবে বাংলার উর্দু কবিদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখেন। উক্ত সময়ে পত্রিকার যে সংখ্যাগুলো বের হয়েছিল, সেগুলো আজ দুষ্প্রাপ্য।[২১] উর্দু সাংবাদিকতার মাধ্যমে হাকিম হাবিবুর রহমান বাংলা ও আসামের মুসলিমদের অধিকার সচেতন করে তোলেন। ফলে মুসলিম জাগরণ ত্বরান্বিত হয়। অবশ্য তাঁর এ খেদমত বাংলা ভাষায় হলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ব্যাপক সুবিধা হতো।

৪. রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও চিন্তা-চেতনা ঃ হাকিম হাবিবুর রহমান ছিলেন একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক। তিনি রাজনীতির খাতিরে রাজনীতি করেননি, বরং মুসলিম জাতির জাগরণ ও উন্নতি সাধনের লক্ষ্যেই তিনি রাজনীতিতে আবির্ভূত হন। তিনি মূলতঃ একজন প্রখ্যাত ইউনানী চিকিৎসাবিদ্ হওয়া সত্ত্বেও জাতির ও সমাজের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদ তাঁকে উক্ত পেশায় সীমাবদ্ধ থাকতে দেয়নি। মুসলিম জাতির দুর্দশা দেখে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন এবং দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ছিলেন মুসলিম স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী। তাঁর রাজনৈতিক চিন্ত াধারা ছিল অনেকটা স্যার সৈয়দ আহমদ, নওয়াব আবদুল লতীফ, সৈয়দ আমীর আলী ও নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ্র চিন্তাধারার অনুরূপ। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন স্যার সলীমুল্লাহর দক্ষিন হস্ত; আবুল ফয়েজ আবদুল আলী ছিলেন তাঁর সহযোগী।[২২] হাকিম সাহেব জাতীয় জাগরণে তাঁর সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেন। তাঁর 'আল্-মাশরিক' পত্রিকায় আবদুল আলীর জাতীয় জাগরণমূলক

---

[২০] ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮, পাদটীকা-২; একই লেখক, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ই.ফা.বা. ১৯৯১, পৃঃ ১১৮।

[২১] ঢাকায় উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চা (১৯০১-১৯৭১), পৃঃ ১৩।

[২২] হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, পৃঃ ১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। ১৯০৬ সালের নভেম্বরে 'আমাদের বর্তমান অবস্থা' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, তাতে তিনি মুসলিম সমাজের করুণ অবস্থা তুলে ধরেন এবং তাদের অগ্রগতির পথে আসার জন্য উৎসাহিত করেন।

১৯০৬ সালে 'পূর্ব-বংগ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম এডুকেশন্যাল কন্‌ফারেন্স' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হাকিম হাবিবুর রহমানের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে তিনি নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ্‌র দক্ষিন হস্তরূপে কাজ করেন। এ প্রতিষ্ঠানটি কায়েম করার উদ্দেশ্যে যে অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়েছিল, হাকিম সাহেব ছিলেন তার অন্যতম প্রধান সদস্য। স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলনের প্রতিও তাঁর বিশষ অনুরাগ ছিলো। এর প্রমান হচ্ছে- তিনি 'আল্‌-মাশরিক' পত্রিকার ১মবর্ষ ২য় সংখ্যা (নভেম্বর- ১৯০৬)- এ স্যার সৈয়দ প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম এডুকেশন্যাল কন্‌ফারেন্স' সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠানটির আদ্যোপান্ত ইতিহাস ও প্রশংসনীয় কার্যাবলী সবিস্তারে বর্ননা করেন।

১৯০৮ সালের ডিসেম্বরে অমৃতসরে 'মুসলিম এডুকেশন্যাল কন্‌ফারেন্স'- এর যে বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে ঢাকার নওয়াব সলীমুল্লাহ্‌ সভাপতিত্ব করেন।[২৩] হাকিম হাবিবুর রহমান সে সময় নওয়াবের সাথে অমৃতসরের অধিবেশনে যোগদান করেন। ইকবাল আযীমের বর্ননা মতে, নওয়ার সলীমুল্লাহ্‌ সভাপতির যে ভাষণ দেন, তা মূলত: হাকিম হাবিবুর রহমানই প্রস্তুত করেন।[২৪]

১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে নওয়াব সলীমুল্লাহ্‌র উদ্যোগে ঢাকায় যে 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' গঠিত হয়, তার পশ্চাতে হাকিম সাহেবেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মুসলিম লীগের আত্ম-প্রকাশের সময় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতামূলক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

a) To promote, among the Musalmans of India, feelings of loyalty to the British Government, and to remove

---

[২৩] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাঙলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী (১৮৫৭-১৯৪৭), কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা, এপ্রিল ২০০০, পৃঃ ৪০।

[২৪] ইকবাল আযীম, মাশ্‌রিকী বাংগাল মে উর্দু, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

any misconception that may arise as to the intention of Government with regard to any of its measures.

b) To protect and advance the political rights and interests of the Musalmans of India, and to respectfully represent their needs and aspirations to the Government.

c) To prevent the rise, among the Musalmans of India, of any feeling of hostility towards other communities, with our prejudice to the other aforementioned objects in the League.[২৫]

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর লর্ড কার্জনের উদ্যোগে এবং নওয়াব সলীমুল্লাহ্‌সহ পূর্ব-বংগের মুসলিম নেতৃবৃন্দের সমর্থনে 'ঢাকা'কে রাজধানী করে 'পূর্ব-বাংলা ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার ছিলেন এর প্রথম লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর। এ নতুন প্রদেশ গঠনের ফলে পূর্ব-বাংলা ও আসামের মুসলিমদের মধ্যে প্রাণ-চাঞ্চল্য সঞ্চার হয়। মুসলিম জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ও মুসলিম জাগরণের দিশারী হাকিম হাবিবুর রহমানের ঐকান্তিক কামনা ছিল -- পূর্ব-বাংলা ও আসামের মুসলিমগণও শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থ-সামর্থ্য ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের পাশাপাশি উন্নতি লাভ করুক এবং তারা রাজনৈতিক মঞ্চেও সংঘবদ্ধ হোক। তিনি মনে প্রাণে বৃটিশ গভর্নমেন্ট ও মুসলিম জাতির মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক ও সর্বভারতীয় মুসলিম-ঐক্য স্থাপণের প্রয়াসী ছিলেন। এ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তিনি 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' গঠনের পূর্বেই এর ক্ষেত্র প্রস্তুতের লক্ষ্যে ১৯০৬ সালের অক্টোবরে ঢাকা থেকে 'আল-মাশরিক' (প্রাচ্য) নামক মাসিক উর্দু পত্রিকাটি প্রকাশ করেন এবং পূর্ব-বাংলা ও আসামের মুসলিমদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয় প্রেরণা সৃষ্টির চেষ্টা করেন, একথা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। পত্রিকাটি বঙ্গবিভাগ সমর্থন করে এবং মধ্যবিত্ত হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের বঙ্গবিভাগ

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী আন্দোলনের অযৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করে। পত্রিকার বিভিন্ন সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি মুসলিমদের দৈন্যদশা তুলে ধরার প্রয়াস পান।[২৬]

১৯০৮ সালে ঢাকায় 'পূর্ব-বাংলা ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ' গঠিত হলে নওয়াব সলীমুল্লাহ্ এর 'অনারারি সেক্রেটারী' এবং হাকিম হাবিবুর রহমান যুগ্ম সচিব (জয়েন্ট সেক্রেটারী) নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট ছিলেন কাযেম আলী সিদ্দিকী। নওয়াব সলীমুল্লাহ্র মৃত্যুর (১৯১৫ খ্রীঃ) পর খাজা মুহাম্মদ আজম রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। হাকিম সাহের খাজা মুহাম্মদ আজমেরও পরামর্শ দাতা এবং রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন।

হাকিম হাবিবুর রহমান ১৯১৯ সালে খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেন। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এ অসহযোগ আন্দোলনের এক প্রস্তাবে বৃটিশের দেয়া খেতাব, আইনসভা, কোর্ট-কাছারি, সরকারী-আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, বিলাতী দ্রব্য ইত্যাদি বর্জনের আহবান জানানো হয়। এর ফলে বাংলার মুসলিমদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা স্কুল-কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অথচ হিন্দু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষাকার্য অব্যাহত থাকে। সে সময় ঢাকার মুসলিম নেতৃবৃন্দ হাকিম হাবিবুর রহমানের সহযোগিতায় মুসলিমদের 'শিক্ষা রক্ষা কমিটি' নামক একটি কমিটি গঠন করেন, 'অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে ভারতীয় আলিমগনের অভিমত' শীর্ষক ৪৪পৃষ্ঠার একটি উর্দু পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং এ মর্মে মুসলিমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, শিক্ষা-দীক্ষা ত্যাগ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া মুসলিমদের পক্ষে মোটেই সমীচীন হবেনা। এ প্রসঙ্গে হাকিম সাহেব নিজে বলেনঃ

---

[২৫] সূত্র ঃ Syed Sharifuddin Pirjada (ed.), Foundation of Pakistan : All-India Muslim League Documents, 1906-1947, Vol.1, Karachi, 1969, P. 6.

[২৬] রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৪-১৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

"অসহযোগ আন্দোলনের হিড়িক পড়ায় বাংলার মৌলভী সাহেবান ও সাধারণ মুসলমানদের উপর এর খুবই বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। কিন্তু প্রায় সকল হিন্দু বিদ্যালয়ই এ অবস্থা থেকে রক্ষাপায়। অসহযোগ আন্দোলনের অন্যান্য দিক সম্পর্কে আমাদের কোন মতবিরোধ ছিলনা। আমাদের মতে, শিক্ষা বর্জন নীতি ছিল অনর্থক, বরং মুসলমানদের জন্য তা ছিল বিষবৎ। এ ছাড়া হিন্দু নেতাদের মনোভাবের প্রতি আমাদের যে সব সন্দেহ ছিল, তাও ছিল যুক্তিযুক্ত। এ জন্য ঢাকার কতিপয় দরদী মুসলমান 'শিক্ষা রক্ষা কমিটি' (হেফাজতে তালিম কমিটি) নামক একটি কমিটি গঠন করেন এবং 'অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে ভারতীয় আলিমদের অভিমত' (তরক-এ-মাওয়ালাত্ পর মুস্তানাদ-ওলামায়ে হিন্দ্-কী-রায়) শীর্ষক উর্দু পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন"।[২৭]

১৯১৯ সালে খিলাফত আন্দোলন চলাকালে হাকিম হাবিবুর রহমান রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে 'গরীব হিন্দুস্তান' শীর্ষক একটি উর্দু নাটক লিখে ঢাকায় মঞ্চস্থ করেন। অবশ্য তা তেমন একটা জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়নি।[২৮] ১৯২৩ সালে তিনি ও খাজা আবদুল করিম ঢাকা থেকে ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্য পদ প্রার্থী ছিলেন। খাজা মুহাম্মদ আজম হাকিম সাহেবকে সমর্থন করেন। কিন্তু খাজা পরিবারের অন্যান্য সদস্যগন খাজা আবদুল করিমের পক্ষে ছিলেন। ফলে খাজা আবদুল করিম নির্বাচনে বিজয়ী হন। [২৯] এর পর থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তিনি সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকান্ড হতে অনেকটা দূরে ছিলেন। এ সময় তাঁর কোন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যায়না।[৩০] সম্ভবত: নির্বাচনে পরাজিত হওয়াই তাঁর রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে সাময়িকভাবে বিরত থাকার কারণ।

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের পূর্বে কোন এক সময় হাকিম সাহেব টাঙ্গাইল শহরে ডায়মন্ড প্রেস সংলগ্ন একটি ঘরে তাঁর হাকিমী দাওয়াখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু করেন। তবে বেশীদিন তিনি রাজনৈতিক কর্মকান্ড হতে দূরে থাকতে পারেননি। কারণ তিনি ছিলেন মুসলিম জাতীয়তাবাদী

---

[২৭] হাকিম হাবিবুর রহমান, সালাসা- গাস্সালাহ্, অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত, পৃঃ ১৮৬।

[২৮] ইশ্রাত রহমানী, উর্দু ড্রামা-কা- ইরতিকা, লাহোর, ১৯৬৮, পৃঃ ২১৮।

[২৯] ঢাকা খিলাফত কমিটির ট্রেজারার খাজা মওদূদের ডায়েরী, তাং- ১৭-১১-১৯২৩ খ্রীঃ।

[৩০] মাসিক জাগরণ, ১মবর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, বৈশাখ ১৩৩৫, পৃঃ ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ও মুসলিম লীগের ঘোর সমর্থক। তাই বিপুল প্রাণ-চাঞ্চল্য নিয়ে তিনি অবতীর্ন হলেন তদানীন্তন টাঙ্গাইল মহকুমা মুসলিম লীগ গঠনের কাজে। তাঁর আহবানে সাড়া জাগলো টাঙ্গাইল মহকুমার সর্বত্র। ১৯৩৬ সালের কোন একদিন নেতৃস্থানীয় মুসলিমগণ টাঙ্গাইল জামে মসজিদে সমবেত হয়ে টাঙ্গাইল মহকুমা মুসলিম লীগ গঠন করেন। সভাপতি ও সেক্রেটারী নির্বাচিত হন যথাক্রমে চাঁদ মিয়ার পুত্র মাসুদ আলী খান পন্নী ওরফে নওয়াব মিয়া এবং হাকিম হাবিবুর রহমান।

টাঙ্গাইলে মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার ফলে টাঙ্গাইলের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় এবং সেখানকার দীর্ঘকালীন কংগ্রেসী আধিপত্যে কিছুটা ভাটা পড়ে। ঐ সময় নির্বাচনের ব্যাপারে কায়েদে আযমের সাথে এ. কে. ফজলুল হকের সমঝোতা না হওয়ায় ফজলুল হক সাহেব মুসলিম লীগের সাথে একই মঞ্চ থেকে নির্বাচন না করে তাঁর কৃষক-প্রজা পার্টিকে মুসলিম লীাগের বিরোধী দলরূপে দাঁড় করান। ফলে সর্বত্র মুসলিম লীগের সমর্থকদের বড় একটি অংশ যোগদিল কৃষক-প্রজা পার্টিতে। টাঙ্গাইলেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। হাকিম হাবিবুর রহমান ও নিযামুদ্দীন আহমদ মোক্তার ছিলেন পরস্পরের বন্ধু। হাকিম সাহেব ছিলেন মুসলিম লীগের সেক্রেটারী এবং মোক্তার সাহেব ছিলেন কৃষক-প্রজা পার্টির সেক্রেটারী। ফলে ১৯৩৭ সালের সাধারন নির্বাচনে রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন মুসলিম সমাজে দ্বিধা-বিভক্তি দেখা দেয়। স্বভাবতঃই নির্বাচনে মুসলিম লীগ টাঙ্গাইলে কৃষক-প্রজা পার্টির প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। উত্তর টাঙ্গাইল আসনে মুসলিম লীগ প্রার্থী প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ কৃষক-প্রজা পার্টির প্রার্থী নওয়াবজাদা হাসান আলী চৌধুরীর কাছে পরাজিত হন। পূর্ব টাঙ্গাইলে কৃষক-প্রজা পার্টির প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরীকে পরাজিত করে মুসলিম লীগ প্রার্থী মাসুদ আলী খান পন্নী জয় লাভ করেন। টাঙ্গাইল সদর থেকে কৃষক-প্রজা পার্টির প্রার্থী মেজর মফিজুদ্দীনকে পরাজিত করে স্বতন্ত্র প্রার্থী (পরে মুসলিমলীগ) মির্জা আবদুল হাফিজ নির্বাচিত হন।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের সময় থেকে ১৯৪৬ সালের নির্বাচন পর্যন্ত কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টির আন্দোলনে টাঙ্গাইলের হিন্দু-মুসলিম সমাজ গভীরভাবে আলোড়িত হয়। মফঃস্বল এলাকায় মুসলিম লীগের ব্যাপক নেতৃত্ব গড়ে

Dhaka University Institutional Repository

তোলার পেছনে হাকিম হাবিবুর রহমানের অবদান ছিল অপরিসীম। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে মাওলানা ভাসানী আসাম হতে টাঙ্গাইল এসে হাকিম হাবিবুর রহমানসহ অন্যান্য বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক সহযোগিতায় কাগ্মারীতে এক মহাসম্মেলন করেছিলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন তদানীন্তন টাঙ্গাইল মহকুমার মুসলিম লীগ সভাপতি প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ। ঐ সম্মেলনে মাওলানা ভাসানী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান প্রস্তাবের যথার্থতা জনগণের সামনে ব্যাখ্যা করেন। ফলে ঐ নির্বাচনে টাঙ্গাইল মহকুমার মুসলিম লীগের জয়-জয়কার অন্য কোন রাজনৈতিক দল রুখতে পারেনি। ঐ নির্বাচনে যে কয়জন জাঁদরেল মুসলিম লীগ নেতা পাকিস্তান আন্দোলনকে টাঙ্গাইলে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন, তন্মধ্যে হাকিম হাবিবুর রহমান ছিলেন অন্যতম।[৩১] ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব তথা পাকিস্তান-প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর পরই তিনি এর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনকে বেগবান করে তোলেন। কিন্তু পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার ৫/৬ মাস পূর্বেই তিনি ১৯৪৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। ঢাকাস্থ আজিমপুর দায়রা শরীফে তাঁর পিতার পদপ্রান্তে তাকে সমাহিত করা হয়। ইন্তেকালের সময় তিনি চার পুত্র ও দুই কন্যা রেখে যান। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হাকিম ইরতিযাউর রহমান ও মেজো পুত্র হাকিম হোসামুর রহমান চিকিৎসা কার্যে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন।

উপরে হাকিম হাবিবুর রহমানের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হয়েছে। এতে প্রসঙ্গক্রমে তাঁর চিকিৎসা সেবা, উর্দু চর্চা এবং সাংবাদিকতা সম্পর্কেও আলোচনা স্থান পেয়েছে এবং তাঁর রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও চিন্তা-চেতনার দিকটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্টরূপে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। তাঁর চিন্তা-চেতনা ও যাবতীয় কর্মকান্ডে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম দিশারীর ভূমিকা পালন করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা তাঁর সমাজ সেবা, ঐতিহ্য-চেতনা এবং ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনার বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করবো।

---

[৩১] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, আবদুর রহিম খন্দকার, টাংগাইলের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬০-৪৬৬; ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৮-৭২।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) হাকিম হাবিবুর রহমানের সম্পূরক সমাজ সেবা

হাকিম হাবিবুর রহমান (১৮৮১-১৯৪৭ খ্রীঃ) ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলিম, বিশিষ্ট মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ, প্রথিতযশা চিকিৎসক, মহান ইতিহাসবিদ এবং সমাজ সংস্কারক ও সমাজ সেবক। বিভিন্নভাবে মুসলিম সমাজের সেবা করাই ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। মূলতঃ সমাজ সেবার মাধ্যমে তিনি মুসলিম সমাজের জাগরণ ও সার্বিক উন্নতি প্রত্যাশা করেছিলেন। সত্যিকার অর্থে রাজনীতি ও সমাজ সেবাকে তিনি কখনও পৃথক ভাবতেন না। তিনি প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ব্যাপী সমাজ সংস্কার ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রণী ছিলেন এবং খোশবাস [১] হিসেবে ঢাকাস্থ মুঘল যুগীয় ঐতিহ্যের শেষপর্বের একজন প্রতিনিধি ছিলেন।

হাকিম হাবিবুর রহমান মুসলিম বাংলার একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁকে বাদ দিয়ে তদানীন্তন ঢাকা কেন্দ্রিক মুসলিম রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজ সেবার কথা ভাবাই যায় না। বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পূর্ব-বাংলায় নবাব স্যার সলীমুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে যে মুসলিম জাগরণ ও মুসলিম রাজনীতি গড়ে উঠেছিল, হাকিম হাবিবুর রহমান ছিলেন তার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। তাঁর ঢাকা কেন্দ্রিক সাংবাদিকতা ও সমাজসেবা বাংলার জাতীয় জাগরণে বিশিষ্ট ভূমিকা রেখেছে। তাঁর রচনাবলীর সৌজন্যে ঢাকার ঐতিহ্য ও শান-শওকত জনসমক্ষে অনেকটা ফুটে উঠেছে। উর্দু সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্র এবং এর মাধ্যমে সমাজসেবার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান কম নয়।[২] এখন আমরা তাঁর সমাজ সেবার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবো।

---

১ খোশবাস বা সুখবাস, ঢাকায় বসবাসকারী সে সব লোক যারা মুঘল গভর্নরদের সঙ্গে এখানে আগমন করেন, যাদের ভাষা উর্দু এবং সাধারণতঃ পরিশীলিত রুচি ও সংস্কৃতির অধিকারী। [হাকিম হাবিবুর রহমান, ঢাকাঃ পচাস বরস পহ্‌লে, লাহোর, ১৯৪৫, পৃঃ ১৬; S. M. Taifoor, Glimpses of old Dhaka, Dacca, 1956 (2nd ed.), P. 71.

২ এ. জেড. এম. শামসুল আলম, মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

হাকিম হাবিবুর রহমান আখুন্‌যাদা ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইউনানী চিকিৎসক ।[৩] তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপী জনসাধারণের চিকিৎসা সেবায় রত ছিলেন এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে এবং অনেক সময় নিজের পকেট থেকে টাকা খরচ করে তাদেরকে মৃত্যুর ছোবল থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন । ইউনানী চিকিৎসার মাধ্যমে দেশ ও সমাজ সেবার যে আদর্শ তিনি রেখে গেছেন তা অক্ষয় ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে । এই মহান ব্যক্তি বাংলাদেশে ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে যে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখে গেছেন, তার ঋণ শোধ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয় ।[৪]

প্রসঙ্গক্রমে একটি প্রশ্ন এসে যায়, কেন তিনি ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী হতে চাইলেন? জবাবে বলা যায়, এ দূরদর্শী মানুষটি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলিমদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাকে ইংরেজ বেনিয়ারা ধ্বংস করে ফেল্‌ছে । ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রও এর ব্যতিক্রম ছিলনা । কাজেই মুসলিম চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী হাকিম হাবিবুর রহমান মুসলিমদের ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের এ দুরবস্থা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হন । আর এ কারণে তিনি নিজে এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে এ শাস্ত্রকে গৌরবের উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন ।

একথা সন্দেহাতীত সত্য যে, চিকিৎসা বিজ্ঞান ধর্মীয় সংস্কৃতির দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত । সে কারণে প্রায় সকল ধর্মের অনুসারীদের একটা স্বতন্ত্র চিকিৎসা পদ্ধতি চালু রয়েছে । মুসলিমগণ ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির প্রসারের জন্য ব্যাপক ও বহুমুখী প্রচেষ্টা চালিয়েছেন বিধায় এ চিকিৎসা পদ্ধতিকে ইসলামী চিকিৎসাশাস্ত্রও বলা হয়ে থাকে । এ শাস্ত্রটি মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল । এর অগ্রগতি ও বিকাশের লক্ষ্যে ইবনে সিনা, জাকারিয়া আল্ রাজী, ইবনুন নাফিসসহ প্রাচ্যের অনেক মনীষী

---

[৩] হাকিম হাবিবুর রহমান, ঢাকাঃ পচাস্ বরস পহ্‌লে, প্রাগুক্ত, খাজা নাযিমুদ্দীন লিখিত ভূমিকা, পৃঃ ২; প্রস্‌পেক্টাস, তিব্বিয়া হাবীবিয়া কলেজ, ঢাকা, পৃঃ ২, ৬ ।

[৪] আবু তোহা, 'হাকীম হাবিবুর রহমান,' দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ৩ রা মার্চ, ২০০০ ।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপক চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় রেনেসাঁর জোয়ারে মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এ চিকিৎসা শাস্ত্র ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়।[৫]

ভারতীয় উপমহাদেশে আয়ুর্বেদিক (কবিরাজী) ও ইউনানী (হাকিমী) চিকিৎসা পদ্ধতির বেশ জনপ্রিয়তা ছিল। কিন্তু বৃটিশরা ক্ষমতা দখলের পর তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে ও দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ধ্বংস করে দেয়ার মানসে একচেটিয়াভাবে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগ করতে থাকে এবং এলোপ্যাথিক ঔষধ বাজারজাত করতে থাকে। ফলে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি রাজদ্রোহের কবলে পড়ে অবনতির চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। কিন্তু এদেশের হাকিম ও কবিরাজদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ চিকিৎসা পদ্ধতি একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি। ইউনানী বা হাকীমী চিকিৎসা পদ্ধতিকে পুনরুদ্ধার করে একে আরও গতিশীল করার মানসে ভারতে হাকিম আজমল খান ও হাকিম আবদুল মজিদ এবং বাংলা প্রদেশে হাকিম হাবিবুর রহমান এক ব্যাপক ও বহুমুখী প্রচেষ্টা চালান। ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের চরম দুর্দিনে এ মহান ব্যক্তির সংস্পর্শ পেয়ে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে এ চিকিৎসা শাস্ত্র নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।[৬]

হাকিম হাফেজ আজীজুল ইসলাম অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উপমহাদেশে ইউনানী চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রসারে ও মর্যাদা বর্ধনে দিল্লীর 'খান্দানে শরীফী' (হাকিম শরীফ খানের পরিবার)-এর অবদান অপরিসীম। এ পরিবারের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হাকিম হাফেজ আজমল খান, যাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় সর্পগন্ধা থেকে উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় কার্যকর সক্রিয় উপাদান 'আজমালীন' আবিষ্কৃত হয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়। দেশীয় চিকিৎসার শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক

---

[৫] আবু তোহা, পূর্বোক্ত।
[৬] আবু তোহা, পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মানের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যে স্থাপিত দিল্লীর 'আয়ুর্বেদ এন্ড ইউনানী তিব্বিয়া কলেজ' হাকিম আজমল খানের এক অমর কীর্তি। ঠিক তেমনি উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে ইউনানী চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের জন্যে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন ঢাকা তথা বাংলার অন্যতম কৃতী সন্তান 'শেফাউল্-মুল্ক' হাকিম হাবিবুর রহমান খান, যাঁর একক প্রচেষ্টায় ঢাকার বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইউনানী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ'।[৭]

হাকিম হাবিবুর রহমান অনুধাবন করলেন যে, বাংলার আলিম সমাজের বেকার সমস্যা সমাধানের উত্তম পন্থা হল - এ দেশে ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ। তাই তিনি প্রথমে সরকারী উদ্যোগে কলকাতা ও ঢাকায় দু'টি তিব্বিয়া কলেজ স্থাপনের চেষ্টা করেন। এতদুদ্দেশ্যে ১৯২১ সালে সরকারী নির্দেশনায় একটি পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়। হাকিম হাবিবুর রহমান ছিলেন উক্ত কমিটির একজন প্রভাবশালী সদস্য। কমিটির অন্যতম সদস্য হিসাবে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের সকল ইউনানী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তিব্বে ইউনানীর সকল সমস্যা সম্পর্কে সম্যক অবগত হন। উক্ত কমিটি সরকারের নিকট কলকাতা ও ঢাকায় দু'টি তিব্বিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। তবে তদানীন্তন সরকার উক্ত সুপারিশ নীতিগতভাবে মেনে নিলেও আর্থিক অসুবিধার অজুহাতে তা বাস্তবায়িত করেনি। কিন্তু হাকিম হাবিবুর রহমান এতে হতোদ্যম হননি। তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকার ছোট কাটরায় তাঁর নামে নামাংকিত 'হাকিম হাবিবুর রহমান রোডের' এক বাড়ীতে বাংলা-আসামের

---

[৭] হাকীম হাফেজ আজীজুল ইসলাম, ইউনানী চিকিৎসা-বিজ্ঞান, শেফা দাওয়াখানা ইউনানী, ঢাকা-১২১১, ২০০১ খ্রীঃ, পৃঃ ৯।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বপ্রথম ইউনানী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮] হাকিম হাবিবুর রহমান আজীবন এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি সাধন করেন।[৯] কলেজটি অচিরেই তদানীন্তন বাংলা, আসাম, বিহার সরকারের স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলা সরকার ছয়টি সরকারী বৃত্তি মঞ্জুর করেন। বিভিন্ন জেলা বোর্ডও ছাত্রবৃত্তি মঞ্জুর করে। উল্লেখ্য, অবিভক্ত বাংলার তদানীন্তন গভর্নর লর্ড ফ্রেডারিক বোর্ন ১৯৪৪ সালে তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন। কলেজটি বর্তমানে ২৫নং উমেশ দত্ত রোড, বখশী বাজার, ঢাকায় খরিদ করা নিজস্ব ভবনে অবস্থিত। কলেজ ভবনটি পুনঃনির্মাণ করে আবাসিক হাসপাতাল সুবিধাসহ 'হাকীম হাবিবুর রহমান কমপ্লেক্স' নামে একটি বহুতল ভবন গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।[১০]

প্রাথমিক পর্যায়ে তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হাকিম হাবিবুর রহমানের আর্থিক সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে হাকিম হাফেজ আজীজুল ইসলাম বলেন যে, তিনি সে সময় (১৯৩০ খ্রীঃ) তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল হতে যে দশ হাজার টাকা খরচ করে কলেজের নিজস্ব ভবন তৈরী করেন, ১৯৯৬ খ্রীঃ বর্তমান কলেজ ভবন ক্রয় করার সময় সেই পুরাতন ভবনটি কলেজ কর্তৃপক্ষ পঞ্চান্ন লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দেয়। অর্থাৎ কলেজ কর্তৃপক্ষ মূলতঃ তাঁর ঐ দশ হাজার টাকার বদৌলতেই বর্তমানে এ ভবন ক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে।[১১]

---

৮ ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ই. ফা.বা., ঢাকা, জুন ১৯৯১, পৃঃ ১৩৪।

৯ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : আবুল লায়েস আনসারী, আল্-হাকীম, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭।

১০ হাকীম হাবিবুর রহমান জন্মবার্ষিকী স্মারক-২০০৪, পৃঃ ৪-৫; হাকীম হাফেজ আজীজুল ইসলাম, 'শেফাউল-মুল্ক হাকীম হাবিবুর রহমান,' ত্রৈমাসিক 'আল-হাকীম', জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৪, পৃঃ ৯-১০।

১১ হাকিম হাবিবুর রহমানের ৫২-তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে হাকিম হাফেজ আজীজুল ইসলামের বক্তব্য,' ত্রৈমাসিক 'আল-হাকীম', জানুয়ারী-জুন, ১৯৯৯, পৃঃ ৬-৭।

Dhaka University Institutional Repository

'তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ' প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলাদেশে অনেক দক্ষ হাকিম সৃষ্টি হয়। তাঁদের চেষ্টা ও সেবা কার্যের ফলে ইউনানী চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেশের ও সমাজের অনেক কল্যাণ সাধিত হয়েছে এবং বর্তমানেও এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। এ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানটি বাংলার বহু বেকার আলিমকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে, আর দুঃস্থ ও পীড়িত লোকের সামনে উপস্থিত করেছে আরোগ্য লাভের সুবর্ণ সুযোগ।[১২] মাওলানা আকরম খাঁ হাকিম হাবিবুর রহমানের সমাজ সেবা ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত উক্ত কলেজ সম্পর্কে মন্তব্য করেন :

> "ঢাকার স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক ও পন্ডিত মাননীয় হাকীম হাবিবুর রহমান ছাহেব সেখানে একটি উচ্চ শ্রেণীর তিব্বিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাক্সর্বস্ব বাংগালী মুছলমান নেতাদিগের সম্মুখে সমাজ সেবার যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সকলের অনুকরণীয় এবং মুছলমান সমাজের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সহানুভূতি লাভের যোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রধানতঃ হাকিম ছাহেবের চেষ্টায় দিন দিন যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়া চলিয়াছে, তাহা দেখিয়া খুবই আশার সঞ্চার হয়। আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা, হাকিম ছাহেব যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে তাঁহার আশানুরূপভাবে গঠন করিয়া যাইতে সমর্থ হউন।"[১৩]

হাকিম হাবিবুর রহমান দুরারোগ্য রোগের সহজ চিকিৎসার জন্য বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি তিব্বে ইউনানীর মাধ্যমে দেশ ও সমাজের নিরলস সেবা করে গেছেন। অসংখ্য জটিল রোগে আক্রান্ত বহু রোগী তাঁর সুযোগ্য চিকিৎসা সেবার দ্বারা আরোগ্য লাভ করেছে। তাঁর আবিষ্কৃত যক্ষা, রক্তচাপ ও কলেরা রোগের কয়েকটি ঔষধ বহু রোগীকে ব্যাধিমুক্ত করেছে, যা রোগীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করেছে।[১৪] তাঁর চিকিৎসা বিষয়ক দক্ষতার বর্ণনা প্রসঙ্গে সৈয়দ সুলায়মান নদভী বলেন যে, হাকিম হাবিবুর রহমান তীক্ষ্ণ জ্ঞান সম্পন্ন

---

[১২] ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৪।
[১৩] মাসিক মোহাম্মদী, ৭ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪১ (৯৩৪ খৃঃ), পৃঃ ৮৮১।
[১৪] আবুল লায়েস আন্সারী, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসক ছিলেন; লক্ষণ দেখে এবং শিরা ধরেই তিনি রোগ নির্ণয় করতে পারতেন। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন পাকা উস্তাদ। রোগীর চেহারা দেখে ও মৌখিক বিবরণ শুনে তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।[১৫]

সৈয়দ সুলায়মান নদভী হাকিম হাবিবুর রহমানের চিকিৎসা দক্ষতা সম্পর্কে ব্যক্তিগত একটি ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, কয়েক বছর পূর্বে তিনি (নদভী) একদা বেতারে ভাষণ দিচ্ছিলেন। হাকিম সাহেব তখন ঢাকা হতে তাঁকে জানালেন - তিনি বেতারে তাঁর (নদভীর) বক্তৃতা শুনেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁর হৃদপিন্ড খুবই দুর্বল। তাই হাকিম সাহেব তাঁকে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বললেন। ব্যাপারটি তাই হল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নদ্‌ভী সাহেব এ ধরনের একটি অসুখে আক্রান্ত হলেন। আল্লাহ্ তাঁকে তা থেকে পরে অব্যাহতি দিয়েছেন।[১৬]

নবাব স্যার সলীমুল্লাহ্ এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে হাকিম হাবিবুর রহমানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি ছিলেন মূলতঃ নওয়াব বাহাদুরের রাজনৈতিক সচিব এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে দক্ষিণ হস্ত। তাই ঢাকার সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকদের সাথে তাঁর সখ্যতা গড়ে উঠে। নবাব স্যার সলীমুল্লাহ্ তাঁকে পারিবারিক চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ দেন। সেই সূত্রে তিনি চিকিৎসার মাধ্যমে সমাজ সেবার ব্যাপক সুযোগ পান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজের সাথে একটি দাওয়া খানা ছিল। সেখান থেকে গরীব ও দুঃস্থ রোগীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান করা হত।[১৭] তিব্বে ইউনানী শাস্ত্রে তাঁর মহান সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ বৃটিশ সরকার তাঁকে ১৯৩৯ সালে 'শেফাউল মুল্‌ক' (দেশের রোগ মুক্তি) খেতাবে ভূষিত করেন। ঢাকা

---

[১৫] সৈয়দ সুলায়মান নদভী, মাসিক আল্-মাআরিফ, প্রাগুক্ত,পৃঃ ৩১৪।

[১৬] সৈয়দ সুলায়মান নদভী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১৪-১৫।

[১৭] হাকিম হাবিবুর রহমান, ঢাকা : পচাস্ বরস্ পহ্‌লে, প্রাগুক্ত, খাজা নাজিমুদ্দীন লিখিত ভূমিকা, পৃঃ তের-চৌদ্দ।

Dhaka University Institutional Repository

মিউনিসিপ্যালিটি তাঁর দেশ, সমাজ ও জনসেবার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর নামানুসারে ছোট কাট্‌রার একটি রোডের নামকরণ করেন 'হাকীম হাবীবুর রহমান রোড'। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ যখন পাকিস্তান অর্জনের উদ্দেশ্যে সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণের কর্মসূচী পেশ করলেন এবং বৃটিশ সরকারের দেয়া সকল খেতাব বর্জনের সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন হাকিম হাবিবুর রহমানও সানন্দে সে বছর সেপ্টেম্বরে তাঁর 'শেফাউল মুলক' খেতাব বর্জন করেন।[১৮]

ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানকে জনগণের মাঝে পরিচিত করে তোলার লক্ষ্যে হাকিম হাবিবুর রহমান তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজের মুখপত্র হিসেবে ১৯৩৮ সালে 'শেফা' নামক একটি মাসিক ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান পত্রিকা বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন। এটি ছিল ঐ সময়ের জন্য একটি সাহসী উদ্যোগ। কয়েক বছর প্রকাশিত হওয়ার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে হাকিম আজীজুল ইসলামের সম্পাদনায় এটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। কিন্তু একটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটি আবার বন্ধ হয়ে যায়। [১৯] চিকিৎসা সেবা করার পাশাপাশি হাকিম হাবিবুর রহমান মুসলিমদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্যও আন্দোলন করেছেন। তিনি ঢাকা জাতীয় যাদুঘরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। উল্লেখ্য যে, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন। [২০]

হাকিম হাবিবুর রহমান সুষ্ঠুভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করতে হলে হাকিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ শাস্ত্রের উন্নয়ন লাভ ঘটবে। এ মহান উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩৮ সালে মতান্তরে ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন

[১৮] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, হাকীম হাবীবুর রহমান, ই.ফা.বা., ঢাকা, ১৯৮১, পৃঃ ৬৬।
[১৯] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, হাকীম হাবীবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৬।
[২০] হাকীম হাবিবুর রহমান জন্ম বার্ষিকী স্মারক, শেফাউল মুল্‌ক হাকীম হাবিবুর রহমান ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

'আঞ্জুমান-এ-আতিব্বা-এ-বাংগালা ওয়া আসাম' অর্থাৎ 'ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলা এন্ড আসাম'। এ সমিতির মাধ্যমে তিনি হাকিম সমাজকে সংগঠিত করেন। এ সমিতির অধীনে গঠিত হয় অবিভক্ত বাংলার 'স্টেট ফ্যাকাল্টি অব্ ইউনানী মেডিসিন'। দেশের নামকরা হাকিমগণ এ ফ্যাকাল্টির সদস্য ছিলেন। হাকিম সাহেবের স্মৃতি-বিজড়িত সেই সংগঠনটি 'আঞ্জুমান-এ-আতিব্বা-এ-বাংলাদেশ' অর্থাৎ 'বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন' নামে আজও টিকে আছে।[২১] ত্রৈমাসিক 'আল্ হাকিম' এ সংগঠনেরই বহুল পঠিত মুখপত্র।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক অধ্যাদেশ, ১৯৮৩-এর মাধ্যমে ইউনানী ও আয়ুর্বেদ উভয় চিকিৎসা পদ্ধতি বাংলাদেশে সরকারীভাবে স্বীকৃত। উক্ত অধ্যাদেশ মোতাবেক সরকার কর্তৃক গঠিত 'বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী এন্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেম্স অব মেডিসিন' (বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিষয়ক বোর্ড) সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি প্রণীত বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতেও ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ডিগ্রী কোর্সের একটি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ডিপ্লোমা কোর্সের নয়টি ইউনানী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন অনুযায়ী সরকারী স্বীকৃতি ও মঞ্জুরী প্রাপ্ত। এগুলোর মধ্যে ঢাকার মীরপুরে সরকারী ইউনানী-আয়ুর্বেদিক ডিগ্রী কলেজ ও হাসপাতাল ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে সেখানে যথারীতি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ডিগ্রী কোর্সের শিক্ষা কার্যক্রম চল্ছে এবং কলেজটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাফিলিয়েশনও লাভ করেছে।[২২] বলা বাহুল্য, সরকারী পর্যায়ে উক্তসব পদক্ষেপের শুভ-পরিণতি হিসেবে দেশে

---

[২১] আবু তোহা, প্রাগুক্ত; মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬-৬৭।
[২২] হাকীম হাফেজ আজীজুল ইসলাম, ইউনানী চিকিৎসা-বিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

সার্বিকভাবে ইউনানী চিকিৎসার ব্যাপক প্রসারের পথ সুগম হবে, এর মান উন্নত হবে, ইউনানী চিকিৎসকদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং ইউনানী কলেজ থেকে ডিগ্রী-ডিপ্লোমা কোর্সের পাশ করা চিকিৎসকদের জন্য সরকারী, আধা-সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে কর্মসংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি হবে। আর এসবের মূলে যিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন, তিনি হলেন 'শেফাউল মুল্ক' হাকিম হাবিবুর রহমান।

হাকিম হাবিবুর রহমান ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের চরম দুর্দিনে যে ভূমিকা রেখেছিলেন, তা আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এ মহামনীষীর সন্তানগণও পিতার মহান আদর্শকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে স্বীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাকিম ইরতিযাউর রহমান এবং মেঝো পুত্র হাকিম হোসামুর রহমান পিতার প্রতিষ্ঠিত সেই তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজের অধ্যক্ষসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর অপর পুত্রদ্বয় যথাক্রমে ই. আর. খান ও এহ্তেশাম উর রহমান 'হাকিম হাবিবুর রহমান ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করে এ শাস্ত্র বিকাশে ভূমিকা রেখে চলেছেন।[২৩] এ প্রসঙ্গে 'হাকীম হাবিবুর রহমান জন্মবার্ষিকী স্মারক-২০০৪'-এ বলা হয়েছে :

> "Hakim Habibur Rahman Foundation is named after the great soul of Late Shefa-ul-Mulk Hakim Habibur Rahman Khan Akhunzada who besides being an illustrious political thinker of undivided India and a historian of repute was one of the pioneers in popularising the uncommon heritage in Unani System of Medicine in this sub-continent and served humanity all throughout his life. Late Hakim Shaheb developed the

[২৩] দৈনিক সংগ্রাম, ৩রা মার্চ, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

> Unani System of Medicine in this part of the sub-continent of which Late Hakim Ajmal Khan of Delhi was the Architect. Late Hakim Shaheb spent the last drop of his blood to explore the natural resources gifted by the Almighty Allah and utilize the same for the humanity. His son E.R. Khan established the Foundation to augment his father's effort to make fundamental research on Herbal/Unani which traces its origin in Greek and Egyptian Civilization giving birth later on the Muslim way of treatment."[২৪]

জাতি ও সমাজের প্রতি অকৃত্রিম দরদের কারণে হাকিম হাবিবুর রহমান ইউনানী চিকিৎসা পেশায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেননি। মুসলিম জাতির দুর্দশা দেখে তিনি সক্রিয় রাজনীতির মাধ্যমে দেশ ও সমাজ সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন মুসলিম সমাজ ও স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল স্যার সৈয়দ আহমদ, নওয়াব আবদুল লতীফ, সৈয়দ আমীর আলী ও নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ্‌র চিন্তাধারার অনুরূপ।[২৫] রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ্‌র দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ।[২৬]

মুসলিম জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হাকিম হাবিবুর রহমানের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল পূর্ব-বাংলা ও আসামের মুসলিমগণও শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থ-সামর্থ্য ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের পাশাপাশি উন্নতি লাভ করুক এবং রাজনৈতিকভাবেও সংঘবদ্ধ হোক। তিনি মনে-প্রাণে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ও মুসলিম

---

[২৪] হাকীম হাবিবুর রহমান জন্মবার্ষিকী স্মারক–২০০৪, পৃঃ ২।

[২৫] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌, রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা, ই.ফা.বা., ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ১৬৪।

[২৬] ইতোপূর্বে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতির মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক ও সর্বভারতীয় মুসলিম ঐক্য স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন।[২৭] এ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তিনি ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকা থেকে 'আল্-মাশরিক' (প্রাচ্য) নামক একটি মাসিক উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম পূর্ববঙ্গ ও আসামে উর্দু সাংবাদিকতার সূচনা করেন এবং সাথে সাথে পূর্ব-বাংলা ও আসামের মুসলিমদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয় প্রেরণা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। এটা ছিল তদানীন্তন পূর্ব-বাংলা ও আসাম প্রদেশের মুসলিমদের একমাত্র জাতীয় পত্রিকা ।[২৮]

এতদ্ব্যতীত তিনি খাজা আদিলের সহযোগিতায় ১৯২১ সালে (মতান্তরে ১৯২৩ সালে) 'জাদু' (মন্ত্র) নামক একটি মাসিক উর্দু পত্রিকা ঢাকা থেকে প্রকাশ করেছেন। এটি ছিল পূর্ব-বাংলা ও আসামের দ্বিতীয় উর্দু পত্রিকা। এটি দীর্ঘকাল চালু ছিল এবং সমগ্র উপমহাদেশের উর্দু প্রেমিকদের মধ্যে পত্রিকাটির কদর এবং প্রচার সংখ্যাও ছিল ব্যাপক।[২৯] এভাবে তিনি রাজনীতির পাশাপাশি সাংবাদিকতার মাধ্যমেও দেশ, জাতি ও সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং মুসলিম জাগরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন।

হাকিম হাবিবুর রহমান হিন্দু নেতাদের মুসলিম স্বার্থ বিরোধী কোন নীতি, বিবৃতি বা ভাষণ নীরবে সহ্য করতেন না। তৎকালীন হিন্দু নেতা গোখ্‌লে সারা ভারতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। অথচ তাঁর ভাষণে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ভঙ্গেরই বীজ নিহিত থাকতো। মুসলিমদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের বিলোপ সাধন করে ধর্ম নিরপেক্ষ সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের শিক্ষাই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। তাই হাকিম হাবিবুর রহমান গোখ্‌লের কয়েকটি বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করে প্রকারান্তরে মুসলিমদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের চেতনাকে

---

[২৭] ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৪।

[২৮] পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৫।

[২৯] আবদুস সোবহান, 'আরবি ফার্সি উর্দু সাহিত্য', বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), তৃতীয় খন্ড, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৪০৬-৪০৭।

Dhaka University Institutional Repository

জাগিয়ে তোলেন। এভাবে তিনি মুসলিম সমাজের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।[৩০]

শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম জাতি ও সমাজের দূরবস্থা ও পশ্চাদ্পদতা হাকিম হাবিবুর রহমানকে সব সময় ভাবিয়ে তুল্ত। তিনি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, মুসলিম সমাজের পশ্চাদ্পদতা ও দূরবস্থার মূল কারণ হল শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অনীহা ও অনগ্রসরতা। এ ক্ষেত্রে তিনি নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ্র অনুবর্তী ছিলেন। মূলতঃ নওয়াব সলীমুল্লাহ্ মুসলিম সমাজের উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হিসেবে শিক্ষার উন্নয়নের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে যে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তাতে হাকিম হাবিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল। সত্যিকার অর্থে হাকিম হাবিবুর রহমানের পরামর্শকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতেন। শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত না হলে মুসলিম সমাজ ও সম্প্রদায় পশ্চাদ্পদ ও দুর্বল থাকবে এবং অধিকতর উন্নত জাতিসমূহের দ্বারা শোষিত হবে- হাকিম সাহেবের এরূপ মনোভাবের প্রতিধ্বনি করেই এ. কে. ফজলুল হক বলেন : 'The leaders of the Muslim Community... realised that unless there was rapid development of education, the Muslim Community would remain backward and would continue to be exploited by more advanced Communities.'[৩১]

দারিদ্রের কশাঘাতে জর্জরিত ও অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে মুসলিমগণ হিন্দু মহাজন বা হিন্দু উকিল-আমলার সামনে মাথা নোয়াবে- এটা তাঁর কাছে ছিল বেদনাদায়ক। তাই তিনি মুসলিম সমাজে শিক্ষার বিস্তারে আত্ম নিয়োগ করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে ঢাকার মুসলিম মহল্লা-সমূহে নৈশ বিদ্যালয়

---

[৩০] হাকিম হাবিবুর রহমান, মাসিক আল্ মাশরিক, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯০৭।

[৩১] Zainul Abedin, A. K., Memorable Speeches of Sher-e-Bangla, Barisal, 1978, P. 146.

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপন করেন। তাছাড়া তিনি শিক্ষা তহবিল গঠনেও মনোযোগী হন।[৩২] তিনি একথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, রাজনীতির চেয়ে শিক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশী। তাই তিনি শিক্ষাকে রাজনীতির উর্ধ্বে স্থান দেন।[৩৩] এভাবে তিনি শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজ সেবায় আত্ম নিয়োগ করেন। তাঁর এ চিন্তা-চেতনা নওয়াব সলীমুল্লাহ্‌কে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই তিনি বলেন : 'To my mind, what is more urgently needed for our community than any politics is a combined effort on the part of all our leaders to spread education in all its branches amongst the various sections of our community'[৩৪]

মুসলিম সমাজে শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার বিষয়ক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নওয়াব সলীমুল্লাহ্ ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে ঢাকায় 'নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র অধিবেশন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন এবং পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা-চেতনার সৃষ্টি ও শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ১৯০৬ সালের এপ্রিলে স্যার সৈয়দ আহমদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'মোহামেডান এডুক্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স'-এর শাখা হিসেবে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে হাকিম হাবিবুর রহমান তাঁর দক্ষিণ হস্তের ন্যায় কাজ করেছেন এবং উভয়ে সম্মিলিতভাবে শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি হয়েছে।[৩৫]

---

৩২ ঢাকা প্রকাশ, ৩রা চৈত্র, ১৩১৩/১৭ই মার্চ, ১৯০৭; Syed Muhammed Taifoor, Glimpses of old Dhaka, Dacca, 1956, P. 328.

৩৩ দেখুন, Sharifuddin Pirzada (ed.), Foundation of Pakistan (1906-1924), vol. 1, Karachi, 1969, P. 247.

৩৪ উদ্ধৃত: Sharifuddin Pirzada (ed.), Ibid, P. 247.

৩৫ ঢাকা প্রকাশ, ১২ই মার্চ, ১৯১০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি কেবল আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের প্রতিই মনোযোগ দেয়নি, এর পাশাপাশি প্রাচ্যশিক্ষা তথা আরবী, ফার্সী ও উর্দু শিক্ষার সুযোগ-সুবিধে দেয়ার জন্যেও সমিতির কর্মকর্তাগণ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সমিতির নেতৃবৃন্দ নিছক লোকায়ত শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁরা ধর্ম শিক্ষা ও লোকায়ত শিক্ষার মধ্যে একটি সুন্দর সমন্বয় চেয়েছিলেন।[৩৬] ১৯১৫ সালে গোটা বঙ্গদেশে যে 'Reformed New-Scheme Madrasah' শিক্ষা প্রবর্তিত হয়, সেই শিক্ষা-পদ্ধতির কাঠামো রচনায় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' অনেকটা মৌলিক ও একক ভূমিকা পালন করেছিল। সমিতির নেতৃবৃন্দ ভাবলেন - লোকায়ত শিক্ষার দিকেও সাধারণ মুসলিমরা ঝুঁক্‌ছেন, আবার অন্যদিকে যুগের অনুপযোগী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাও তাদের বাস্তব ও বৈষয়িক জীবনে তেমন কাজে আসছে না। একদিকে হিন্দুরা আধুনিক শিক্ষা লাভ করে চাকরি-বাকরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে এগিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে মুসলিমরা সাধারণ মান্ধাতা আমলের আরবী-ফার্সী-উর্দু শিক্ষা আঁকড়ে ধরে প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। ১৯০৬ সালের এপ্রিলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির ১ম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে নওয়াব সলীমুল্লাহ শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিমদের এ অনগ্রসরতার কারণ বর্ণনা করে বলেন :

> "It is notorious that the Mahomedans in general, and of this province in particular, are very backward when judged by the modern standard of education. The learned men and the leaders of community in the past thought that religious education imparted through the medium of Arabic and Persian was all that a true Mahomedan should possess. They thought that western culture would denationalize them and make them profane... But the

---

[৩৬] Report of the proceedings of the fourth Provincial Mahomedan Educational Conference, 1911, P.9.

Dhaka University Institutional Repository

effect of this policy is now being seriously felt by the present generation and we find Mahomedans left behind in the race of life on account of their not being abreast of modern thought and being ill-equipped with the more advanced theories and methods demanded by modern times"[৩৭]

এমতাবস্থায় নেতৃবৃন্দ প্রাচ্য সভ্যতাধারী ও পাশ্চাত্য সভ্যতাবাহী শিক্ষা ব্যবস্থাদ্বয়ের সমন্বয়ে 'Reformed New-scheme Madrasah' শিক্ষা প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এতদুদ্দেশ্যে প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির ১ম অধিবেশনেই নওয়াব শামসুল হুদা মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং হাকিম হাবিবুর রহমান তা সমর্থন করেন।[৩৮] প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপ :

"Resolved that in the opinion of this conference the education imparted in the Madrasahs requires reform, and that a committee be formed of the following gentlemen to consider the measures that may be necessary for the purpose of reorganizing the Madrasahs on such lines as will provide for the students of those Institutions a three-fold choice of studies"[৩৯]

এ প্রস্তাব অনুসারে মাওলানা আবু নসর মুহাম্মদ ওহীদকে সদস্য সচীব করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি বিভিন্ন সময়ে ও

---

[৩৭] Report of the Proceedings of the first session of the Provincial Mahomedan Educational Conference, 1906, P. 8 ; মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, নওয়াব সলীমুল্লাহ্ ঃ জীবন ও কর্ম, ই.ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৬ পৃঃ ২৩৯ , Presidential Address: Nawab Sir Salimullah, পরিশিষ্ট্য-৩,

[৩৮] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, নওয়াব সলীমুল্লাহ : জীবন ও কর্ম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৮-২৯।

[৩৯] Ibid, Resolution No.11, P. 13.

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করে সর্বশেষে ১৯১৫ সালে কাংক্ষিত সফলতা অর্জন করে। এক্ষেত্রে হাকিম হাবিবুর রহমানের প্রচেষ্টা ও অবদান ছিল অনস্বীকার্য।[৪০]

হাকিম হাবিবুর রহমান জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তৎকালীন ঢাকা পৌরসভার কর্মকান্ডের সঙ্গে কমিশনার হিসেবে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[৪১] আর সেই সুবাদে তিনি সমাজ উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং সমাজ সেবার মহান ব্রত নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে তদানীন্তন ঢাকাবাসীর খিদমতে আত্ম নিয়োগ করেন। তাঁর সমাজ সেবা বিষয়ক বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডে ঢাকাবাসী মুগ্ধ ছিলেন। ফলে তৎকালীন ঢাকা পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রাইমারী স্কুলের নামকরণ করা হয় 'শেফাউল-মুল্‌ক ফ্রি প্রাইমারী স্কুল'।[৪২] তাঁর সমাজ সেবা বিষয়ক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ চকমোগলটুলী থেকে ছোট কাটারা হয়ে সোয়ারীঘাট রোড পর্যন্ত বিস্তৃত সড়কটির নামকরণ করা হয়েছে 'হাকীম হাবিবুর রহমান রোড'।[৪৩] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক বিভাগ ২০০৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী হাকিম হাবিবুর রহমানের ৫৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং তাঁর কর্মময় জীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর ছবি সম্বলিত আট টাকা মূল্যমানের স্মারক ডাক টিকেট এবং ছয় টাকা মূল্যমানের উদ্বোধনী খাম প্রকাশ করে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার মোঃ আমিনুল হক ডাকভবন সভাকক্ষে তা আনুষ্ঠানিকভাবে অবমুক্ত করেন।[৪৪] এছাড়া ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে হাকীম হাবিবুর রহমান স্মরণে একটি ঔষধি-বৃক্ষ-উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাঁর দেশ ও সমাজ সেবার

---

৪০ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: Report of the Moslem Education Advisory Committee, 1934, PP. 76-77; ঢাকা প্রকাশ, ২৯শে চৈত্র, ১৩২০/১২ই এপ্রিল, ১৯১৪।

৪১ ত্রৈমাসিক আল্‌-হাকিম, জানুয়ারী–মার্চ, ২০০৪, পৃঃ ১১; হাকীম হাবিবুর রহমান জন্ম বার্ষিকী স্মারক–২০০৪, পৃ: ৬।

৪২ ত্রৈমাসিক আল্‌-হাকীম, জানুয়ারী–মার্চ, ২০০৩, পৃঃ ৩৬।

৪৩ ত্রৈমাসিক আল্‌-হাকীম, জানুয়ারী–মার্চ, ২০০৪, পৃঃ ১১; হাকীম হাবিবুর রহমান জন্মবার্ষিকী স্মারক, ২০০৪, পৃঃ ৬।

৪৪ ত্রৈমাসিক আল্‌-হাকীম, জানুয়ারী–মার্চ, ২০০৩, পৃঃ ১৫, ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকৃতিস্বরূপ পরিবেশ ও বনমন্ত্রী জনাব শাজাহান সিরাজ এর উদ্বোধন করেন ।[৪৫]

হাকিম হাবিবুর রহমান ঢাকার কুর্মিটোলা এলাকায় ২০০ একরেরও অধিক জায়গা নিয়ে একটি ভেষজ উদ্যান গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীতে বৃটিশ সরকার সেটি হুকুম দখল করে ঢাকা সেনা নিবাসের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়। তিনি ১৯৩৩ সালে ঢাকা পৌরসভার নিকট থেকে আগা ছাদেক রোডে বর্তমান বাংলাদেশ মাঠের ১.৩৮ একর খালি জমি লিজ বরাদ্দ নিয়েছিলেন তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ ভবনসহ দুর্লভ ভেষজ বাগান গড়ে তোলার লক্ষ্যে। পরবর্তীতে আইয়ুবী সামরিক শাসনামলে সরকারের অনুরোধে হাকিম সাহেবের পরিবারবর্গ তাঁর নামে শিশু পার্ক করার শর্তে উক্ত জমি পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, পৌরসভা কথা রাখেনি ।[৪৬]

হাকিম হাবিবুর রহমান যদিও মুসলিম স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন, কিন্তু হিন্দু বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর কোন ঘৃণা-বিদ্বেষ ছিলনা ।[৪৭] তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে ভালবাসতেন এবং তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করতেন। তাঁর মধ্যে ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামী মোটেই ছিলনা। তাঁর ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ছিল প্রগতিশীল এবং চিন্তাধারা ছিল সংস্কারধর্মী ।[৪৮] তিনি মনে করতেন, যুবকেরা যদি তাদের অবসর সময় ক্লাব বা বৈঠকখানায় গান-বাজনা বা খেলা-ধুলায় অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত চিত্তবিনোদনে অতিবাহিত করে, তবে তাতে দোষের কিছু নেই, বরং এতে তারা কুপথে গমন থেকে রক্ষা পাবে এবং তাদের চরিত্রও কলুষমুক্ত থাকবে ।[৪৯] এতদুদ্দেশ্যে তিনি নিজ খরচে ও উদ্যোগে ঢাকার বিভিন্ন

---

[৪৫] হাকীম হাবিবুর রহমান জন্মবার্ষিকী স্মারক-২০০৪, পৃঃ ৬; ত্রৈমাসিক আল-হাকীম, জানুয়ারী–মার্চ, ২০০৪, পৃঃ ১১ ।

[৪৬] হাকীম হাবিবুর হরমান জন্মবার্ষিকী স্মারক-২০০৪, পৃঃ ৬ ।

[৪৭] পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬ ।

[৪৮] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮ ।

[৪৯] পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮-৬৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

মহল্লায় ক্লাব এবং নৈশ বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন।[৫০] এভাবে তিনি সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

হাকিম হাবিবুর রহমান কোন নবাব-জমিদার শ্রেণীর লোক ছিলেন না। কিন্তু সরকারী-বেসরকারী সকল মহলেই তাঁর পরিচিতি ছিল নবাব-জমিদারদের চেয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী। ঢাকার নবাব পরিবারের অনেক সদস্যও তাঁকে খুব সম্মান করতেন এবং সমীহ করে চলতেন।[৫১] এ ব্যতিক্রমধর্মী মর্যাদা তিনি অর্জন করেছিলেন চিকিৎসক হিসেবে তাঁর অসাধারণ পারদর্শিতা আর সেই সঙ্গে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চা এবং সাংবাদিকতা, রাজনীতি ও সর্বোপরি সমাজ সেবার ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান অবদানের জন্য। তাঁর সমগ্র জীবন যেন মানব সেবা তথা দেশ ও সমাজ সেবারই মূর্তিমান নির্দশন। আর এখানেই একজন একনিষ্ঠ ও নিঃস্বার্থ সমাজ সেবক হিসেবে তাঁর সফলতা।

---

[৫০] ঢাকা : পঁচাস বরস পহ্‌লে, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭০-৭১।
[৫১] পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭০-৭১।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

হাকিম হাবিবুর রহমানের ঐতিহ্য চেতনা এবং ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনা

ক. হাকিম হাবিবুর রহমানের ঐতিহ্য চেতনা

ইতিহাস (history) এবং ঐতিহ্য (heritage) শব্দ দুটির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। বলা চলে একে অন্যের পরিপূরক অথবা সম্পূরক। ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত হতে হলে ইতিহাস সচেতন হতে হবে। অন্যকথায় ইতিহাসের মাধ্যমেই ঐতিহ্য প্রকাশ পায়। ঐতিহ্য হচ্ছে কোন জাতির অতীত গৌরবের সমন্বিত রূপ এবং ইতিহাস হচ্ছে অতীতকে জানার মাধ্যম। সুতরাং ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা কোন জাতির গৌরবময় অতীতকে জানতে পারি, এ সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান অর্জন করতে পারি এবং এ জ্ঞান আমাদের ভবিষ্যৎ বিনির্মান ও ভবিষ্যতের পথনির্দেশ করতে সাহায্য করে। ফলে একজন ঐতিহাসিক বা ইতিহাসবিদকে অবশ্যই ঐতিহ্য সচেতন হতে হবে এবং ঐতিহ্য চেতনা তাঁর মধ্যে সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে চেতনা বলতে আমরা কি বুঝবো। চেতনা (Sense or Consciousness) হচ্ছে হুঁশ বা বোধ বা বুদ্ধি বা জ্ঞান। তবে চেতনা শব্দটির একটি জ্ঞানগত ধারণা রয়েছে। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হচ্ছে- "Consciousness, the highest form of reflection of objective reality inherent only in man".[১] অর্থাৎ বাস্তব সত্তার সর্বোচ্চ প্রতিবিম্বিত জ্ঞানই হচ্ছে চেতনা, যে ক্ষমতা বা যোগ্যতা রয়েছে কেবলমাত্র মানুষেরই এবং যা কেবলমাত্র মানুষের মগজেই প্রতিবিম্বিত হতে পারে। মানুষের চারপাশে বিকাশমান বাস্তব সত্তা (objective reality)-এর কোন পরিসীমা নেই। এর সমগ্রতা নিয়েই বেড়ে উঠে, গড়ে উঠে নিয়ত বিকাশমান চেতনাও। সুতরাং চেতনার এ সমগ্রতার মধ্যে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনাকে বুঝতে হবে সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক

---

[১] I. Frolov (ed.), Dictionary of Philosophy, Progress Publishers, Moscow, 1984, P. 81

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতার আলোকে। অন্য কথায় ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা হচ্ছে সামাজিক স্মৃতি (Social memory)।

হাকিম হাবিবুর রহমান ছিলেন একজন ইতিহাস-সচেতন ব্যক্তি, ঐতিহ্য চেতনা যাঁর মধ্যে সর্বদা ক্রিয়াশীল ছিল। তিনি ছিলেন একজন মুসলিম পন্ডিত ও ইতিহাসবিদ্। তাই মুসলিম জাতির গৌরবময় অতীত সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। বাংলার মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। মুঘল আভিজাত্য ও খান্দানী বৈশিষ্ট্যের অনুশাসনগুলি তিনি নিজের জীবনে সযতনে প্রতিফলিত রেখেছিলেন। ফলে অনেকেই তাঁকে মুঘল যুগের কৃষ্টি-সভ্যতার শেষ জীবন্ত নমুনা হিসাবে গণ্য করতেন। তিনি ভোজন রসিকও ছিলেন এবং প্রতিটি বিষয়েই অনুপুঙ্খভাবে অবলোকনের দৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসা তাঁর ছিল। 'ঢাকা পচাস্ বরস্ পহ্‌লে' শীর্ষক গ্রন্থখানাই এর সততা নিরূপণের জন্য যথেষ্ট। তিনি শুধুমাত্র ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে রচনা এবং সাহিত্য ও তিব্ব নিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না। প্রাচীন নিদর্শনের প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং উত্তরসূরীদের জন্য তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তিনি ছিলেন সজাগ ও সক্রিয়।[২] এখানে তাঁর ঐতিহ্য চেতনার বিষয়টি আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। অধিকন্তু তিনি প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করে শুধুমাত্র যক্ষের ধনের মতো আগ্‌লে রেখে উত্তরাধিকারীদের নির্লিপ্ত উদাসীনতা অথবা কীট পতঙ্গের ভোজনোৎসবের জন্য ছেড়ে যাননি, বরং প্রতিটি জিনিসের যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা সম্পন্ন করে গেছেন নিজের জীবদ্দশায়। আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষার প্রাচীন পান্ডুলিপি ও পুস্তকের একটি মূল্যবান সংগ্রহ এবং একটি মুদ্রা সংগ্রহ ও কিছু প্রত্নবস্তুর সংগ্রহ তাঁর ছিল। পান্ডুলিপি ও গ্রন্থ সংগ্রহটি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন এবং মুদ্রা সংগ্রহটি তৎকালীন ঢাকা যাদুঘরকে (বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর)

---

[২] ঢাকা পচাস্ বরস্ পহ্‌লে, মোঃ রেজাউল করিম কর্তৃক অনূদিত, ঢাকা ঃ পঞ্চাশ বছর আগে, অনুবাদকের ভূমিকা, পৃঃ পনর।

Dhaka University Institutional Repository

ক্যাটালগ প্রকাশের শর্তে উপহার দেন।[৩] তিনি যে ইতিহাস সচেতন ছিলেন এবং ঐতিহ্য-চেতনা যে তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল, এটা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

তিনি যে পান্ডুলিপি ও গ্রন্থ সংগ্রহটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন, তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে এবং তা 'হাকিম হাবিবুর রহমান কালেক্শন' (H.R.C) নামে পরিচিত। গবেষক নিজে H.R.C. পরিদর্শন করেছেন। এই সংগ্রহে আরবী, ফার্সী ও উর্দু বিষয়ে মোট পৌনে তিনশত পান্ডুলিপিসহ প্রায় দুই হাজার মুদ্রিত পুস্তক সংরক্ষিত আছে। পান্ডুলিপিগুলির মধ্যে ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য, জীবনী, আইন, নীতিশাস্ত্র, গজল, কবিতা, ধর্ম, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি বিষয়ক পান্ডুলিপি রয়েছে। মুদ্রিত পুস্তকগুলিও বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা। তন্মধ্যে প্রায় পাঁচশত আরবী পুস্তক, প্রায় চারশত ফার্সী গ্রন্থ এবং এক হাজারের উপর উর্দু বই রয়েছে। বাংলাদেশের আরবী, ফার্সী ও উর্দু বিষয়ের উপর এমন কতকগুলি মূল্যবান পুস্তক এ সংগ্রহে রয়েছে, যা অন্য কোন সংগ্রহে দুষ্পাপ্য। H.R.C. তাঁকে একজন ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষিত পাঠক ও গবেষক মহলে স্মরণীয় করে রাখবে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাকিম হাবিবুর রহমান ১৯৩৬ সালে তৎকালীন ঢাকা যাদুঘরকে (বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর) ক্যাটালগ প্রকাশের শর্তে তাঁর মুদ্রা সংগ্রহটি উপহার দেন। সেখানে বিভিন্ন ধরণের ২৩১টি মুদ্রা ছিল। উপহারের শর্ত মোতাবেক তৎকালীন ঢাকা যাদুঘরের কিউরেটর বাবু নলীনীকান্ত ভট্টশালী মোট ২২১টি পাঠযোগ্য মুদ্রা অন্তর্ভূক্ত করে একটি ক্যাটালগ প্রকাশ করেন, যার শিরোনাম হচ্ছে- 'Catalogue of the coins collected by Hakim Habibur Rahman Akhunzada of Dacca and presented to the Dacca Museum'. উক্ত ক্যাটালগভূক্ত ২২১টি মুদ্রার মধ্যে ১টি স্বর্ণমুদ্রা, ১৭৮টি রৌপ্যমুদ্রা, ৮টি বিলন বা বেলোয়ারী মুদ্রা, ১টি পিতলের মুদ্রা, ৩টি রৌপ্যমন্ডিত

---

[৩] পূর্বোক্ত, পৃঃ পনর। আবুয যোহা নূর আহমদ, উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

পিতলের মুদ্রা এবং ৩০টি তামার মুদ্রা রয়েছে। চৌধুরী শামসুর রহমানের বর্ণনাতেও এর ইংগিত পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, প্রাচীন মুদ্রার বিরাট সংগ্রহ ঢাকা যাদুঘরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার এ সংগহে পাক-ভারত উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলিম শাসন যুগের বহু রাজা-বাদ্শাহ্ ও সুলতানের মুদ্রা ছাড়াও অনেক সামন্ত নৃপতির মুদ্রাও দেখতে পাওয়া যায়। মুদ্রার এ বিরাট সংগ্রহের মধ্যে হাকিম হাবিবুর রহমান খান ও খান বাহাদুর এস. এম. তৈফুর প্রদত্ত ৪২৩টি মুদ্রাও রয়েছে।[৪] পরবর্তী সময়ে সংগৃহীত মুদ্রাগুলি আযমগড়ের 'দারুল মুসান্নিফিন'-কে দেয়ার ইচ্ছা তিনি কয়েকবারই সৈয়দ সুলায়মান নদ্ভীর নিকট ব্যক্ত করেছিলেন, যদিও তা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি।[৫] মসজিদ ও কবরসমূহের শিলালিপি সংগ্রহের কথা উল্লেখ করে তিনি সৈয়দ নদভীর নিকট বলেছিলেন যে তাঁর সংগ্রহে হুসাইন শাহী ও তৎপূর্ব যুগের অনেক মসজিদ ও কবরের শিলালিপি মজুদ রয়েছে।[৬] তাঁর ইতিহাস সচেতনতা ও ঐতিহ্য চেতনার স্বাক্ষর এখানেও বিদ্যমান।

অনুপম হায়াতের লেখা 'সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর' শীর্ষক জীবনী গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুরের সাথে হাকিম হাবিবুর রহমানের যথেষ্ট সখ্যতা ও সুসম্পর্ক ছিল। তাঁরা উভয়েই ছিলেন প্রায় সমসাময়িক। ইতিহাস চর্চা ও ঐতিহ্য চেতনার ক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে সাযুজ্য ছিল। তাঁরা ছিলেন 'ইসলামী ইতিহাস-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য চেতনায় ভাস্বর' আধুনিক মুসলিম গবেষক ও লেখক।[৭] সৈয়দ আলী আহসানের বর্ণনাতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি দৈনিক ইনকিলাবে লায়লা আর্জুমান্দ বানু সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, লায়লা আর্জুমান্দ বানুর পিতা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুরের সময়কালে তাঁর সহকর্মী যাঁরা তাঁর আশপাশে ছিলেন, তাঁরাও ছিলেন ফারসি ঐতিহ্যের গ্রহীতা। তাঁর সময়ে সংস্কৃতির একটি পরিমন্ডল গড়ে উঠেছিল। সেই পরিমন্ডলের মধ্যে ছিলেন হাকিম হাবিবুর

---

৪ চৌধুরী শামসুর রহমান, 'ঢাকা যাদুঘর', মাহে নও, ঢাকা, মে-১৯৬৪, পৃঃ ৩৯।

৫ মা-আরিফ, আযমগড়, এপ্রিল, ১৯৪৭, পৃঃ ৬১৪।

৬ মা-আরিফ, আযমগড়, ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪, পৃঃ ১১৯।

৭ অনুপম হায়াৎ, সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৫, পৃঃ ২৫, ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

রহমান এবং খান সাহেব আবুল হাসানাত। এঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন মুসলিম ঐতিহ্যের তথ্যানুসন্ধানী। এ তথ্য অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে এঁরা বাংলাদেশ নামক ভূ-খন্ডের মুসলিমদের গর্বিত করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে আত্ম-প্রত্যয় এনে দিয়েছিলেন।[৮]

ইসলামী ঐতিহ্য ও স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক, মুসলিম জাতির প্রকৃত দরদী, মুসলিম স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী হাকিম হাবিবুর রহমান মুসলিম জাতির দুঃখ-দুর্দশা দেখে তাদের জাগরণ ও বিভিন্নমুখী উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল-অনুন্নত মুসলিমগণ শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থ-সামর্থ্য, প্রশাসন, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করুক। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি মনে প্রাণে বৃটিশ গভর্নমেন্ট ও মুসলিম জাতির মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক ও সর্বভারতীয় মুসলিম ঐক্য স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন। মুসলিম জাগরণের লক্ষ্যে এর প্রয়োজন ছিল বলে তিনি মনে করতেন। এ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তিনি 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' গঠনের পূর্বেই এর ক্ষেত্র প্রস্তুতের লক্ষ্যে ১৯০৬ সালের অক্টোবরে ঢাকা থেকে 'আল-মাশ্‌রিক' নামক একটি মাসিক উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং এর মাধ্যমে বাংলা-আসামের মুসলিমদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয় প্রেরণা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। পত্রিকাটির বিভিন্ন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি মুসলিমদের দৈন্যদশা তুলে ধরার প্রয়াস পান।

উক্ত পত্রিকার ১৯০৭ সালের মার্চ সংখ্যায় তিনি উল্লেখ করেন :

"দুঃখের বিষয়, মুসলমানরা অর্থ, বিদ্যা, স্বাস্থ্য সবদিক থেকেই অবনতির অতল গহবরে আপতিত। তুলনামূলকভাবে দেখুন! স্কুল-কলেজের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখুন! দেখতে পাবেন - হিন্দু ছেলেরা কত হৃষ্টপুষ্ট, তাদের চেহারা কত সুন্দর, তারা সুন্দর পোশাক পরে বেরিয়ে আসছে। অথচ মুসলমান ছেলেরা কত জীর্ন-শীর্ন, তারা ময়লা ও কুৎসিত পোশাক নিয়ে বেরিয়ে আসছে। লোকেরা বলে, স্কুলের এই ছোক্‌রারা (হিন্দু ছেলেরা) লাঠির প্রশিক্ষণ নিয়ে মুসলমানদের একটি

৮ সৈয়দ আলী আহসান, 'লায়লা আর্জুমান্দ বানু', দৈনিক ইন্‌কিলাব, ঢাকা, ১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

পশমও বাঁকা করতে পারবেনা। আমারও এ ধারনা ছিল। কিন্তু এখন বুঝলাম - আমাদের অন্যান্য ভুল ধারনার ন্যায় এটাও একটি ভুল ধারনা। শক্তি-সামর্থ্যে তারা আমাদের ছাড়িয়ে গেছে। আস্তে আস্তে তারা এখন সাহসেরও অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে। আজ এ মেম সাহেবকে গালি দিলো, কাল ঐ ইংরেজকে ইট মারলো, পরশু এই মুসলমানকে মারধর করে অসাড় করে দিলো।"[৯]

হাকিম হাবিবুর রহমানের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে তদানীন্তন মুসলিম সমাজের দৈন্যদশা ও অবনতির করুন চিত্রই আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তার পাশাপাশি হিন্দুদের শক্তি-সামর্থ্য এবং ঔদ্ধত্যের বিষয়টিও আমরা অবহিত হই। অথচ এককালে মুসলিম জাতি ইতিহাস-ঐতিহ্য ও শৌর্য-বীর্যে ছিল অতুলনীয়। তাই উপরোক্ত দৈন্যদশা হতে মুসলিম সমাজ ও জাতির উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি তাঁর লিখনীর মাধ্যমে তদানীন্তন পূর্ব-বাংলার মুসলিমদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত প্রকাশের পাশাপাশি তাদের জাতীয় স্বার্থের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তিনি পূর্ব-বঙ্গের মুসলিমদের রাষ্ট্র-সমস্যা সম্পর্কেও সজাগ ছিলেন। ঢাকা হতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'জাগরণ' এর প্রতিষ্ঠা বর্ষের ১ম সংখ্যায় হাকিম হাবিবুর রহমান সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি পূর্ব-বংগের মুসলিমদের রাষ্ট্র সমস্যা সম্বন্ধে খুব সজাগ - এ কথা হয়ত অতি অল্প লোকই জানেন। তাঁর মত প্রখর-বুদ্ধি ব্যক্তি আজ নেতাহীন অনাথ মুসলিমদের ভবিষ্যতের পথ ইঙ্গিত করবার জন্য ভাল করে মনোযোগ দিলে সমাজ ও জাতি অত্যন্ত উপকৃত হবে। তাঁর নিকট বাদশাহ্-নবাবদের কাহিনী সম্পর্কে অনেক materials আছে এবং তিনি নিজে সেগুলি সম্বন্ধে বেশ দস্তুরমত ওয়াকিফহাল আছেন।[১০]

যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যেসব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, তা একটি সমকালীন পরিচিতি নিয়ে আবির্ভূত হলেও কোন গোষ্ঠী, জাতি বা সম্প্রদায়ের একক

---

[৯] আল্-মাশরিক, ঢাকা, মার্চ ১৯০৭, পৃঃ ৯-১০; উদ্ধৃত ঃ ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৫; হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭; ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭।

[১০] জাগরণ, ঢাকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৫, পৃঃ ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

অবদান যে তা নয়, একথা সর্বজন বিদিত। জয়-পরাজয়, বিজয়ী-বিজিতের সম্পর্ক, সহাবস্থান, বিরোধ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে যুগে যুগে সভ্যতার অগ্রযাত্রায় যেমন নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে, তেমনি এক সভ্যতা হস্তান্তরিত হয়েছে পরবর্তী ধারক দলের কাছে এবং প্রত্যেক দল স্ব-স্ব অবদানে সমৃদ্ধ করে তা হস্তান্তর করেছে পরবর্তীদের নিকট। এভাবেই সভ্যতার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। হাকিম হাবিবুর রহমানের বিবরণ হতে একথা অনুমান করা যায় যে, মুঘলযুগের ধারা অনুযায়ী, যখনই কোন সুবাদার ঢাকায় আসতেন তখন তিনি নিজের সাথে শুধুমাত্র সৈন্য সামন্তই নিয়ে আস্তেন না, বরং প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পেশার লোক, যেমন- শিল্পী, গায়ক, প্রকৌশলী, দর্জি, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি পেশার লোকজন থাকতো। আবার প্রশাসক ফিরে যাওয়ার সময় সেনা বাহিনী ও প্রশাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ফিরে যেতে বাধ্য থাকলেও অন্যান্য পেশার লোকজন অনেকেই এখানে স্থায়ীভাবে থেকে যেতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মুর্শিদকুলী খান পর্যন্ত এ রেওয়াজ ছিল যে, আগ্রা এবং দিল্লী থেকে যখন কোন প্রশাসক আসতেন, তখন তিনি নিজের সঙ্গে এক বিরাট দল এবং লস্কর নিয়ে আসতেন। কিন্তু যখন তিনি ফিরে যেতেন তখন আগত লোক-লস্করের এক বিরাট অংশ বাংলার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে এখানেই থেকে যেত। এই থেকে যাওয়াদের মধ্যে হিন্দু কম ও মুসলিমদের সংখ্যা বেশী এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেক জাত-গোষ্ঠী ও পেশার লোক থাক্তো।[১১]

মুঘল প্রশাসকদের মাধ্যমে মুঘল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যেমন ঢাকায় বিস্তার লাভ করেছে, তেমনি অন্যান্য বিদেশী, যেমন- আরমেনীয়, পর্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ প্রভৃতি জাতির সমাজ-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে সংমিশ্রিত হয়ে ঢাকার সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের যে পর্যায়ক্রমিক উত্তরণ ঘটেছে এবং নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে, তাতে এ সকল বিদেশীদের ভূমিকা এবং 'খোশ্বাস'[১২] নামে পরিচিত অধিবাসীদের অবদান কম নয়। হাকিম

[১১] ঢাকা : পচাস্ বরস্ পহ্লে, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।

[১২] খোশ্বাস বা সুখবাস হচ্ছেন ঢাকায় বসবাসকারী সেসব লোক, যাঁরা মুঘল প্রশাসকদের সাথে এখানে আসেন এবং যাঁদের ভাষা উর্দু। তাঁরা সাধারণতঃ পরিশীলিত রুচি ও মার্জিত আচরণ, অর্থাৎ উন্নত সংস্কৃতি ও ঐহিত্যের অধিকারী। দ্রঃ ঢাকা : পচাস্ বরস্ পহ্লে, পৃঃ ১৬; S. M. Taifoor, Glimpses of Old Dhaka, Dacca, 1956, P. 71.

Dhaka University Institutional Repository

হাবিবুর রহমান ছিলেন এমনই একজন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সচেতন, গভীর পর্যবেক্ষণ দৃষ্টিসম্পন্ন, শিল্পানুরাগী, ইতিহাস বিষয়ে প্রাজ্ঞ এক ব্যক্তিত্ব এবং খোশ্‌বাস হিসেবে পরিচিত ঢাকার মুঘল যুগীয় ঐতিহ্যের শেষ পর্বের একজন প্রতিনিধি।

১৯৪৫ সালে অল্ ইন্ডিয়া রেডিওর ঢাকা কেন্দ্র থেকে উর্দু ভাষায় প্রচারিত কথিকা সিরিজ 'ঢাকা আব্‌ছে পচাস্ বরস্ পহ্‌লে' সমকালীন ঢাকার অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের পঞ্চাশ বছর পূর্বের ঢাকার ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে হাকিম হাবিবুর রহমানের নিজের প্রত্যক্ষ করা ঘটনার ধারা ভাষ্য। ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি যে কতটুকু সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ হচ্ছে এই কথিকা সিরিজ, যা ১৯৪৯ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিম উদ্দীনের উদ্যোগে কিতাব মঞ্জিল, লাহোর থেকে উর্দু ভাষায় মুদ্রিত পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। এ পুস্তকে উনিশ শতকের শেষ দশক হতে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়ের ঢাকার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সমাজ-সংস্কৃতি সংক্রান্ত এমন অনেক ঘটনা ও বিষয়ের প্রাণবন্ত উল্লেখ রয়েছে, যা সচরাচর প্রাপ্ত ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়নি। সেদিক থেকে এ পুস্তকটির গুরুত্ব অপরিসীম।

উর্দু ছিল তদানীন্তন সময়ে একটি ঐতিহ্যবাহী ভাষা। অনুকূল পরিবেশের কারণে পুরো উনবিংশ শতাব্দী, এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও উর্দু সাহিত্য বনেদি মুসলিম পরিবারের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলার চেয়ে উর্দুকেই তাঁরা বেশী গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতেন। অনেকেই মনে করতেন যে, উর্দু ভাষায় কথা বলাই খান্দানী পরিবারের সদস্যদের বৈশিষ্ট্য। তাই পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রাখার স্বার্থেও অনেকে তখন উর্দু ভাষাকে আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করতেন। এজন্যই সম্ভবতঃ ১৮৮২ সালে গঠিত হান্টার কমিশনের সামনে স্বাক্ষ্য দিতে গিয়ে নওয়াব আবদুল লতিফ বলেছিলেন যে, উর্দুকে বাংলা-বিহারের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলিমদের মাতৃভাষারূপে স্বীকার করে

Dhaka University Institutional Repository

নেয়া উচিৎ। শহর, গ্রাম নির্বিশেষে তারা এ ভাষা নিজ সমাজে ব্যবহার করে। উর্দু জানা না থাকলে কোন মুসলিম স্বধর্মীয় ভদ্র সমাজে মর্যাদা পায় না।[১৩] ওয়াকিল আহমদের বর্ণনাতেও এর সমর্থন পরিলক্ষিত হয়।[১৪]

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ অভিমত ব্যক্ত করেন এভাবে যে, উর্দু আমাদের মাতৃভাষাও নয়, জাতীয় ভাষাও নয়। কিন্তু ভারতবর্ষে মুসলিম জাতীয়তা রক্ষা ও পুষ্টির জন্য আমাদের উর্দুর দরকার।[১৫] প্রেসিডেন্সি মেজিস্ট্র্যাট আবদুর রহীমের সহায়তায় কলকাতা মুসলমান শিক্ষা সভার উদ্যোগে ১৯০৯ সালে অনুষ্ঠিত এক সভায় কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার তদানীন্তন অধ্যক্ষ এড্ওয়ার্ড ডেনিসন রস একটি প্রস্তাবে বলেন, মক্তবে উর্দু ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিৎ। কারণ বাংলায় শিক্ষা দিলে মুসলিমদের জাতীয়তা অর্ধেকই নষ্ট হবে এবং তারা হীনবীর্য হয়ে পড়বে। উক্ত সভায় উপস্থিত সৈয়দ আমীর আলী, স্যার আবদুর রহীম, সৈয়দ শামসুল হুদা, দেলওয়ার হোসেন আহমদ প্রমুখ তা সমর্থন করেন।[১৬]

উপরের অলোচনা থেকে উর্দুর গুরুত্ব আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ইয়াগিস্তান হতে আগত ইউসুফজাই পরিবারের বংশধরদের ভাষা ছিল উর্দু। হাকিম হাবিবুর রহমান ছিলেন ঐ পরিবারেরই সন্তান। সুতরাং পারিবারিক সূত্রেই তিনি ছিলেন উর্দুভাষী। তাঁর যাবতীয় গ্রন্থ, প্রবন্ধাবলী, সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি উর্দু ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। তিনি উর্দুকে মুসলিমদের জাতীয় ভাষা ও 'লিংগুয়া ফ্রাংকা' (Lingua-Franca) মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এ ভাষার মাধ্যমেই ভারতীয় মুসলিমদের সাথে বাংলার মুসলিমদের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে 'আল্-

---

১৩ Enamul Huq (ed.), Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents, Dacca, 1968, P. 225.

১৪ দেখুন, ওয়াকিল আহমদ, 'বাংলা ভাষা ঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ,' ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা 'ইতিহাস', আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০০০ সংখ্যা, ঢাকা, ১৪০৭ বাংলা, পৃঃ ৬১।

১৫ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মাঘ ১৩২৫।

১৬ মিহির ও সুধাকর, ১২ আষাঢ়, ১৩০৯; ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ২য় খন্ড, ঢাকা-১৯৮৩, পৃঃ ২৮২।

Dhaka University Institutional Repository

মাশ্‌রিক' পত্রিকা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯০৬-এর সর্বশেষ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে - 'আল্ মাশ্‌রিক' প্রকাশের বিশেষ উদ্দেশ্য হল বাংলা-আসামের জাতীয় ভাষা এবং সর্বভারতের 'লিংগুয়া-ফ্রাংকা' (Lingua-Franca) তথা উর্দু ভাষার বিস্তার সাধন করা ; মুসলিমদের ধর্মীয় ও পার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য চিন্তা-ভাবনা করা; শাসক ও শাসিতের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের চেষ্টা করা; ভাবের আদান-প্রদান করে সর্বভারতীয় মুসলিম ভাইদের মধ্যে ঐক্য ও দৃঢ় ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং এসব উদ্দেশ্য উর্দু ছাড়া অন্যকোন ভাষার মাধ্যমে সম্ভব নয়।[১৭] তাই বিশ শতকের প্রারম্ভে ঢাকায় উর্দু ভাষাকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে হাকিম সাহেবের অবদান ছিল অতুলনীয়।

এ. কে. এম. আমিনুল হকের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, হাকিম হাবিবুর রহমান 'আঞ্জুমানে উর্দু মাশ্‌রিকী বাংগাল'-এর অধীনে তাঁর বাসভবন বা তিব্বীয়া হাবীবিয়া কলেজে 'মুশাআরা' (কাব্য সম্মেলন)-এর ব্যবস্থা করতেন। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত প্রতিমাসে 'মুশাআরা' অনুষ্ঠিত হতে থাকে। হাকিম সাহেব 'মুশাআরা'য় যোগদানকারীদেরকে চা-নাশ্‌তা খাওয়াতেন। কবি সম্মেলনে যেসব কবিতা আবৃত্তি করা হতো, সেগুলো হতে বাছাই করা কবিতাগুলো 'গুল্‌দাস্তা' (ফুলঝুড়ি) নাম দিয়ে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হতো এবং উৎসাহী পাঠকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হতো। এরূপ কবি সম্মেলনের ফলে পূর্ব বাংলায়, বিশেষ করে ঢাকায় উর্দুর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।[১৮] এতে হাকিম সাহেবের ঐতিহ্য সচেতনতাই প্রকাশ পায়। তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিতে যেয়ে Abdus Subhan (Professor of Persian, Maulana Abul Kalam Azad College, Calcutta, India) বলেন ঃ "What may be called the most singular contribution so far to Urdu creative literature in Begnal during the present century (Twentieth Century) is that of Shifa-ul-Mulk

---

[১৭] আল্-মাশরিক, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, অক্টোবর ১৯০৬, সর্বশেষ পৃষ্ঠা।
[১৮] ঢাকায় উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চা (১৯০১-১৯৭১), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

Hakim Habibur Rahman (1880-1947), who was decidedly a doyen among the learned elite of Dhaka."[১৯] অর্থাৎ বাংলার সৃজনশীল উর্দু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্তমান শতকে (বিশ শতক) একমাত্র অসাধারণ সংযোজক বলে যাকে আখ্যাত করা যায়, তিনি হলেন 'শিফা-উল্-মুল্ক' হাকিম হাবিবুর রহমান (১৮৮-১৯৪৭)। তিনি ছিলেন ঢাকার শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাচীনতম ব্যক্তি।[২০]

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, হাকিম হাবিবুর রহমান ছিলেন একজন ইতিহাস-সচেতন ব্যক্তি, ঐতিহ্য-চেতনা যাঁর মধ্যে সর্বদা ক্রিয়াশীল ছিল। মুসলিম জাতির গৌরবময় অতীত সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন এবং ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বাংলার মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে।

---

১৯ Abdus Subhan, 'Arabic, Persian and Urdu Literatures,' History of Bangladesh (1704-1971), Vol. Three, Social and Cultural History, Edited by Sirajul Islam, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, September, 1992, P. 455.

২০ আবদুস সোব্হান, 'আরবি ফার্সী উর্দু সাহিত্য,' বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), তৃতীয় খন্ড, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৫।

Dhaka University Institutional Repository

খ. হাকিম হাবিবুর রহমানের ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনা

হাকিম হাবিবুর রহমান (১৮৮১-১৯৪৭ খ্রীঃ) ছিলেন একজন কীর্তিমান পুরুষ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ পন্ডিত ব্যক্তি। তিনি শুধুমাত্র একজন প্রথিতযশা ইউনানী চিকিৎসকই ছিলেন না, বরং তিনি একজন বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিবিদ এবং ইতিহাসবিদ হিসেবেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ রচনাই ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক। তিনি জন্মসূত্রে ঢাকার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন লেখায় তিনি তাঁর স্মৃতি বিজড়িত ঢাকা নগরীর তাহ্‌যীব-তামাদ্দুনের যে চিত্র এঁকেছেন, এখানকার ঐতিহাসিক স্থান, মসজিদ-মাযার ও সমাহিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের যেসব বিবরণ দিয়েছেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে তা আমাদের জন্য মূলবান দলিল হিসেবে বিবেচিত। তিনি কেবল ঢাকার বিভিন্নমুখী ইতিহাসেরই বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, বরং বঙ্গের ইতিহাস এবং ইসলামের ইতিহাসেও তাঁর যথেষ্ট পান্ডিত্য ছিল। এতদ্ব্যতীত পুরনো মুদ্রা ও শিলালিপি সংগ্রহের প্রতিও তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। এটা ছিল তাঁর ইতিহাস ও প্রত্ন-তত্ত্বের প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচায়ক। তিনি আজ থেকে প্রায় অর্ধ-শতাব্দীরও কিছু বেশী সময় পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু অদ্যাবধি তাঁর ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত রচনা ছাড়া সবিস্তারে তেমন কোন মৌলিক ও সমন্বিত গবেষণা হয়নি। অথচ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই হাকিম হাবিবুর রহমানের ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে কতিপয় দিক নিম্নে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছিঃ-

হাকিম হাবিবুর রহমানের ভাষ্য ও তাঁর কার্যাবলী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ঐতিহাসিকের বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর ঝোঁক ছিল ঢাকার ঐতিহাসিক স্থান, সৌধ, মসজিদ, মাযার, গোরস্তান ইত্যাদি পরিদর্শন

Dhaka University Institutional Repository

এবং প্রাচীন শিলালিপি, মুদ্রা ও পুরাকীর্তিসমূহের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রতি। তাঁর এ কর্ম তৎপরতার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটন করা, ঐতিহ্যের স্মৃতিকে জিইয়ে রাখা, সত্য ও সঠিক ইতিহাস রচনা করা এবং যথা সময়ে সেগুলিকে পুস্তকাকারে বন্দী করা।[১] তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে তা প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন :

> "শৈশবেই উর্দু লিখন ও পঠন আয়ত্ত করে নিয়েছিলাম। তখনি ঢাকার মসজিদ ও কবরসমূহের ইতিহাস লেখার ইচ্ছা আমার মনে জাগে। দশ বছর বয়সেই আমি কতক মসজিদের ইতিহাস আমার খাতায় লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলাম। ছাত্র জীবনেই আমি কয়েকটি পুস্তিকা লিখেছিলাম। তন্মধ্যে 'আল্-ফারিক' ও 'হায়াত-এ-সুক্রাত' ছিল অন্যতম"।[২]

এসব পুস্তিকা রচনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর অভিরুচিকে জিইয়ে রাখা ও মানবিক কর্তব্য সম্পাদন করা।[৩] যদিও হাকিম সাহেব ইতিহাস ও সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন না, তথাপিও শৈশব ও ছাত্র জীবনে তাঁর মধ্যে ইতিহাস ও সাহিত্য-চর্চার যে নেশা বদ্ধমূল হয়েছিল, তা আজীবন অব্যাহত থাকে। তাঁর রচিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী নিম্নরূপ ঃ

---

১ জীনাত আরা সিরাজী, 'হাকীম হাবীবুর রহমানের ইতিহাস-চর্চা,' বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা 'ইতিহাস', ষড় বিংশতি বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ঢাকা, আগষ্ট ১৯৯৩ (ভাদ্র ১৪০০), পৃঃ ৭৫।

২ হাকিম হাবিবুর রহমান, আসুদেগান-এ-ঢাকা, ঢাকা, ১৯৪৬, পৃঃ ১; উদ্ধৃতঃ সিরাজী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৫।

৩ আসুদেগান-এ-ঢাকা, প্রর্বোক্ত, পৃঃ ৩।

Dhaka University Institutional Repository

হাকিম হাবিবুর রহমান রচিত রচনাবলী

প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১. আল্ ফারিক, শওকত-এ শাহ্জাহানী প্রেস, আগ্রা, ১৩২২ হিজরী/ ১৯০৪ খৃঃ ।

২. হায়াত-এ সুকরাত, কাদেরী প্রেস, আগ্রা, ১৩২২ হিজরী/ ১৯০৪ খৃঃ ।

৩. আসূদেগান-এ-ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৪৬ খৃঃ ।

[ঢাকা তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজের অধ্যাপক হাকিম আজীজুল ইসলাম কর্তৃক বাংলায় অনূদিত এবং দৈনিক আজাদ (জুলাই ১৯৬১- নভেম্বর ১৯৬১) এ প্রকাশিত ।]

৪. ঢাকা ঃ পচাস্ বরস্ পহলে, ইত্তেহাদ প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত এবং কিতাব মনযিল কর্তৃক প্রকাশিত, লাহোর, ১৯৪৯ খৃঃ ('ঢাকা ঃ পঞ্চাশ বছরআগে' শিরোনামে মোঃ রেজাউল করিম কর্তৃক বাংলায় অনুদিত এবং বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত, ডিসেম্বর ১৯৯৫) ।

অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। তাযকিরাতুল ফুযালা- (দুস্প্রাপ্য)

২। মাসাদিজ-এ-ঢাকা (দুস্প্রাপ্য)

৩। শুআরা-এ ঢাকা (দুস্প্রাপ্য)

৪। সালাসা-গাস্সালাহ্ (আংশিক/অসম্পূর্ণ পান্ডুলিপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে)

৫। কুচ পুরানী বাতে (বেতার সূচীর অধীনে পঠিত ১৬টি নিবন্ধ, বর্তমানে হদিস নেই) ।

৬। ঢাকে কী তারীখী ইমারাত (অল-ইন্ডিয়া রেডিওর অধীনে পঠিত বিশটি প্রবন্ধ, বর্তমানে হদিস নেই)

প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী

১. ঢাকে-কী-তারীখী আযমত, আল মাশরিক, ১ম খন্ড, ২য় সংখ্যা, ১৯০৬ ।

২. হাজী শাহবায, আল্ মাশরিক, ১ম খন্ড, ৭ম সংখ্যা, ১৯০৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩. শামসুল বয়ান, আদীব (মাসিক), এলাহাবাদ, নভেম্বর ১৯১০ ।

৪. বাংগালীয়্যু-কী-উর্দু শায়েরী, ঐ, ১৯১১ ।

৫. কিলআ-এ-ঢাকা, জাদু, সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ ।

৬. বাংগাল-মে ইলমে হাদীস, মাআরিফ, আযমগড়, ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪ ।[৪]

(১) 'আল-ফারিক'ঃ ৮০ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ উর্দু গ্রন্থটি তিনি ছাত্র জীবনে রচনা করেন (১৩২২ হিঃ/ ১৯০৪ খ্রীঃ)। এটি মূলতঃ চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ এবং আধুনিক ইউনানী তিব্বী শাস্ত্রে এটাই সম্ভবতঃ প্রথম রচিত গ্রন্থ। গ্রন্থের ভূমিকাতেও লেখক এ দাবী করেছেন। আরবী শব্দ 'আল্ ফারিক' অর্থ পার্থক্য নিরূপক। যেসব রোগ প্রকৃতি, লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সাদৃশ্যজনক, কিন্তু মূলতঃ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত, অথবা অন্যান্য বিষয়ের যেসব পরিভাষা ধারণার দিক থেকে অনেকটা কাছাকাছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়গুলো স্বতন্ত্র এবং নামের দিক থেকেও আলাদা, চিকিৎসা শাস্ত্রীয় ও অন্যান্য বিষয়ের এরূপ অনেক পরিভাষার সূক্ষ্ম পার্থক্য তিনি এ গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেন। দু'শ জোড়ারও বেশী পারিভাষিক শব্দের পার্থক্য তিনি এ রচনায় তুলে ধরেন।[৫] বইটি আগ্রার শওকত-এ-শাহ্জাহানী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এটি তিনি নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ্ খান বাহাদুরের নামে উৎসর্গ করেন। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর হাকীম মুহাম্মদ আজমল খাঁ ৫০টি কপি ক্রয় করে তাঁকে উৎসাহিত করেন।[৬]

(২) 'হায়াত-এ-সুক্রাত': এটি তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত রচনা। এ গ্রন্থে তিনি গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস (৪৬৯-৩৯৬ খ্রীষ্ট পূর্ব)-এর জীবন চরিত ও জীবন দর্শন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি সক্রেটিসকে একটি আদর্শ চরিত্ররূপে তুলে ধরেন। এতে বুঝা যায় যে, গ্রন্থখানা সরাসরি ইতিহাস বিষয়ক না

---

[৪] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, হাকীম হাবীবুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮১।।

[৫] ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

[৬] আসূদেগান-এ-ঢাকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

হলেও ইতিহাসের মাল-মসলা এতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কারণ জীবন-চরিত বিষয়ক গ্রন্থ ইতিহাসের অনুসঙ্গী হিসেবেই বিবেচিত হয়। ১৩২২ হিঃ/১৯০৪ সালে আগ্রার কাদেরী প্রেস থেকে প্রকাশিত এ গ্রন্থের নাম পত্রে (Title Page) উল্লেখ রয়েছে: 'আল্-ফারিক' ও 'তায্কিরাতুল ফুজালা'-এর রচয়িতা। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ গ্রন্থটি রচনার পূর্বে তিনি 'আল্-ফারিক' ছাড়াও 'তায্কিরাতুল ফুজালা' নামক অন্য একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। বর্তমানে গ্রন্থখানার কোন অস্তিত্ব না থাকলেও 'তায্করিাতুল ফুজালা' (জ্ঞানীদের স্মৃতি চারণ) নামকরণ হতে অনুমান করা যায় যে, গ্রন্থখানা 'জীবন-চরিত' বিষয়ক, যা ইতিহাসের অনেক তথ্য-উপাদান বক্ষে ধারণ করে আছে।

'হায়াত-এ- সুক্রাত' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন, জীবন-চরিত অধ্যয়ন করে উপদেশ, সদ্গুনাবলী অর্জন ও আনন্দ-সবকিছুই লাভ করা যায়। কিন্তু তা কখন লাভ করা যায়? যখন এর নায়ক ঐসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় এবং লেখকও সে সম্পর্কে মন্তব্য পেশ করতে সক্ষম হয়। বিশ্বের প্রাচীন সভ্য দেশ হচ্ছে গ্রীস। উক্ত দেশের প্রবীণ দার্শনিক সক্রেটিসকে তিনি এ গ্রন্থে নায়করূপে পেশ করেছেন।[৭] এতে বুঝা যায় যে, এ গ্রন্থে তিনি সক্রেটিসকে আদর্শ চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। তিনি এ গ্রন্থে সক্রেটিসের চরিত্রের যাবতীয় গুণাবলী বর্ণনার সাথে সাথে তাঁর ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাও তুলে ধরেন।

'Know thyself' বা 'নিজকে জান' অর্থাৎ আত্মজ্ঞান অর্জনের শিক্ষাই সক্রেটিসের দর্শনের মূলকথা। এরকম দার্শনিক তত্ত্ব সংক্রান্ত ১৬ খানা মোক্ষম বাণী উদ্ধৃত করে তিনি রচনাটির পরিসমাপ্তি ঘটান। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, সক্রেটিস ছিলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও দার্শনিক। অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সত্য প্রতিষ্ঠার আত্ম-প্রত্যয়ে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর

---

৭ হাকিম হাবিবুর রহমান, হায়াত-এ সুক্রাত, কাদেরী প্রেস, আগ্রা, ১৩২২ হিঃ/১৯০৪ খ্রীঃ, ভূমিকা, পৃঃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

তরুণ শীষ্যদের মধ্যে একদল সত্যের পথের সৈনিক ছিল। কিন্তু রক্ষণশীল এথেন্স বাসীরা তাঁর বিরুদ্ধে 'যুব সমাজকে বিপদগামী করণ ও সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে এক অভিনব ধর্মতত্ত্ব প্রবর্তন'-এর অভিযোগ এনে তাঁর বিচারের ব্যবস্থা করেন। বিচারে তাঁকে বিষপানে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

উক্ত বিষয়টি হাকিম হাবিবুর রহমান তাঁর 'হায়াত-এ-সুকরাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, যার মূল কথা হচ্ছে– শেষ পর্যন্ত সক্রেটিসের বিরুদ্ধে আদালতে এ অভিযোগ আনীত হল যে, তিনি আইন ভঙ্গ করেছেন এবং আইনের অবমাননা করেছেন। তিনি গ্রীকদের খোদারও অবমাননা করেছেন। কারণ তিনি এক অভিনব খোদার পূজা-অর্চনা শুরু করেছেন। সুতরাং তাঁকে শাস্তি দিতে হবে। আদালতে যখন তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দেয়া হলো, তখন তিনি সত্যের উপর অবিচল ছিলেন। কিছুদিন তাঁকে কারাগারেই বন্দীজীবন যাপন করতে হল। শেষ পর্যন্ত এক ভয়াবহ মূহুর্ত তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হল। সরকারী নির্দেশে জল্লাদ এলো। তার হাতে ছিল কানায় কানায় ভরা এক গ্লাস বিষ। তার চোখ দুটি ছিল অশ্রুসিক্ত। সে সক্রেটিসকে লক্ষ করে তার সাহস, ভদ্রতা, নীতি-নৈতিকতা ও সততার চরম প্রশংসা করলো এবং সরকারী নির্দেশ প্রাথমিক পর্যায়ে অমান্য করে সক্রেটিসকে বিষপান না করিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। সক্রেটিস উপস্থিত লোকদের (তাঁর শিষ্যবর্গ ও শুভানুধ্যায়ীগণ) লক্ষ্য করে তাদের খোদার উপর ভরসা রাখার ও ধৈর্য্য ধারণ করার পরামর্শ দিলেন এবং জল্লাদকে ডেকে আনার জন্য বললেন। অ্যাক্রিতুন (সক্রেটিসের শিষ্য এরিস্টটল) তাঁকে তাড়াহুড়া না করার জন্য অনুরোধ জানালে তদুত্তরে সক্রেটিস পূর্ববৎ পরামর্শ দিলেন এবং স্বীয় বক্তব্যে অটল থাকলেন। ফলে আবার জল্লাদকে ডাকা হল। তার নিকট থেকে গ্লাস নিয়ে সক্রেটিস তা পান করলেন এবং ধীরে ধীরে হাটতে আরম্ভ করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই নড়াচড়ার ফলে তাঁর শরীরের সর্বত্র উত্তাপের সৃষ্টি হল এবং সারা দেহে বিষক্রিয়া সঞ্চালিত হলো। সক্রেটিসের পা অবশ হয়ে গেল। তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন। তাঁর হাত-পা

Dhaka University Institutional Repository

শীতল হয়ে গেল। তাঁর চক্ষু সাদা ও অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়লো। এমনিভাবে ৭৩ বছর বয়সে খ্রীষ্টপূর্ব ৩৯৬ সালে তিনি ইহধাম ত্যাগ করলেন।[৮]

উপরোক্ত আলোচনা হতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আধুনিক ঐতিহাসিকগণ যেভাবে বিচার বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ইতিহাস রচনা করেন, হাকিম হাবিবুর রহমান সেভাবে ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ না করলেও তাঁর বিবরণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক হয়েছে এবং ঘটনার বিবরণ ও সততা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। ফলে বিষয়টি ইতিহাস হিসেবে সাদামাটা হলেও সাহিত্য হিসেবে মানোত্তীর্ণ হয়েছে। আর সাহিত্য তো নিঃসন্দেহে ইতিহাসের সহোদর। অন্যকথায় ইতিহাস রচনার কিছু তথ্য-উপাদান এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সর্বোপরি সক্রেটিসের সত্যের প্রতি অবিচল থেকে জীবন উৎসর্গ করার বিষয়টি যুগ যুগ ধরে সত্যানুসন্ধিৎসুদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আর হাকিম হাবিবুর রহমান তা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করে পাঠকদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করলেন এবং নিজেও স্মরণীয় হয়ে রইলেন।

(৩) 'আসূদেগান-এ-ঢাকা' ঃ এটি হাকিম হাবিবুর রহমানের তৃতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ। ১৯৪৬ সালে ঢাকার এমদাদিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত এ গ্রন্থখানা ঢাকা তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজের অধ্যাপক (পরবর্তীতে অধ্যক্ষ) হাকিম আযীযুল ইসলাম বঙ্গানুবাদ করেন এবং দৈনিক আজাদ পত্রিকায় জুলাই ১৯৬১ হতে নভেম্বর ১৯৬১ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়। এটি একটি গবেষণামূলক ইতিহাস ও সাহিত্য গ্রন্থ। ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে গ্রন্থটি লিখিত হলেও এতে তাঁর ঐতিহাসিক এবং জাতীয় মানসও সচেতন ছিল। এ গ্রন্থে তিনি মুসলিম শাসনাধীন ঢাকার আদ্যোপান্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন, ঢাকার মাজারসমূহের বিবরণ ও কবরে সমাহিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং আমীর উমারাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী পেশ করেন। তাঁর বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, এ গ্রন্থ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে– যেসব মহামানবের

---

[৮] বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য : হায়াত-এ-সুকরাত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

সৌজন্যে ঢাকা আজও সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং যাঁদের চেষ্টায় এখানে আল্লাহ্ ও রসূল (সাঃ) এর নাম বিস্তার লাভ করেছে, তাঁদের ইতিবৃত্ত তুলে ধরা।[৯] কারণ তাদের নাম-ধাম মুছে গেলে তা হবে জাতির জন্য চরম দুর্ভাগ্য ।[১০] এ বক্তব্য হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জাতির দুর্দিনে তিনি কলম ধরেছেন এবং তাঁদের মনে আশার আলো প্রজ্জ্বলিত করেছেন। সাথে সাথে তিনি একজন মহান ও সচেতন ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালনেরও চেষ্টা করেছেন।

হাকিম হাবিবুর রহমান ঢাকাকে মোট সাতটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে প্রত্যেক ওয়ার্ডের আলাদা আলাদা ভৌগোলিক বিবরণ, জনংখ্যা, নগরবাসীদের ভাষা এবং কবরস্থানসমূহের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেন। এ ছাড়া তিনি ঢাকার পার্শ্ববর্তী তেজগাঁও, ফতুল্লা ও নারায়ণগঞ্জ থানার মাযার ও কবরসমূহের ইতিহাসও এ গ্রন্থে তুলে ধরেন। তিনি গ্রন্থটির শেষভাগে একটি আলাদা অধ্যায়ে শিয়া মতাবলম্বীদের গোরস্থানগুলোর বিবরণও পেশ করেন। সব মিলিয়ে এ গ্রন্থে তিনি প্রায় দুই শ' মাযার ও কবর সম্পর্কিত তথ্যাদি সন্নিবেশিত করেন। শিয়াদের মাযার ও কবরের আলোচনা করতে যেয়ে এক পর্যায়ে তিনি বলেন, ঢাকার সমাজ ব্যবস্থা ও তাহযীব-তামাদ্দুন মূলতঃ আগ্রারই সমাজ ব্যবস্থা ও তাহযীব-তামাদ্দুনের ন্যায়। কিন্তু এ সমাজ কাঠামোতে ইরানের আধুনিক সভ্যতা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। এদের মাধ্যমে শিয়া মতবাদ সংশ্লিষ্ট লোকদের মধ্যেও প্রবেশ লাভ করেছে। এ ধর্মীয় মতবাদটি অজ্ঞাতসারে উর্দুভাষী সুন্নীদেরকে প্রভাবিত করেছে।[১১]

হাকিম হাবিবুর রহমান বিবেক ও প্রকৃতি বিরোধী কোন ঘটনা বা তথ্যকে এ গ্রন্থে স্থান না দিয়ে বরং ইতিহাস নির্ভর তথ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

---

৯ আসূদেগান-এ-ঢাকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।
১০ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪।
১১ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৯; ঢাকায় উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

"আরো দুটি কথা বলবো। প্রথম কথা হল - দু'চারটি জায়গা ছাড়া আমি কোথাও এ গ্রন্থে কারামত বা অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিনি। কারণ শরীয়াতের উপর অবিচল থাকাকেই আমি প্রকৃত কারামত বলে মনে করি। (দ্বিতীয়তঃ) মৌখিক জমা-খরচ, পূর্ব পুরুষদের সন্তানাদি ও খান্‌কার খাদেমদের নিকট থেকে পরম্পরাগত বর্ণনার চেয়ে ঐতিহাসিক তথ্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করাই আমি সমীচীন বলে মনে করি"।[১২]

তিনি যে ঐতিহাসিক তথ্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তার প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে, মুন্‌শী রহমান আলী তায়েশ[১৩] তাঁর 'তাওয়ারীখ-এ-ঢাকা (১৯১০) গ্রন্থে ঢাকাস্থ মীরপুরে শাহ্ আলী বাগদাদী (রঃ) ও তাঁর মাযারের আলোচনা করতে গিয়ে 'রুদ্ধদ্বার মসজিদের অভ্যন্তর থেকে তৈল ফুটার আওয়াজ শ্রবণ এবং তথাকার একটি গর্ত থেকে ফুটন্ত খুন (রক্ত) উথলে পড়ার' জনশ্রুতি বর্ণনা করেন।[১৪] কিন্তু হাকিম হাবিবুর রহমান অতিপ্রাকৃতিক হওয়ার অজুহাতে এবং ইতিহাস স্বীকৃত নয় বলে তাঁর গ্রন্থে এসব জনশ্রুতির কোন স্থান দেননি।[১৫] বরং তিনি সেগুলো ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় রদ্ (বাতিল) করেন এবং 'মিথ্যার গাইট' বলে অভিহিত করেন।[১৬] এক্ষেত্রে আমরা তাঁর ইতিহাস সচেতনতার পরিচয় পাই। অপরদিকে অনেকের নিকট অদ্ভূত মনে হলেও প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করতে তিনি মোটেও কার্পণ্য করেননি। নওয়াব সৈয়দ হুসামুদ্দীন খাঁর কবরের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আনুমানিক চল্লিশ বছর পূর্বে কোন এক অনুষ্ঠান লগ্নে কবরটি খুলে গিয়েছিল। শত শত লোক দেখেছেন যে, এ শহীদের (সৈয়দ হুসামুদ্দীন) মৃতদেহ অপরিবর্তিত রয়েছে। এমনকি মৃতদেহের নীচে যে শীতল পাটি বিছানো ছিল,

---

১২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭।

১৩ ঢাকার সংগত টোলায় জন্মগ্রহণকারী মুন্‌শী রহমান আলী তায়েশ (১৮২৩-১৯০৮) একজন উঁচু মানের কবি, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক ছিলেন। হাকিম হাবিবুর রহমানের ভাষায়ঃ বাংলাদেশে তাঁর 'গুল্‌জার-এ-নাত' নামক গ্রন্থখানা যতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তা এর পূর্বে বা পরে অন্যকোন গ্রন্থের ভাগ্যে জোটেনি। এ পুস্তিকার কোন কোন না'ত আজও মিলাদ মাহফিলে পাঠ করা হয় [সালাসা গাস্‌সালাহ্, অপ্রকাশিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত]। তাঁর আজীবন সাধনার মানস ফসল 'তাওয়ারীখ-এ-ঢাকা' (১৯১০ খ্রীঃ) ঢাকার ইতিহাস সংক্রান্ত রচনাবলীর মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এ গ্রন্থখানা ড. শরফুদ্দীন কর্তৃক অনূদিত এবং ১৯৮৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। দুই যুগেরও বেশী সময় ধরে হাকিম সাহেব ও রহমান আলী তায়েশের সাথে উঠাবসা ও সুসম্পর্ক বজায় ছিল।

১৪ মুন্‌শী রহমান আলী তায়েশ, তাওয়ারীখ-এ-ঢাকা, আরা (ভারত), ১৯১০, পৃঃ ২৮১-৮২।

১৫ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

১৬ আসুদেগান-এ-ঢাকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

সেটাও অটুট রয়েছে। কাফনও ময়লাযুক্ত হয়নি। এটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে কবরটি বন্ধ করে দেয়া হয়।[১৭] এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ঐতিহাসিক ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোন থেকে ঘটনা ও জনশ্রুতির সত্যাসত্য বিচার করতেন, যা একজন ঐতিহাসিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত।

হাকিম হাবিবুর রহমান ইতিহাসের নিরীখে 'কুট্টি' নামকরণের যথার্থতা সম্পর্কেও এ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। ঢাকায় 'কুট্টি' নামক এক শ্রেণীর লোক রয়েছে। এরা এ নামে কেন অভিহিত হলেন, তার ব্যাখ্যা হাকিম সাহেব দিয়েছেন এভাবে-১৭৭০ সালে তদানীন্তন বাংলায় যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন নাসিরাবাদ (ময়মনসিংহ), কুমিল্লা, সুধারাম (নোয়াখালী) ও জালালপুর (ফরিদপুর) থেকে দরিদ্র লোকেরা ঢাকায় এসে ভিড় জমায় এবং বসতি স্থাপন করে। ঢাকা শহরের আমীর-উমারাগণ খাজনার পরিবর্তে প্রজাদের নিকট হতে যে ধান আদায় করতেন, এসব লোকেরা ঢেঁকিতে সেই ধান ভান্‌তো এবং এ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। তুষ থেকে চাউল বের করাকে ধান কোটা বলা হয়। এজন্য এ শ্রেণীর লোকদের 'কুট্টি' বলে অভিহিত করা হত।[১৮]

অন্যদিকে 'চাষাড়া' নামকরণের ক্ষেত্রেও তিনি ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ঢাকার অদূরে নারায়নগঞ্জে 'চাষাড়া' নামক একটি রেল ষ্টেশন আছে। এ 'চাষাড়া' শব্দটির প্রকৃত রূপ বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন যে, নারায়নগঞ্জ রোডের পূর্ব মাথায় একটি 'সারায়' (সরাই খানা) এবং তৎসংলগ্ন একটি 'চাহ্' (কুপ) ছিল। এই 'সারায়'টি শেরশাহ্ নির্মাণ করেছিলেন। কালক্রমে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কিন্তু 'চাহ্'টি বিদ্যমান থাকে। এই 'চাহ্ সারায়' (সরাইখানার কুপ) শব্দ দুটি বিকৃত হয়ে বর্তমানে 'চাষাড়া'য় পরিণত হয়েছে।[১৯] উপর্যুক্ত আলোচনা হতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি 'ঐতিহাসিক-ভাষাতাত্ত্বিক' হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছেন।

---

[১৭] পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪০।
[১৮] পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২।
[১৯] পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

হাকিম হাবিবুর রহমানের পূর্বে ঢাকাকে কেন্দ্র করে আরও কতিপয় মূল্যবান গ্রন্থ লিখিত হয়। যেমন: স্যার চার্লস্ ডি' ওইলীর 'এন্টিকুইটিজ্ অব্ ঢাকা' (১৮১৪-১৫), জেম্স টেইলরের 'এ স্কেচ্ অব্ দি টপগ্রাফি এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্স অব্ ঢাকা' (১৮৪০), সৈয়দ আওলাদ হাসানের 'নোট্স অন দি এন্টিকুইটিজ্ অব্ ঢাকা' (১৯০৪), ব্রাডলে বার্টের 'দি রোমাঞ্চ অব্ এন্ ইস্টার্ণ ক্যাপিটাল' (১৯০৬), নুসরত জং-এর 'তারীখ-এ-জাহাঙ্গীর নগর' (ঢাকা) (১৯০৮), সৈয়দ হুসাইনের 'একোজ্ ফ্রম ওল্ড ঢাকা' (১৯০৯), কেদার নাথের 'ঢাকার বিবরণ' (১৯১০), মুনশি রহমান আলী তায়েশের 'তাওয়ারীখ-এ-ঢাকা' (১৯১০) ইত্যাদি। কিন্তু এসব গ্রন্থে ঢাকার দরগাহ্, মাযার ও কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত বিশিষ্ট পীর আওলিয়া ও খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত ব্যাপক আলোচনা নেই, যেমনটি রয়েছে হাকিম হাবিবুর রহমানের 'আসূদেগান-এ-ঢাকা' গ্রন্থে। এদিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে তাঁর এ গ্রন্থখানা অভিনবত্ব ও কৃতিত্বের দাবীদার এবং এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ইতিহাস রচনায় হাকিম সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তাঁর 'আসূদেগান-এ-ঢাকা' গ্রন্থের উল্লেখ করে সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুর[২০] তাঁর 'Glimpses of Old Dhaka' গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেন : My friend Late Hakim Habibur Rahman's work 'Asoodegan-e-Dhaka' has also been of much help to me in finding historical or traditional background of the tombs and mausoleums in Dhaka. This

---

[২০] সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুর (১৮৮৫-১৯৭২ খ্রীঃ) ছিলেন একজন ইতিহাসবেত্তা, লেখক, গবেষক এবং ঐতিহাসিক নিদর্শন সমূহের সংগ্রাহক। তাঁর সংগ্রহে সমৃদ্ধ হয়েছে তদানীন্তন ঢাকা যাদুঘর (বর্তমান বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর)। সকল প্রকার গোঁড়ামীর উর্ধ্বে থেকে তিনি সারা জীবন জ্ঞান চর্চা ও সত্যের সাধনা করেছেন। পুরনো মূল্যবোধ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও তিনি প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। কালের চাহিদার প্রতি পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন। সামাজিক পরিবর্তনকে তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। প্রাচীন ঢাকা তথা মুসলিম বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক ধারণা ও গভীর জ্ঞান ছিল। এ বিষয়ে দীর্ঘ সাধনার পর তিনি 'Glimpses of old Dhaka' নামে একটি বই লিখেন, যা ১৯৫২ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। লক্ষণীয় যে, তিনিই ১৯৫২ সালে সর্বপ্রথম ইংরেজীতে 'Dhaka' বানানটি চালু করেন। তিনি হাকিম হাবিবুর রহমানের সমসাময়িক ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

gentleman devoted much of his time and energy in compiling this important work.[২১]

(৪) 'ঢাকা ঃ পচাস্ বরস্ পহ্লে' ঃ ১৮৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ উর্দু গ্রন্থখানা তদানীন্তন পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দীন রচিত আট পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি ভূমিকাসহ লাহোরের কিতাব মঞ্জিল থেকে ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানা জনাব মোঃ রেজাউল করিম 'ঢাকা ঃ পঞ্চাশ বছর আগে' শিরোনামে বাংলায় অনুবাদ করেন এবং তা বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক ডিসেম্বর ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত জনাব হাশেম সুফীও গ্রন্থখানা 'ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে' শিরোনামে বাংলায় অনুবাদ করেন এবং তা ঢাকা ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক অক্টোবর ১৯৯৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানা মূলতঃ বৃটিশ আমলের অল্ ইন্ডিয়া ঢাকা রেডিও কেন্দ্র' হতে ১৯৪৫ সালে প্রচারিত[২২] ১৬টি কথিকার সমষ্টি। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৪৮ সালে ঢাকা রেডিও কেন্দ্র থেকে তাঁর কথিকাগুলোর একটি অনুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করা হয়। কথিকাগুলোর প্রচার যেদিন শেষ হয়েছিল, সেদিন ঢাকা রেডিও কেন্দ্র হতে তিনি বলেছিলেন যে, তখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ঢাকা যেমন ছিল এবং যা ছিল, তা তিনি ষষ্ঠদশ আসরে খুব সংক্ষেপে শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপন করে বিদায় নিচ্ছেন। কিন্তু ঢাকা তখনও ঢাকাই (আচ্ছন্নই) রয়ে গেছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, ঢাকার উপর আরও বেশী আলোকপাত করে এর সৌন্দর্য জনগণের সামনে তুলে ধরা উচিত।[২৩]

গ্রন্থটিতে মূলতঃ ঢাকার উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের সাংস্কৃতিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। সংস্কৃতি বলতে আজকাল আমাদের

---

[২১] S.M. Taifoor, Glimpses of Old Dhaka, Dacca, 1952, P. V.

[২২] A.B.M. Habibullah, Descriptive Catalogue of the Persian, Urdu and Arabic Manascripts in the Dacca University Library, Vol. II, Urdu and Arabic Manascripts, Dacca, 1968, P. 409.

[২৩] ঢাকা পচাস্ বরস্ পহ্লে, কিতাব মঞ্জিল, লাহোর, ১৯৪৯, পৃঃ ১৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

দেশে সাধারণ্যে যা বোঝানো হয়, তার কোনটাই এ গ্রন্থে বাদ পড়েছে বলে মনে হয় না। এতে ঢাকার কৃষ্টি পরায়ণ সভ্যসমাজের গান-বাদ্য, রঙ্গ রসিকতা, রঙ্গ মঞ্চের অভিনয়, কবিতার আসর, মেলা, প্রদর্শনী, উৎসব, খেলা-ধূলা, বেশ-ভূষা, সাজ-সজ্জা, আপ্যায়ন-আতিথেয়তা, পানাহার, খাদ্য-উপাদান, খাদ্য প্রস্তুতির বৈশিষ্ট্য, মিষ্টান্নের বৈচিত্র্য–মোট কথা ঢাকার নাগরিক জীবনের যাবতীয় রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান হৃদয় গ্রাহী ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিধৃত হয়েছে। এমন একটি সাংস্কৃতিক ইতিহাস গ্রন্থ হাকিম সাহেবের পূর্বেতো নয়-ই, আজও প্রণীত হয়েছে বলে মনে হয় না। এ গ্রন্থে কেবল সাংস্কৃতিক ইতিহাসই নয়, কতকটা সামাজিক ইতিহাস- তথা ঢাকা বাসীর তদানীন্তন পেশা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্পকলা ইত্যাদিও স্থান লাভ করেছে।[২৪] এদিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহমদ বলেন: "তাঁর (হাকিম হাবিবুর রহমান) রচিত ঢাকা পচাস্ বরস্ পহ্লে' বিগত যুগের ঢাকা নগরীর সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কিত একটি অত্যন্ত মূল্যবান দলিল। উর্দু ভাষায় রচিত এই পুস্তকে হাকীম সাহেব তাঁর সময়কালের ঐতিহ্যবাহী ঢাকা নগরীর যে হৃদয়গ্রাহী ও তথ্যসমৃদ্ধ চিত্র উপস্থাপিত করেছেন, তা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক দিক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান।"[২৫]

গ্রন্থটিতে 'অল্ ইন্ডিয়া রেডিও ঢাকা কেন্দ্র হতে প্রচারিত যে ১৬টি কথিকা রয়েছে, সেগুলোর শিরোনাম হচ্ছে- (১) ইতিহাসের দৃষ্টিতে ঢাকা, (২) ঢাকার শিল্প (মখমল), (৩) টুপির কাহিনী, (৪) রমজানের আগমন, (৫) ঢাকার রুটি, (৬) পেশা, (৭) খাদ্য পরিবেশন, (৮) ঢাকার বিশেষ বিশেষ খাদ্য, (৯) উল্লেখযোগ্য খাদ্য, (১০) কুস্তি ও ব্যায়াম, (১১) মিষ্টি, (১২) খেলাধূলা, (১৩) সংগীত চর্চা, (১৪) মেলা ও পর্ব, (১৫) তবলা ও গান এবং (১৬) হুঁকা, পান ও চা। এ ১৬টি বেতার কথিকাই গ্রন্থমধ্যে ১৬টি অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত।

---

[২৪] জীনাত আরা সিরাজী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭; ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩০ এবং হাকীম হাবীবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১।

[২৫] প্রফেসর সালাহ্ উদ্দীন আহমদ রচিত 'মুখবন্ধ', হাকীম হাবীবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৬টি অধ্যায়ে কি কি বিষয় স্থান লাভ করেছে, তা প্রথম অধ্যায়ের শীর্ষভাগে প্রদত্ত স্বয়ং হাকিম সাহেবের বক্তব্য হতেই অনুধাবন করা যায়। 'ইতিহাসের দৃষ্টিতে ঢাকা' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, তখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ঢাকা কেমন ছিল, তখনকার জনসাধারণের জীবন যাত্রা কেমন ছিল, তাহযীব-তামাদ্দুনের অবস্থা কি ছিল, শিক্ষা-দীক্ষা কি ধরনের ছিল, কোন্ কোন্ বিদ্যা ও বিষয়ের চর্চা হত, জনসাধারণ কিভাবে বসবাস করতো, ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কি কি কাজ করতো, দুঃখ-দরদের দিনগুলো কিভাবে কাটতো, মেলা ও পর্ব অনুষ্ঠানে কি হতো, অতিথি আপ্যায়নে কি কি খাদ্য সামগ্রী পরিবেশন করা হতো, সুধী ও প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদে কি ধরনের অভিনব নক্শা প্রবর্তন করেছিলেন, ঢাকার কোন্ কোন্ শিল্প বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিল, অর্থাৎ যে সমৃদ্ধি বলে ঢাকা ভারতের বুকে শেষ যুগীয় তাহযীব-তামাদ্দুনের লালনভূমি হয়ে উঠেছিল সেসব বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও সেখানকার বাসিন্দাদের সম্পর্কে আলোচনাই এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।[২৬]

গ্রন্থখানা ঢাকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস হিসেবে বিবেচিত হলেও 'ইতিহাসের দৃষ্টিতে ঢাকা' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়টি ব্যতিক্রম। এ অধ্যায়ে তিনি প্রথম দিকে সংক্ষেপে হিন্দু যুগ হতে মুসলিম শাসনামল পর্যন্ত ঢাকার ইতিহাস আলোচনা করেছেন। অত:পর ঢাকার ভৌগোলিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা শেষ করে এখান্‌কার জনগণের উৎসমূল (পূর্ব-পুরুষদের আবাসস্থল), পেশা ও ভাষার বিবরণ দিয়েছেন। ফলে ঢাকার উদ্ভব, বিকাশ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি। হাকিম হাবিবুর রহমান ঢাকার যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আলেখ্য এ গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন, তা ছিল তাঁর চাক্ষুস অভিজ্ঞতার ফসল। ঢাকার সমাজের নানা স্তরে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি বিদ্যমান ছল। একজন সফল ইউনানী চিকিৎসক হিসেবে ঢাকার সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে তাঁর উঠা-বসার সুযোগ হয়েছিল। তিনি সুধী সমাজের সকল অনুষ্ঠান ও সভা-সমিতিতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করতেন। তাই

---

[২৬] ঢাকা : পচাস্ বরস্ পহ্‌লে, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।

Dhaka University Institutional Repository

এখানকার সমাজ-সংস্কৃতি, তাহযীব-তামাদ্দুন, আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন পুরোপুরি ওয়াকিফ্হাল। এ প্রসঙ্গে তদানীন্তন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিম উদ্দীনের বক্তব্য হতে জানা যায় যে, হাকিম সাহেব তাঁর বন্ধুদের বারংবার অনুরোধে ঢাকার প্রাচীন বিবরণ এবং রসম-রেওয়াজ সম্পর্কে রেডিওতে ধারাবাহিক বক্তৃতা করেছিলেন। উক্ত ভাষণ লোকেরা খুবই আনন্দের সাথে উপভোগ করতো এবং শুন্তো। কেননা ঢাকার ইতিহাস ও রসম-রেওয়াজ এবং পরম্পরাগত বিবরণ সম্পর্কে তাঁর সমকক্ষ জ্ঞান অন্য কারো ছিলনা। হাকিম সাহেব ঢাকার অতীত অবস্থা ও বিবরণ যেমন বিশদ এং আকর্ষণীয় করে বর্ণনা করেছেন, তা থেকে জানা যাবে তাঁর জ্ঞান কত গভীর ও বিস্তৃত ছিল।[২৭] এদিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে হাকিম সাহেব এবং তাঁর গ্রন্থখানা কৃতিত্ব ও অভিনবত্বের দাবীদার।

অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাকিম হাবিবুর রহমান রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'মাসাজিদ-এ-ঢাকা' (ঢাকার মসজিদসমূহ), 'শুআরা-এ-ঢাকা' (ঢাকার কবিগণ) এবং 'সালাসা-গাস্সালাহ্' (ক্লান্তিমোচক তিন পেয়ালা শরাব) এখনও অপ্রকাশিত রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের কোন চিহ্নই বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না। গবেষক নিজে বিভিন্নভাবে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ এবং হাকিম হাফেজ আজিজুল ইসলামসহ আরও কতিপয় লব্ধ প্রতিষ্ঠিত পন্ডিত/ বিশেষজ্ঞের সাথে মতবিনিময় করেছেন, কিন্তু গ্রন্থ দু'টির হদিস পাওয়া যায়নি। তবে গ্রন্থদ্বয়ের নামকরণ থেকে একথা অনুমান করা সম্ভবত: অযৌক্তিক হবে না যে, গ্রন্থ দু'টি ছিল ইতিহাস বিষয়ক। গ্রন্থদ্বয়ে তিনি ঢাকার বিভিন্ন মসজিদ ও বিভিন্ন কবি সম্পর্কে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যা খুঁজে পেলে ও প্রকাশিত হলে ঢাকার ইতিহাস সম্ভবত: আরও পূর্ণাঙ্গ এবং আকর্ষণীয় হতে পারতো।

---

[২৭] 'খাজা নাজিমুদ্দীনের ভূমিকা,' পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮।

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত গ্রন্থাবলী ব্যতীত 'কুচ্ পুরানী বাঁতে' (কিছু পুরনো কথা) শিরোনামে ২০টি প্রবন্ধ এবং 'ঢাকা-কী তারীখী ইমারত' (ঢাকার ঐতিহাসিক দালান) শিরোনামে ১২টি প্রবন্ধও তিনি 'অল্ ইন্ডিয়া রেডিও ঢাকা কেন্দ্র' হতে পাঠ করেন বলে ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন,[২৮] যদিও সেগুলোর কোন অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। তবে 'ঢাকা আব্সে পচাস্ বরস্ পহ্লে' শীর্ষক বেতার কমসূচীর অধীনে পঠিত ১৬টি প্রবন্ধসহ উপর্যুক্ত প্রবন্ধসমূহ যে ইতিহাস বিষয়ক ছিল, তা তাঁর নিজস্ব বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত হয়। তিনি 'আসূদেগান-এ-ঢাকা' শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে বলেন, এ তিনটি বেতার কর্মসূচীতে ঢাকার পুরনো ইতিহাস এসে গেছে। এগুলো প্রকাশ করা প্রয়োজন।[২৯]

'সালাসা-গাস্সালাহ্' ঃ হাকিম হাবিবুর রহমানের এ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক গ্রন্থখানা ঢা:বি: কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। এ পান্ডুলিপি পাঠে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বংগ-দেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যা বাংলা ও আসামের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। হাকিম সাহেব আনুষ্ঠানিক বিদ্যার্জন শেষে ১৯০৪ সালে উত্তর ভারত থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। তখন তাঁর মনে এ খেয়াল জাগ্রত হলো যে, তিনি হাজী খলিফা রচিত 'কাশ্ফুয্ যুনূন' গ্রন্থের রচনা-রীতি অবলম্বনে উপমহাদেশীয় লেখকদের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ প্রদেশভিত্তিক আরবী, ফার্সী ও উর্দু রচনাবলীর একটি পরিচিতি গ্রন্থ রচনা করবেন এবং জ্ঞান জগতে একটি বিশাল জ্ঞান ভান্ডার রেখে যাবেন। ইতোমধ্যে ১৯০৬ সালে ঢাকায় নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ্ কর্তৃক আয়োজিত 'মোহামেডান এডুক্যাশনাল কন্ফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে আল্লামা শিবলী নু'মানীও ঢাকায় আসেন। ফলে উক্ত কন্ফারেন্সে তাঁর সাথে হাকিম সাহেবের পরিচয় ঘটে। এটি ছিল হাকিম সাহেবের জীবনে একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। আল্লামা শিবলী নু'মানীর ছোঁয়া

---

[২৮] হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫

[২৯] আসূদেগান-এ-ঢাকা, ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

লেগে তাঁর মধ্যে জ্ঞান চর্চার স্পৃহা ও জাতীয় কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। তিনি শিবলী নু'মানীর নিকট গ্রন্থ প্রণয়নের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ কামনা করেন। শিবলী নু'মানী তাঁর পরিকল্পনা পছন্দ করেন এবং এর ভূয়শী প্রশংসা করেন। কিন্তু তিনি হাকিম সাহেবকে ভারতীয় উপমহাদেশের পরিবর্তে কেবলমাত্র বংগদেশীয় লেখকদের গ্রন্থ পরিচিতি রচনার পরামর্শ দেন। তখন থেকে হাকিম সাহেব বাংলার আনাচে-কানাচে দীর্ঘ চল্লিশ বছর অনুসন্ধান চালিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করেন এবং একটি মূল্যবান গ্রন্থাগার সৃষ্টি করেন।[৩০] তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর সাধনা ও পরিশ্রম করে এ গ্রন্থখানা জীবন-সায়াহ্নে এসে সমাপ্ত করেন। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে এটা প্রকাশ করে যেতে পারেননি। তাঁর বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থখানা বাংলা-আসামের জ্ঞানমূলক ইতিহাস সমৃদ্ধ একটি মূল্যবান দলিল।[৩১]

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌র বিবরণ হতে জানা যায় যে, হাকিম সাহেবের ইন্তেকালের পর সম্ভবতঃ গ্রন্থখানার একটা বড় অংশই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নিজে হাকিম সাহেবের দুই পুত্র হাকিম ইরতিযাউর রহমান ও হাকিম হুসামুর রহমানের সাথে আলাপ করে জেনেছেন যে, হাকিম হাবিবুর রহমানের ইন্তেকালের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগের তদানীন্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ আন্দালীব শাদানীই সর্বপ্রথম তাঁদের বাড়ী থেকে 'সালাসা-গাস্‌সালাহ্‌'-এর পান্ডুলিপি এনে নিজের গবেষণা কর্মে ব্যবহার করেন। অত:পর ঢাকা কলেজের তদানীন্তন উর্দুর অধ্যাপক ইকবাল আযীম অধ্যাপক আন্দালীব শাদানীর নিকট থেকে এ পান্ডুলিপি চেয়ে নেন এবং নিজের গবেষণা কর্মে ব্যবহার করেন। 'মাশ্‌রিকী বাংগাল-মে উর্দু' শীর্ষক যে গ্রন্থ খানা ইকবাল আযীম রচনা করেন, তাতে তিনি উক্ত পান্ডুলিপি হতে সাহায্য গ্রহণের কথা

---

[৩০] জীনাত আরা সিরাজী, পূর্বোক্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭; হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬; আসূদেগান-এ-ঢাকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২; কুলসুম আবুল বাশার, দানিশ, ১ম খন্ড, ৩য় সংখ্যা, দিল্লী, ১৯৯০, পৃঃ ১৫২-৫৩।

[৩১] আসূদে-গান-এ-ঢাকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকারও করেছেন ।[৩২] হাকিম হুসামুর রহমানের বক্তব্য হতে জানা যায় যে, ১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশে (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান) আযাদী আন্দোলন (স্বাধীনতা সংগ্রাম) চলছিল, তখন ইকবাল আযীম সাহেব বাংলাদেশ ত্যাগ করার সময় 'সালাসা-গাস্‌সালাহ্‌'-র অনেকটা অংশ আত্মসাৎ করেন এবং বাদ-বাকী অংশটি তাঁর কাছে একজন বাহক মারফত পাঠিয়ে দেন, যা তিনি অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌র অনুরোধে ১৯৭৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন । এ অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিখানা এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে । তাছাড়া আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষার প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও পুস্তকের যে মূল্যবান সংগ্রহটি তাঁর ছিল, তাও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছিলেন । এগুলোও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে এবং তা 'হাকিম হাবিবুর রহমান কালেক্‌শন' (H.R.C) নামে পরিচিত ।[৩৩]

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌র বিবরন হতে জানা যায় যে, ঐ 'সালাসা-গাস্‌সালাহ্‌' নামক পাণ্ডুলিপিতে হাকিম সাহেব প্রত্যেকটি গ্রন্থের পরিচিতি প্রদানের জন্য যে আলাদা আলাদা ফর্দ (১২''×৮'') ব্যবহার করেছেন[৩৪] তাতে পৃষ্ঠা নম্বর ছিলনা । উর্দু ভাষায় রচিত এ পাণ্ডুলিপিতে বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দু - এ তিন ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহের এবং তাদের লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি রয়েছে, যা ভাষাভিত্তিক তিন খন্ডে বিভক্ত করে বাঁধাই করে রাখা হয়েছে । সিরাজীর বর্ণনা মতে, অধ্যাপক আবদুল্লাহ্‌ ফার্সী গ্রন্থ-পরিচিতির শিটগুলোকে আরবী বর্ণনানুক্রমে বিন্যস্ত করে পৃষ্ঠা নম্বর দিয়ে প্রথম খন্ডের অন্তর্ভূক্ত করেন । এতে রয়েছে ১ থেকে ১৬০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত । এ খন্ডে মোটামুটি ১৫০টি ফার্সী গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি রয়েছে । অনুরূপ ভাবে তিনি উর্দু গ্রন্থ-পরিচিতির ফর্দগুলোকে ২য় খন্ডে এবং আরবী গ্রন্থ-

---

৩২ মাশ্‌রিকী বাংগাল-মে উর্দু, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫ ।

৩৩ গবেষক নিজে H.R.C. পরিদর্শন করেছেন । এই সংগ্রহে আরবী, ফার্সী ও উর্দু বিষয়ে মোট পৌনে তিনশত পাণ্ডুলিপিসহ প্রায় দুই হাজার মুদ্রিত পুস্তক সংরক্ষিত আছে । এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা 'ঐতিহ্য চেতনা' অংশে করা হয়েছে ।

৩৪ কোন কোন গ্রন্থের জন্য একই শীটের ২/৩টি করে কপিও রয়েছে, যা এক পিঠে লেখা ছিল ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিতির শিটসমূহকে ৩য় খন্ডের অন্তর্ভূক্ত করেন। ২য় খন্ডে রয়েছে ১৬১ থেকে ৩৯২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। এ খন্ডে দুইশ'র বেশী উর্দু গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। ৩য় খন্ডে রয়েছে ৩৯৩ থেকে ৪৩৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। এ খন্ডে ৩৫/৪০টি আরবী গ্রন্থের পরিচিতি রয়েছে।[৩৫]

ডঃ কুলসুম আবুল বাশারের উদ্যোগে পান্ডুলিপির ১ম খন্ডটি ১৯৮৮ সালে লাহোরের 'কিতাব শিনাসী' পত্রিকায় (পৃঃ ১-১২৪) এবং ২য় খন্ডটি একই বছর ইসলামাবাদের 'ফিক্‌র-ওয়া-নযর' নামক পত্রিকায় (পৃঃ ৩৯-৫২/আংশিক) প্রকাশিত হয়। জানা যায়, অতিসম্প্রতি এ তিন খন্ডযুক্ত পান্ডুলিপিখানা পাকিস্তানের হায়দরাবাদ হতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।[৩৬] হাকিম সাহেব তার উক্ত 'সালাসা-গাস্‌সালাহ্-' গ্রন্থে বঙ্গদেশ ও আসামে লিখিত ইতিহাস বিষয়ক অনেক গ্রন্থ, যেমন: 'সালাতীন-এ-আফাগেনা', 'রিয়াজুস্‌-সালাতীন', 'সিয়ারুল-মুতাআখ্‌খিরীন', 'খুলাসা-এ-তাওয়ারীখ-এ-বাঙ্গালা', 'আহাদীসুল-খাওয়ানীন', 'সুহায়েল-এ- ইয়ামেন', 'তারীখ-এ- নুস্‌রাত জঙ্গী', 'তারীখ-এ- কাশ্‌মীরিয়ান-এ-ঢাকা', 'তাওয়ারীখ-এ- খান্দান-এ-কাশ্‌মীরিয়া', 'তাওয়ারীখ-এ-ঢাকা' ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করেন।এতে উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ইতিহাস বিষয়ে তাঁর ব্যাপক ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় মেলে।

এ গ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে বলা যায় যে, 'সালাসা-গাস্‌সালাহ্'-এ নামটির উভয় শব্দই আরবী। 'সালাসা' শব্দের অর্থ 'তিন' এবং 'গাস্‌সালাহ্' শব্দের অর্থ 'যে পরিচারিকা মনিবকে গোসল করায়'। সুতরাং 'সালাসা-গাস্‌সালাহ্' অর্থ দাঁড়ায় 'মনিবকে গোসলদানকারীনী তিনজন পরিচারিকা'। কিন্তু এর আরও একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে। শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি দূর করার লক্ষ্যে সকাল বেলা যে বিশেষ তিন পেয়ালা শরাব (মদ্য) পান করা হয়, তাকে 'সালাসা-গাস্‌সালাহ্' বলা হয়। এক্ষেত্রে 'তিন পেয়ালা শরাব' অর্থ পান্ডুলিপি খানা আরবী, ফার্সী ও উর্দু-এ তিন

---

[৩৫] জীনাত আরা সিরাজী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮।
[৩৬] হাকিম হাবিবুর রহমান স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা-২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী সমন্বয়ে লিখিত, যা অধ্যয়ন করে সাহিত্যামোদীগন মানসিক ক্লান্তির অবসান ঘটিয়ে মানসিক প্রশান্তি লাভে সক্ষম হবেন' ।

অধ্যাপক আবদুল্লাহ্‌র বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সোনার গাঁয়ের সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের 'সারভ্' (সাইপ্রাস বৃক্ষ), 'গুল' (গোলাপ ফুল) ও 'লালা' (পপি ফুল) নাম্নী তিনজন পরিচারিকা ছিল । এ তিন জন দাসী তাঁকে গোসল করাতো । তিনি উক্ত তিনজন দাসীর নামের সমন্বয়ে নিম্নোক্ত চরণটি রচনা করেন :

ساقی! حدیث سرو و گل و لاله می رود

অনুবাদ : হে সাকী! সার্‌ভ, গুল আর লালার আলোচনাই চল্‌ছে ।

তিনি পারস্যের কবি হাফিয সিরাজীর নিকট এই চরণটি পাঠিয়ে এ মর্মে অনুরোধ করলেন যে, কবি যেন এ চরণ সংযোগে ও এর ছন্দরীতি অবলম্বনে তাঁর জন্য একটি গযল রচনা করে পাঠিয়ে দেন । কবি হাফিয সিরাজী সুলতানের অনুরোধক্রমে অনুরূপভাবে দশটি চরণ বিশিষ্ট একটি গযল রচনা করে পাঠিয়ে দেন । সেই গযলের শীর্ষ লাইনদ্বয় ছিল নিম্নরূপঃ

ساقی! حدیث سرو و گل و لاله می رود
وین بحث با ثلاثهٔ غساله می رود۔

অনুবাদ ঃ হে সাকী! সারভ্, গুল আর লালার আলোচনাই চলছে, তিনজন স্নাপিকা নিয়েই এই কথোপকথন চলছে ।

অথবা, ভোরবেলার ক্লান্তিমোচক তিন পেয়ালা শরাব যোগেই এই কথাবার্তা আরম্ভ হচ্ছে ।

Dhaka University Institutional Repository

হাকিম সাহেবের গ্রন্থের এ নামটি কবি হাফিয সিরাজীর উক্ত গযলের ২য় লাইন থেকেই নেয়া হয়েছে এবং আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদ্‌ভীর পরামর্শক্রমেই এ নামটি রাখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ সুলায়মান নদ্‌ভী বলেন যে, হাকিম সাহেব বঙ্গদেশের আরবী, ফার্সী ও উর্দু–এ তিন ভাষায় লিখিত গ্রন্থের বিস্তারিত সূচী তৈরী করতে চেয়েছিলেন। তিন ভাষার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি (নদ্‌ভী) এর নাম রাখেন 'সালাসা-গাসসালাহ্'। এতে অন্য একটি সামঞ্জস্য এই ছিল যে, হাফিয সিরাজী বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের নামে যে গযলটি পাঠিয়েছিলেন, তার শীর্ষ লাইনদ্বয়ে সালাসা-গাস্‌সালাহ্' শব্দ দু'টি রয়েছে।[৩৭]

উপরোক্ত গ্রন্থগুলো ছাড়াও হাকিম হাবিবুর রহমানের আরও অনেক রচনা ও প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক তথ্য ও ইতিবৃত্ত স্থান পেয়েছে। মাসিক আল মাআরিফ, আযমগড়, ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪ (পৃঃ ১১৮-১২৪) সংখ্যায় প্রকাশিত 'বেঙ্গল-মে-ইল্‌মে হাদীস' শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধখানা তিনি সৈয়দ সুলায়মান নদ্‌ভীর অনুরোধে রচনা করেছিলেন। এ প্রবন্ধে তিনি বঙ্গদেশে যুগে যুগে হাদীসের যে চর্চা হয়েছিল, তার একটি ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। তাঁর দেয়া বিবরণ হতে জানা যায় যে, বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনার গাঁয়ে জাঁকালো একটি মসজিদ রয়েছে। এ মসজিদটি হুসাইন শাহের পুত্র নুসরত শাহ্ হুসাইনীর যুগে হুসাইন শাহের মৃত্যুর ঠিক দু'বছর পর নির্মিত হয়। এ মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন মালিকুল উমারা তাকিউদ্দীন বিন্ আইনুদ্দীন (যিনি মোবারক মোল্লা নামে পরিচিত ছিলেন) বিন্ মজলিস মুখতার বিন্ মজলিস সরর। এ মসজিদটির গায়ে যে উৎকীর্ণ শিলা লিপি রয়েছে, তাতে এমন একটি শব্দ রয়েছে, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, এই ফাতেমী বংশীয় (হুসেন শাহী বংশ) শাসনামলে হাদীস শাস্ত্রের চর্চা হয়েছিল এবং 'মুহাদ্দিস' হওয়া ছিল কৃতিত্বের ব্যাপার। এ যুগে এবং পূর্ব-যুগেও মুহাদ্দিস নন, এমন অন্যান্য আলিমদের বলা হতো 'দানিশমান্দ' (বুদ্ধিমান)। 'দানিশ মান্দী' (বুদ্ধিমত্তা) বলে যে শাস্ত্রটি পরিচিত

---

[৩৭] আল মাআরিফ, আযমগড়, ফেব্রুঃ ১৯৩৪, পৃঃ ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

ছিল, তা ছিল ফিক্‌হ্‌ শাস্ত্রেরই অপর নাম। আমরা দেখ্‌তে পাই, উক্ত মসজিদের নিকটেই হযরত ইব্রাহীম দানিশ্‌মান্দ-এর মাযার বিদ্যমান রয়েছে। আজও এ মাযারটিকে 'মুতাবাররাক' (সৌভাগ্যের আধার) বলে মনে করা হয়।[৩৮]

উপরোক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা সম্ভবতঃ অযৌক্তিক হবে না যে, ইতিহাসের দৃষ্টিকোন থেকে প্রবন্ধ খানার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাছাড়া এলাহাবাদের মাসিক 'আদীব' (সাহিত্যিক) পত্রিকায় ১৯১০ সালের নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত 'শামসুল বয়ান' শীর্ষক গবেষণামূলক প্রবন্ধখানা তিনি মির্যাজান তাপিশ রচিত ফার্সী গ্রন্থ 'শামসুল বয়ান'-এর সমালোচনা হিসেবে রচনা করেন, যাতে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর নায়ক নওয়াব শামসুদদৌলাহ্‌, সৈয়দ আহমদ আলী খাঁ ও তাঁর সহচর মির্যাজান তাপিশের কোল্‌কাতায় কারাবরণ সংক্রান্ত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মির্যাজান তাপিশ মুর্শিদাবাদ থেকে কল্‌কাতায় আসেন এবং এখানে কিছুদিন ফিরিংগী জেল খানায় অতিবাহিত করেন। তাঁর কারাবরণের কারণ জানা যায়নি। তবে এতটুকু অনুমান করা যায় যে, তাঁকে রাজনৈতিক অভিযোগে কারাবরণ করতে হয়েছিল। সম্ভবতঃ নওয়াব শামসুদ্‌দৌলার সাহচর্যই ছিল তাঁর এই কারাবরণের কারণ। এ নওয়াব সাহেব ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও উচ্চ ধ্যান-ধারণা সম্পন্ন গভর্ণর বা প্রশাসক। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কিছুদিন কল্‌কাতায় কারারুদ্ধ ছিলেন।[৩৯]

উক্ত বিবরণের সাথে প্রফেসর ওয়াকিল আহমদের বিবরণের কিছুটা সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। ওয়াকিল আহমদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মির্যাজান তাপিশ ১৭৮৬ সালে জীবিকার সন্ধানে লক্ষ্ণৌ থেকে মুর্শিদাবাদে আগমন করেন এবং নবাব শামসুদ্দৌলার সাহচর্য লাভ করেন। শামসুদ্দৌলা ইংরেজ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে মির্যাজান তাপিশ তাঁর প্রধান অনুচর হিসাবে কাজ করেন। ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেলে তাঁরা বন্দী হন এবং দীর্ঘকাল কারাভোগ করেন। পরে মুক্তিলাভ করে শামসুদ্দৌলা

---

[৩৮] আল্‌ মাআরিফ, আযমগড়, ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪, পৃঃ ১১৯।
[৩৯] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌, হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকায় চলে আসেন, কিন্তু তাপিশ কলকাতায় থেকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ফার্সী নথিপত্র ও পাণ্ডুলিপি লেখা ও পরীক্ষা করার দায়িত্বে নিয়োজিত হন ।[৪০]

উক্ত প্রবন্ধ ছাড়া ১৯১১ সালে উক্ত 'আদীব' পত্রিকায় তাঁর 'বাংগালিয়্যূ-কী উর্দু শায়েরী' (বাংগালীদের উর্দু কাব্য চর্চা) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যাতে তিনি পূর্ব-বংগ ও বিশেষ করে ঢাকার উর্দু কবিদের কাব্য চর্চা ও তাঁদের জীবনালেখ্য তুলে ধরেন । এতদ্ব্যতীত 'আল্ মাশ্‌রিক' পত্রিকার ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত 'ঢাকে-কী-তারীখী আযমত' অর্থাৎ 'ঢাকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব' এবং উক্ত পত্রিকার ১ম বর্ষের ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'হাজী শাহবায' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় এ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী । ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে 'জাদু' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কিল্‌আ-এ-ঢাকা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি ঢাকার লালবাগ কেল্লা সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেন । তাঁর বিবরণ হতে জানা যায় যে, লালবাগ কেল্লার প্রকৃত নাম 'আওরংগাবাদ কেল্লা' । প্রকৃত ব্যাপার হল- আওরংগযিব আলমগীরের শাসনামলে শাহ্‌যাদা আযম খাঁ ১৬৭৮ খ্রীঃ এ কেল্লাটির নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন । কিন্তু পিতার আদেশে তাঁকে দাক্ষিণাত্যে রওয়ানা হতে হয় বিধায় কেল্লা নির্মাণের দায়িত্ব অর্পিত হয় শায়েস্তা খানের উপর । কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এ সময় শায়েস্তা খানের কন্যা ইরান দুখ্‌ত্ (পরী বিবি), যিনি মুহাম্মদ আযমের বেগম ছিলেন, তাঁর মৃত্যু ঘটে । এদিকে কুসংস্কার বশতঃ শায়েস্তা খানের মনে এ ধারণা জন্মালো যে, এ নির্মাণ কাজ অশুভ । তাই সৌধটির যতটুকু নির্মাণ কাজ হয়েছিল, সেখানেই তা অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হলো । অবশ্য কাজের অগ্রগতি এতটুকু হলো যে, কেল্লার ময়দানের মধ্যস্থলে পরী বিবির একটি সুন্দর সমাধি নির্মাণ করা হল । এখন এর পশ্চিম দিকে রয়েছে একটি দেয়াল (এটি নিশ্চয়ই কোন নির্মানাধীন সৌধের দেয়াল ছিল), দক্ষিণ দিকে মুরচাবন্ধ দেয়াল, উত্তর-দক্ষিণ মুখী দুটি বড় গেইট, অভ্যন্তরে একটি পাকা পুষ্করিণী, একটি

---

[৪০] ওয়াকিল আহমদ, বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী (১৭৫৭-১৮০০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ৮৮-৮৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

গোসলখানা ও একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে–এসবকে একত্রে মিলিয়ে বলা হয় কেল্লা।[৪১] তাছাড়া তাঁর 'উর্দু ভাষার সংস্কার' শীর্ষক একটি প্রবন্ধও ১৯২৩ সালের নভেম্বরে 'জাদু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, যার সাহিত্যিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

হাকিম হাবিবুর রহমান পেশাগতভাবে একজন সফল ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ্ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক হলেও তাঁর রচিত উপর্যুক্ত গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধসমূহ তাঁকে একজন ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিক হিসেবে সমাজে পরিচিত করে তুলে। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উর্দু লেখক ও সাহিত্যিক ঢাকার ইতিকথা ও তাহযীব-তামাদ্দুন নিয়ে এত বেশী মসি চালনা করেননি।[৪২] পূর্ব বঙ্গীয় উর্দু সাহিত্যের সকল ইতিহাস গ্রন্থে তাঁর নাম স্থান পেয়েছে। তাঁকে বাদ দিয়ে বঙ্গ ও আসামের উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস লেখা অসম্ভব। তিনি শুধু ইতিহাস চর্চাই করেননি, বরং ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতাও দান করেছেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ্‌র সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯০৬ সালে তদানীন্তন বঙ্গ প্রদেশ (পূর্ব বাংলা ও আসাম)-এর মুসলিমদের একমাত্র উর্দু জাতীয় পত্রিকা হিসেবে 'আল্ মাশ্‌রিক' সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। পত্রিকাটিতে মূলতঃ অন্যান্য বিষয়ের সাথে ইতিহাস ও জাতীয় জাগরণ বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হত। জাতীয় জাগরণ ও ইতিহাস বিষয়ক লেখক ছিলেন স্বয়ং হাকিম হাবিবুর রহমান ও আবুল ফয়েয মোঃ আবদুল আলী এম.এ। পত্রিকাটির বিষয়বস্তু নির্দেশ করে মলাটে লেখা থাক্‌তো-

اسلامی علمی سیاسی ادبی تاریخی مضامین
اور اخباری دلچسپیوں کا ماہوار میگزین ۔

অর্থাৎ "ইসলামী, জ্ঞানমূলক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও আকর্ষণীয় খবরাদির মাসিক পত্রিকা"।

---

[৪১] জাদু, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯২৩, পৃঃ ২৮-২৯।
[৪২] ঢাকায় উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

এতদ্ব্যতীত খাজা আদিলের সহযোগিতায় ১৯২৩ সালে হাকিম সাহেব 'জাদু' নামক যে মাসিক উর্দু পত্রিকাটি সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছিলেন, তাও অন্যান্য বিষয়ের সাথে ইতিহাস বিষয়ক লেখায় সমৃদ্ধ ছিল এবং যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ প্রসঙ্গে হাকিম হাবিবুর রহমানের ইতিহাস জ্ঞান, পান্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ মেধার প্রশংসা করে এন.কে. ভট্টশালী বলেন :

> "As a scholar, Hakim Sahib enjoys considerable reputation, and his well-known Urdu Magazine, The Jadu, which he published for several years, has produced sufficient evidence of his versatility in the dominion of learning. His knowledge of history and topography of Bengal is remarkable." [৪৩]

তাঁর ইতিহাস-বিষয়ক রচনাবলী থেকে পরবর্তীকালের ঢাকার ইতিহাস রচয়িতাগণ যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করেছেন। 'Panchayat System of Dacca' নামক গ্রন্থ রচনায় ঢাকার খাজা মুহাম্মদ আযম তাঁর উপদেশ, পরামর্শ ও নির্দেশে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।[৪৪] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, খাজা মুহাম্মদ আযম-এর 'Panchayat System of Dacca' শীর্ষক ৬১টি পৃষ্ঠার এ বইটি কলকাতার গুপ্ত মুখার্জী এন্ড কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তিনি নিজে বইটির উর্দু অনুবাদ করেন এবং তা 'ইসলামী পঞ্চায়েত ঢাকা' নামে অভিহিত করেন। ৮০ পৃষ্ঠার এ উর্দু বইটি ১৯১১ সালে কলকাতার নুসরাতুল ইসলামী প্রেস থেকে প্রকাশত হয়।এটি অতীত ঢাকার একটি সামাজিক ইতিহাস। এতে খাজা আযম ঢাকার পঞ্চায়েত প্রথার ইতিহাস, এ প্রথা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য, এর গঠন প্রণালী, পঞ্চায়েত প্রধানদের ক্ষমতা, তাঁদের সামাজিক দায়-দায়িত্ব, এ প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস,

---

[৪৩] N.K. Bhattasali, Catalogue of the coins collected by Hakim Habibur Rahman Akhunzada of Dacca and presented to the Dacca Museum, Dacca, 1936, Introduction; The Donor.

[৪৪] Khawaja Mahomed Azam, Panchayat System of Dacca, Calcutta, 1911, Preface.

Dhaka University Institutional Repository

ব্যয়ের খাত ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেন। বইটির প্রথম দিকে তিনি ঢাকা শহরের ঐতিহ্য বর্ণনা করে শহরটিকে 'প্রাচীন স্মৃতির প্রতীক' এবং এখানকার অধিবাসীদের 'ঐতিহ্য-পূজারী' বলে অভিহিত করেন।[৪৫] পঞ্চায়েত প্রথাকে তিনি পূর্ব-বাংলার মুসলিম কর্তৃক আবিষ্কৃত একটি গণতান্ত্রিক শাসন-প্রথা বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, পূর্ব বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই বহিরাগত ইসলাম প্রচারক পীর-ফকীরগণ এবং এখানকার ইসলাম দীক্ষিত মুষ্টিমেয় মুসলিম তাঁদের ইসলামী বিধি-বিধান পালন ও পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির উদ্দেশ্যে এ প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন।[৪৬] খাজা মুহাম্মদ আযম এ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে হাকিম হাবিবুর রহমানের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা পেয়েছেন এবং ঋণও স্বীকার করেছেন। হাকিম হাবিবুর রহমান যে একজন প্রাজ্ঞ ও গভীর জ্ঞান সম্পন্ন ইতিহাসবিদ ছিলেন, এর প্রমাণ আমরা এখানে পাই।[৪৭]

হাকিম হাবিবুর রহমান কেবল ঢাকার বিভিন্নমুখী ইতিহাসেরই বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। বরং বংগের ইতিহাস এবং ইসলামের ইতিহাসেও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। এর প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে যখন 'History of Bengal' শীর্ষক গ্রন্থখানা রচনার কাজ চলছিল, তখন বাংলার মধ্যযুগীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের তথ্য-উপাদান ও মাল-মসলা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল এবং এ বিষয়ে তাঁর সহযোগিতার হাত তিনি সম্প্রসারিত করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তদানীন্তন বাংলার গভর্ণর জেনারেল খাজা নাজিম উদ্দীন অভিমত ব্যক্ত করেন যে, পূর্ব বাংলার মুসলিম সালতানাতের অবস্থা এবং তৎকালীন সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রতি হাকিম সাহেবের খুবই আগ্রহ ছিল। সে যুগের ইতিহাস তিনি গভীরভাবে ও সযতনে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং ঐ সময়ের পুস্তকাদি ও কলমী পুঁথির বিরাট সংগ্রহ তাঁর

---

৪৫ Jyotis Chandra Das Gupta, National Biography for India, Vol. VI, Dacca, 1919, pp.11-12.

৪৬ Ibid, P. 12.

৪৭ খাজা মুহাম্মদ আযম, ইসলামী পঞ্চায়েত ঢাকা, কলকাতা, ১৯১১, পৃঃ ৬-৭; ঢাকায় উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চা (১৯০১-১৯৭১), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭)।

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। তিনি অসংখ্য মুদ্রা, শিলালিপি, ফরমান ইত্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন। বাংলার যোগ্য ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁকে গণ্য করা হতো এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যাপকগণ অধিকাংশ সময় তাঁর কাছ থেকে ঐসব ব্যাপারে যুক্তি-পরামর্শ ও সহযোগিতা নিতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলার ইতিহাসের উপর যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানেও তাঁর সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। [৪৮] কিন্তু কাজটি সমাপ্ত ও প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ড. এম. হাসান 'The History of Bengal', vol.II-এর মুখবন্ধে এ প্রসঙ্গে বলেন :

> "It is a great pity that before this volume could be completed two of the promoters of the scheme were taken away from us by the cruel hand of death.Shifaul-Mulk Hakim Habibur Rahman Khan who was the embodiment of all that is best in Muslim Culture, died suddenly in the midst of his labours. He was engaged at the time of his death in collecting useful material for the social and cultural history of mediaeval Bengal intended for this volume."[৪৯]

হাকিম হাবিবুর রহমান শুধুমাত্র ইতিহাস বিষয়ের গবেষণা ও ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়েই সময় কাটাননি। পুরনো মুদ্রা ও শিলালিপি সংগ্রহের প্রতিও তাঁর বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন নিদর্শনের প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং উত্তরসূরীদের জন্য তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও তিনি ছিলেন সজাগ ও সক্রিয়। এ ক্ষেত্রে তাঁর ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক মনোভাবের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। অধিকন্তু তিনি প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করে শুধুমাত্র যক্ষের ধনের মত আগলে রেখে উত্তরাধিকারীদের নির্লিপ্ত উদাসিনতা অথবা কীটপতঙ্গের

---

৪৮ ঢাকা : পচাস্ বরস্ পহ্‌লে, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬-৭; 'ঢাকাঃ পঞ্চাশ বছর আগে', মোঃ রেজাউল করিম অনূদিত, পৃঃ ২১-২২, খাজা নাজিম উদ্দীনের ভূমিকা।

৪৯ The History of Bengal, vol. II, Muslim period (1200-1757), Sir Jadu Nath Sarkar (ed.), Published by the University of Dacca, First edition, August 1948, Foreword.

Dhaka University Institutional Repository

ভোজনোৎসবের জন্য ছেড়ে যাননি, বরং প্রতিটি জিনিসের যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিজের জীবদ্দশাতেই সুসম্পন্ন করে গেছেন। তিনি তাঁর মুদ্রা সংগ্রহটি তৎকালীন ঢাকা যাদুঘরকে (বর্তমান বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর) ক্যাটালগ প্রকাশের শর্তে উপহার দেন।[৫০] সেখানে বিভিন্ন ধরনের ২৩১ টি মুদ্রা ছিল। উপহারের শর্ত মোতাবেক তৎকালীন ঢাকা যাদুঘরের কিউরেটর বাবু নলিনী কান্ত ভট্টশালী মোট ২২১টি পাঠযোগ্য মুদ্রা অন্তর্ভূক্ত করে ১৯৩৬ সালে একটি ক্যাটালগ প্রকাশ করেন, যার শিরোনাম হচ্ছে 'Catalogue of the Coins collected by Hakim Habibur Rahman Akhunzada of Dacca and presented to the Dacca Museum'. উক্ত ক্যাটালগভূক্ত ২২১টি মুদ্রার মধ্যে ১টি স্বর্ণমুদ্রা, ১৭৮টি রৌপ্য মুদ্রা, ৮টি বিলন বা বেলোয়ারী মুদ্রা, ১টি পিতলের মুদ্রা, ৩টি রৌপ্য মন্ডিত পিতলের মুদ্রা এবং ৩০টি তামার মুদ্রা রয়েছে। চৌধুরী শামসুর রহমানের বর্ণনাতেও এর ইংগিত পাওয়া যায়। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন মুদ্রার বিরাট সংগ্রহ ঢাকা যাদুঘরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার এ সংগ্রহে পাক্-ভারত উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলিম শাসন যুগের বহু রাজা-বাদশাহ্ ও সুলতানের মুদ্রা ছাড়াও অনেক সামন্ত নৃপতির মুদ্রাও দেখতে পাওয়া যায়। মুদ্রার এ বিরাট সংগ্রহের মধ্যে হাকিম হাবিবুর রহমান খান ও খান বাহাদুর এস.এম. তৈফুর প্রদত্ত ৪২৩টি মুদ্রাও রয়েছে।[৫১] পরবর্তী সময়ে সংগৃহীত মুদ্রাগুলি আযম গড়ের 'দারুল মুসান্নিফিন'-কে দেয়ার ইচ্ছা তিনি সৈয়দ সুলায়মান নদ্ভীর নিকট কয়েকবারই ব্যক্ত করেছিলেন, যদিও তা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি।[৫২] মসজিদ ও কবরসমূহের শিলালিপি সংগ্রহের কথা উল্লেখ করে তিনি সৈয়দ নদ্ভীকে জানিয়ে ছিলেন যে, তাঁর সংগ্রহে হুসাইন শাহী ও পূর্ব যুগের অনেক মসজিদ ও কবরের শিলালিপি মজুদ রয়েছে।[৫৩] সৈয়দ সুলায়মান নদভী হাকিম হাবিবুর রহমানের

---

[৫০] আবুয যোহা নূর আহমদ, উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১।
[৫১] 'ঢাকা যাদুঘর' শীর্ষক প্রবন্ধ, মাহে নও, ঢাকা, মে-১৯৬৪, পৃঃ ৩৯।
[৫২] আল্ মা-আরিফ, আযমগড়, এপ্রিল ১৯৪৭, পৃঃ ৬১৪।
[৫৩] আল্ মা-আরিফ, আযমগড়, ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪, পৃঃ ১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক অভিরুচির কথা উল্লেখ করে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উর্দু সাহিত্য ও বঙ্গীয় ইতিহাসের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল।[৫৪]

তদানীন্তন ঢাকা যাদুঘরের কিউরেটর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ নলিনী কান্ত ভট্টশালীও হাকিম হাবিবুর রহমানের ইতিহাস বিষয়ক জ্ঞান, পান্ডিত্য, তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রাচীন মুদ্রা বিষয়ক জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর রচিত 'Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal' শীর্ষক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রেও হাকিম সাহেবের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি হাকিম সাহেবের নিকট যে সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছেন, তার ঋণও তিনি স্বীকার করেছেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে N.K. Bhattasali বলেন ঃ

> "Twelve years ago, when I was engaged in writing my book 'Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal', the Hakim rendered me ungrudging help, of which I was then very much in need. It was the Hakim, who first made out the name of the new Sultan Alauddin Firoz Shah, son of Bayazid Shah, the discovery of whose identity is a noteworthy feature of my book. I have thus had ample opportunity for knowing that no one is better fitted to compile this catalogue than the donor himself. But as his profession is 'Herbs' and mine 'Coins', he has wisely and compassionately left the work to be done by the professional, though, I am sure, the man of 'Herbs' knows much more about old coins than the man of 'Coins' himself."[৫৫]

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি :

[৫৪] আল্ মা-আরিফ, আযমগড়, এপ্রিল ১৯৪৭, পৃঃ ৩১৪।

[৫৫] N. K. Battasali, op.cit. Preface.

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমতঃ হাকিম হাবিবুর রহমান ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন না এবং ঐতিহাসিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পূর্ব পরিকল্পনাও তাঁর ছিলনা । তবে নিঃসন্দেহে তিনি একজন ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি ছিলেন এবং ঐতিহ্য-চেতনা তাঁর ভেতর সক্রিয় ছিল ।

দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত ঢাকা নগরীর তাহযীব-তামাদ্দুনের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন এবং ঢাকার ঐতিহাসিক স্থান, মসজিদ-মাযার ও সমাহিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন, ইতিহাসের দৃষ্টিকোন থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে এতে কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলেও এগুলো আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান দলিল হিসেবে বিবেচিত । ইতিহাস হিসেবে সাদামাটা হলেও এগুলোর সাহিত্যিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য ।

তৃতীয়তঃ তিনি কেবল ঢাকার বিভিন্নমুখী ইতিহাসেরই বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, বরং বাংলার ইতিহাস এবং ইসলামের ইতিহাসেও তাঁর যথেষ্ট পান্ডিত্য ছিল ।

চতুর্থতঃ পুরনো মুদ্রা ও শিলালিপি সংগ্রহের প্রতি তাঁর যে বিশেষ ঝোঁক ছিল, তা তাঁর ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচায়ক ।

পঞ্চমতঃ তাঁর ইতিহাস চর্চার উদ্দেশ্য ছিল ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটন করা, ঐতিহ্যের স্মৃতিকে জিইয়ে রাখা, সত্য ও সঠিক ইতিহাস রচনা করা, এগুলোকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা এবং সর্বোপরি মুসলিম জাতিকে ইতিহাস-সচেতন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা ও তাঁদের ভেতর ঐতিহ্য চেতনাকে সক্রিয় করা । বলা বাহুল্য, আধুনিক ঐতিহাসিকদের বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস চর্চার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত না হলেও ইতিহাস সাধনার মাধ্যমে তিনি অন্ততঃ বাংলার মুসলিমদেরকে ইতিহাস-ঐতিহ্য সচেতন জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছেন, যা বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠতঃ ইতিহাস চর্চাকে Promote করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর লিখনী পরিচালনা করেছেন। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তিনি model নন, তবে এর মাধ্যমে তিনি অন্যান্যদের উৎসাহিত করেছেন, এতে সন্দেহ নেই।

সপ্তমতঃ তিনি ঐতিহাসিক ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোন থেকে ঘটনা ও জনশ্রুতির সত্যাসত্য বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, যা একজন ঐতিহাসিকের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত।

অষ্টমতঃ তিনি ইতিহাসের সাথে ভাষাতত্ত্বের সংযোগ সাধনের মাধ্যমে নিজেকে একজন ঐতিহাসিক-ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঢাকার 'কুট্টি' এবং নারায়নগঞ্জের 'চাষাড়া' শব্দের বিশ্লেষণই এর প্রমাণ।

সর্বশেষে বলা যায়-তিনি কেবল ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেননি, বরং কাব্য ও সাহিত্য চর্চা, সাংবাদিকতা, রাজনীতি চর্চা, চিকিৎসার মাধ্যমে সমাজ সেবা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তাঁর ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। ইতিহাস-সাধনা ছিল তাঁর জীবনের বহুমুখী কর্মকান্ডের একটি দিক মাত্র। আর এতসব কর্মকান্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মুসলিমদের জাগরণ।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

নির্বাচিত তিন মনীষীর চিন্তা-চেতনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বাংলায় মুসলিম জাগরণ এতদঞ্চলের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং এ সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় বহু মুসলিম মনীষীর অবদান ভাস্বর হয়ে আছে। তাঁদের মধ্যে মাওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮ খ্রীঃ), মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০ খ্রীঃ) এবং হাকিম হাবিবুর রহমান (১৮৮১-১৯৪৭ খ্রীঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। এ তিনজন মহান ব্যক্তিই ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে কীর্তিমান ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ।

পূর্বোক্ত অধ্যায়সমূহে মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর রহমানের ঐতিহ্যচেতনা, ইতিহাস সাধনা ও সমাজসেবাসহ তাঁদের চিন্তা-চেতনা ও সামগ্রিক কর্মকান্ডের বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। ফলে প্রত্যেকের চিন্তা-চেতনা ও কর্মকান্ডের মিল ও গরমিল তথা পার্থক্য আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাঁদের তিনজনের চিন্তা-চেতনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ তথা পারস্পরিক সম্পর্ক, যোগাযোগ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ঐক্য, সাধনার ক্ষেত্রে মিল ও ভিন্নতা ইত্যাদির সমন্বয়মূলক মূল্যায়ন নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

১. আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তিনজনের জন্ম এবং মৃত্যুর সময়কাল প্রায় কাছাকাছি। এঁদের তিন জনেরই জীবনকাল ছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ (ষাটের দশক) হতে বিশ শতকের প্রথমার্ধ (ষাটের দশক) পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দী ব্যাপী বিস্তৃত। আমরা এ-ও লক্ষ করেছি যে, উক্ত সময়ে বিশ্ব রাজনীতির দ্রুত পটপরিবর্তন এবং বৃটিশ শাসিত বাংলা-ভারতে স্বাধীনতা অর্জনের স্পৃহার অংকুরোদ্গম ও ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়া জোরদার হতে হতে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহন করে এবং এ একটি শতাব্দীর মধ্যেই বাংলার শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধাপে আত্ম-সমালোচনা ও আত্মোপলব্ধির কাঙ্ক্ষিত স্তরে নিজেদের উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজুদ্দৌলাহ্‌র পরাজয়ের এক শতাব্দীকাল পর ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব, ১৮৬৫ সালে সংঘটিত সিত্তানার যুদ্ধ, ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মুসলিম সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা আন্দোলন, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ, ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ, বলকান যুদ্ধ (১৯১২), প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮), ভারতে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-২০), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৯২১), ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০), ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন প্রভৃতি এ সময়েরই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ সময়েই বাংলার মুসলিমদের মধ্যে বহুসংখ্যক মুসলিম চিন্তানায়ক ও কর্মবীরের আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা মুসলিম জাগরণের ইতিহাসে দিশারীর ভূমিকা পালন করেছেন। উপর্যুক্ত তিনজনই ছিলেন এঁদের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব।

২. মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা ইসলামাবাদী এবং হাকিম হাবিবুর রহমান-এ তিনজনের জন্মস্থান এবং মৃত্যুস্থান আলাদা হলেও উভয়ের কর্মজীবন (বিশ শতকের প্রথমার্ধ) প্রায় একই সময়ে এবং একই পরিস্থিতিতে কাটে বিধায় উভয়ের চিন্তা-চেতনা ও কর্মকান্ডের ভেতরে বহু মিল আমরা খুঁজে পাই। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে গরমিল বা পার্থক্যও স্পষ্ট। উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য লক্ষনীয় দিক হচ্ছে এই যে, মাওলানা আকরম খাঁ ও মাওলানা ইসলামাবাদী বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে রাজনীতি ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একে অন্যের সহকর্মী ছিলেন এবং উভয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে সম্মিলিতভাবে দেশ ও জাতির জন্য কাজ করেছেন। তাছাড়া মাওলানা আকরম খাঁ ও মাওলানা ইসলামাবাদী সম্মিলিতভাবে 'আঞ্জুমান-এ-উলামা-এ-বাঙ্গালা' 'ইসলাম মিশন', 'খাদিমুল ইসলাম', 'বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলায় মুসলিম জাগরণের

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা নিঃসন্দেহে উভয়ের বড় অবদান। অবশ্য তাঁদের দু'জনের সাথেই হাকিম হাবিবুর রহমানের যোগাযোগ ও সম্পর্ক প্রায় অনুপস্থিত ছিল। তবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে অনেকাংশে মিল থাকার ফলে সরাসরি সম্পর্ক ও যোগাযোগ প্রায় না থাকলেও তিনজনের মানসিক চিন্তনের সম্পর্ককে অস্বীকার করা যায় না।

৩. তিনজনের প্রত্যেকেই ছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষায় বা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত আলিম ও মাওলানা। তবে কেহই সাধারণ উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। অবশ্য হাকিম হাবিবুর রহমান ছিলেন এক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম। মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং এক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অন্যদিকে মাওলানা ইসলামাবাদীর আইন বিষয়ক অধ্যয়নের খানিকটা ধারণা পাওয়া গেলেও তা তিনি কতটুকু সমাপ্ত করেছিলেন, সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, তাঁরা সাধারণ আধুনিক শিক্ষায় উচ্চতর শিক্ষিত না হলেও আধুনিক যুগ ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন এবং আধুনিকতার সাথে ইসলামের সমন্বয়ের লক্ষ্যেও সচেতনভাবে কাজ করে গেছেন।

৪. তিনজনই মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কারণে প্রথম থেকেই আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় ব্যাপক দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জন করেন। মাওলানা আকরম খাঁ প্রয়োজনের তাগিদে এবং নিজস্ব আন্তরিকতা, অধ্যবসায়, প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় ব্যাপক দক্ষতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন এবং বাংলা ভাষায় লিখনী পরিচালনার মাধ্যমে একজন শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বাংলা ভাষার উন্নতি- অগ্রগতির লক্ষ্যে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে, কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত অবস্থায় মাওলানা আকরম খাঁ লক্ষ্য করলেন যে, মাদ্রাসার সিলেবাসে বাংলা ভাষা শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই রাখা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

তাই তিনি মাদ্রাসার সিলেবাসে বাংলা ভাষা অন্তর্ভূক্ত করার জন্য বিভিন্ন সভা-সমাবেশে জনমত গঠনের মাধ্যমে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বাংলা ভাষাকে পাঠ্য তালিকাভূক্ত করতে বাধ্য হন। উল্লেখ্য যে, ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ দেশের ছাত্র-জনতা যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন, তার বীজ মাওলানা আকরম খাঁ ১৮৯৬-৯৭ সালে মাদ্রাসার ছাত্র থাকাকালীনই বপন করেছিলেন।

অন্যদিকে মাওলানা ইসলামাবাদী প্রাথমিক জীবনে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ব্যাপক দক্ষতা অর্জনে সক্ষম না হলেও উত্তরাধিকার সূত্রে বহুভাষাবিদ্ ও অসামান্য সাহিত্য গুণের অধিকারী পিতা মতিউল্লা পন্ডিতের তত্ত্বাবধানে বাংলা ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। পরবর্তীকালে প্রয়োজনের তাগিদে নিজের চেষ্টা, শ্রম, অধ্যবসায় ও জাতীয় উন্নতির প্রেরণায় বাংলা ভাষায় অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। বাংলা ভাষায় তিনি এতটাই ব্যুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম হন যে, পরবর্তীকালে তিনি বাংলা ভাষায় লিখনী পরিচালনার মাধ্যমে একজন অন্যতম সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ঐতিহাসিকের মর্যাদায় ভূষিত হন। ইংরেজীতেও পরবর্তী সময়ে নিজস্ব উদ্যোগে ও প্রয়োজনের তাগিদে তাঁরা দু'জন দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাঁদের দু'জনের বেশীরভাগ লেখা ও রচনা ছিল বাংলা ভাষায়। তবে তাঁরা উর্দু বিদ্বেষী ছিলেন না। বরং মাওলানা আকরম খাঁ উর্দু পত্রিকা 'দৈনিক জামানা'ও প্রকাশ করেন।

অবশ্য হাকিম হাবিবুর রহমান এক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম। তাঁর মাতৃভাষা ছিল উর্দু এবং ঢাকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও উর্দুর প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়নি। কারণ তদানীন্তন সময়ে পুরাতন ঢাকায় বসবাসকারী নবাব, জমিদার ও অন্যান্য খান্দানী পরিবারের ভাষাও ছিল উর্দু। আর এঁদের সাথেই হাকিম হাবিবুর রহমানের উঠাবসা ছিল প্রায় সার্বক্ষণিক। তাই তিনি উর্দু ভাষাতেই তাঁর যাবতীয় লেখা-রচনা সুসম্পন্ন করেন। এমনকি তিনি উর্দুকে 'Lingua-Franca' মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এ ভাষার মাধ্যমেই ভারতীয়

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিমদের সাথে বাংলার মুসলিমদের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাই বিশ শতকের প্রারম্ভে ঢাকায় উর্দুকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে হাকিম হাবিবুর রহমানের অবদান অনস্বীকার্য। অবশ্য এক্ষেত্রে মাওলানা আকরম খাঁর দৃষ্টিভঙ্গী একটু ভিন্ন। তাঁর বক্তব্য অনুসারে, উর্দু আমাদের মাতৃভাষাও নয়, জাতীয় ভাষাও নয়। কিন্তু ভারতবর্ষে মুসলিম জাতীয়তা রক্ষা ও পুষ্টির জন্য আমাদের উর্দুর দরকার। কাজেই উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁরা দু'জনই উর্দুর প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেছেন। বাংলা ভাষা-ভাষী না হলেও পূর্ব-বাংলায় তথা ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের কারণে এবং ইংরেজী আন্তর্জাতিক ভাষা হওয়ার ফলে হাকিম হাবিবুর রহমান বাংলা ও ইংরেজী বুঝতেন এবং মাঝে মধ্যে চর্চাও করতেন। তিনি বাংলা ভাষা বিদ্বেষী ছিলেন না, বরং বাংলা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন। এর প্রমাণ হচ্ছে– বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মাসিক গবেষণা পত্রিকা 'আল্ শেফা'। তাঁর ইংরেজী বিদ্বেষ বিষয়ক কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না।

৫. ছাত্রজীবন থেকেই তিনজনের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং জাতীয় জাগরণ তথা বাংলা-ভারতে মুসলিম জাগরণের লক্ষ্যেই তিনজন নিজ নিজ অঙ্গনে কাজ করেন। বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রকৃত দিশারীর দায়িত্ব পালন করেন, যা তাঁদেরকে যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় করে রাখবে। আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি যে, তিনজনই সাংবাদিকতা, রাজনীতি চর্চা, ঐতিহ্য চেতনা, ইতিহাস সাধনা, সাহিত্য চর্চা, সমাজ সংস্কার ও সমাজ সেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁদের সাধনার ক্ষেত্রে কখনও মিল এবং কখনও ভিন্নতা থাকলেও তিনজনেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল প্রায় অভিন্ন এবং তা ছিল মুসলিম জাগরণ।

প্রমাণ হিসেবে আমরা প্রথমেই সাংবাদিকতা সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করতে পারি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, মাওলানা আকরম খাঁর সময়ে

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলিমগণ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ছিল অনুন্নত। আর তাই তিনি মনে করলেন যে, এ অনুন্নত মুসলিম সমাজ ও জাতিকে জাগ্রত করার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে সংবাদপত্র। কাজেই হাজারো প্রতিবন্ধকতা এবং আর্থিক সংকট থাকা সত্ত্বেও মুসলিম জাগরণের লক্ষ্যে তিনি সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন এবং 'আহলে হাদীস' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে তিনি সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেন। ১৯০১ সালে তিনি সর্বপ্রথম 'ত্রৈমাসিক মোহাম্মদী' সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। মোহাম্মদী পত্রিকা ১৯০৩ সালে মাসিক আকারে এবং ১৯১০ সালে সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তাঁর মালিকানা ও সম্পাদনায় বাংলা ভাষায় একে একে প্রকাশিত হয় মাসিক আল্ এসলাম (১৯১৫), দৈনিক জামানা (উর্দু ভাষায়/১৯২০), সাপ্তাহিক ও দৈনিক সেবক (১৯২১), দৈনিক মোহাম্মদী (১৯২২), মাসিক মোহাম্মদী (১৯২৭), দৈনিক আজাদ (১৯৩৬), সাপ্তাহিক কমরেড (ইংরেজী ভাষায়/১৯৪৬) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা। তাঁর সম্পাদিত সংবাদপত্রসমূহের মাধ্যমে জনমত গড়ে তুলে তিনি মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্‌পদতা এবং কুসংস্কার-মূলে আঘাত করে তাদের সামনে সামগ্রিক উন্নতির নতুন দ্বার উন্মোচন করতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক বা পথিকৃৎ।

অন্যদিকে মাওলানা ইসলামাবাদীর সময়েও মুসলমানদের অবস্থা ছিল একই রকম। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, মুসলিম সমাজে সংবাদপত্রের বহুল প্রচার না হলে কোন আন্দোলনই সার্থক হবেনা। দ্বিতীয়ত: আলিম সমাজকে এদিকে টেনে এনে সাংবাদিকতায় সম্পৃক্ত করলে তা জাতির জন্য আরও কল্যাণকর প্রমাণিত হবে। কারণ মুসিলম জাতির উন্নতি-অগ্রগতিতে আলিমদের অবদান অনস্বীকার্য। এতদুদ্দেশ্যে তিনি সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন এবং আলিমদেরকেও এতে সম্পৃক্ত করে মুসলিম সাংবাদিক জীবনের ব্যাপকতর অনুশীলনের পথ নির্মাণ ও সুগম করেন। তিনিও সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, অন্ধকারাচ্ছন্ন মুসলিম জাতিকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলার ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্র-সাময়িকীর কোন বিকল্প নেই। তাঁর সম্পাদনায় একে একে প্রকাশিত হয়– সাপ্তাহিক সোলতান (১৯০৪), বাংলা দৈনিক হাবলুল মতিন (১৯১২), মাসিক আল্ এস্লাম (১৯১৪), দৈনিক সোলতান (১৯২৬) এবং দৈনিক আমীর (১৯২৯)।

মাওলানা ইসলামাবাদী যে উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র সম্পাদনা ও পরিচালনা করেন, তা ছিল অতি মহৎ এবং সে দায়িত্ব ছিল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুদায়িত্ব পালনে তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার কোন ঘাটতি ছিলনা। সত্যিই সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক কিংবদন্তীস্বরূপ। মুসলিমদের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশের এক ব্যাপক আন্দোলন তিনি গড়ে তোলেন। বাঙালী মুসলিমদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও জাতি হিসাবে তার হৃৎগৌরব ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে তাঁর যে স্বপ্ন ও স্বাদ ছিল, তাকে যথারীতি প্রতিষ্ঠা করার সাধ্য হয়তো তাঁর পুরোপুরি ছিলনা, কিন্তু তাঁর সেই বলিষ্ঠ চিন্তা-চেতনা তাঁর কীর্তিলতার মধ্যে আজও ভাস্বর হয়ে আছে। আর এখানেই তাঁর সফলতা ও সার্থকতা।

হাকিম হাবিবুর রহমানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, তিনি বাংলা ভাষার পরিবর্তে পূর্ববঙ্গ ও আসামে সর্বপ্রথম উর্দু সাংবাদিকতার সূচনা করেন এবং এর মাধ্যমে পূর্ববঙ্গ ও আসামের মুসলিমদের শিক্ষা-দীক্ষা, প্রশাসন, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করেন এবং তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয় প্রেরণা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। তাঁর আরেকটি লক্ষ্য ছিল বৃটিশরাজ ও মুসলিমদের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক ও সর্বভারতীয় মুসলিম ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস। তিনিই সর্বপ্রথম ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকা থেকে 'আল্ মাশ্‌রিক' (প্রাচ্য বা পূর্ব) নামক একটি মাসিক উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করে পূর্ববঙ্গ ও আসামে উর্দু সাংবাদিকতার সূচনা করেন। এটা ছিল তদানীন্তন পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের মুসলিমদের একমাত্র উর্দু জাতীয় পত্রিকা। ১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসে খাজা আদিলের সহযোগিতায় তিনি ঢাকা থেকে 'জাদু' নামক আরও একটি মাসিক উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটা ছিল পূর্ববাংলা ও আসামের দ্বিতীয় উর্দু পত্রিকা, যা অতি অল্প সময়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. তাঁদের তিনজনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মকান্ড সম্পর্কে আলোচনা করলেও প্রতীয়মান হয় যে, সাধনা ও কর্মকান্ডে মিল বা পার্থক্য যাই থাকুকনা কেন, উদ্দেশ্য প্রায় অভিন্ন এবং তা ছিল মুসলিম সমাজের কল্যাণ, অগ্রগতি ও রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন। যেমন, মাওলানা আকরম খাঁ সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে মুসলিম জাতির আত্ম-প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তিনি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম হতে ষাটের দশক পর্যন্ত উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তার প্রায় প্রত্যেকটির সাথেই তাঁর নাম ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। অন্যকথায় তাঁর সাংবাদিকতা ছিল মূলতঃ তাঁর রাজনৈতিক সত্তার বহিঃপ্রকাশ।

মাওলানা ইসলামাবাদী সম্পর্কে বলা যায় যে, তিনি মুসলিম জাতি তথা সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার এবং তাদের জীবনের সুখ, শান্তি, স্বাধীনতা, আদর্শ, ঐতিহ্য তথা সার্বিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বস্তুতঃ ইসলাম প্রচার ও সমাজ-সংস্কারকর্মের আবেগ ও অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শন মূলতঃ মুসলিম সমাজের সামগ্রিক পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন, ধ্যান ও চেতনায় ব্যাপকভাবে উদ্ভাসিত ছিল। অন্যদিকে হাকিম হাবিবুর রহমানের ক্ষেত্রেও প্রায় একই কথা প্রযোজ্য। তিনি নিছক রাজনীতির খাতিরে রাজনীতি করেননি; বরং মুসলিম জাতির জাগরণ ও উন্নতি সাধনের লক্ষ্যেই তিনি রাজনীতিতে আবির্ভূত হন। তিনি মূলতঃ একজন প্রখ্যাত ইউনানী চিকিৎসাবিদ্ হওয়া সত্ত্বেও জাতি ও সমাজের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদ তাঁকে উক্ত পেশায় সীমাবদ্ধ থাকতে দেয়নি। মুসলিম জাতির দুঃখ-দুর্দশা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন এবং দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ্ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ছিলেন মুসলিম স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী।

৭. রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অভিন্নতা সত্ত্বেও উভয়ের রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও চিন্তা-চেতনায় মিল ও গরমিল দু'টোই লক্ষনীয়। যেমন,

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আকরম খাঁ সম্পর্কে বলা যায় যে, কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্র থাকাবস্থায়ই তাঁর মধ্যে জাতীয় ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। তিনি ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে প্রকৃতপক্ষে সক্রিয় রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং এ আন্দোলন সূত্রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে তিনি মুসলিম লীগ, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ্য আন্দোলন ও সেই সূত্রে 'Bengal Pact' প্রনয়ণ, ১৯২৯ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে প্রজা আন্দোলনে অংশগ্রহন ও নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠন, লাহোর প্রস্তাব ও পাকিস্তান আন্দোলন প্রভৃতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

অন্যদিকে মাওলানা ইসলামাবাদী ভারতীয় কংগ্রেসে যোগদানের মাধ্যমেই সক্রিয় রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৯৯ সালে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং আমৃত্যু তিনি কংগ্রেস কর্মী ছিলেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, কৃষক-প্রজা আন্দোলন, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ্, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, সুভাষ বসুর 'ফরওয়ার্ড ব্লক' ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ইত্যাদিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং ব্যাপক অবদান রাখেন। তবে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন।

অপরপক্ষে হাকিম হাবিবুর রহমান ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহন না করলেও আন্দোলনের পক্ষে অনুকূল মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং মনে প্রাণে বৃটিশরাজ ও মুসলিমদের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক ও সর্বভারতীয় মুসলিম ঐক্য স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন। তিনি ১৯০৬ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং ১৯০৮ সালে পূর্ব-বাংলা ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ গঠনের মাধ্যমে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে তিনি খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, লাহোর প্রস্তাব ও

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান আন্দোলন প্রভৃতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে অসামান্য অবদান রাখেন। অবশ্য স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েকমাস পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

৮. মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর রহমান- এ তিনজনই ছিলেন স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রবক্তা, মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত এবং একই সাথে 'Pan-Islamism' বা বিশ্ব ইসলামবাদেরও অকুণ্ঠ সমর্থক। তাঁরা হিন্দু-মুসলিম মিলনে বিশ্বাসী ছিলেন, হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ তথা সাম্প্রদায়িকতার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, হিন্দু-মুসলিমদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান কামনা করতেন এবং সর্বভারতীয় মুসলিম ঐক্য স্থাপনে প্রয়াসী ছিলেন।

৯. মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ মাজহাবী কোন্দল ও অন্যান্য ধর্মীয় কুসংস্কার নির্মূলে তাঁরা তিনজনই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ব্যক্তিগতভাবে মাওলানা আকরম খাঁ আহলে হাদীস সম্প্রদায়ভূক্ত, মাওলানা ইসলামাবাদী হানাফী মাজহাবভূক্ত এবং হাকিম হাবিবুর রহমান সুন্নী তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত-এর মতাদর্শভূক্ত হলেও তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ে অসহিষ্ণুতা ও সংকীর্ণ মনোভাব বিদ্যমান ছিলনা। বরং সকলেই কখনও ব্যক্তিগতভাবে নিজস্ব পরিমন্ডলে এবং কখনওবা সম্মিলিতভাবে মুসলিম সমাজের অনৈক্য, অন্তর্কলহ ও বিবাদ ইত্যাদি দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।

১০. এখানে একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, মাওলানা আকরম খাঁ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অবদান রেখে নিজেকে জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি চেয়েছিলেন অবিভক্ত বঙ্গে অবিভক্ত মুসলিম শক্তির মজবুত অবস্থান ও সর্বভারতীয় মুসলিম ঐক্য। অথচ তিনিই আবার পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অবদান রেখে ভারত থেকে পাকিস্তানকে পৃথক করে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মুসলিম আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং নিজে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মুসলিম শক্তির বিভক্তি সত্ত্বেও স্বাধীন ও

Dhaka University Institutional Repository

স্বতন্ত্র মুসলিম আবাস ভূমি 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠাই ছিল মূল বিবেচ্য বিষয় এবং তা হয়েছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ।

অন্যদিকে মাওলানা ইসলামাবাদী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করে এবং বঙ্গভঙ্গ রদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে বাংলার মুসলিমদের মুক্তি প্রত্যাশা করেছিলেন । তিনি ভেবেছিলেন যে, এতেই পূর্ববঙ্গ ও আসামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের কল্যাণ সাধিত হবে । এভাবে তিনিও নিজেকে মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন । অথচ তিনিই আবার পাকিস্তান আন্দোলনকে মুসলিমদের জন্য একটি আত্মঘাতী পরিকল্পনা হিসেবে মনে করতেন । কারণ তাঁর মতে, ভারত দ্বিখন্ডিত হলে মুসলিমগণই অপেক্ষাকৃত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে । কেননা উক্ত অবস্থায় তারা ত্রিধা-বিভক্ত হয়ে এক অংশ ভারতে, এক অংশ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এবং অপর অংশ দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে থাকবে বিধায় সংহতি হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হবে । অর্থাৎ এক্ষেত্রে তিনি চেয়েছিলেন অবিভক্ত ভারতে অবিভক্ত মুসলিম শক্তির ঐক্য, মজবুত অবস্থান ও উন্নতি-অগ্রগতি । আর তাই ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সাথে সাথে নিজ মাতৃভূমি পূর্ববঙ্গে বা পূর্ব-পাকিস্তানে না এসে প্রায় দু'বছর কলকাতাতেই অবস্থান করেন । এক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারলাম যে, উভয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে অভিন্নতা সত্ত্বেও চিন্তা-চেতনা ও সাধনা-দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য স্পষ্ট ।

অবশ্য এক্ষেত্রে হাকিম হাবিবুর রহমান খানিকটা ব্যতিক্রম । তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পক্ষেও অনুকূল মনোভাব ব্যক্ত করেন, কেননা তিনি চেয়েছিলেন বৃটিশরাজ ও মুসলিমদের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক এবং এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজের উন্নতি-অগ্রগতি । অপরদিকে পাকিস্তান আন্দোলনেরও তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ কর্মী এবং এক্ষেত্রে তাঁর অবদানও অনস্বীকার্য । কারণ এক্ষেত্রে তিনি এটা অনুধাবন করেছিলেন যে, স্বাধীনতা ব্যতীত উন্নতি-অগ্রগতি তথা জাগরণ অসম্ভব ।

Dhaka University Institutional Repository

১১. এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে এবং তা হচ্ছে এই যে, ভাষা আন্দোলন তথা বাংলাকে মাতৃভাষা, জাতীয় ভাষা এবং রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে মাওলানা আকরম খাঁর ভূমিকা অনন্যসাধারণ এবং তা অনস্বীকার্য। তিনি পূর্ব-পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিটি এবং বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটিরও সভাপতি ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান সর্বজন স্বীকৃত। তিনি বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রাখেন এবং সরকারকর্তৃক বাংলা একাডেমীর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। অন্যদিকে ভাষা আন্দোলনের পূর্বে ইন্তেকাল করলেও এর ভিত্তি তৈরীতে এবং মাতৃভাষার উন্নতি-অগ্রগতি তথা বিকাশে মাওলানা ইসলামাবাদীর অবদানও কম নয়। বাংলা সাহিত্যে তাঁর ব্যাপক অবদান সর্বমহলে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং প্রশংসা কুড়িয়েছে। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল প্রতিভা ও কালজয়ী ব্যক্তিত্ব। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন ও পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

অবশ্য হাকিম হাবিবুর রহমান এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে– তিনি উর্দুকে 'Lingua-Franca' তথা মুসলিমদের জাতীয় ভাষা মনে করতেন এবং উর্দু সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় তাঁর অবদান ব্যাপক। হাকিম হাবিবুর রহমান রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সমূহ, সংবাদপত্র ও সাময়িকীসমূহ সবই ছিল উর্দু ভাষায়। এতে তাঁর উর্দু চর্চার ব্যাপকতা সম্পর্কে আমরা স্পষ্ট ধারণা পেতে পারি। তিনি ব্যতীত, অন্য কোন উর্দু লেখক ও সাহিত্যিক ঢাকার ইতিকথা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে এত বেশী মসি চালনা করেন নি। পূর্ববঙ্গীয় উর্দু সাহিত্যের সকল ইতিহাস গ্রন্থে তাঁর নাম স্থান পেয়েছে। তাঁকে বাদ দিয়ে বঙ্গ ও আসামের উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস লেখা অসম্ভব।

একথা অনস্বীকার্য যে, ভাষার ক্ষেত্রে ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের তিনজনের সাহিত্য চর্চারই মূল লক্ষ্য ছিল মুসলিমদের মধ্যে স্বীয় ঐতিহ্য চেতনা জাগ্রত করা এবং জাতীয় সচেতনতা ও জাতীয় মানস চাঙ্গা করা। এক্ষেত্রে তাঁরা তিনজনই নিজ

Dhaka University Institutional Repository

নিজ অঙ্গনে সফলতা অর্জন করেছিলেন। তাঁরা কেহ কারো প্রতি কখনও বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করতেন না।

১২. মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর রহমান– এ তিনজনই ছিলেন ইতিহাস-সচেতন ব্যক্তি এবং ঐতিহ্য চেতনা তাঁদের মধ্যে সর্বদা ক্রিয়াশীল ছিল। মুসলিম জাতির গৌরবময় অতীত সম্পর্কে তাঁরা সম্যক অবহিত ছিলেন এবং তা বিভিন্নভাবে মুসলিমদের সামনে তুলে ধরে তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন করে তোলেন।

মাওলানা আকরম খাঁ ইসলাম ধর্ম, মুসলিম শাসন এবং বাঙ্গালী মুসলিমদের বিভিন্ন সমস্যা ও সেগুলোর সমাধান বিষয়ক বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। এগুলোর ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং এগুলো নিঃসন্দেহে তাঁর ঐতিহ্য-চেতনার প্রমাণ বহন করে। তাঁর লেখাগুলো ভাবাবেগ ও প্রতিক্রিয়াশীলতার দোষ থেকে মুক্ত এবং প্রগতি ও যুক্তিবাদের মহিমায় ভাস্বর। বাংলার মুসলিমদের মধ্যে বিরাজমান অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূরীকরণের লক্ষ্যে তিনি যুক্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে বিভিন্ন সাহিত্য ও ইতিহাস রচনা করেন এবং মুসলিমদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন করে তোলেন। যুক্তিবাদের আশ্রয় নিয়ে মাওলানা আকরম খাঁ মুসলিমদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল্-কুরআনের ব্যাখ্যা করেও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাংলার মুসলিমদের অন্ধবিশ্বাসের মূলোৎপাটনে সচেষ্ট ছিলেন।

মাওলানা আকরম খাঁ সাইয়েদ জামাল উদ্দীন আফগানীর 'Pan-Islamism' বা 'বিশ্ব-ইসলামবাদ' দ্বারা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন এবং বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন। তিনি এক হাতে অসি ও অপর হাতে মসি নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে যে আত্ম-চেতনা ও গৌরবময় অতীতের যে উপলব্ধি সৃষ্টি করেছিলেন, সে ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত আছে। বাঙালী মুসলিম সমাজের যে জাগরণ আমরা বিশ শতকে লক্ষ্য করি, এর মূলে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে যাঁরা অবদান রাখেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর নেতৃত্বে

Dhaka University Institutional Repository

কতিপয় সমাজ হিতৈষী আলিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা'। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ইজ্‌তিহাদের দরজা যে বন্ধ হয়ে যায়নি এবং তা যে সকল সময়ের জন্য উন্মুক্ত, তা মুসলিমগণ বেমালুম ভুলে গেছে। তাই তিনি এ সংকীর্ণ গন্ডী থেকে মুসলিমদের বের করে এনে সঠিক পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং মুজতাহিদের ভূমিকায় অবতীর্ন হন।

মাওলানা ইসলামাবাদীও ইসলাম ধর্ম এবং মুসলিম শাসন বিষয়ক বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। এগুলোর ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্ট এবং এগুলো নিঃসন্দেহে মুসলিম ঐতিহ্য-চেতনার প্রমাণ বহন করে। এগুলোর মধ্যদিয়ে তাঁর সমাজ সেবা, ইসলাম প্রচার, সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চা, শিক্ষা বিস্তার ও আযাদী সংগ্রাম বিষয়ক চিন্তাধারা ও কার্যাবলী পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি তাঁর সমসাময়িক বহু আলিমের তুলনায় অনেক বেশী উদারচেতা, প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী ছিলেন। এ যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় সেকালের বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন কর্মকান্ডের প্রতি তাঁর গঠনমূলক সমালোচনার মধ্যে।

মাওলানা ইসলামাবাদী মুসলিম সমাজের অর্থ-সম্পদ ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তির অভাবকে গভীর উদ্বেগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেন। তাই তিনি মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। মুসলিম জাতির অতীত গৌরবের কথা শুনিয়ে তাদের অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যেই তিনি তাঁর লিখনী পরিচালনা করেছেন। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান সম্পর্কে বাঙ্গালী মুসলিমদের অবহিত করে তাদের উজ্জীবিত করাই ছিল তাঁর এসব লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইসলামের আদর্শ প্রচার ও মর্যাদা বৃদ্ধি তাঁর জীবনের ব্রত ছিল সত্য, কিন্তু তিনি কখনও অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও ব্যাখ্যার উপর ইসলামের প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন– 'ইসলাম ও বিজ্ঞান' (প্রচারক, মাঘ ১৩০৭), 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' (নবনূর, ভাদ্র ১৩২২) প্রভৃতি প্রবন্ধে তার প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এমন কিছু ঘটনা ঘটল (এগুলোর উল্লেখ যথাস্থানে রয়েছে) যাতে মাওলানা ইসলামাবাদীর প্যান-ইসলামী চিন্তা-চেতনায় ভাটা পড়ে এবং তিনি ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে নিশ্চুপ থেকে ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন ।এ সময় তিনি হলেন একজন খাঁটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী । ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বার্থেই তিনি হিন্দু-মুসলিমদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং তাদের মধ্যে স্থায়ী ঐক্য, বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা কামনা করেন একান্তভাবে । হিন্দু-মুসলিমদের সংঘাতকে তিনি 'মহাপাপ' বলে ঘোষণা করেন ।

বাংলার মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনে হাকিম হাবিবুর রহমানের বিশেষ অবদান রয়েছে । মুঘল আভিজাত্য ও খান্দানী বৈশিষ্ট্যের অনুশাসনগুলি তিনি নিজের জীবনে সযতনে প্রতিফলিত রেখেছিলেন । ফলে অনেকেই তাঁকে মুঘল যুগের কৃষ্টি-সভ্যতার শেষ জীবন্ত নমুনা হিসাবে গণ্য করতেন । তিনি শুধুমাত্র ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চা, গবেষণা, তিব্ব ইত্যাদি নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন না, প্রাচীন নিদর্শনের প্রতিও তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল এবং উত্তরসূরীদের জন্য তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও তিনি ছিলেন সজাগ ও সক্রিয় । অধিকন্তু তিনি প্রাচীন নিদর্শন সমূহ সংগ্রহ করে প্রতিটি জিনিসের যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা সম্পন্ন করে গেছেন নিজের জীবদ্দশায় । আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষার প্রাচীন পান্ডুলিপি ও পুস্তকের একটি মূল্যবান সংগ্রহ এবং একটি মুদ্রা সংগ্রহ ও কিছু প্রত্নবস্তুর সংগ্রহ তাঁর ছিল । পান্ডুলিপি ও পুস্তক সংগ্রহটি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন এবং মুদ্রা সংগ্রহটি তৎকালীন ঢাকা যাদুঘর (বর্তমান বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর)-কে ক্যাটালগ প্রকাশের শর্তে উপহার দেন । তিনি যে ইতিহাস সচেতন ছিলেন এবং ঐতিহ্য চেতনা যে তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল, উপর্যুক্ত বিবরণ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ।

Dhaka University Institutional Repository

হাকিম হাবিবুর রহমানের বিবরণ হতে তদানীন্তন মুসলিম সমাজের দৈন্যদশা ও অবনতির করুন দৃশ্যই আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠে। তার পাশাপাশি হিন্দুদের শক্তি-সামর্থ্য এবং ঔদ্ধত্যের বিষয়টিও আমরা অবহিত হই। অথচ এককালে মুসলিম জাতি ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শৌর্য-বীর্য্যে ছিল অতুলনীয়। তাই মুসলিম সমাজ ও জাতির দৈন্য দশা হতে তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি তাঁর লিখনীর মাধ্যমে তদানীন্তন পূর্ববাংলার মুসলিমদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত প্রকাশের পাশাপাশি তাদের জাতীয় স্বার্থের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেন। মুসলিম জাতির অকৃত্রিম দরদী, মুসলিম স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী ও ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হাকিম হাবিবুর রহমানের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল অনুন্নত মুসলিমগণ শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থ-সামর্থ্য, প্রশাসন, রাজনীতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করুক। তিনি পূর্ববাংলার মুসলিমদের রাষ্ট্র সমস্যা সম্পর্কেও সজাগ ছিলেন।

১৩. তাঁদের তিনজনের কেহই সরাসরি ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন না। এতদসত্ত্বেও জাতীয় প্রয়োজনে ও নিজস্ব সাধনাবলে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেকে ইতিহাসবিদ হিসেবে প্রমাণ করেন। তাঁরা স্বীয় প্রতিভা ও নিরলস সাধনার মাধ্যমে ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাসের উন্নতি ও অগ্রগতিতে যে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। তাঁদের ইতিহাস চর্চার মূল কারণ বা উদ্দেশ্য ছিল পশ্চাদ্‌পদ মুসলিম জাতির মধ্যে চৈতন্যোদয় ঘটানো এবং তাদেরকে স্বীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। এক কথায় বাংলা তথা উপমহাদেশের উদাসীন মুসলিমদের জাগ্রত করাই ছিল তাঁদের ইতিহাস সাধনার অন্যতম ব্রত। এর মূল লক্ষ্য ছিল মুসলিম সমাজের উন্নতি-অগ্রগতি ও সমাজ সংস্কার। মুসলিম সমাজে যেসব বিজাতীয় অপসংস্কৃতি জমাট বেঁধেছিল, সেগুলোর মূল্যেৎপাটনের লক্ষ্যে মাওলানা আকরম খাঁ অবিরাম মসি পরিচালনা করেছেন এবং জাতীয় ইতিহাসের সঠিক রূপরেখা তুলে ধরেছেন। মাওলানা ইসলামাবাদী দেশবাসীর কাছে অতীতের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার তাগিদেই একজন

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিকের ভূমিকায় অবতীর্ন হন। একইভাবে হাকিম হাবিবুর রহমানও সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য উদঘাটন করা, অতীত ঐতিহ্যের স্মৃতিকে জিইয়ে রাখা, সত্য ও সঠিক ইতিহাস জাতির সামনে তুলে ধরা এবং এভাবে মানবিক কর্তব্য সম্পাদন করাকে অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করেছেন এবং এতদুদ্দেশ্যে ইতিহাস চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

১৪. মাওলানা আকরম খাঁ জ্ঞান ও যুক্তির সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত ও প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁর লেখা এরকম একখানা গ্রন্থ হচ্ছে 'মোস্তফা-চরিত', যা একটি বিশাল ও মৌলিক সীরাতগ্রন্থ। এটি বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম যুক্তিভিত্তিক ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রচিত মহানবী (স) এর জীবন চরিত। এ গ্রন্থে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যায় তিনি যে মুক্ত-বুদ্ধি ও যুক্তি-বিচারের পরিচয় দিয়েছেন, তা বিস্ময়কর ও দুর্লভ। এ গ্রন্থ রচনায় তিনি ঐতিহাসিকদের পরিবেশিত তথ্যসমূহের উপরই কেবল নির্ভর করেননি, বরং আল্-কুরআন ও হাদীসের মানদন্ডে এসবের যাচাই-বাছাই করেছেন। ফলে এ ক্ষেত্রে তিনি একজন সচেতন ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

মাওলানা আকরম খাঁ মনে করেন যে, নিরেট ইতিহাসের দৃষ্টিতে মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে ভক্তের অতিভক্তি এবং কিংবদন্তীর আবর্জনায় জীবনের সঠিক তথ্যসমূহ ঢাকা পড়ে গেছে। তাই এ ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনেতিহাস রচনার প্রধান উপকরণ-উৎস হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন, আল হাদীস এবং প্রাচীন আরবীয় ইতিহাস। তিনি মনে করেন যে, এসব উৎস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করতে হলে ঐতিহাসিকদের সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

অন্যান্য সীরাতকারদের সাথে মাওলানা আকরম খাঁর মৌলিক পার্থক্য এই যে, অন্যান্য সীরাতকারগণ যেখানে সীরাত রচনার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত হাদীসকে সূক্ষ্মভাবে যাচাই-বাছাই না করেই গ্রহণ করেছেন, সে ক্ষেত্রে তিনি হাদীস গ্রহণকালে হাদীসের রাবী, সনদ ও মতন তথা হাদীসের যাবতীয় বিষয়কে সূক্ষ্মভাবে যাচাই-বাছাই করার

Dhaka University Institutional Repository

পর তা গ্রহণ করেছেন। তিনি আল্ কুরআনের বিপরীত বিবরণ বিশিষ্ট কোন হাদীস কখনও গ্রহণ করেননি। কাজেই তাঁর রচিত ইতিহাসের 'authenticity' সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

মাওলানা আকরম খাঁর ইতিহাস চর্চা বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সমাজচিন্তা। ইতিহাস বলতে তিনি শুধু রাজনৈতিক ইতিহাসকেই বোঝেন না। তাঁর মতে, সামাজিক ইতিহাসের আলোচনা ব্যতীত ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হয়না। এর প্রমাণ হচ্ছে– তাঁর রচিত গ্রন্থ 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস'। গ্রন্থখানা মূলতঃ মুসলিম ভারতের সামাজিক ইতিহাসেরই একটি সংক্ষিপ্ত রূপ ও আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। এ গ্রন্থে তিনি জাতীয় ইতিহাসের শুভ সূচনা, বাংলার সমসাময়িক অবস্থা, মুসলিম বাংলার পতন ও অধঃপতনের বাস্তব উদাহরণ, হিন্দুদের পঞ্চতত্ত্ব রহস্য ও মুসলিম সমাজে এর প্রভাব, মুসলিম ভারতের বিপর্যয় কাল, ইসলামের মৌলিক আদর্শ, মুসলিম বাংলায় অনৈসলামিক ভাবধারা অনুপ্রবেশের প্রকৃত কারণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোসহ আরও কতিপয় দিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনা করেছেন, যা তাঁকে একজন সচেতন ও বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

'আমাদের ইতিহাস' শীর্ষক প্রবন্ধে মাওলানা আকরম খাঁ মুসলিমদের ইতিহাস চর্চার আবশ্যকতা ও এর গুরুত্ব, জাতীয় ইতিহাস রচনার সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা, উত্তরণের উপায়, ইতিহাস রচনার কতিপয় উপকরণ, সুলতান মুহাম্মদ বিন্ তুঘ্লককে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারাণীর পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য ও এর যথার্থতা বিশ্লেষণ, প্রসঙ্গক্রমে সমসাময়িক ধর্মীয় সাহিত্যের আলোকে সে সময় ও সমাজের বিভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতি এবং মুসলিম মন-মানসে এর প্রভাব, ভারতীয় সঙ্গীত ও মুসলিম সঙ্গীতের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে ইতিহাসের দৃষ্টিকোন থেকে অত্যন্ত তথ্যবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-সমালোচনা করেন। তাঁর এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক তথা বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চায় তাঁর ব্যাপক দখল ছিল, যা তাঁকে একজন আধুনিক ঐতিহাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে একটি বিষয়ের অবতারণা করা বিশেষ জরুরী এবং তা হচ্ছে- মাওলানা আকরম খাঁ পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের ইসলাম ও রসূল বিদ্বেষমূলক বক্তব্য কীভাবে গ্রহণ করেছেন এবং স্বীয় গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন? এর জবাবে বলা যায় যে, তিনি 'মোস্তফা-চরিত' গ্রন্থের উপক্রমণিকা অংশের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে 'হযরতের জীবনী ও পাশ্চাত্য লেখকগণ' শিরোনামে পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের ইসলাম ও রসূল-বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের শোচনীয় অজ্ঞতা ও জঘন্য মিথ্যাচার প্রমাণ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ ১৭শ, ১৮শ ও উনিশ শতকের ১৫খানা বইকে তিনি 'মিথ্যাবাদের বিশ্বকোষ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি ডা. স্প্রেঙ্গার, উইলিয়াম মূর, মার্গোলিয়থ প্রমুখের তীব্র সমালোচনা করেন। তাদের ভাষায়, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) 'মৃগী' বা 'মূর্ছা' রোগে পীড়িত ছিলেন। প্রমাণ হিসেবে তিনি এতদ্সংক্রান্ত এবং আরও অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের বিকৃত বক্তব্য সমূহ স্বীয় গ্রন্থে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত করে এগুলোর তীব্র সমালোচনা করেন, পাশাপাশি সঠিক তথ্য তুলে ধরেন এবং এভাবে নিজেকে একজন যোগ্য ঐতিহাসিক হিসেবে প্রমাণ করেন।

১৫. উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম পাদে শিক্ষা-দীক্ষায় মুসলিমগণ হিন্দুদের তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও সে সময় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ প্রকাশ পায়। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক, ইতিহাস-সাহিত্য ও নাটক-উপন্যাসে মুসলিম সমাজ ও শাসকদের বিকৃতরূপ দেখে তাদের আত্ম-সম্মানবোধে প্রচন্ড আঘাত লাগে। একজন সুশিক্ষিত, সচেতন ও দায়িত্বশীল মুসলিম হিসাবে মাওলানা ইসলামাবাদী এ আঘাত মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন এবং দেশবাসীর কাছে অতীতের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার তাগিদেই তিনি একজন ঐতিহাসিকের ভূমিকায় অবতীর্ন হন।

মাওলানা ইসলামাবাদী অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক ভারতের মুসলিম শাসনামলের মলিন চিত্রাঙ্কনের মৌলিক কারণসমূহ উদ্ঘাটন করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, এসব কারণে ভারতে মুসলিম সভ্যতার ও গৌরব-গরিমার

Dhaka University Institutional Repository

অনেক অমূল্য রত্ন-রাজি অযত্নে ও অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। সেই ঐতিহাসিক সূত্রসমূহ অনুসন্ধান করে ভারতের মুসলিম সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন এবং দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বহু উপেক্ষিত মুসলিম শাসনামলের ও মুসলিম সভ্যতার নিদর্শন তুলে ধরে মুসলিম শাসকদের সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝির নিরসন করাই ছিল মাওলানা ইসলামাবাদীর ইতিহাস সাধনার মূল উদ্দেশ্য।

মাওলানা ইসলামাবাদী বহু পান্ডিত্যপূর্ণ, তথ্যবহুল এবং গবেষণামূলক গ্রন্থ রেখে গেছেন, যার অধিকাংশই মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ক। তিনি দেশের শিক্ষা পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে স্বল্প আয়তনের গ্রন্থেও যে তথ্য উপস্থিত করেছেন এবং সে সাথে তাঁর যে যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ যুক্ত করেছেন তা রীতিমত বিস্ময়কর। তাছাড়া বিভিন্ন রচনায় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষানীতি, শিক্ষাদান প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সমালোচনা ও সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর সূক্ষ্ম চিন্তা ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর ফল। তিনি পৃথিবীর ও গ্রহ-নক্ষত্রপুঞ্জের যেসব তথ্য উপস্থিত করেছেন এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভূগোল ও খগোলশাস্ত্র তথা জ্যোতির্বিদ্যা এবং নগরতত্ত্বের খুঁটিনাটি বিবরণসহ মধ্যযুগীয় মহান ব্যক্তিবর্গের অবদানের কথা যে প্রণালীতে ও যথাপ্রয়োজনানুযায়ী উল্লেখ করেছেন, তা এযুগেও শ্লাঘার বিষয়। এগুলো তাঁকে অত্যন্ত উচুঁমানের একজন পন্ডিত, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক হিসেবে এবং ঐতিহ্য সচেতন ব্যক্তি হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে।

মাওলানা ইসলামাবাদী তাঁর 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' নামক গ্রন্থের আলোচ্যসূচীর অন্তর্গত প্রধান প্রধান প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি ও শিল্পকর্মের চিত্র সংযোজনে অপারগতার কারণে গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এটাই তাঁর ঐতিহ্যচেতনা, ইতিহাস সচেতনতা ও সৃজনশীল মননশীলতার বড় প্রমাণ। তিনি অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করে ইতিহাসের সূত্রসন্ধান করেছেন এবং ইতিহাসের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্যে নারী জাতির অবস্থান যে দুর্বল নয় এবং তাঁদের ভূমিকা যে নগণ্য নয়, বরং পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও যে ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ ও অসামান্য অবদান রেখেছেন এবং ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন -এ বিষয়টিও মাওলানা ইসলামাবাদীর দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি এতদ্‌সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং উদাহরণ হিসেবে আমাতুল হাবিব (অন্য নাম হামিদা বেগম)-এর সেনানায়করূপে পুরুষবেশে যুদ্ধ পরিচালনা ও অসাধারণ বীরত্ব এবং রণ-কৌশলের বিবরণ তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে আমরা তাঁর সূক্ষ্ম ইতিহাস চিন্তা ও ঐতিহ্য চেতনার পরিচয় পাই।

ইতিহাসে সময়-সচেতনতা ও সময়-জ্ঞান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা একজন ঐতিহাসিকের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত। আর এ বৈশিষ্ট্যখানা নিঃসন্দেহে মাওলানা ইসলামাবাদীর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তিনি যে একজন সচেতন ঐতিহাসিক ছিলেন এবং ইতিহাস রচনার নিয়ম-নীতি মেনে চলতেন, তার প্রমাণ হচ্ছে তিনি তাঁর 'আত্মজীবন' গ্রন্থের পান্ডুলিপির সূচনা-পৃষ্ঠার ওপরের মার্জিনে গ্রন্থ রচনার তারিখ, সময় ও স্থান সম্পর্কে লিখে রেখেছেন এবং পান্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠায়ও অনুরূপ তথ্য সংযুক্ত করেছেন।

মাওলানা ইসলামাবাদীর ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পাশ্চাত্যের অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক মুসলিম জাতি ও শাসকদের উপর অন্যায়ভাবে আরোপিত বিভিন্ন অভিযোগসমূহের প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন করা এবং মুসলিম জাতি ও শাসকদের প্রকৃত ইতিহাস জন সমক্ষে তুলে ধরা। মাওলানা ইসলামাবাদীর বিবরণ হতে জানা যায়, ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ মুসলিম শাসকদেরকে অন্যায়ভাবে ও সত্য বিকৃত করে হিন্দু বিদ্বেষী হিসেবে চিত্রিত করলেও প্রকৃত পক্ষে তাঁরা হিন্দু বিদ্বেষী নন। বরং ভারতের মুসলিম শাসকগণ

হিন্দুদের যথেষ্ট সম্মান ও স্বাধীনতা প্রদান করতে কুণ্ঠিত হননি। তাঁরা হিন্দুদের বিভিন্ন সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করতেন এবং হিন্দু রাজকর্মচারীদের শাসন বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উচ্চতর পদে নিযুক্ত করতেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রী পদে পর্যন্ত তাঁরা হিন্দুদের নিযুক্ত করতেন। রাজস্ব বিভাগটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের হাতে ন্যস্ত ছিল।

মুসলিম বিদ্বেষী ঐতিহাসিকগণ যে অন্যায় ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে মোহাম্মদ ঘুরী, সুলতান মাহমুদ গজনবী ও আওরঙ্গযিবকে মন্দির ও প্রতিমা ভাঙ্গার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন, তা থেকে তাঁদের অব্যাহতি দিয়ে মাওলানা ইসলামাবাদী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, তাঁদের কেহই শান্তির সময় নিছক হিংসা-বিদ্বেষ বা গোঁড়ামীর বশীভূত হয়ে অন্যায়ভাবে দেবমন্দির ও প্রতিমা ভাঙ্গেননি; শুধুমাত্র যুদ্ধের সময় ও রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় বিদ্রোহীগণ যখন দেবালয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তখন কিছু দেব মন্দির, ভজনালয় ও প্রতিমা বিনষ্ট হয়ে থাকতে পারে। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, ঐরূপ অবস্থায় মুসলিমগণ যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় ভেঙ্গে ছিলেন, তদ্রুপ শিবাজী, সম্ভুজী, শাহ্জী, রঞ্জিৎ সিংহ প্রমুখ হিন্দু রাজাগণও মুসলিমদের মসজিদ, মাদ্রাসা, দরগাহ্, সমাধি প্রভৃতি ধূলিসাৎ করে দেন। আওরঙ্গযিবের বানারস ফরমানে হিন্দু দেবালয়ের জন্য বাদশাহ্র নিষ্কর ভূমিদানের সনদ প্রদানের ঘটনা উল্লেখ করে তিনি প্রমাণ করেন যে, আওরঙ্গযিব হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন না।

মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিজাতীয় ঐতিহাসিকদের আর একটি বড় অভিযোগ ছিল এই যে, তাঁরা অমুসলিম প্রজাদের উপর জিযিয়া নামক একটি অপমানজনক ও বৈষম্যমূলক কর আরোপ করে তাদের ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতেন। এক্ষেত্রে মাওলানা ইসলামাবাদী অসীম সাহসিকতা নিয়ে

অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে জিযিয়ার উদ্ভব ও তা আরোপের সঙ্গত কারণ, কি কি কারণে কাদেরকে এ কর হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি বিবরণ তুলে ধরেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিজাতীয় ঐতিহাসিকদের উক্ত অভিযোগ আদৌ সঠিক নয়। তাঁর উক্তসব তথ্যসমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-সমালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক তথা বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চায় তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল, যা তাঁকে একজন আধুনিক ঐতিহাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

মাওলানা ইসলামাবাদী তাঁর 'ভারতে ইসলাম প্রচার' নামক গ্রন্থে ইসলাম প্রচার সম্পর্কিত বিষয়ে হিন্দুদের প্রতিকূল মনোভাবকে যুক্তির সাহায্যে খন্ডন করেছেন এবং সঠিক মতামত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে ভারতে ইসলাম প্রচারের সঠিক ও নিয়মানুগ তথ্য এতে প্রকাশ পেয়েছে এবং এক্ষেত্রে তিনি একজন যুক্তিবাদী ঐতিহাসিকের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি আরও প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম তরবারীর সাহায্যে বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রচারিত হয়নি এবং এ প্রসঙ্গে উপদেশ ও যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্তে যে বিধান রয়েছে, তা তিনি সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি যাভা, সুমাত্রা, মালদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

মাওলানা ইসলামাবাদী তাঁর 'আওরঙ্গজেব' নামক গ্রন্থে বাদ্শাহ আওরঙ্গযিব সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের অভিযোগ খন্ডন করেন। তাঁদের বর্ণনা মোতাবেক, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য প্রধানতঃ অযোগ্য ও

দুর্বল বাদ্‌শাহ আওরঙ্গযিবই দায়ী ছিলেন। মাওলানা ইসলামাবাদী বিস্তারিত বিচার-বিশ্লেষণ সাপেক্ষে প্রমাণ করেন যে, মুঘল সাম্রাজ্য পতনের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গতভাবে বাদশাহ্ আওরঙ্গযিবকে দায়ী করা যায় না; কিংবা তাঁকে অযোগ্য ও দুর্বল শাসক হিসেবেও অভিহিত করা যায় না; বরং বাদশাহ্ আওরঙ্গযিবের পরবর্তী শাসকগণই এ জন্য দায়ী। এক্ষেত্রেও তিনি একজন সচেতন ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বাদশাহ আওরঙ্গযিবকে বিভিন্ন অন্যায় অভিযোগ থেকে অব্যাহিত দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন।

১৬. হাকিম হাবিবুর রহমানের অধিকাংশ রচনাই ছিল ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ক। তিনি জন্মসূত্রে ঢাকার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন লেখায় তিনি তাঁর স্মৃতি বিজড়িত ঢাকা নগরীর তাহযিব-তামাদ্দুনের যে চিত্র এঁকেছেন, এখানকার ঐতিহাসিক স্থান, মসজিদ-মাযার ও সমাহিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের যেসব বিবরণ দিয়েছেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মূল্যবান দলিল হিসেবে বিবেচিত। তিনি কেবল ঢাকার বিভিন্নমুখী ইতিহাসেরই বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, বরং মধ্যযুগীয় মুসলিম ইতিহাসেও তাঁর যথেষ্ট পান্ডিত্য ছিল।

হাকিম হাবিবুর রহমান বিবেক ও প্রকৃতি বিরোধী কোন ঘটনা বা তথ্যকে তাঁর গ্রন্থে স্থান না দিয়ে বরং ইতিহাস ও যুক্তি নির্ভর তথ্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন, যা তাঁকে একজন যুক্তিবাদী ঐতিহাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এর প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে, মুনশী রহমান আলী তায়েশ (১৮২৩-১৯০৮) তাঁর 'তাওয়ারীখ্-এ-ঢাকা' (১৯১০) গ্রন্থে ঢাকাস্থ মীরপুরের শাহ্ আলী বাগদাদী (রঃ) ও তাঁর মাযারের আলোচনা করতে

যেয়ে 'রুদ্ধদ্বার মসজিদের অভ্যন্তর থেকে তৈল ফুটার আওয়াজ শ্রবণ এবং তথাকার একটি গর্ত থেকে ফুটন্ত রক্ত উথ্‌লে পড়া'র জনশ্রুতি বর্ণনা করেন। কিন্তু হাকিম হাবিবুর রহমান অতিপ্রাকৃতিক হওয়ার অজুহাতে এবং ইতিহাস স্বীকৃত নয় বলে তাঁর গ্রন্থে এসব জনশ্রুতির কোনস্থান দেননি। বরং তিনি সেগুলো ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় রদ্‌ (বাতিল) করেন এবং 'মিথ্যার গাঁইট' বলে অভিহিত করেন। অপরদিকে অনেকের নিকট অদ্ভূত মনে হলেও প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করতে তিনি মোটেও কার্পণ্য করেননি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ঐতিহাসিক ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনা ও জনশ্রুতির সত্যাসত্য বিচার করতেন, যা একজন সচেতন ঐতিহাসিকের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত।

হাকিম হাবিবুর রহমান 'ঐতিহাসিক-ভাষাতাত্ত্বিক' হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। এর প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে, ঢাকায় 'কুট্টি' নামক যে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে, তিনি তাদের সেই 'কুট্টি' নামকরণের চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অন্যদিকে ঢাকার অদূরে নারায়নগঞ্জে 'চাষাড়া' নামক যে রেলষ্টেশনটি আছে, তিনি সেই 'চাষাড়া' নামকরণেরও ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

হাকিম হাবিবুর রহমান ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করে প্রকৃত তথ্যসূত্র আহরণ করেছেন। তাঁর ইতিহাস চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা। কারণ তাঁর মতে, সমাজ-সংস্কৃতিই মূলতঃ ইতিহাসের প্রাণ। 'ঢাকা পঁচাস বরস্‌ পহলে' গ্রন্থখানা এর প্রমাণ। এ গ্রন্থে প্রদত্ত বিবরণসমূহ তাঁর চাক্ষুস অভিজ্ঞতার ফসল। কারণ ঢাকার সমাজের নানাস্তরে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিদ্যমান ছিল। একজন সফল ইউনানী চিকিৎসক হিসেবে ঢাকার সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে তাঁর উঠা-বসার সুযোগ হয়েছিল। তিনি সুধী সমাজের সকল অনুষ্ঠান ও সভা-সমিতিতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করতেন। তাই

এখানকার সমাজ-সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি সম্পর্কে ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ ধারণা। আর এগুলোর আলোকেই তিনি রচনা করেন এ গ্রন্থখানা। এটি কেবল সাংস্কৃতিক ইতিহাসই নয়, বরং ঢাকার সামাজিক ইতিহাসেরও মূল্যবান দলিল হিসেবে বিবেচিত। এ গ্রন্থের 'authenticity' এবং তাঁর ইতিহাস জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

হাকিম হাবিবুর রহমানের 'সালাসা-গাস্সালাহ্' গ্রন্থখানা জ্ঞানের রাজ্যে এক বিশাল ও অমূল্য সংযোজন। তিনি এ গ্রন্থে বঙ্গদেশ ও আসামে লিখিত ইতিহাস বিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থের এবং এসব গ্রন্থের লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করেন। এতে উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ইতিহাস বিষয়ে তাঁর ব্যাপক ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তাঁর আরও বহু রচনা ও প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য ও ইতিবৃত্ত স্থান পেয়েছে। তাঁর রচিত উক্তসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী তাঁকে একজন ঐতিহাসিক হিসেবে সমাজে পরিচিত করে তোলে।

১৭. তাঁরা তিনজনই ইতিহাস চর্চার পাশাপাশি জীবন চরিতও রচনা করেছেন এবং জীবন-চরিতকে ইতিহাসের অনুসঙ্গী হিসেবে বিবেচনা করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, মাওলানা আকরম খাঁর 'মোস্তফা-চরিত', মাওলানা ইসলামাবাদীর 'খাজা নেজামুদ্দীন আওলিয়া' এবং হাকিম হাবিবুর রহমানের 'হায়াতে সুক্রাত" নিঃসন্দেহে জীবন-চরিত গ্রন্থসমূহের অন্যতম। এগুলো রচনার ক্ষেত্রেও তাঁরা ইতিহাস রচনার নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি হতে বিচ্যুত হননি। তাই জীবন-চরিত হিসেবে পরিচয়ের পাশাপাশি এগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্বও অনস্বীকার্য। জীবন-চরিতে সাধারণতঃ মোজেজা, কারামত বা অলৌকিক ঘটনার বিবরণ থাকে। তবে তাঁরা এগুলোকে নির্বিচারে গ্রহণ করেননি, বরং তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই স্বীয় গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর রহমান– এ তিনজনই ছিলেন মহান সমাজ-সংস্কারক ও সমাজ সেবক। নিঃস্বার্থভাবে সমাজ সেবা করাই ছিল তাঁদের জীবনের মহান ব্রত। প্রকৃত পক্ষে সমাজ সেবা ও রাজনীতি চর্চাকে তাঁরা কখনও পৃথক মনে করেননি, বরং জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করতেন। তাছাড়া সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চা এবং সাংবাদিকতার মাধ্যমেও তাঁরা ব্যাপকভাবে সমাজ-সংস্কার ও সমাজ সেবার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের সমাজ সেবার মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন এবং তা হচ্ছে– সমাজের লোকদের সার্বিক কল্যাণ সাধন, বিশেষ করে মুসলিম সমাজের উন্নতি-অগ্রগতি তথা জাগরণ বা আত্মোপলব্ধি। সত্যিকার অর্থে গঠনমূলক সকল কর্মকান্ডকেই তাঁরা দেশ সেবা বা সমাজ সেবা মনে করতেন। এক কথায় বলতে গেলে দেশ, জাতি ও সমাজের কল্যাণের ও জাগরণের জন্য তাঁরা ছিলেন নিবেদিত প্রাণ ও নিঃস্বার্থ কর্মী। প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপী তাঁরা ছিলেন সমাজ সেবার ক্ষেত্রে আমাদের পথ প্রদর্শক। সমাজ সেবার অংশ হিসেবে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে হাকিম হাবিবুর রহমানের তুলনায় মাওলানা আকরম খাঁ ও মাওলানা ইসলামাবাদী অগ্রগামী হলেও ইউনানী চিকিৎসার মাধ্যমে সমাজ সেবা ছিল হাকিম হাবিবুর রহমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য, যা মূলতঃ মাওলানা আকরম খাঁ ও মাওলানা ইসলামাবাদীর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

১৯. মাওলানা আকরম খাঁ এমন এক সময়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন, যখন এদেশের মুসলিম সমাজ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে হতাশাগ্রস্ত ও নির্জীব হয়ে পড়ে। তাই বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে ও সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করার উদ্দেশ্যে দেশের প্রত্যন্ত

অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সফর করার ফলে তিনি দেশের সাধারণ মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশার সুযোগ পান এবং তাদের সুখ-দুখের সাথে পরিচিত হন। সাধারণ মানুষের অশিক্ষা-কুশিক্ষার সুযোগ নিয়ে খৃষ্টান মিশনারী কর্তৃক খৃষ্টধর্ম প্রচার, জমিদারদের অত্যাচার-অবিচার এবং সর্বোপরি বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবে মুসলিম সমাজে প্রচলিত অনৈসলামিক ক্রিয়াকলাপে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং এগুলোর প্রতিকারকল্পে তিনি ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

২০. মাওলানা ইসলামাবাদী সমাজ সেবার উদ্দেশ্যে বহুমুখী গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে স্কুল-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা আন্দোলন ও কন্‌ফারেন্স, সামাজিক আন্দোলন ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, নারী কল্যাণমূলক উদ্যোগ, মানব সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও এতিমখানা নির্মাণ প্রভৃতি ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া তাঁর 'আত্মজীবন' থেকে আমরা তাঁর সমাজ সেবামূলক বিস্তৃত পরিকল্পনার বিষয়টি জানতে পারি।

মাওলানা ইসলামাবাদীর শেষ জীবনের অনন্যসাধারণ কীর্তি হচ্ছে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম সমাজের খেদমত বা সেবা করা। তিনি 'ইসলামাবাদ টাউন কো-অপারেটিভ ব্যাংক' নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সুস্পষ্টরূপে বলেছেন যে, শরীয়াহ্ নিষিদ্ধ 'রিবা' এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রচলিত সাধারণ সুদ এক নয়। এতে তদানীন্তন সমাজের আলিমগণ তাঁকে 'কাফির' হিসেবে ফাত্ওয়া দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এতে দমে যাননি। তিনি এ সহজাত দুঃসাহসে ভর করেই সমাজকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

২১. হাকিম হাবিবুর রহমান ছিলেন মুসলিম বাংলার একজন অনন্য সাধারন ব্যক্তিত্ব। তাঁকে বাদ দিয়ে তদানীন্তন ঢাকা কেন্দ্রিক মুসলিম রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজ সেবার কথা ভাবাই যায়না। বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পূর্ববাংলায় নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে যে মুসলিম জাগরণ ও মুসলিম রাজনীতি গড়ে উঠেছিল, তিনি ছিলেন এর অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। তাঁর ঢাকা কেন্দ্রিক সাংবাদিকতা ও সমাজ সেবা বাংলার মুসলিম ও জাতীয় জাগরণে বিশিষ্ট ভূমিকা রেখেছে। ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্র এবং এর মাধ্যমে সমাজ সেবার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান কম নয়। তিনি ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইউনানী চিকিৎসক এবং নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ্‌র পারিবারিক চিকিৎসক। তিনি দরিদ্র ও নিঃস্বদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছিলেন এবং অনেক সময় নিজের পকেট থেকে টাকা খরচ করে তাদেরকে মৃত্যুর ছোবল থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। ইউনানী চিকিৎসার মাধ্যমে দেশ ও সমাজ সেবার যে আদর্শ তিনি রেখে গেছেন এবং বাংলাদেশে ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে যে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন, তা অক্ষয় ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর একক প্রচেষ্টায় ঢাকার বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইউনানী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ'। তিনি আজীবন এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং একে কেন্দ্র করে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

২২. সমাজ-সংস্কারমূলক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে মাওলানা আকরম খাঁ ও মাওলানা ইসলামাবাদী বাংলার মুসলিম সমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মাওলানা আকরম খাঁ জীবনের প্রথম দিকে মুসলিমদের মাজ্‌হাবী দ্বন্দ্বে কিছুটা লিপ্ত থাকলেও অচিরেই সত্যানুসন্ধিৎসা ও

চারিত্রিক দৃঢ়তা বলে সংকীর্ণতা পরিহার করে বৃহত্তর মুসলিম সমাজের সংহতি সাধনে ব্রতী হন এবং মাওলানা ইসলামাবাদীর সক্রিয় সহযোগিতায় মুসলিমদের মাজহাবী দ্বন্দ্বের অবসানে ও মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফলে এতদঞ্চলের মুসলিমদের কুসংস্কারের গন্ডি পেরিয়ে রাজনীতি ও সমাজের বৃহত্তর আঙ্গিনায় প্রবেশের অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি হয়। অনুরূপভাবে বাংলার মুসলিমদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পশ্চাদ্‌পদতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাওলানা আকরম খাঁ ও মাওলানা ইসলামাবাদী 'সমাজ হিতৈষী' আলিমদের নিয়ে 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা' নামে যে সমাজসেবামূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন, তা মুসলিমদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। ফলে বাংলার মুসলিমদের মধ্যে যে নবজাগরণের সূচনা হয়, তা মুসলিম সমাজকে অপরাপর সম্প্রদায়, বিশেষতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানসিক ও নৈতিক শক্তি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

মাওলানা আকরম খাঁ ও মাওলানা ইসলামাবাদী কর্মজীবনের শুরুতেই একে অপরের সহকর্মী ছিলেন এবং মুসলিম সমাজের কল্যাণের লক্ষ্যে একসাথে মিলে বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। অধিকন্তু তাঁরা দু'জন সমাজ সংস্কারের মহান ব্রত নিয়ে দেশের প্রায় সর্বত্র ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন শির্‌ক, বিদ্‌আত, কুসংস্কার, মাতম, ছিয়ম, চেহলাম, কবর পূজা, পীর পূজা, কবরে বাতি জ্বালানো, মৃত ব্যক্তির নিকট কিছু চাওয়া, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, তালাক, নারী-নির্যাতন, আশ্‌রাফ-আত্‌রাফ বৈষম্য, ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিবর্তে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ আওয়াজ তোলেন, এগুলোর গঠনমূলক সমালোচনা

করেন এবং মুসলিম সমাজকে এগুলো থেকে দূরে রাখার প্রয়োজনীয় দিক্ নির্দেশনা দান করেন ।

২৩. হাকিম হাবিবুর রহমান উক্ত সব সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকান্ডে তেমন একটা মনোযোগী হতে পারেননি । কারণ এসবের বিপরীতে ইউনানী চিকিৎসার মাধ্যমে সমাজের মানুষের সেবা করা এবং ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে তাঁকে অজস্র সময় ও মেধা খরচ করতে হয়েছিল । তিনি এক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সফলতাও অর্জন করেছিলেন এবং বৃটিশ সরকার কর্তৃক ১৯৩৯ সালে 'শেফাউল মূল্ক' [দেশের রোগমুক্তি] খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন । তাঁর জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমের শ্রেষ্ঠ ফসল 'তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ' তাঁর অবর্তমানে এখনও ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখ্ছে । তাছাড়া সমাজ সেবার অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁরা তিনজনই নিজস্ব পরিমন্ডলে ও নিজস্ব পরিকল্পনা মাফিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, যা প্রত্যেকের সমাজ সেবা বিষয়ক আলোচনাতে বিস্তারিতভাবে স্থান পেয়েছে । এভাবে তাঁরা তিনজনই বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে দিশারীর ভূমিকা পালন করেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

উপসংহার

পূর্বোক্ত অধ্যায়সমূহের সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলায় মুসলিম জাগরণ এতদঞ্চলের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং এ সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় বহু মুসলিম দিক্‌পাল ব্যাপক অবদান রেখেছেন। তন্মধ্যে মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এবং হাকিম হাবিবুর রহমান অন্যতম দিশারীর ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা তিন জনই যে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কীর্তিমান ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন, তা-ও পূর্বোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়। বিশেষ করে ঐতিহ্য-চেতনা, ইতিহাস সাধনা ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে তাঁদের তিনজনের অবদান এবং বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বের দাবী রাখে। তাই প্রসঙ্গক্রমে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তাঁদের চিন্তা-চেতনার তুলনামূলক বিশ্লেষণের একটি চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান উপসংহার অধ্যায়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের ওপর খানিকটা আলোচনার প্রয়োজন বিধায় নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলঃ

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন্ বখতিয়ার খল্‌জী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে এ দেশে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। তখন থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে বহু মুসলিম সুলতান, সুবাহ্‌দার, নবাব ও নাযিম প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে বাংলা শাসন করেন। মাঝখানে রাজা গণেশ মাত্র চার বছর (১৪১৪-১৮ খ্রীঃ) স্বাধীনভাবে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা টোডরমল (১৫৮০-৮২ খ্রীঃ) এবং রাজা মানসিংহ (১৫৮৯-৯৬ খ্রীঃ)-ও বাংলা শাসন করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা ছিলেন বাদশাহ্ আকবর-এর প্রতিনিধি নাযিম। প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর ব্যাপী যে মুসলিমগণ শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছিল, ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট নবাব সিরাজের

পরাজয়ের মাধ্যমে তারা শাসিত শ্রেণীতে পরিণত হল। অবশ্য নবাব মীর কাসিমের সময় পর্যন্ত মুসলিমগণ নামেমাত্র শাসক শ্রেণী হিসেবে টিকে থাকলেও ১৭৬৪ খ্রীঃ বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট নবাব মীর কাসিমের চূড়ান্ত পরাজয়ের ফলে বাংলার মুসলিমগণ প্রায় দুইশত বছরের জন্য শাসিত শ্রেণীতে পরিণত হল এবং ইংরেজদের অধীনে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হল।

বস্তুত:পক্ষে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রাষ্ট্র-ক্ষমতাচ্যুতি, ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলিম জমিদারীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস, ১৮২৮ সালের বাজেয়াপ্ত আইনের ফলে নিস্কর ভূমির রায়তিস্বত্ব লোপ এবং ১৮৩৭ সালে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজিকে রাজভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান– পরপর এ চারটি বড় ধরণের আঘাতে পূর্ববর্তী মুসলিম শাসক শ্রেণী (বর্তমান শাসিত শ্রেণী) নিঃস্ব রিক্ত নিরক্ষর নিষ্ক্রিয় নির্জীব জাতিতে পরিণত হয়। ইংরেজদের প্রশাসনিক আইন ও শিক্ষানীতির ফলেই মূলতঃ এরূপটি হয়েছে। ফলে অভিজাত শ্রেণীটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

বণিক কোম্পানীর শোষণ-নীতি থেকে কৃষক, শ্রমিক ও বিত্তহীন জনসাধারণও রেহাই পায়নি। ইংরেজ বণিকদের প্রবর্তিত ব্যবসায়-নীতির ফলে ১৭৭০ সালের (বাংলা ১১৭৬ সন) মহা দুর্ভিক্ষে বাংলা ও বিহারের প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লাখ মানুষ প্রাণ হারায়, যা ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত কোম্পানী বিদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য এদেশের কুটির শিল্প ধ্বংস করে দিয়েছিল। কোম্পানীর বাণিজ্য নীতির ফলে তাঁতীগণ সর্বস্বান্ত হয়। নীলচাষে বাধ্য করার ফলে কৃষকের সর্বনাশ ঘটে। এর ওপর রোগ-ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে তারা একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়। অশিক্ষা ও দারিদ্র্য তাদের ঘোর অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

১৭৫৭ সাল হতে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এ একশ বছর মুসলিমগণ ছিল মূলতঃ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বহীন তথা কান্ডারী শূন্য। সংকট ও চ্যালেঞ্জের এ ক্রান্তিলগ্নে কেন্দ্রীয় মুসলিম নেতৃত্বের এ চরম ব্যর্থতাই উনিশ শতকে মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতার

মূল কারণ। তাছাড়া তখন মুসলিমদের মনোভাব ছিল অতীতমুখী। আর এ ধরনের চিন্তা-চেতনা মূলতঃ মুসলিমদের উন্নতির পক্ষে মোটেই সহায়ক ছিলনা, বরং ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছিল। অন্যদিকে হিন্দুরা বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বুঝতে সক্ষম হয়েছিল হাওয়া কোন্ দিকে বইতে শুরু করেছিলো। সে অনুযায়ী তারা তাদের মনোভাব ও কর্মপন্থাকে সংশোধন করে অনেক লাভবান হয়েছিল। অথচ নতুন যুগের নতুন চিন্তাধারা এবং কর্মকান্ডের ফলে যে সুদূরপ্রসারী ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল, সে সম্বন্ধে সাধারণতঃ মুসলিমগণ তখন কোন সুস্পষ্ট ধারণা ও দিক নির্দেশনা পায়নি এবং সমকালীন পরিস্থিতির রূঢ় বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারেনি। ফলে মুসলিম জাগরণ বিলম্বিত হয়েছিল।

এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শুরু থেকেই হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করতে শুরু করে এবং অত্যন্ত উৎসাহের সাথে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হয়। ফলে তারা ইংরেজ সরকারের পূর্ণ আস্থা অর্জন করে, পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করে এবং ইংরেজী শিক্ষার সুবাদে চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলিমদের তুলনায় অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা পায়। তারা পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয় এবং সমকালীন ইউরোপীয় চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে হিন্দু সমাজে ক্রমান্বয়ে নতুন ভাবধারার বিকাশ ঘটতে থাকে এবং তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, যা হিন্দু সমাজের অগ্রগতিকে অনেকখানি ত্বরান্বিত করে। তাছাড়া হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষার সাথে সাথে নিজেদের মাতৃভাষা বাংলাও চর্চা করতে থাকে সমান তালে। কলকাতার হিন্দুদের এ নতুন শিক্ষা কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে মফঃস্বল অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। অথচ এক্ষেত্রে মুসলিমগণ ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের মত তাৎক্ষনিকভাবে মনোযোগ দিতে পারেননি। তাদের এ অমনোযোগিতার কারণ হিসেবে তাদের প্রতি এ অপবাদ আরোপ করা হয় যে, তারা ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল। এমনকি বাংলা ভাষার প্রতিও তারা ছিল উদাসীন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে- মুসলিমগণ কি সত্যি সত্যিই ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল? জবাবে বলা যয়- এমন ধারণা পোষন করলে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। কারণ মুসলিমগণ জন্মগতভাবে, জাতিগতভাবে এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোন হতেও অন্য যে কোন জাতি অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষানুরাগী ছিল। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ায় শিক্ষা ক্ষেত্রেও তারা পশ্চাদ্‌পদ হয়ে পড়ে। ইংরেজি শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তারা বীতশ্রদ্ধ ছিলনা। কিন্তু ইংরেজি স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করা ছিল সেই সময়ে অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ, যা ঐ মূহুর্তে তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। তাছাড়া এ ব্যাপারে তারা সরকারের সামান্যতম সহানুভূতিও আকর্ষণ করতে পারেনি। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদের জন্য সরকারী ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজেও মুসলিমদের প্রবেশাধিকার ছিলনা। মুসলিমদের প্রতি তাদের এ বিমাতাসুলভ আচরণই মূলতঃ এর জন্য দায়ী।

অন্যদিকে বাংলা ভাষার প্রতি মুসলিমদের উদাসীনতার মূল কারণ ছিল এই যে, তখন বাংলা ভাষায় যেসব পাঠ্যপুস্তক ছিল, তার সবগুলোই ছিল হিন্দু ধর্ম সংক্রান্ত, হিন্দুআনীতে ভরপুর এবং সংস্কৃত-ব্যাকরণবহুল শব্দে পরিপূর্ণ, যা মুসলিমদের বোধগম্য ছিলনা। অন্য কথায় মুসলিমদের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রাখার লক্ষ্যে বৃটিশ শাসক, খৃষ্টান মিশনারী ও এদেশীয় হিন্দু দালালদের এটা ছিল এক ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা, যা মুসলিম শক্তি ধ্বংস করার সুদূরপ্রসারী নীল নক্‌সা হিসাবে বিবেচিত। ফলে মুসলিমগণ মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে যায়।

উনিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে যখন ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে কলকাতার হিন্দু সমাজে এক নবজাগরণের সাড়া পড়ে গেল, তখন কলকাতার শীর্ষস্থানীয় মুসলিমগণ নীরব থাকলেও গ্রামাঞ্চলের মুসলিমগণ খানিকটা সক্রিয় ছিল। সে সময় গ্রামাঞ্চলের মুসলিম জনসাধারণ স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত অভ্যুত্থানে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যদিও এসব

অভ্যুত্থানের মূল উৎস ছিল কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ, অচিরেই এগুলো ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করে। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, ইংরেজ পদানত বাংলার মুসলিম জাগরণ আন্দোলন সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয় দিল্লীর বিখ্যাত আলিম শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (রহঃ) (১৭০৩-১৭৬৩ খ্রীঃ) এর চিন্তাধারার দ্বারা। তিনি ইসলামের বিশুদ্ধবাদী ধারাকে সমকালীন প্রয়োজনের তাগিদে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারাকে উপ-মহাদেশের আনাচে-কানাচে পরিচিত করে তোলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ্ আবদুল আযীয (রহঃ) (১৭৪৬-১৮৩৪ খ্রীঃ)। ভারতীয় আলিমদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এদেশকে নির্ভয়ে 'দারুল হর্ব' বলে ফাত্ওয়া প্রদান করেন। তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সংগঠন কায়েম করেন, যা ইতিহাসে 'তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়া' নামে পরিচিত। এ আন্দোলনের ফলেই বহু লোক ইসলামের সত্যিকার ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নানারূপ অনৈসলামিক ও কুসংস্কারমূলক অভ্যাস পরিত্যাগ করে খাঁটি ইসলামী শিক্ষাদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। কালক্রমে এ আন্দোলন অত্যাচারী শিখ ও বৃটিশদের বিরুদ্ধে 'জিহাদ আন্দোলন'-এ পরিণত হয়। বাংলার মুসলিম জাগরণে এ আন্দোলনের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক, গভীর ও সুদূরপ্রসারী। এ আন্দোলনকে চূড়ান্ত পরিনতির দিকে এগিয়ে নিয়ে বাস্তবরূপ দিয়েছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ) (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রীঃ)। তাঁর প্রধান সহকর্মী ছিলেন শাহ্ ইসমাইল শহীদ (রহঃ)।

নওশেরায় শিখদের সাথে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর হতে বালাকোটের যুদ্ধ পর্যন্ত ছোট বড় এগারটি বা ততোধিক যুদ্ধে সাইয়েদ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী শত্রুদের মোকাবেলা করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজয় অর্জন করে। তিনি চেয়েছিলেন যে, মুসলিম অধ্যুষিত সীমান্ত অঞ্চলে তিনি একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করবেন। আর তাই সীমান্তকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে। কিন্তু সীমান্তের যেসব মুসলিমের সাহায্য-

সহযোগিতার আশা হৃদয়ে পোষণ করে তিনি তাঁর জিহাদের রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন, তাদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর সংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। এর প্রমাণ হচ্ছে বালাকোট যুদ্ধে ১৮৩১ সালের ৬ই মে মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর চরম বিপর্যয় এবং সাইয়েদ আহমদ শহীদ, শাহ্ ইসমাইল শহীদ ও অন্যান্য কতিপয় প্রধান সহকর্মীর শাহাদাতবরণ।

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই এসে যায়– দেশের অভ্যন্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে সাইয়েদ আহমদ শহীদ সুদূর সীমান্ত এলাকায় গিয়ে শিখ্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন কেন? এর জবাব তিনি নিজেই দিয়েছিলেন এভাবে– প্রথমত: ইংরেজরা এখানে মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করেনি, যা শিখ্রা করেছে। দ্বিতীয়ত: এদেশে ইংরেজ আধিপত্য সুদৃঢ় করার পেছনে শিখ্দের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তৃতীয়ত: সীমান্ত অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য কায়েম হলে পরবর্তী পর্যায়ে সমগ্র উপমহাদেশকে সর্বপ্রকার শত্রুর কবলমুক্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। আর তাই তিনি প্রথমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে সীমান্তকে বেছে নিলেন শিখ্দের পরাভূত করার জন্য।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে এবং তা হচ্ছে এই যে, কেহ কেহ সাইয়েদ আহমদ শহীদের জিহাদ আন্দোলনকে 'ওয়াহাবী আন্দোলন' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সত্যিকার অর্থে এ আখ্যা কতটুকু সঙ্গত? এর জবাবে বলা যায় যে, এ আখ্যা মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ কথিত ওয়াহাবী আন্দোলন এবং জিহাদ আন্দোলন সম্পূর্ণ পৃথক এবং এদের প্রেক্ষাপটও সম্পূর্ণ ভিন্ন, যা যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

বালাকোটের চরম বিপর্যয়ের ফলে জিহাদ আন্দোলন স্তব্ধ বা স্তিমিত হয়ে যায়নি। আহত মুজাহিদগণ নেতৃবৃন্দের আকস্মিক শাহাদাতের শোক ভুলতে না পারলেও অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে পুনঃগঠিত হয়ে পশ্চিমাঞ্চলে গভীর পার্বত্য এলাকায় সরে গিয়ে সিতানায় কেন্দ্র স্থাপন করে জিহাদ অব্যাহত রেখেছিলেন। সাইয়েদ আহমদ শহীদের জিহাদ আন্দোলন ছিল মূলত: সংস্কারধর্মী। সীমান্তে

মুজাহিদ অভিযান ছিল এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় মাত্র। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে তিনি মুজাহিদ্দের কাফেলাকে সীমান্তের দুর্গম পার্বত্য এলাকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছিল। মুজাহিদ্দের রক্তের বিনিময়ে সীমান্ত এবং পাঞ্জাবের মুসলিমগণ আগ্রাসী শিখ্ শক্তির চরম নির্যাতন থেকে অনেকটা রক্ষা পেয়েছিলেন। অধিকন্তু, পেশোয়ার কেন্দ্রিক একটি ইসলামী খিলাফত কায়েম করে চার বছরাধিক কাল তা পরিচালনা করার মাধ্যমে পরবর্তী যুগের ঈমানসমৃদ্ধ মুসলিমদের সামনে নবুওয়্যাতের আদর্শে খিলাফতের এমন এক বাস্তব নমুনা তিনি পেশ করে গেছেন, যা আজ পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

পলাশী-উত্তর যুগে বাংলার অবক্ষয় প্রাপ্ত, ক্ষয়িষ্ণু ও পতনোন্মুখ মুসলিম সমাজে আশু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে তদানীন্তন বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবী শ্রেণী অক্ষম ছিল। তাই মুসলিম উচ্চ শিক্ষিত স্তর থেকে নেতৃত্বের উন্মেষ না হওয়ায় সমাজের নিম্নস্তরের জনসাধারণ এ শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসে এবং তাদের জীবনবোধের ভিত্তিতে নেতৃত্ব গড়ে উঠে। পলাশী যুদ্ধোত্তর সময়ে ফকীর মজনু শাহের নেতৃত্বে বাংলা ও বিহারে ইংরেজ ও তার দালাল জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে যে ফকীর আন্দোলন শুরু হয়, তাতে জমি হারা, গৃহ হারা, দিন মজুর, নিরন্ন চাষী, বেকার কারিগর ও তাঁতী ইত্যাদি সকল স্তরের হাজার হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে, যা বিভিন্ন পর্যায়ে সুদীর্ঘ প্রায় আটত্রিশ বছর স্থায়ী হয়। এ সব গণআন্দোলনের মধ্যদিয়ে পরাধীনতার মসিলিপ্ত ইতিহাস রক্তরঙিন, গৌরবময় ও উজ্জ্বল হয়ে উঠে। বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে এঁদের অবদানকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই।

উনিশ শতকের শুরুতে যে তিজন মহৎপ্রাণ ব্যক্তি বাংলার মুসলিম সমাজের সামগ্রিক সংস্কার সাধনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁরা হলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ, শহীদ তিতুমীর ও সাইয়েদ আহমদ শহীদের অন্যতম খলিফা মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী। তাঁদের প্রত্যেকেরই কর্মস্থল ছিল নিরক্ষর পল্লীবাসী কৃষক ও

কারিগর মুসলিম সমাজে– হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র সমগ্র পূর্ববাংলায়, তিতুমীরের চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, যশোর ও ফরিদপুরে এবং কারামত আলী জৌনপুরীর সমগ্র পূর্ববাংলা ও আসামে। বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

হাজী শরীয়তুল্লাহ্ (১৭৮১-১৮৪০ খ্রীঃ) সাধারণ কৃষক শ্রেণীর মধ্য থেকে ১৮১৮ সালে ফারায়েজী আন্দোলন শুরু করেন এবং ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন। পাশাপাশি তিনি এদেশকে 'দারুল হর্‌ব্' হিসেবে ঘোষণা করেন এবং যতদিন পর্যন্ত এদেশ 'দারুল ইসলাম'-এ পরিণত না হবে ততদিন পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার এবং জুমা ও ঈদের নামাজ না পড়ার নির্দেশ দেন। তিনি হিন্দু জমিদার, মহাজন ও জোতদারদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য কৃষকদের আহবান জানান । তাঁর এ আহবানে শোষিত, বঞ্চিত ও নিষ্পেষিত মুসলিমগণ সম্বিত ফিরে পেল এবং নতুন প্রাণ সঞ্চরণ অনুভব করলো। ফলে তারা দলে দলে এসে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগল এবং বৃটিশ সরকার, হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করলো। ১৮৪০ সালে হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র ইন্তেকালের পর তাঁর একমাত্র পুত্র মুহ্‌সীন উদ্দীন আহ্‌মদ ওর্‌ফে দুদু মিয়া (১৮১৯-৬২ খ্রীঃ) ফারায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার প্রতিরোধ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত খিলাফত ব্যবস্থা ছিল রাষ্ট্রাভ্যন্তরে একটি 'ক্ষুদ্র রাষ্ট্র' সদৃশ। এভাবে হাজী শরীয়তুল্লাহ্ প্রবর্তিত ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে দুদু মিয়া অনেকটা রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করেন।

বৃটিশ বিরোধী তীব্র গণ আন্দোলনে মীর নিসার আলী ওর্‌ফে তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১ খ্রীঃ)-এর ভূমিকা ছিল অসামান্য। তিতুমীরের প্রতিষ্ঠিত 'বাঁশের কেল্লা'কে কেন্দ্র করে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ শীষ্যগণ হিন্দু জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এ সর্বাত্মক

সংগ্রাম ও গণআন্দোলন পরবর্তীকালে মুসলিমদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় আজাদীর পথে আলোকবর্তিকার কাজ করেছে।

১৮৫৭ সালের বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামকে তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠী 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে আখ্যায়িত করলেও প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল বৈদেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সত্যিকার আযাদী সংগ্রাম বা স্বাধীনতা সংগ্রাম। সমগ্র ভারতবর্ষে অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে যে তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তা হচ্ছে ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ, ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ১৯৪৭ সালের স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। প্রথম দু'টিতে মুসলিমদের চরম বিপর্যয় হলেও তৃতীয়টিতে তাঁরা সফলতা অর্জনে সক্ষম হন। সুতরাং প্রথম দু'টি ছিল তৃতীয়টিতে সফলতা অর্জনের প্রেরণার উৎস।

১৮৫৭ সালে সমগ্র ভারতের সকল শ্রেণীর জনগণ যে বৃটিশদের বিরুদ্ধে রুদ্ররোষে ফেটে পড়েছিল, তার কারণ ছিল বহুবিধ। শতাব্দীর পুঞ্জীভূত আক্রোশ আগ্নেয়গিরির ন্যায় বিস্ফোরিত হয়েছিল এ সংগ্রামে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্, শাহ্ আবদুল আযীয, সাইয়েদ আহমদ শহীদ, শাহ্ ইসমাইল শহীদ, হাজী শরীয়তুল্লাহ্, দুদু মিয়া, মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর প্রমুখ বীর মুজাহিদগণ যে জিহাদী প্রেরণার সঞ্চার করে রেখেছিলেন, তা যেন বারুদের স্তূপে দিয়াশলাইয়ের কাজ করলো। আর তাই চারিদিকে দাউ দাউ করে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠলো। স্বেচ্ছা প্রনোদিত হয়ে যে যেখানে ও যেভাবে পেরেছে সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছে। সিপাহীদের সাথে যোগ দিয়েছে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল স্তরের সাধারণ মানুষ– কৃষক, মজুর, সরকারী-বেসরকারী কর্মচারী প্রমুখ। ফলে কোথাও কোথাও হয়তোবা নিয়ম-নীতি লংঘিত হয়েছে, হয়েছে লুঠতরাজ ও অপ্রয়োজনীয় হত্যাকান্ড। কোন আদর্শবান কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে এ সংগ্রাম পরিচালিত হয়নি। অথচ বৃটিশরা এক্ষেত্রে মুসলিমদের একচেটিয়াভাবে দায়ী করে। মুসলিমদের রাজক্ষমতা হারানোর ক্ষোভকে তারা এ বিদ্রোহের প্রধান কারণ হিসেবে মনে করে এবং

পৈশাচিকতার সাথে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, যা মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি কলংকজনক অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত।

স্বাধীনতা বিপ্লব পরবর্তী দীর্ঘ এক যুগেরও বেশী সময় ব্যাপী জিহাদ ও ফারায়েজী আন্দোলনের কর্মীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামী তৎপরতা অব্যাহত থাকলেও তা ক্রমেই স্তিমিত হয়ে পড়ে। বিদ্রোহ দমনের নামে ইংরেজদের ব্যাপক দলন-পীড়ন ও দমন নীতির ফলে মুসলিম সমাজ খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনই এক পরিস্থিতিতে প্রথমবারের মত ইংরেজদের সাথে মুসলিমদের আপোসের একটি ধারা প্রবল হয়ে উঠে। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী এ ধারারই প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি মনে করতেন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হুকুম ও নিয়ম-নীতি পরিবর্তিত হয়। ফলে ১৮৬৭ সালে তিনি জিহাদ আন্দোলনের মূল 'Spirit' হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিমদের মধ্যে 'ভিতর থেকে সংস্কার' (reform from within) তথা অন্তর্বিপ্লবের ধারণা প্রচার করেন। তিনি প্রচার যুদ্ধের মাধ্যমে অশিক্ষিত গ্রামীণ জনসাধারণের অনৈসলামী আচার-বিশ্বাস ও হিন্দুয়ানী রীতি-নীতি দূর করে বাংলায় ইসলামের ভিত্তি শক্তিশালী করার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ইংরেজদের প্রতি নমনীয় নীতি গ্রহণ করে তিনি জিহাদ ও ফারায়েজী আন্দোলনের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন। তিনি বৃটিশ শাসিত বাংলা-ভারতকে 'দারুল ইসলাম' বা 'দারুল আমান' বলে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং জুমা ও ঈদের নামাজ অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেন। ফলে ইংরেজদের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া অবৈধ বিবেচিত হয় এবং তাদের সাথে বাংলা-ভারতের মুসলিমদের সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। তিনি মুসলিমদের ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা করেননি, বরং তাঁর পুত্র মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী মুসলিমদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে জোরালো অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

উনিশ শতকের শেষদিকে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর সনাতনপন্থী অনুসারীদের সাথে জিহাদ ও ফারায়েজী আন্দোলনের কর্মীদের মাযহাবী বিতর্ক চরম

আকার ধারণ করলে 'বাহাস' বা তর্কযুদ্ধ মুসলিম সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে পরিণত হয় এবং এর মাধ্যমে মুসলিমগণ ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সুযোগ পান । ফলে তাঁরা আত্ম পরিচয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন এবং তাঁদের মধ্যকার বিভেদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায় । বাংলার সনাতনপন্থী এবং জিহাদী ও ফারায়েজী পন্থীদের মধ্যে সহযোগিতার বৃহত্তর ক্ষেত্র রচনায় সাইয়েদ জামালউদ্দীন আফগানী (১৮৩৮-৯৭ খ্রীঃ)-এর Pan-Islamism' বা 'বিশ্ব ইসলামবাদ'ও এ সময় বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে । এই পর্যায়ে এসে ইংরেজি শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ মুসলিম পরিবারগুলো আলিম সমাজের সান্নিধ্যে আসেন এবং মুসলিম জনগণকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে উদ্বুদ্ধ, জাগ্রত ও সংগঠিত করার এবং হিন্দু 'Elite Class'-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার এক বিরাট সম্ভাবনাময় শক্তির সন্ধান পান । ঢাকা, কলকাতা, হুগলী ও চট্রগ্রামের উচ্চতর মাদ্রাসাগুলো থেকে পাশ করে বেরিয়ে আসা গ্রাজুয়েটগণ এ সময় মুসলিম জাগরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন ।

শহুরে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিমগণ জিহাদ ও ফারায়েজী আন্দোলনের মৌলিক পুনর্গঠন ও তাঁদের ইংরেজ বিরোধী নিরাপোস সংগ্রামের সাথে একাত্ম হতে পারেননি । ইসলামের পূর্ব গৌরব বা ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন যদিও তাঁরা দেখেছেন, কিন্তু সেই সাথে পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্যেও তাঁরা গৌরব খুঁজেছেন । তাই তাঁরা ইংরেজদের সাথে আপোস করেছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং পাশ্চাত্যের চিন্তা চেতনায় আকৃষ্ট হয়েছেন । পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও ভাবধারার চাকচিক্যে বিমোহিত এ শহুরে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির নেতৃত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসেন নওয়াব আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও সৈয়দ আমীর আলীর মত 'Enlightened' বা 'আলোকপ্রাপ্ত' ব্যক্তিবর্গ ।

নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮৬৩ সালে 'Calcutta Mohamedan Literary Society' গঠন করেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের নেতৃত্বে ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'Gazi Pur Translated Society.' সৈয়দ আমীর আলী ১৮৭৮ সালে গঠন করেন 'Central National Mohamedan Association'. দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও এ তিনজনই ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলিমদের স্বাধিকার আদায়ের নীতিতে বিশ্বাস করতেন। তাঁরা মনে করতেন, ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে 'আধুনিকীকরণ' ছাড়া মুসলিমদের পক্ষে ভারতে আত্মমর্যাদা নিয়ে টিকে থাকা সম্ভব নয়। নওয়াব আবদুল লতিফ ও স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলিমদেরকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে এনে শিক্ষায় উন্নতি লাভের মাধ্যমে সামাজিকভাবে যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠার প্রবক্তা ছিলেন। অন্যদিকে সৈয়দ আমীর আলী নৈতিক পুনর্গঠন ও রাজনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুসলিমদের সঙ্গত দাবী আদায়ের কথা বলেছেন। মুসলিম সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ছিল তাঁদের চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দু এবং তাঁদের আধুনিক যুগের উপযোগী করে গড়ে তোলাই ছিল তাঁদের স্বপ্ন। এতদুদ্দেশ্যে তাঁরা প্রয়োজনীয় সকল কর্মকান্ড সুসম্পন্ন করেন এবং বাংলায় মুসলিম জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

উনিশ শতকের শেষপাদে উত্তর ভারতে দু'টি সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়, যার ঢেউ বাংলাতেও লাগে এবং বাঙালী মুসলিমগণ উক্ত আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হন। দু'টি আন্দোলনের একটি দেওবন্দ কেন্দ্রিক (১৮৬৭ খ্রীঃ) ও অপরটি আলীগড় কেন্দ্রিক (১৮৭৫ খ্রীঃ)। প্রথমটির নেতা ছিলেন মাওলানা আবুল কাশেম নানুতুভী (১৮৩২-৮০ খ্রীঃ) এবং দ্বিতীয়টির স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-৯৮ খ্রীঃ)। দেওবন্দ মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে প্রথমোক্ত আন্দোলন ও মতবাদ গড়ে উঠে। প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি এবং ইসলামী চেতনার বিকাশ সাধনে তাঁদের অবদান অবশ্যই অনস্বীকার্য।

অন্যদিকে স্যার সৈয়দ ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মুসলিম জাতির পশ্চাদ্‌পদতা দূর করে মুসলিম সমাজের উন্নয়নকল্পে 'আলীগড় মোহামেডান ওরিয়েন্টাল কলেজ' কেন্দ্রিক দ্বিতীয় আন্দোলনটি গড়ে তোলেন। এ আন্দোলনে কবি আলতাফ হুসায়ন হালী, মুহসিনুল মুল্‌ক, নাজির আহমদ, চেরাগ আলী প্রমুখ মনীষীবৃন্দ যোগদান করে আন্দোলনকে আরো গতিদান করেন এবং মুসলিম জাগরণ তরান্বিত করেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৭-১৯২০ খ্রীঃ)-এর ন্যায় কিছু সংখ্যক রক্ষণশীল ও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হিন্দু নেতাদের নেতৃত্বে হিন্দুত্বের পুনরুত্থান আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এবং ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং কয়েকটি অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। উক্ত সাম্প্রদায়িক বিরোধ বিশ শতকে আরও তীব্র আকার ধারণ করে। তখন বাংলার বেশ কিছু সংখ্যক মুসলিম ও হিন্দু নেতা উভয় সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহঅবস্থানের ভিত্তিতে এ বিরোধ মিটিয়ে ফেলার লক্ষ্যে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন– ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তি, ১৯২৩ সালে সম্পাদিত বেঙ্গল প্যাক্ট, ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের পর কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন প্রচেষ্টা এবং সর্বশেষে ১৯৪৭ সালে স্বাধীন যুক্তবাংলা গঠনের প্রস্তাব। উক্তসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে একদিকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ অনেকটা হ্রাস পায় এবং অন্যদিকে মুসলিমগণ হিন্দু পুনরুত্থান আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেরাও সচেতন হন এবং সংগঠিত হতে চেষ্টা করেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় মুসলিম জাগরণের নব পর্যায়ে ধর্মীয় বিধি-বিধান সংক্রান্ত 'নসিহত নামা' বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সাহিত্য সৃষ্টির আকাঙ্খার চেয়ে সমাজ সংশোধনের প্রচেষ্টাই এসব গ্রন্থ রচনার পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এসব গ্রন্থ বাংলার মুসলিমদেরকে আত্ম পরিচয়ে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রতিবেশী হিন্দুদের থেকে নিজেদের স্বকীয়তা সম্পর্কে সচেতন করতে সহায়ক হয়।

এসব গ্রন্থের মাধ্যমে লেখকগণ মুসলিম জাগরণের যে প্রয়াস চালান, তা মুসলিমদের আত্মবিশ্বাস ও সচেতনতা ফিরিয়ে আনতে ব্যাপক অবদান রাখে। এতদ্ব্যতীত এ সময়ে মুসলিম সমাজে একদল প্রখ্যাত সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে, যাঁদের সাহিত্যচর্চা বাঙালী মুসলিমদের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধিতে ও মুসলিম সমাজের জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের প্রথমপাদে বাংলার মফস্বল এলাকায় বিশেষত: নদীয়া, যশোর, খুলনা ও মালদহে ইসলাম, ইসলামের নবী ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে খৃষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। মুন্‌শী মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ এবং তাঁর সহকর্মীগণ খৃষ্টান মিশনারীদের উক্ত সব অপতৎপরতা রোধে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন, তা সত্যিই তুলনাহীন ও বিস্ময়কর। তাঁর অন্যতম সহকর্মী মুন্সী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন এবং সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীও মুসলিম জাতি ও সমাজকে আত্মপরিচয়ে উদ্বুদ্ধ করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বাংলার মুসলিম সমাজে সচেতনতাবোধ জাগ্রত হয়ে তা ক্রমশ: প্রবলতর হতে থাকে। এ সময় দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম সমাজের উন্নতি, অগ্রগতি ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বেশ কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। বাংলায় মুসলিম জাগরণের ইতিহাসে এসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সমাজ হিতৈষণার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও সাময়িকী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। দেশ, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র প্রভৃতির উন্নতি, সংস্কার, পরিবর্তন একান্তভাবেই সংবাদ-সাহিত্য সাপেক্ষ। কাজেই একে বলা যায় চতুর্থ-শক্তি। ইসলামের বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসীরা নিজ নিজ

মতাদর্শ প্রচারের বাহন হিসাবে সংবাদপত্রকে ব্যবহার করতেন। আবার কিছু কিছু পত্রিকা বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য গোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে কাজ করতো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ ধরণের অসংখ্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। মুসলিম সমাজের উন্নতি-অগ্রগতি ও আত্মোপলব্ধিতে এবং মুসলিম জাগরণের বিভিন্ন পর্যায়ে এসব পত্র-পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, উনিশ শতকের শুরুতে বাংলার মুসলিমগণ ছিলেন বিভিন্ন গোষ্ঠী ও অঞ্চলে বিভক্ত। আরো সূক্ষ্মভাবে দেখলে, গ্রামীণ ক্ষেত্রে বর্ণবিভক্তি ছিল তখনকার এক প্রচ্ছন্ন সামাজিক বৈশিষ্ট্য। মুসলিমদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ছিল নিজেদের বলয়ে সীমাবদ্ধ। জিহাদ ও ফারায়েজী আন্দোলন তাদেরকে সেই বদ্ধ সামাজিক গন্ডী থেকে বের করে আনতে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছিল। অন্যদিকে উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম বছরগুলোতে পরিচালিত আন্দোলন মুসলিম সমাজের রুদ্ধদ্বার খুলে দেয় এবং মুসলিম সমাজকে সামনের দিকে যথেষ্ট এগিয়ে নেয়। একটি কথা স্মরণযোগ্য যে, বৃটিশ শাসনের সার্বিক পরিণতি সম্পর্কে নব্যশিক্ষিত মুসলিম ব্যক্তিবর্গ পুরোপুরি বুঝে উঠার পূর্বেই ইসলাম প্রচারক আলিম সমাজ মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। দেরীতে হলেও নব্যশিক্ষিত মুসলিম ব্যক্তিবর্গ তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের সমন্বয়ে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল, এঁদেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল মুসলিম বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, যাঁদের চিন্তা ও কর্ম বাংলার মুসলিম সমাজে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটায় এবং বিশ শতকের সূচনালগ্নে বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে অসামান্য অগ্রগতি অর্জিত হয়।

ইসলাম প্রচারক আলিম সমাজ এবং নব্যশিক্ষিত মুসলিম বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই বাংলার মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক তথা সার্বিক অবস্থার উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয় এবং মুসলিমগণ আত্মপরিচয়ে উদ্বুদ্ধ হন। সমস্বার্থ ও অভিন্ন আদর্শের পথ ধরে তাঁদের মধ্যে

জাতিগত ঐক্য-চেতনা সৃষ্টি হয়। বিশ শতকের শুরুতে বাংলার মুসলিমগণ পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক যুগে প্রবেশ করেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এ যুগ শুরু হয়। কংগ্রেসের আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে মুসলিমদের উন্নতির সুযোগ সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত হলেও এরই সূত্র ধরে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু হিন্দু নেতৃবৃন্দ এর তীব্র বিরোধিতা করলে তাদের এ সংকীর্ণ হিন্দু মানসিকতা বরং মুসলিমদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধকে আরও প্রবলতর করে। এরই পরিনতিতে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ভারতীয় মুসলিমদের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চের লাহোর প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট মুসলিমদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

পূর্বাপর সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা নিঃসন্দেহে একথা বলতে পারি যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজ জীবনে ও মুসলিম মানসে যে আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল বা পরিবর্তনের সপক্ষে আন্দোলনের মাধ্যমে যে প্রবল আত্মসচেতনতাবোধ ও অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রবল অনুরাগ জাগ্রত হয়েছিল, তা-ই বাংলায় মুসলিম জাগরণ-হিসেবে বিবেচিত। এখন প্রশ্ন হল– বাংলার এ মুসলিম জাগরণ কি ইউরোপীয় রেনেসাঁর সঙ্গে তুলনীয়? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে প্রসঙ্গক্রমে ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। রেনেসাঁ (Renaissance) শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো পুনর্জন্ম বা পুনর্জাগরণ। খৃষ্টীয় পনের শতকে ইউরোপের নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি যে প্রবল আকর্ষণ ও অনুরাগ পরিলক্ষিত হয় এবং সমকালীন ভাবজগতে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করে সেটাই রেনেসাঁ নামে পরিচিতি লাভ করে। এ রেনেসাঁ আন্দোলনের মাধ্যমে ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান হয় এবং আধুনিক যুগের সূচনা

হয়। তবে এই রেনেসাঁকে পুনর্জন্ম নামে চিহ্নিত করা বিভ্রান্তিকর এই কারণে যে, অতীতকে কখনও ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তাই ইতিহাসে কোন কিছুর পুনর্জন্ম হয় না। তবে অতীত থেকে প্রেরণা লাভ করা যায়, অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। তাই আমরা দেখতে পাই যে, পনের শতকের রেনেসাঁ আন্দোলনের ফলে প্রাচীন গ্রীক বা রোমান সভ্যতাকে ফিরিয়ে আনা যায়নি, তবে এ আন্দোলনের ফলে হাজার বছরের মধ্যযুগীয় সভ্যতার অবসান ঘটেছে এবং আধুনিক সভ্যতার আবির্ভাবের মাধ্যমে ইউরোপের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হয়েছে। ইউরোপে পনের শতকের রেনেসাঁ আন্দোলনের ফলে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, সেটা পরিণতি লাভ করে আঠার শতকের শেষের দিকের চিন্তাক্ষেত্রে দার্শনিক বিপ্লব, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শিল্প বিপ্লব ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ফরাসী বিপ্লবের মধ্যদিয়ে এবং এসকল প্রক্রিয়ার ফলে গোড়াপত্তন হয় আধুনিক আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার।

আধুনিক ভাষা শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, সভা-সমিতি গঠন, বাংলা গদ্যের বিকাশ ও তার মাধ্যমে আধুনিক সাহিত্যের সৃষ্টি, কলকারখানা স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, নগর সৃষ্টি ও নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, শিক্ষা-ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলন এবং তার মধ্য দিয়ে মুক্ত বুদ্ধির ও মানবতা বোধের বিকাশ– আধুনিকতার এসব লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই রেনেসাঁ বা নবজাগরণের আত্মপ্রকাশ ঘটে। অন্যকথায় রেনেসাঁর প্রধান ধর্ম যুক্তিবাদ, মুক্তবুদ্ধি, স্বাধীন ও ধর্ম নিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনা, ইহজাগতিকতা ও মানবতাবাদ বা মানবিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থা ও সম্মান। এখন দেখা যাক, এগুলোর সাথে মুসলিম রেনেসাঁ বা জাগরণের মিল ও গরমিল কী পরিমান বা কতটুকু।

উপরে আধুনিকতার যে সব লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হল, যার মাধ্যমে রেনেসাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে– এর অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের সাথেই বাংলার মুসলিম রেনেসাঁর মিল রয়েছে। তবে লাগামহীন যুক্তিবাদ ও মুক্তবুদ্ধি এবং ধর্ম নিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনার সাথে ইসলামের দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রকট বিধায় এবং শুধু ইহজাগতিকতা নিয়েই ইসলাম চিন্তা করেনা বিধায় (কারণ ইসলামে ইহকাল ও পরকাল দুটোই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহকালীন কর্মকান্ডের মাধ্যমেই পরকালীন মুক্তি ও

শান্তির কথা বলে ইসলাম) বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে এগুলোর প্রতিফলন অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি-অগ্রগতিই ইসলামের সব কিছু নয়, বরং জীবন ধারনের জন্য যে পরিমাণ অর্থ-বিত্তের প্রয়োজন তার সাথে নৈতিক শক্তি ও চারিত্রিক দৃঢ়তার ওপরই ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে। কাজেই ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও মুসলিম রেনেসাঁর প্রকৃতিগত পার্থক্য সুস্পষ্ট। এতদ্ব্যতীত ইউরোপ ও বাংলা-ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেও ব্যবধান দুস্তর। সুতরাং উভয় রেনেসাঁকে এক ও অভিন্ন করে দেখার কোন সুযোগ নেই।

European Perspective-এ Renaissance-এর যে সংজ্ঞা উপরে দেয়া হল, তার সাথে Islamic point of view-তে Renaissance-এর সংজ্ঞার তেমন কোন পার্থক্য নেই। কারণ খৃষ্টীয় পনের শতকে ইউরোপের নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার প্রতি যে প্রবল আকর্ষণ ও অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়, খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম নব্য শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেও ইসলামের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি তেমন প্রবল আকর্ষণ ও অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপীয়রা যেমন প্রাচীন সভ্যতার পুনর্জন্ম দিতে পারেনি বা তাকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি, বরং তা থেকে প্রেরণা লাভ করেছে; ঠিক তেমনি বাংলার মুসলিম সমাজ ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে হুবহু ফিরে পায়নি, তবে তা থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনা লাভ করেছে ব্যাপকভাবে। অবশ্য ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের মত কোন বিপ্লব মুসলিম রেনেসাঁয় পরিলক্ষিত হয়না। তবে বাংলায় যে মুসলিম জাগরণ এসেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

বাংলায় মুসলিম জাগরণ আন্দোলনে অসংখ্য মহৎপ্রাণ ব্যক্তিত্ব দিকপাল ও দিশারীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন- মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এবং হাকিম হাবিবুর রহমান। এ তিনজন মহান ব্যক্তিই ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে কীর্তিমান ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ। বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁদের যে ব্যাপক ও বহুমুখী অবদান রয়েছে এবং তাঁরা যে এ ক্ষেত্রে অন্যতম দিশারীর ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁর প্রমাণ হচ্ছে, তাঁদের

জীবনের সামগ্রিক কর্মকান্ড ও চিন্তা-চেতনা, বিশেষ করে তাঁদের ঐতিহ্য-চেতনা, ইতিহাস সাধনা ও সমাজসেবা বিষয়ক বিবরণ, যা বর্তমান অভিসন্দর্ভে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে এবং এগুলোর একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে উক্ত তিনজন মনীষীর আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে খানিকটা আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমে মাওলানা আকরম খাঁ প্রসঙ্গে আসা যাক। বর্তমান অভিসন্দর্ভের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে মাওলানা আকরম খাঁর সামগ্রিক কর্মকান্ড ও চিন্তা-চেতনার মূল্যায়ন করতে যেয়ে আমরা দেখেছি যে, মাদ্রাসায় পড়াশুনা করার কারণে তিনি আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে পারদর্শিতা অর্জন করেন। পরবর্তীকালে সমসাময়িক পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বাস্তবতা উপলব্ধি করে প্রয়োজনের তাগিদে তিনি বাংলা ভাষায়ও ব্যাপক পারঙ্গমতা লাভ করেন। তাঁর ইতিহাস ও সাহিত্য কর্মের দিকে নজর দিলে এর সততা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। এমনকি বাংলা ভাষা আন্দোলন এবং বাংলা ভাষা সংস্কারের ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যাপক অবদান ছিল।

তাছাড়া তাঁর ইংরেজী ভাষায়ও যথেষ্ট দখল ছিল। 'The Comrade পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে Dr. Syed Sajjad Hussain মাওলানা আকরম খাঁর সাথে পরামর্শ করতেন এবং তাঁর দিক্‌নির্দেশনা অনুসরণ করতেন। তাছাড়া তাঁর 'মোস্তফা-চরিত' গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, তিনি উক্ত গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে প্রসঙ্গক্রমে বহু পাশ্চাত্য–ঐতিহাসিকের সমালোচনা করেছেন। সংগত কারণেই প্রশ্ন এসে যায়– তিনি যদি ইংরেজী না বুঝতেন, তাহলে ইংরেজী ভাষায় রচিত পাশ্চাত্য–ঐতিহাসিকদের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করে তাদের দেয়া বিকৃত তথ্যের সমালোচনা কীভাবে করেছিলেন? কাজেই তিনি ইংরেজী বুঝতেন, এতে সন্দেহ নেই। তিনি তাঁর উক্ত গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের বক্তব্য উদ্ধৃত

করে তার বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করেছেন, পাশাপাশি সঠিক তথ্য উপস্থাপন করেছেন এবং এভাবে নিজেকে একজন ঐতিহাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ।

মাওলানা আকরম খাঁর প্রায় সবগুলো গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, এমনকি তাঁর সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলোও বাংলা ভাষায় রচিত ও সম্পাদিত । তবে আরবী ও ফার্সী ভাষায় তাঁর পারদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও তিনি এ দু'ভাষায় কোন গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি । অবশ্য তাঁর রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহে আরবী ও ফার্সী শব্দ ও ভাষার ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় । তিনি উর্দু বিদ্বেষী ছিলেন না । বরং উর্দু ভাষায় 'দৈনিক জামানা' সম্পাদনা করেছেন । সংগত কারণে একটি প্রশ্ন এসেই যায়– দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁর প্রায় সবগুলো গ্রন্থ ও প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে কেন? জবাবে বলা যায় যে, তাঁর উক্তসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা এবং পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মুসলিমদের স্বীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং আত্ম-উপলব্ধিতে সহায়তা করা; অর্থাৎ বাংলায় মুসলিম জাগরণ ত্বরান্বিত করা । আর অধিকাংশ মানুষ যেহেতু বাংলা ভাষা-ভাষী এবং অল্প-শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, তাই বাংলা ভাষায় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করা এবং পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা ব্যতীত উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না । সুতরাং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনই তাঁর বাংলা প্রীতির কারণ ।

মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক ও পথিকৃৎ । মূলত: তাঁর সাংবাদিকতা ছিল তাঁর রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন বা বহিঃপ্রকাশ । তাঁর প্রকাশিত ও সম্পাদিত মাসিক মোহাম্মদী ও দৈনিক আজাদ ছিল এদেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণের পত্রিকা । বাংলার প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে এ পত্রিকা পৌঁছতো । এগুলো অধ্যয়ন করে জনসাধারণ স্বীয় পরিচয় ও স্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্ভাসিত হতো । মাওলানা আকরম খাঁর এতসব অবদান থাকা সত্ত্বেও তাঁর মৃত্যুর প্রায় তিনযুগ পরও তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে পরবর্তী প্রজন্ম তেমন কিছুই করতে পারেনি । যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এদিকে মনোযোগী হওয়া দরকার ।

Dhaka University Institutional Repository

এখন মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন। বর্তমান গবেষণাকর্মের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে মাওলানা ইসলামাবাদীর সামগ্রিক কর্মকান্ড ও চিন্তা-চেতনার মূল্যায়ন করতে যেয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, মাওলানা আকরম খাঁর মত তিনিও মাদ্রাসায় পড়াশুনা করার কারণে আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় ব্যাপক পারদর্শিতা অর্জন করেন। তবে কর্মজীবনে প্রবেশ করার পূর্বে তিনি বাংলা ও ইংরেজী তেমন একটা জানতেন না। অবশ্য স্বীয় পিতা পন্ডিত মতিউল্লার কাছ থেকে তিনি বাংলা ভাষায় খানিকটা পান্ডিত্য অর্জন করেন এবং পরবর্তীকালে সমসাময়িক পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বাস্তবতা উপলব্ধি করে প্রয়োজনের তাগিদে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে ব্যাপক পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর ইতিহাস ও সাহিত্য কর্মের দিকে তাকালেই এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তাছাড়া পরবর্তী জীবনে ইংরেজীতেও তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে, তাঁর রচিত 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা', 'ভারতে এছলাম প্রচার', 'আওরঙ্গজেব', প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ঐতিহাসিকের ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ বিষয়ক বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং তাঁদের বিকৃত তথ্য খন্ডন করে সঠিক ইতিহাস আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে তিনি নিজেকে একজন ঐতিহাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য তিনি ইংরেজীতে কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা করেছেন কি-না, তা বহু চেষ্টা করেও জানা যায়নি।

মাওলানা ইসলামাবাদীর প্রায় সবগুলো গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, এমনকি তাঁর সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলোও বাংলা ভাষায় রচিত ও সম্পাদিত। আরবী, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় তাঁর দখল থাকা সত্ত্বেও তিনি এ তিন ভাষায় কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। তবে মিশরে তদানীন্তন সময়ে আরবী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা 'আল্-মানার' বা 'আল্-মিনার', 'আল্-এহরাম' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি কখনও কখনও বিভিন্ন সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন বলে কোন কোন সূত্রে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এ ধরনের কোন নমুনা কপি বর্তমান গবেষকের নজরে পড়েনি। অবশ্য তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধে আরবী, ফার্সী শব্দ ও ভাষার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে তাঁর রচিত 'ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান' এবং 'খগোল শাস্ত্রে মুসলমান' গ্রন্থদ্বয় অধ্যয়ন

করলে এর সততা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তিনি উর্দু বিদ্বেষী ছিলেন, এমন কোন প্রমাণ আমাদের কাছে নেই।

প্রসঙ্গক্রমে একটি প্রশ্ন এসেই যায়– তাঁর প্রায় সবগুলো গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকা বাংলা ভাষায় রচিত ও সম্পাদিত হয়েছে কেন? এরকম প্রশ্ন মাওলানা আকরম খাঁর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। এর জবাবও প্রায় একই রকম, যা ইতোপূর্বে মাওলানা আকরম খাঁর আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মাওলানা আকরম খাঁর ন্যায় মাওলানা ইসলামাবাদীরও বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকা রচনা ও সম্পাদনার উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় মুসলিম জাগরণ। আর অধিকাংশ মানুষই বাংলা ভাষা-ভাষী বিধায় বাংলা ভাষার ব্যবহার ব্যতীত স্বীয় উদ্দেশ্য মোটেও পূর্ণ হতে পারে না। সুতরাং মাওলানা আকরম খাঁর ন্যায় তাঁর ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে যে, বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর জাগরণ ও কল্যাণসাধনই তাঁর বাংলা প্রীতির কারণ।

মাওলানা আকরম খাঁর মত মাওলানা ইসলামাবাদীও বাংলার রাজনীতি ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সাংবাদিকতায় তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী অবদান হচ্ছে আলিম সম্প্রদায়কে সাংবাদিকতায় যুক্ত করা এবং এভাবে সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশ ও সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করা। আর তাঁর ধারণা ছিল, আলিমগণ এক্ষেত্রে সম্পৃক্ত হলে সাধারণ মানুষ সহজে আকৃষ্ট হবে। ফলে মুসলিমদের মধ্যে স্বীয় ঐতিহ্য ও উপলব্ধি জাগ্রত হবে। কারণ তখনও আলিমদের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধাবোধ ছিল ব্যাপক। বলা বাহুল্য, মাওলানা ইসলামাবাদী এক্ষেত্রে অনেকটা সফল হয়েছিলেন। অসংখ্য পাঠক তাঁর সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা পাঠ করে স্বীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল। তারা সম্বিত ফিরে পেয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর অর্ধশতাব্দীরও বেশী সময় পরও তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে পরবর্তী প্রজন্ম দু'চারটি স্মরণিকা প্রকাশ এবং আনুসঙ্গিক কিছু কাজ ছাড়া তেমন কিছুই করতে পারেনি। পরবর্তী প্রজন্ম তথা ইসলামাবাদী ভক্তদের এদিকে আশু মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

এখন আমরা হাকিম হাবিবুর রহমান সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। বর্তমান অভিসন্দর্ভের সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে তাঁর সামগ্রিক কর্মকান্ড ও চিন্তা-চেতনার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, তিনিও মাওলানা আকরম খাঁ এবং মাওলানা ইসলামাবাদীর ন্যায় মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন বিধায় আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় ব্যাপক দক্ষতা অর্জন করেন। তাছাড়া তাঁর মাতৃভাষা ছিল উর্দু এবং উর্দুকে তিনি 'Lingua-Franca' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, এ কথা পূর্বেও বলা হয়েছে। তিনি বিদেশী হওয়ার কারণে বাংলা তেমন একটা চর্চা না করলেও ঢাকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ফলে বাংলার প্রভাব তাঁর ওপর একেবারে পড়েনি, এমনটি বলা যাবে না। তাছাড়া ইংরেজী আন্তর্জাতিক ভাষা হওয়ার কারণে এর প্রতিও তাঁর কম-বেশী আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। তবে তিনি সযতনে স্বীয় ঐতিহ্য ও আভিজাত্য অক্ষুণ্ন রেখেছেন এবং সব সময় তা রক্ষা করে চলেছেন।

হাকিম হাবিবুর রহমানের সবগুলো গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, এমনকি তাঁর সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলোও উর্দুভাষায় রচিত ও সম্পাদিত। আরবী ও ফার্সী ভাষায় পারদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও তিনি এসব ভাষায় কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়না। তিনি বাংলা এবং ইংরেজী বুঝতেন কিন্তু তেমন একটা চর্চা করতেন না। বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় তিনি কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধও রচনা করেননি। তবে তিনি বাংলা বা ইংরেজী বিদ্বেষী ছিলেন, এমনটিও ঠিক নয়। অবশ্য বাংলা ভাষায় পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি উৎসাহ যুগিয়েছেন, এরকম দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নয়। প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মাসিক গবেষণা পত্রিকা 'আল্ শেফা' প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

সঙ্গত কারণেই একটি প্রশ্ন এসে যায়– তাঁর যাবতীয় গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকা উর্দু ভাষায় রচিত ও সম্পাদিত হওয়ার কারণ কী? জবাবে বলা যায় যে, হাকিম হাবিবুর রহমানের মাতৃভাষা ছিল উর্দু। কাজেই ঢাকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও উর্দুর প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণের কোন ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়নি। বরং পুরো উনিশ শতক, এমনকি বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এদেশে, বিশেষ করে

পুরনো ঢাকায় উর্দু ভাষা ও সাহিত্য বনেদী মুসলিম পরিবারের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। কাজেই তদানীন্তন সময়ে পুরাতন ঢাকায় বসবাসকারী নবাব, জমিদার ও অন্যান্য খান্দানী পরিবার উর্দু ভাষা চর্চা করতেন। আর এঁদের সাথেই হাকিম হাবিবুর রহমানের উঠা-বসা ছিল প্রায় সার্বক্ষণিক। তাই তিনি উর্দু ভাষাতেই তাঁর যাবতীয় লেখা-রচনা সুসম্পন্ন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় মুসলিমদের সাথে বাংলা ও আসামের মুসলিমদের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং তিনি বিশ্বাস করতেন, উর্দু ভাষার মাধ্যমেই এটা সম্ভব। তাই বিশ শতকের শুরুতে ঢাকায় উর্দুকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

হাকিম হাবিবুর রহমানই সর্বপ্রথম ঢাকা থেকে 'আল্ মাশরিক' (প্রাচ্য) এবং 'জাদু' নামক দু'টি মাসিক উর্দু পত্রিকা পর পর প্রকাশ করেন। মূলতঃ তিনিই ছিলেন পূর্ববঙ্গ ও আসামে উর্দু সাংবাদিকতার পথিকৃৎ। ঢাকাসহ পূর্ববঙ্গ ও আসামের মুসলিম জনসাধারণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ উর্দু ভাষা-ভাষী হওয়ার কারণে এবং অন্যকোন উর্দু পত্রিকার অবর্তমানে হাকিম হাবিবুর রহমান সম্পাদিত উর্দু পত্রিকাদ্বয় এতদঞ্চলের উর্দু ভাষা-ভাষী জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাছাড়া পত্রিকাদ্বয়ে মুসলিম জাগরণমূলক লেখা ছাপা হতো বিধায় এর আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। তবে বাংলা ভাষা-ভাষী বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে এ পত্রিকাদ্বয় তেমন একটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

প্রায় পাঁচ যুগ হল হাকিম হাবিবুর রহমান মৃত্যুবরণ করেছেন। দেরীতে হলেও আশার কথা এই যে, তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম ও ভক্তবৃন্দ ২০০৪ সালে 'শেফাউল্ মুল্ক হাকীম হাবিবুর রহমান ফাউন্ডেশন' গঠন করে 'হাকীম হাবিবুর রহমান জন্মবার্ষিকী স্মারক' প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে হাকিম হাবিবুর রহমান বিষয়ক অনেক দুর্লভ তথ্য হয়তবা ভবিষৎ পাঠক-গবেষকের কাছে সহজলভ্য হবে।

বর্তমান গবেষণা-কর্ম সম্পর্কে আরও কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়, যা নিম্নরূপ:

প্রথমতঃ এটা সম্পূর্ণভাবে বাংলায় মুসলিম জাগরণের তিনজন মহান দিশারী মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর রহমানের ঐতিহ্য চেতনা, ইতিহাস সাধনা ও সমাজ সেবার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কেন্দ্রিক একটি পূর্নাঙ্গ গবেষণা কর্ম ।

দ্বিতীয়ত ঃ কতিপয় বাঙালী ঐতিহাসিককে নিয়ে ইতোপূর্বে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন লেখক কর্তৃক আলোচনা হলেও বর্তমান গবেষণাকর্মের অন্তর্ভূক্ত তিনজন মহান মনীষীর ঐতিহ্য চেতনা ও ইতিহাস চর্চা বিষয়ক পদ্ধতিগত ও বিস্তৃত বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা এটাই প্রথম ।

তৃতীয়ত ঃ বিশ শতকের প্রথমার্ধে তাঁরা তিনজনই নিজ নিজ অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং নিজস্ব কর্মকান্ড পরিচালনা করেছেন বিধায় এ সময়ে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মননশীলতার প্রেক্ষাপটে তাঁদের ইতিহাসকর্মসহ সামগ্রিক কর্মকান্ডের মূল্যায়ন করা হয়েছে ।

চতুর্থত ঃ একটি সুনির্দিষ্ট সময়কালের পরিসীমায় একজন ঐতিহ্য সচেতন ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক কিংবা সমাজ বিজ্ঞানীর চিন্তা-চেতনাকে ঐ সময়-কালের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিধারা প্রভাবিত করে থাকে । এঁদের তিনজনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি ।

পঞ্চমত ঃ বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা-ভারতের ইতিহাসের দু'টো মৌলিক বিষয় অবশ্যই স্মরণযোগ্য । যথাঃ ঔপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো এবং জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন । বর্তমান গবেষণাকর্মের অন্তর্ভূক্ত তিনজন মহান দিকপালের সামগ্রিক কর্মকান্ডেও উক্ত দু'টি বৈশিষ্ট্যের প্রভাব কমবেশী লক্ষনীয় ।

ষষ্ঠত ঃ উক্ত তিনজনের ইতিহাস সাধনা বিষয়ক কর্মকান্ডের প্রতি লক্ষ্য করলে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের ঐতিহ্য চেতনা, ইতিহাস অনুসন্ধান, গবেষণা ও অনুশীলন বাংলা বা ভারতীয় ইতিহাসের কোন বিশেষ যুগ,

শাসনামল বা শাসক প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে কদাচিৎ আবর্তিত হলেও তাঁদের সামগ্রিক গবেষণা এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন সূত্রে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কলম ধরেছেন। তবে একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, তাঁরা প্রত্যেকেই মুসলিম ঐতিহ্য সম্পর্কে ব্যাপকভাবে সচেতন ছিলেন এবং ইসলামের ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে তাঁরা মুসলিমদেরকে স্বীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করার সার্বিক চেষ্টা অব্যাহত রাখেন, যা বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তাঁদের অভিন্ন লক্ষ্য ছিল-বাংলায় মুসলিম জাগরণ।

বর্তমান গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত উৎস গ্রন্থ, তথ্য-উপাত্ত ও উপাদানসমূহকে প্রধানত: তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত: মৌলিক উপাদান। গবেষণাকর্মের অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিত্রয়ের লেখা সকল গ্রন্থ, পুস্তিকা, সভাসমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতা বা অভিভাষণ, সাক্ষাৎকার, ব্যক্তিগত ডায়েরী, স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী, তাঁদের লেখা চিঠি-পত্র ইত্যাদি এ পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত। দ্বিতীয়তঃ এ তিনজন মহান দিশারী সম্পর্কে অন্যান্য লেখকগন কর্তৃক লিখিত পুস্তক, পুস্তিকা, প্রবন্ধ, আলোচনা, জীবনীগ্রন্থ, স্মারকগ্রন্থ, স্মৃতিচারণ প্রভৃতি। তৃতীয়তঃ ঐতিহ্য চেতনা, ইতিহাস চর্চা, ইতিহাসতত্ত্ব, ইতিহাস দর্শন, রাজনীতি, সাহিত্য চর্চা, সাংবাদিকতা, সমাজ সেবা ইত্যাদি সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা তথা বাংলা-ভারত ও ইউরোপের পন্ডিতদের রচিত বহুমাত্রিক গ্রন্থাবলী, যেগুলোতে প্রসঙ্গক্রমে উক্ত তিনজন সম্পর্কেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে কম-বেশী আলোচনা রয়েছে অথবা তাঁদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত প্রায় সকল প্রকার উপাদানই বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় রচিত। তবে এদের কিছু কিছু তথ্য-উপাদান উর্দুতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

পরিশেষে আরও কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করা জরুরী মনে করছি। প্রথমত: বর্তমান গবেষণাকর্মের অন্তর্ভূক্ত তিনজন মহান ব্যক্তিত্বই ছিলেন 'আলিম' ও 'মাওলানা'। কিন্তু আমরা দুই জনের নামের পূর্বে 'মাওলানা' শব্দটি ব্যবহার করলেও

অন্যজনের ক্ষেত্রে তা করিনি। বরং ইউনানী শাস্ত্রে তাঁর ব্যাপক পারদর্শিতা ও অবদানের জন্য তাঁর নামের পূর্বে 'হাকিম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এতে ভুল বুঝাবুঝির কোন সুযোগ নেই।

দ্বিতীয়তঃ মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর নামের দুটি শব্দের বানানেও তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি নিজে লিখতেন 'মনিরুজ্জমান'। কিন্তু সাধারন্যে তিনি পরিচিত ছিলেন 'মনিরুজ্জামান' হিসেবে। তাই আমরা এটিকেই প্রাধান্য দিয়েছি এবং বর্তমান গবেষণাকর্মের সংশ্লিষ্ট সকল স্থানে 'মনিরুজ্জামান' লিখেছি। অন্যদিকে, তাঁর নামের শেষে উপাধি হিসেবে তিনি কখনও লিখতেন 'এছলামাবাদী', আবার কখনও 'এসলামাবাদী'। তবে সাধারন্যে তিনি পরিচিত ছিলেন 'ইসলামাবাদী' হিসেবে। তাই আমরা 'ইসলামাবাদী' শব্দটিই বেছে নিয়েছি।

তৃতীয়তঃ ঐতিহ্য চেতনা ও ইতিহাস সাধনা পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। অন্যকথায় ইতিহাসের ভালো দিকগুলো ঐতিহ্যের অন্তর্ভূক্ত বিধায় ঐতিহ্য সচেতনতা মানুষকে ইতিহাস প্রেমিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে সহযোগিতা করে। একের সাথে অন্যের সম্পর্ক এমনই নিবিড় যে, পরস্পরকে আলাদা করে আলোচনা করা বেশ কঠিন। তাই দেখা যাবে যে, বর্তমান গবেষণাকর্মের অন্তর্ভূক্ত তিনজন মহান দিশারীর ঐতিহ্য চেতনা ও ইতিহাস সাধনা বিষয়ক আলোচনাতে কখনও কখনও পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তাছাড়া সাহিত্য ইতিহাসের উপাদান হিসেবে বিবেচিত বিধায় এর সংমিশ্রণও অস্বাভাবিক নয়।

সর্বশেষে একটি কথা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে চাই যে, ইতিহাসে যেহেতু শেষ সিদ্ধান্ত বলে কিছু নেই, সেহেতু ইতিহাস চর্চার দ্বার সবসময় সকলের জন্যই উন্মুক্ত। কাজেই বর্তমান গবেষক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে গবেষণা- কর্মের সূচনা করলেন, ভবিষ্যৎ গবেষকগণ তা আরও ব্যাপক এবং পূর্ণাঙ্গ ভাবে সম্মুখপানে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এখানেই শেষ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : ১

মাওলানা আকরম খাঁর বংশ লতিকা

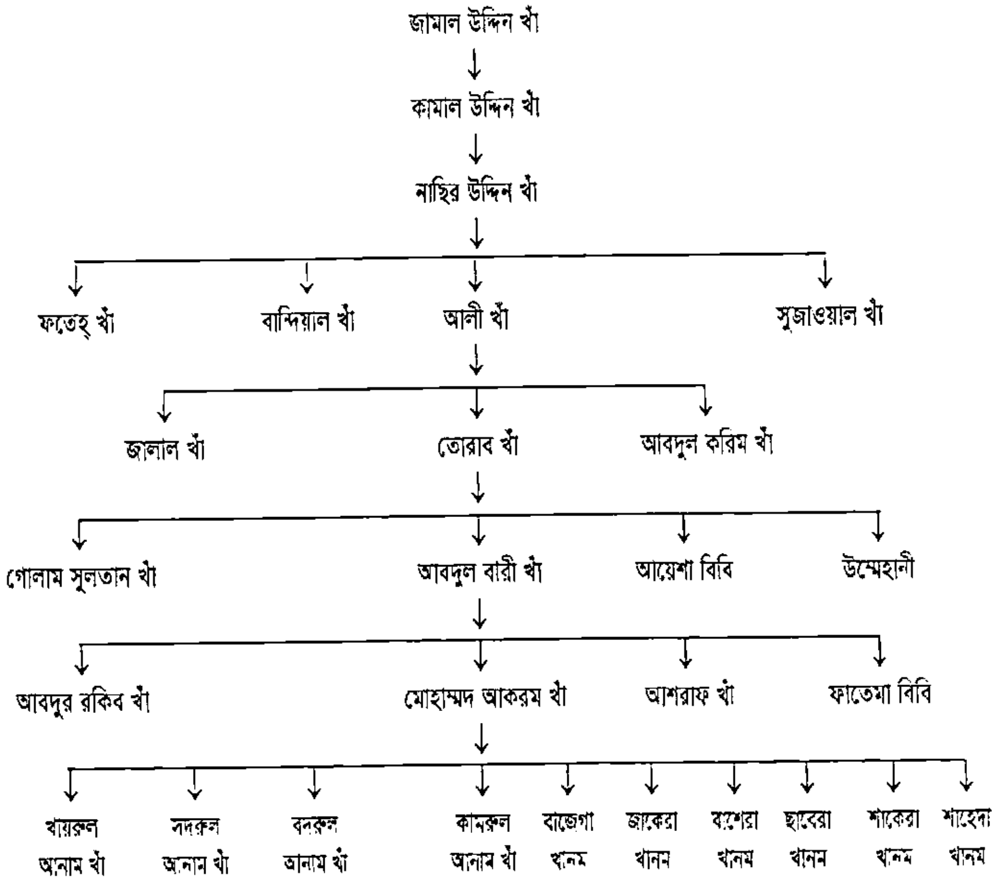

সূত্র : লাহোর হতে ২৩ ডিসেম্বর ১৯২২ সালে প্রকাশিত উর্দু দৈনিক 'নকুশ' পত্রিকা অবলম্বনে দৈনিক আজাদ, ১৮ আগষ্ট ১৯৯৪ সংখ্যায় প্রকাশিত ।

সহ দ্রষ্টব্য: আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌র পি.এইচ-ডি থিসিস 'বাংগালী মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা আকরম খাঁ-র অবদান', ঢা. বি. ১৯৯৭, (অপ্রকাশিত), পরিশিষ্ট-৭; এ.টি.এম. আতিকুর রহমান, বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৯০৫-১৯৪৭), ঢাকা, ১৯৯৫, পরিশিষ্ট-১, পৃঃ ১২৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : ২

মাওলানা ইসলামাবাদীর বংশ লতিকা

সৈয়দ ফতেহ্ শাহ (ফতেহ্ খান)

↓

আদিল মোহাম্মদ খান (আকেল মোহাম্মদ তরফদার)

↓

আমির মোহাম্মদ তালুকদার

↓

খোসনে মোহাম্মদ (খোশ্হাল মোহাম্মদ তরফদার)

↓

খান মোহাম্মদ পন্ডিত

↓

- ফাজর আলী পন্ডিত
- মুনশী মতিউল্লাহ্ পন্ডিত
- আব্দুল জলিল

মুনশী মতিউল্লাহ্ পন্ডিত

↓

- মফিজুল্লাহ্
- হাকিমুল্লাহ্
- মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী
- বশিরুল্লাহ্
- মনিরুন্নেছা

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী

↓

- শামসুজ্জামান ইসলামাবাদী
- কামরুজ্জামান ইসলামাবাদী
- আহমদ আজাদ ইসলামাবাদী
- মো: শাহজাহান ইসলামাবাদী
- বদরুল আলম আজাদ ইসলামাবাদী
- বদরুন্নেছা ইসলামাবাদী

সূত্র : মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ১৫ অবলম্বনে ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : ৩

হাকিম হাবিবুর রহমানের বংশ লতিকা

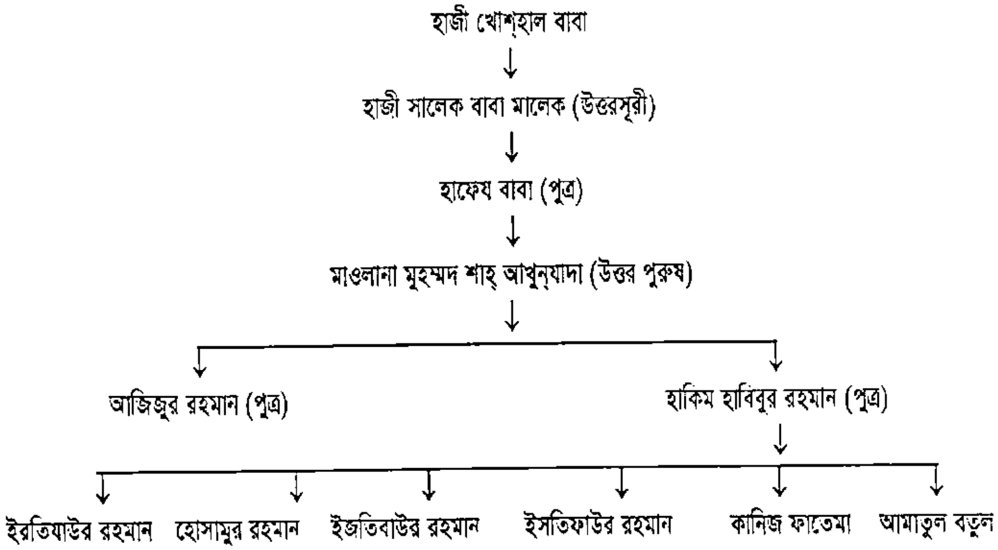

সূত্র : মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, হাকীম হাবীবুর রহমান, ঢাকা, ১৯৮১, পৃঃ ১-২; শেফাউল্-মুল্ক হাকীম হাবিবুর রহমান জন্মবার্ষিকী স্মারক-২০০৪, পৃঃ ৬-৯; ত্রৈমাসিক আল্-হাকীম, বর্ষ ১৪ সংখ্যা ১ : জানুয়ারী-মার্চ ২০০৪, পৃঃ ৯-১১ ইত্যাদি অবলম্বনে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

১. বাংলা ও উর্দু :

(ক) অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ ও পাণ্ডুলিপি:

১. আব্দুল্লাহ, আবুল কালাম মুহাম্মদ : বাংগালী মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা আকরম খাঁর অবদান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৭ (ঢাঃ বিঃ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত)।

২. আলমগীর, মোঃ : বাংলার মুসলিমদের সমাজ জীবনে ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৯ (ঢাঃ বিঃ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত)।

৩. আহমদ, মুহাঃ মুস্তাক : শায়খুল ইসলাম সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানী : জীবন ও কর্ম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ২০০০ (ঢাঃ বিঃ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত)।

৪. আমীন, মুহাম্মদ রুহুল : বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফীদের ভূমিকা (১৭৫৭-১৮৫৭), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৬ (ঢাঃ বিঃ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত)।

৫. ইসলাম, এম. নূরুল : বাঙালীর ইতিহাস চর্চার ধারা (১৯০১-১৯৫০), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৫ (ঢাঃ বিঃ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত)।

৬. নাহার, শামসুন : বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে সংবাদ-সাময়িক পত্রের ভূমিকা (১৯০৬-৪৭), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ২০০২ (ঢাঃ বিঃ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত)।

৭. বাকী, মুহাম্মদ আবদুল : বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা (১৮০১-১৯৭১), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৩ (ঢাঃ বিঃ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত)।

Dhaka University Institutional Repository

৮. মামুন, মুনতাসীর উদ্দিন খান : পূর্ব বঙ্গের সমাজ জীবনের কয়েকটি দিক : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৮৫৭-১৯০৫), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ১৯৮২ (ঢাঃ বিঃ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত)।

৯. হক, আবুল মাছাকিন মোহাম্মদ আনোয়ারুল : রাজনীতি ও সমাজ সেবায়- বাংলাদেশী আলিমগণের ভূমিকা (১৯৩৫-৭১), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ২০০১ (ঢাঃ বিঃ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত)।

১০. হোছাইন, এ. এইচ. এম. মুজতবা : শায়খুল হিন্দ মাহ্‌মুদ হাসান ও তাঁর রাজনীতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৮ (ঢাঃ বিঃ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত)।

১১. হক, এ, কে, এম, আমিনুল : ঢাকায় উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যের চর্চা (১৯০১-১৯৭১), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম,ফিল ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ২০০০ (ঢাঃ বিঃ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত)।

১২. এছলামাবাদী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান : আত্মজীবন (এ পাণ্ডুলিপিখানা জনাব শামসুজ্জামান খানের নিকট সংরক্ষিত ছিল। বর্তমান গবেষক তা ব্যবহার করেছেন)।

১৩. রহমান, হাকিম হাবিবুর : সালাসা- গাস্‌সালাহ্‌, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত।

(খ) <u>প্রকাশিত গ্রন্থাবলীঃ</u>

১. আবদুল্লাহ্‌, মুহাম্মদ : নওয়াব সলীমুল্লাহ : জীবন ও কর্ম, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬।

২. আবদুল্লাহ্‌, ডঃ মুহাম্মদ : ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ : হাকীম হাবীবুর রহমান, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১ ।

৪. আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ : মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ ।

৫. আবদুল্লাহ্, মুহাম্মদ : মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ ।

৬. আবদুল্লাহ্, মুহাম্মদ : স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ'র ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, ঢাকা, ১৯৮২ ।

৭. আবদুল্লাহ্, মুহাম্মদ : মুসলিম সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্রে ধর্ম ও সমাজ চিন্তা (১৯০১-১৯৪৭), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫ ।

৮. আবদুল্লাহ্, ড. মুহাম্মদ : আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাঙলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী (১৮৫৭-১৯৪৭), ঢাকা, কামিয়াব প্রকাশন, এপ্রিল ২০০০ ।

৯. আবদুল্লাহ্, ড. মুহাম্মদ : মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ ।

১০. আবদুল্লাহ্, ড. মুহাম্মদ : রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ ।

১১. আবদুল্লাহ্, ড. মুহাম্মদ : বাংলাদশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ ।

১২. আযম, খাজা মুহাম্মদ : ইসলামী পঞ্চায়েত ঢাকা, কলকাতা, নুসরাতুল ইসলাম প্রেস, ১৯১১ ।

১৩. আযীম, ইকবাল : মাশরিকী বাংগাল-মে-উর্দু, ঢাকা, মাশরিক কো-অপারেটিভ পাবলিশার্স, ১৯৫৪ ।

১৪. আল্-গালিব, মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ : আহ্‌লে হাদীস আন্দোলন, রাজশাহী, হাদীস ফাউন্ডেশন, ১৯৯৬ ।

১৫. আলম, জাফর : স্মরণীয়-বরণীয়, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. আলম, মাহবুবুল : চট্টগ্রামের ইতিহাস, ১ম খন্ড, চট্টগ্রাম, ১৯৬৭ ।

১৭. আলী, সৈয়দ মুর্তাজা : কালের কথা, চট্টগ্রাম, ১৯৬৮ ।

১৮. আলী, শাহেদ : বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান, চট্টগ্রাম, জিলা কাউন্সিল, ১৯৬৫ ।

১৯. আহমদ, ডঃ ওয়াকিল : উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ১ম ও ২য় খন্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩ ।

২০. আহমদ ওয়াকিলঃ বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী, (১৭৫৭-১৮০০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫ ।

২১. আহমদ, আবুয্‌যোহা নূর : উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫ ।

২২. আহমদ, আবুল মনসুর : আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫ (খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৫) ।

২৩. আহমদ, আলী (সংকলিত) : বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, ঢাকা, ১৯৮৫ ।

২৪. আহমদ, কামরুদ্দীন : পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ ।

২৫. আহমদ, কামরুদ্দীন : বাংলায় মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, ২য় খন্ড, ঢাকা, ১৩৮২ ।

২৬. আহমদ, সালাহ্ উদ্দীন : বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১ ।

২৭. আহমদ, সালাহ্ উদ্দীন : আমাদের রেনেসাঁ ভাবনা, ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ৩ জুন, ২০০১ ।

২৮. আহমদ, সুফিয়া : বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় : ১৮৮৪-১৯১২ (সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ অনূদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০২ ।

২৯. আজাদ, মাওলানা আবুল কালাম : ভারত যখন স্বাধীন হচ্ছিল (মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ কর্তৃক অনূদিত), ঢাকা, ১৯৭৯ ।

৩০. আনিসুজ্জামানঃ মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, ঢাকা, ১৯৬৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩১. আনিসুজ্জামানঃ মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৪ ।

৩২. ইউসুফ, মনির উদ্দীন : উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮ ।

৩৩. ইসলাম , সিরাজুল (সম্পাদিত) : বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ১ম, ২য় ও তৃতীয় খন্ড, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩ ।

৩৪. ইসলাম, সিরাজুল (প্রধান সম্পাদক) : বাংলাপিডিয়া (১-১০ খণ্ড), ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ ।

৩৫. ইসলাম, আজ্হার : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, ঢাকা, ১৯৬৯ ।

৩৬. ইসলাম, মুস্তাফা নূর উল্ : সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত (১৯০১-১৯৩০), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ ।

৩৭. ইসলাম, হাকীম হাফেজ আজীজুল : ইউনানী চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ঢাকা-১২১১, শেফা দাওয়াখানা ইউনানী, ২০০১ ।

৩৮. উমর, বদরুদ্দীন : বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, কলকাতা, ১৯৮৭ ।

৩৯. উমর, বদরুদ্দীন : ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৭ ।

৪০. উমর, বদরুদ্দীন : সংস্কৃতির সংকট, ঢাকা, ১৯৬৭ ।

৪১. উদ্দীন, মুহম্মদ মনসুর : বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ঢাকা, ১৯৬৫ ।

৪২. উল্লাহ্, মোহাম্মদ ওয়ালি : আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮ ।

৪৩. উল্লাহ্, মোহাম্মদ ওয়ালি : যুগ বিচিত্রা, ঢাকা, ১৯৬৭ ।

৪৪. উল্লাহ্, মোহাম্মদ মাহফুজ : মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ ।

৪৫. এছলামাবাদী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান : আত্মজীবন (শামসুজ্জামান খান : ভূমিকা ও সম্পাদনা), ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০০৪ ।

৪৬. এছলামাবাদী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান : ভারতে মুসলমান সভ্যতা, কলিকাতা, ১৯১৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪৭. এছলামাবাদী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান : তুরস্কের সুলতান, কলিকাতা, রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস, ১৯০১ ।

৪৮. এছলামাবাদী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান : খাজা নেজামুদ্দীন আওলিয়া, কলিকাতা, ১৩২৩/১৯১৬ ।

৪৯. ওদুদ, কাজী আবদুল : শাশ্বত বঙ্গ, কলিকাতা, ১৩৫৮ ।

৫০. কায়কোবাদ : মহাশ্মশান, ১৯০৪

৫১. কাদির, আবদুল : ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচনাবলী, ঢাকা, বাংলা উন্নয়নবোর্ড, ১৯৬৭ ।

৫২. কাদির, আবদুল (সম্পাদিত) : মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, ঢাকা, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৬ ।

৫৩. করিম , মোঃ রেজাউল (অনূদিত) : ঢাকা ঃ পচাস্ বরস্ পহ্লে, (ঢাকা ঃ পঞ্চাশ বছর আগে), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ১৯৯৫

৫৪. কিসমতী, জুলফিকার আহমদ : বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখ (১ম ও ২য় খণ্ড), ঢাকা, প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৮৮ ।

৫৫. কুরায়শী, জামাল-উল্ : সুর্‌রাহ্, কলকাতা, ১২৪৫ হিঃ ।

৫৬. খন্দকার, আবদুর রহিম : টাংগাইলের ইতিহাস, টাংগাইল, ১৯৮৬ ।

৫৭. খাঁ, মোহাম্মদ আকরম : মোস্তফা চরিত, কলকাতা, ১৯২৫ (ঢাকা, ২০০০) ।

৫৮. খাঁ, মোহাম্মদ আকরম : মোস্তফা-চরিতের বৈশিষ্ট্য, কলকাতা, ১৯৩১ ।

৫৯. খাঁ, মোহাম্মদ আকরম : মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ঢাকা, ঢাকেশ্বরী রোড, ১৯৬৫ ।

৬০. খাঁ, মোহাম্মদ আকরম : বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম, ঢাকা, ১৯৬২ ।

৬১. খাঁ, মোহাম্মদ আকরম : তাফছীরুল কোরআন, ১ম খন্ড, ঢাকা, ঢাকেশ্বরী রোড, ১৯৫৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

৬২. খাঁ, মোহাম্মদ আকরম : তাফছীরুল কোরআন, ২য় খন্ড, ঢাকা, ঢাকেশ্বরী রোড, ১৯৫৯ ।

৬৩. খাঁ, মোহাম্মদ আকরম : তাফছীরুল কোরআন, ৩য় খন্ড, ঢাকা, ঢাকেশ্বরী রোড, ১৯৫৯ ।

৬৪. খাঁ, মোহাম্মদ আকরম : তাফছীরুল কোরআন, ৪র্থ খন্ড, ঢাকা, ঢাকেশ্বরী রোড, ১৯৫৯ ।

৬৫. খাঁ, মোহাম্মদ আকরম : তাফছীরুল কোরআন, ৫ম খন্ড, ঢাকা, ঢাকেশ্বরী রোড, ১৯৬০ ।

৬৬. খান, নওয়াব আবদুল লতীফ : মুসলিম বাংলা : আমার যুগে (অনুবাদ : আবু জাফর শামসুদ্দীন), ঢাকা, বাংলা একাডমী, ১৯৬৮ ।

৬৭. খান, মোশাররফ হোসেন : মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন, ২০০২ ।

৬৮. খান, আব্বাস আলী : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন ২০০২ ।

৬৯. খান, মুহিউদ্দীন (অনূদিত) : আযাদী আন্দোলন, ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৪ ।

৭০. খান, শামসুজ্জামান : মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮ ।

৭১. খান, শামসুজ্জামান (সম্পাদিত) : চরিতাভিধান, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ ।

৭২. গঙ্গোপাধ্যায়, সৌম্যেন্দ্র : স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৮১ ।

৭৩. গফুর, অধ্যাপক আবদুল (সম্পাদিত) : আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঢাকা, জ্ঞান বিতরণী, ২০০১ ।

৭৪. ঘোষ, বিনয় : সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ৩য় ও ৪র্থ খন্ড, কলকাতা, ১৯৬৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

৭৫. ঘোষ, বিনয় : বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ (৩ খন্ড একত্রে), কলকাতা, ১৯৭৩।

৭৬. ঘোষ, ডা. নরেশ চন্দ্র : চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন, কলকাতা, ১৩৭৮।

৭৭. চক্রবর্তী, অজিত কুমার : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলকাতা, ১৯৭১।

৭৮. চৌধুরী, আবদুল হক : চট্টগ্রামের চরিতাভিধান, চট্টগ্রাম, ১৯৭৯।

৭৯. চৌধুরী, আবদুল হক : শহর চট্টগ্রামের ইতিকথা, ঢাকা, কথামালা প্রকাশন, ১৯৮৫।

৮০. জলীল, এ, এম, এম, আবদুল : দেওবন্দ আন্দোলন একটি জিহাদ, ঢাকা, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৩।

৮১. জাফর, আবু (সম্পাদিত): মাওলানা আকরম খাঁ, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬।

৮২. জামান, ড. হাসান : সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য : ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০।

৮৩. জামাল, ছৈয়দ মোস্তফা (সম্পাদিত): মওলানা ইসলামাবাদী, চট্টগ্রাম, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০।

৮৪. জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ : মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ঢাকা, ১৯৮৭।

৮৫. তালিব, আবদুল মান্নান : বাংলাদেশে ইসলাম, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০।

৮৬. তায়েশ, মুন্সী রহমান আলী : তাওয়ারীখ-এ-ঢাকা, ঢাকা, ষ্টার অব ইন্ডিয়া প্রেস, ১৯১০।

৮৭. দত্ত, অমর : ডিরোজিও ও ডিরোজীয়ান্‌স্‌, কলকাতা, ১৯৭৩।

৮৮. দে, অমলেন্দু : পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক, কলকাতা, ১৯৭২।

৮৯. দে, ড. সুনীল কান্তি : আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও মুসলিম সমাজ, কোলকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯২।

৯০. নাসিরুদ্দীন, মোহাম্মদ : বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, ঢাকা, ১৯৮৫।

৯১. পন্ডিত, দিলীপ : বাংলাদেশে খ্রীস্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস, কুমিল্লা, ১৯৮৫।

৯২. ফজল, আবুল : রেখাচিত্র, চট্টগ্রাম, ১৯৬৮ ।

৯৩. ফারুকী, আশ্রাফ (সম্পাদিত) : কোরআনে স্বাধীনতার বানী, চট্টগ্রাম, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০ ।

৯৪. বন্দোপাধ্যায়, অজিত কুমার : শংকরীপ্রসাদ বসু ও শংকর, কলকাতা, বিশ্ব-বিবেক, ১৯৫৩ ।

৯৫. বাগল, যোগেশচন্দ্র (সম্পাদিত) : বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড, কলকাতা, ১৯৬৯ ।

৯৬. বিশী, প্রমথ নাথ (সম্পাদিত) : ভূদেব রচনাসম্ভার, কলকাতা, ১৯৬৮ ।

৯৭. মওদূদ, আবদুল : ওহাবী আন্দোলন, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৫ ।

৯৮. মওদূদ, আব্দুল : সিপাহী বিপ্লবের পটভূমিকা, ঢাকা, শতাব্দী পরিক্রমা, ২০০২ ।

৯৯. মওদূদ, আব্দুল : মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সাংস্কৃতিক রূপান্তর, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ ।

১০০. মকসুদ, সৈয়দ আবুল : জীবনী গ্রন্থমালা-১, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭ ।

১০১. মজুমদার, রমেশ চন্দ্র : বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৫ ।

১০২. মান্নান, মুহাম্মদ সিরাজ : বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলিল, ঢাকা, ১৯৮৮ ।

১০৩. মান্নান, কাজী আবদুল : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ঢাকা, ১৯৬১ ।

১০৪. মামুন, মুনতাসির (সম্পাদিত) : বঙ্গভঙ্গ, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮১ ।

১০৫. মাশ্রিকী পাকিস্তান-কে-উর্দু আদীব, করাচী, পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৫১ ।

Dhaka University Institutional Repository

১০৬. মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ : বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৮ ।

১০৭. মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ : আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭০ ।

১০৮. মনিরুজ্জমান, মৌলানা মোহাম্মদ : আদি ইতিহাস, (কদম মোবারক এতিমখানার উদ্বোধনী সভায় পঠিত এবং পরে দৈনিক আজাদী-তে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত), চট্টগ্রাম, ১৮ জানুয়ারী, ১৯৩১ ।

১০৯. মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত) : মৌলানা মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ ।

১১০. মুখোপাধ্যায়, শ্যামা প্রসাদ : পঞ্চাশের মন্বন্তর, কলকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ ।

১১১. মোস্তফা, কবি গোলাম : বিশ্বনবী, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৮ ।

১১২. মোস্তফা, কবি গোলাম : বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৩ ।

১১৩. মিয়া, ড. মুহাম্মদ মজির উদ্দীন : বাংলা সাহিত্যে রসূল চরিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ ।

১১৪. রহমান, আবদুর : যতটুকু মনে পড়ে, চট্রগ্রাম, ১৯৭২ ।

১১৫. রহমান, এ.টি.এম. আতিকুর : বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৯০৫-১৯৪৭), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫ ।

১১৬. রহমান, হাকীম আলতাফুর : মওলানা ইসলামাবাদীর আরবী বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা, চট্টগ্রাম, তাঃ বিঃ ।

১১৭. রহমান, হাকীম আলতাফুর : মওলানা ইসলামাবাদী, চট্রগ্রাম, ১৯৬৯ (পুনঃ মুদ্রণ ১৯৮০) ।

১১৮. রহমান, হাকিম হাবিবুর : আসূদেগান-এ-ঢাকা, ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৪৬ ।

১১৯. রহমান, হাকিম হাবিবুর : হায়াত-এ-সুক্রাত, আগ্রা, কাদেরী প্রেস, ১৩২২ হিঃ/ ১৯০৪খ্রীঃ ।

Dhaka University Institutional Repository

১২০. রহমান, হাকিম হাবিবুর : ঢাকা পচাস্ বরস্ পহ্লে, লাহোর, কিতাব মঞ্জিল, ১৯৪৯ ।

১২১. রহমান, হাকিম হাবিবুর : ঢাকা পাচাস্ বারাস্ পাহ্লে (হাশেম সূফী অনূদিত), ঢাকা, ঢাকা ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৫ ।

১২২. রহমান, ড. মুজিবুর : বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ ।

১২৩. রহমানী, ইশ্রাত : উর্দু ড্রামা-কা- ইরতিকা, লাহোর, ১৯৬৮ ।

১২৪. রাজ্জাক, মোঃ আবদুর : বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জী, ৪র্থ খন্ড, ঢাকা, ১৯৮৫ ।

১২৫. রহিম, মুহম্মদ আবদুর : বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ ।

১২৬. রহিম, মুহম্মদ আবদুর : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭) ঢাকা, ১৯৭৬ ।

১২৭. শামসুদ্দীন, আবুল কালাম : অতীত দিনের স্মৃতি, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮ ।

১২৮. শামসুদ্দীন, আবুল কালাম : দৃষ্টিকোন, ঢাকা, ১৩৭৪ ।

১২৯. শামসুদ্দীন, আবু জাফর : আত্ম স্মৃতি (১), ঢাকা, ১৯৮৯ ।

১৩০. সম্পাদনা পরিষদ (সম্পাদিত) : ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খন্ড, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ ।

১৩১. সম্পাদনা পরিষদ (সম্পাদিত) : ইসলামী বিশ্বকোষ, ৭ম খন্ড, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ ।

১৩২. সম্পাদনা পরিষদ : হাকীম হাবিবুর রহমান জন্মবার্ষিকী স্মারক, ঢাকা, শেফাউল মূল্ক হাকীম হাবিবুর রহমান ফাউন্ডেশন, ২০০৪ ।

১৩৩. সিদ্দিকী, রেজোয়ান : পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৪. সেন, ভবানী : নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, ২য় খন্ড, কলকাতা, ১৯৭৭ ।

১৩৫. সেনগুপ্ত, সুবোধ চন্দ্র (সম্পাদিত): সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬ ।

১৩৬. সোবহান, শেখ আবদোস : হিন্দু-মোসলমান, কলিকাতা, ভিক্টরিয়া প্রেস, ১৮৮৮ ।

১৩৭. হক, মুহম্মদ এনামুল : মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৫ ।

১৩৮. হক, মুহাম্মদ ইনাম-উল : ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ ।

১৩৯. হক, মোহাম্মদ সেরাজুল : সিরাজী চরিত, কলিকাতা, হিন্দুস্থান প্রিন্টার্স, ১৯৩৫ ।

১৪০. হাই, মুহম্মদ আবদুল ও সৈয়দ আলী আহসান : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চট্টগ্রাম, ১৯৬৯ ।

১৪১. হায়াৎ, অনুপম : সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৫ ।

১৪২. হামিদ, দেওয়ান আবদুল : মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ঢাকা, ১৯৭০ ।

১৪৩. হেলাল, নাসির : মুন্সী মহম্মদ মেহের উল্লা, ঢাকা, সুহৃদ প্রকাশন, ১৯৮৫ ।

১৪৪. হেলাল, বশীর আল্ : বাংলা একাডেমীর ইতিহাস, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬ ।

১৪৫. হেলাল, বশীর আল্ : ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ ।

১৪৬. হোসেন, ড. ইমরান : বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম (১৯০৫-১৯৪৭), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৩ ।

১৪৭. হোসেন, শওকত আরা : বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা (১৯২১-১৯৩৬) : অবিভক্ত বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০ ।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাসমূহ :

১. দৈনিক আজাদ, রজত জয়ন্তী সংখ্যা ।

২. দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ ।

৩. দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ৫ পৌষ, ১৩৪৩ ।

৪. দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ১৯ জুন, ১৯৫০ ।

৫. দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ২৪ অক্টোবর, ১৯৫৫.

৬. দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৬১ ।

৭. দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৭ জুন ১৯৬৮, বিশেষ সংখ্যা ।

৮. দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৭ই কার্ত্তিক, ১৩৭২ ।

৯. দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৭ই জুন, ১৯৮৯ ।

১০. দৈনিক আজাদ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৩৬ ।

১১. দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ২১ জুলাই, ১৯৪৩ ।

১২. দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ১১ই জুন, ১৯৪৭ ।

১৩. দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ ।

১৪. দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ১২ই পৌষ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ।

১৫. দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ ।

১৬. দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ১৫ই জুলাই, ১৯৪৭ ।

১৭. দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ২ জুলাই, ১৯৪৭ ।

১৮. দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ২২শে মার্চ, ১৯৩৮ ।

১৯. দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৬ ।

২০. দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ২৭শেষ আগষ্ট, ১৯৪২ ।

২১. দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ২৮শে জুলাই, ১৯৩৭ ।

২২. দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ৫ই জুন, ১৯৪৩ ।

২৩. দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ৫ই জুলাই, ১৯৪৫ ।

২৪. দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ১৯ জুন , ১৯৫৫ ।

২৫. দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ১৮ আগষ্ট, ১৯৮৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

২৬. দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৬ই জুন, ১৯৭৫ ।

২৭. দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৭ই নভেম্বর, ১৯৬২ ।

২৮. দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৭ই জুন, ১৯৭৫ ।

২৯. দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৭ই কার্ত্তিক, ১৩৭২ ।

৩০. ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ১ চৈত্র, ১৩২৬ ।

৩১. ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ১০ মার্চ ১৯১২ ।

৩২. ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ১২ই মার্চ, ১৯১০ ।

৩৩. ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ২৯শে চৈত্র, ১৩২০/১২ই এপ্রিল, ১৯১৪ ।

৩৪. ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ৩রা চৈত্র, ১৩১৩/১৭ই মার্চ, ১৯০৭ ।

৩৫. ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯২০ ।

৩৬. ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ৭ জানুয়ারী ১৯২৩ ।

৩৭. দৈনিক আজাদী, ৭ কার্ত্তিক, ১৩৭২ । ।

৩৮. দৈনিক আজাদী, ২৪ অক্টোবর, ১৯৬১.

৩৯. দৈনিক আজাদী, ৭ কার্ত্তিক, ১৩৭৯ ।

৪০. দৈনিক আজাদী, ৮ কার্ত্তিক, ১৩৬৮ ।

৪১. দৈনিক আজাদী, ২৪ অক্টোবর, ১৯৫৮ ।

৪২. দৈনিক ইন্‌কিলাব, ঢাকা, ১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ ।

৪৩. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯১ ।

৪৪. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ২৭ অক্টোবর ২০০০ ।

৪৫. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ ।

৪৬. দৈনিক ইনসাফ, ঢাকা, ১৬ই কার্তিক, ১৩৫৭ ।

৪৭. দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ১৯৫৪ ।

৪৮. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ২৬ অক্টোবর, ২০০০ ।

৪৯. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ৩ রা মার্চ, ২০০০ ।

৫০. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯ ।

৫১. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ১৭ জানুয়ারী, ১৯৭১ ।

Dhaka University Institutional Repository

৫২. আনন্দ বাজার, ২৭ অক্টোবর, ১৯৫০ ।

৫৩. ছোলতান, ১৭শ সংখ্যা, ২১ ভাদ্র, শুক্রবার ১৩৩০/৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ ।

৫৪. ছোলতান, ১৯শ সংখ্যা, ৪ আশ্বিন, ১৩৩০/২১ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ ।

৫৫. ছোলতান, ৫ পৌষ, ১৩৩০/২১শে ডিসেম্বর, ১৯২৩ ।

৫৬. সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, কলকাতা, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৯ ।

৫৭. সাপ্তাহিক ছোলতান, কলকাতা, ১১ই জানুয়ারী, ১৯২৪ ।

৫৮. সাপ্তাহিক আহলে হাদিস, কলকাতা, ২রা অক্টোবর, ১৯৩০ ।

৫৯. সাপ্তাহিক সওগাত, কলকাতা, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯২৮ ।

৬০. সাপ্তাহিক 'ছোলতান', নব পর্য্যায়, পৌষ ১৩৩০ ।

৬১. সওগাত, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৩ ।

৬২. সওগাত, ৫ম বর্ষ, ১১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৫ ।

৬৩. আল্ এস্লাম, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৯২৩ ।

৬৪. আল্-এস্লাম, ৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২৬/১৯১৯ সাল ।

৬৫. আল্-এসলাম, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ ।

৬৬. আল্-এসলাম, ১ম ভাগ, ষষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩২২ সাল ।

৬৭. আল্-এসলাম, ৩য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২৪ (১৯১৭) ।

৬৮. আল্-এসলাম, ৩য় ভাগ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২৪ ।

৬৯. আল্-এসলাম, ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩২৫ (১৯১৮) ।

৭০. আল্-এসলাম, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২৬ সাল ।

৭১. আল্-এসলাম, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩২৬ ।

৭২. আল্-এসলাম, ৫ম ভাগ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ ১৩২৬ ।

৭৩. আল্-এসলাম, ৫ম ভাগ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ন ১৩২৬ ।

৭৪. আল্-এসলাম, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২৭ ।

৭৫. আল্-এসলাম, ঢাকা, ২৩ মার্চ, ১৯৬৬ ।

৭৬. আল্-এছলাম, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ ।

৭৭. আল-এসলাম, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৭ ।

৭৮. আল-এসলাম, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২৫ ।

৭৯. আল-এসলাম, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ ১৩২৭ ।

৮০. আল্-মাশরিক , ঢাকা , মার্চ ১৯০৭ ।

৮১. আল্-মাশরিক, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, অক্টোবর, ১৯০৬ ।

৮২. 'আল্-মাশরিক', ঢাকা, নভেম্বর, ১৯০৬ ।

৮৩. জাদু, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ ।

৮৪. মিহির ও সুধাকর, ১ শ্রাবণ, ১৩১০ ।

৮৫. মিহির ও সুধাকর, ১২ আষাঢ়, ১৩০৯ ।

৮৬. মিহির ও সুধাকর, ৫ অগ্রহায়ণ, ১৩০১ ।

৮৭. মিহির ও সুধাকর, ৮ই পৌষ, ১৩০৬ ।

৮৮. নবনূর, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩১০ ।

৮৯. নবনূর, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ ।

৯০. নবনূর, ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩১২ ।

৯১. প্রচারক, মাঘ-ফাল্গুন, ১৩০৬ ।

৯২. ইসলাম-প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল, ১৯০৩ ।

৯৩. ইসলাম-প্রচারক, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩ ।

৯৪. ইসলাম-প্রচারক, জুলাই-আগষ্ট, ১৯০৩ ।

৯৫. ইসলাম প্রচারক, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১/১৯০৪ ।

৯৬. ইসলাম প্রচারক, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১১ সাল ।

৯৭. ইসলাম প্রচারক, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১১ ।

৯৮. ইসলাম প্রচারক, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩০৮ ।

৯৯. বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৭ ।

১০০. বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১১ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭৪ ।

১০১. মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক-১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, (নভেম্বর, ১৯২৭) ।

১০২. মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

১০৩. মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩৪ (১৯২৭)।

১০৪. মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৫।

১০৫. মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫।

১০৬. মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩৫ (১৯২৮)।

১০৭. মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ১২ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৩৫।

১০৮. মাসিক মোহাম্মদী, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৫।

১০৯. মাসিক মোহাম্মদী, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩৫।

১১০. মাসিক মোহাম্মদী, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৬।

১১১. মাসিক মোহাম্মদী, ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ (১৯৩০)।

১১২. মাসিক মোহাম্মদী, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৯ (১৯৩২)।

১১৩. মাসিক মোহাম্মদী, ৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪০ (১৯৩৪)।

১১৪. মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, কার্তিক-১৩৪১।

১১৫. মোহাম্মদী , ঈদসংখ্যা, কলকাতা, পৌষ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ।

১১৬. মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, ফাল্গুন, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ।

১১৭. মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

১১৮. মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

১১৯. মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ

১২০. মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, কার্তিক ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ।

১২১. মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

১২২. মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

১২৩. মাসিক মোহাম্মদী, ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

১২৪. মাসিক মোহাম্মদী, ঢাকা, আশ্বিন, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

১২৫. এলান, ডিসেম্বর, ২য় পক্ষ, ঢাকা, ১৯৫৫ ।

১২৬. এলান, ফেব্রুয়ারী, ২য় পক্ষ, ১৯৭১।

১২৭. দানিশ, ১ম খন্ড, ৩য় সংখ্যা, দিল্লী, ১৯৯০।

১২৮. মাসিক আহলে হাদিস, কলকাতা, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ (মাস উল্লেখ নেই)।

Dhaka University Institutional Repository

১২৯. মাসিক মাআরিফ, আযমগড়, ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪।

১৩০. মাসিক মাআরিফ, আযমগড়, এপ্রিল, ১৯৪৭।

১৩১. মাসিক শরীয়ত, ২য় বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৩২।

১৩২. মাসিক জাগরণ, ১মবর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, বৈশাখ ১৩৩৫।

১৩৩. মাহে নও, ঢাকা, মে-১৯৬৪।

১৩৪. মাহে নও, ঢাকা, আষাঢ়, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ (জুন, ১৯৬২)।

১৩৫. মাসিক বঙ্গ দর্শন, মার্চ ১৮৭৩।

১৩৬. ছুন্নত আল্-জামায়াত, ৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, ১৩৪৬/৪৭।

১৩৭. মাসিক 'আল-হাকীম', ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭।

১৩৮. ত্রৈমাসিক 'আল-হাকীম', জানুয়ারী-জুন, ১৯৯৯।

১৩৯. ত্রৈমাসিক 'আল্-হাকীম', জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৩।

১৪০. ত্রৈমাসিক 'আল্-হাকীম', জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৪।

১৪১. বার্ষিক মোহাম্মদী, কলকাতা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।

১৪২. বার্ষিক সওগাত, কলকাতা, ১৩৩৩।

১৪৩. সচিত্র বাংলাদেশ, ১৬ অক্টোবর, ঢাকা, ১৯৮০।

১৪৪. মাসিক মদীনা, ঢাকা, মার্চ, ১৯৮৬।

১৪৫. আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা, ঢাকা, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৫।

১৪৬. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মাঘ ১৩২৫।

১৪৭. ইতিহাস (বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা), বৈশাখ-শ্রাবণ, ঢাকা, ১৩৭৫।

১৪৮. ইতিহাস (বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা), ষড় বিংশতি বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ঢাকা, আগষ্ট ১৯৯৩ (ভাদ্র ১৪০০)।

১৪৯. ইতিহাস (বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা), পঁয়ত্রিশ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ঢাকা, ১৪০৮।

১৫০. ইতিহাস (বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০০০ সংখ্যা, ঢাকা, ১৪০৭ বাংলা।

Dhaka University Institutional Repository

১৫১. মিয়াজী, মোঃ আতাউর রহমান ঃ চিত্রকলার প্রতি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী ঃ একটি সমীক্ষা, নিবন্ধ মালা, দশম খন্ড, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৮ ।

১৫২. মিয়াজী, মোঃ আতাউর রহমান : মাওলানা আকরম খাঁর 'মোস্তফা-চরিত': কতিপয় দিক মূল্যায়ন, প্রবন্ধাবলী-৫, উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৫ ।

১৫৩. মিয়াজী, মোঃ আতাউর রহমান : 'সাংবাদিকতায় মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর অবদান', প্রবন্ধাবলী-৫, উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৫ ।

(ঘ) <u>ব্যক্তিগত ডায়েরী, ক্যাটালগ, স্মরণিকা, রিপোর্ট ইত্যাদিঃ</u>

১. ঢাকা খিলাফত কমিটির ট্রেজারার খাজা মওদূদের ডায়েরী, তাং- ১৭-১১-১৯২৩ ।

২. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, প্রথম ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা ১০৩৪, কলকাতা, ১৯৩১ ।

৩. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা ৬৭১, কলকাতা, ১৯৩২ ।

৪. সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংকলন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২ ।

৫. সংকলন 'পথিকৃৎ', বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৯৮৭ ।

৬. ৩৪-তম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত 'স্মরণিকা', বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ২০০৩ ।

৭. জামাল, ছৈয়দ মোস্তফা (সম্পাদিত), ১৬-তম স্মৃতি বার্ষিকী, ইসলামাবাদী স্মৃতি সমিতি, ঢাকা, ১৯৬৬ ।

৮. প্রসপেক্টাস, তিব্বিয়া হাবীবিয়া কলেজ, ঢাকা, তা.বি. ।

Dhaka University Institutional Repository

৯. আহমেদ, ইজাব উদ্দীন : মাওলানা ইসলামাবাদীর ১৬-তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনির, ঢাকা, ১৯৬৬।

১০. জামাল, সৈয়দ মোস্তফা (সম্পাদিত) : স্যুভেনির, ইসলামাবাদী স্মৃতি সমিতি, ঢাকা, ১৯৬৮।

১১. আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার জেনারেল সেক্রেটারীর পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট।

১২. আঞ্জুমানের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত রিপোর্ট, ১৯১৭।

১৩. পূর্ববঙ্গ ও আসাম শিক্ষা সমিতি রিপোর্ট, ১৯১০।

১৪. ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক কার্য বিবরণী, ঢাকা, ১৮৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইংরেজী :

(a) Theses and Manascripts unpublished:

1. Ahmed, Rana : Educational Progress of the Muslim Community in Bengal : 1911-1935, Dhaka, Dhaka University, 1996 (Ph. D. Thesis).
2. Ali, Md. Kased : Maulana Muhammad Akram Khan (1868-1968): His life and Works , Calcutta, University of Calcutta, 1989 (Ph. D. Thesis).
3. Huq, Md. Shamsul : Bibliography on the Works of Maulana Mohammad Akram Khan, Dhaka, Dhaka University, 1961 (M.Phil Thesis).
4. Karim, Abul Khair Nazmul : Changing Society: Indian Transition and East Pakistan Today : A study in Social Stratification, Dhaka, Dhaka University (Ph.D. Thesis).
5. Khan, Muin-ud-Din Ahmad : A History of the Faraidi Movement in Bengal (Down to A.D. 1906), Dhaka, Dhaka University, 1960 (Ph. D. Thesis).
6. Latif, Muhammad Abdul : The Role of the Ulama in Bengal Politics (1906-1947), Dhaka, Dhaka University, 1997 (Ph. D. Thesis).

Dhaka University Institutional Repository

(b) Books:

1. Abedin, A.K. Zainul : Memorable Speeches of Shere-e-Bangla, Barisal, 1978.
2. Adam, W : Education Report, 1335-38, Calcutta, 1911.
3. Ahmad, Kamruddin : A Socio-Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh, Dacca, 1975.
4. Ahmad, Mohiuddin : Saiyid Ahmad : His Life and Mission, Lucknow, Academy of Islamic Research and Publications, DNF.
5. Ahmed, A. F. Salahuddin : Social Ideas and Social Change in Bengal (1818-1835), Leiden, 1965.
6. Ahmed, Kamruddin : A Social History of Bengal, Dacca, 1970.
7. Ahmed, Kamruddin : The Social History of East Pakistan, Dacca, Pioneer Press, 1967.
8. Ahmed, Rafiuddin : The Bengal Muslim 1871-1906: A Quest for Identity, Delhi, Oxford University Press, 1981.
9. Ahmed, Sufia : Muslim Community in Bengal (1884-1912), Dacca, 1974.
10. Ali, Dr. A. K. M. Ayub and Others (ed.) : Islam in Bangladesh Through Ages, Dhaka, Islamic Foundation Bangladesh, 1995.
11. Ali, Muhammad Mohar : The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities (1833-1857), Chittagong, 1965.

Dhaka University Institutional Repository

12. Ali, S. M. : History of Chittagong, Chittagong, 1964.
13. Ali, Syed Ameer : Memorial of the National Mahomedan Association, Calcutta, 1882.
14. Ali, Syed Ameer : The Spirit of Islam, London, 1955.
15. Arnold, Thomas : The Preaching of Islam, Lahore, 1956.
16. Azad , Abul Kalam : India Wins Freedom, Bombay, Orient Longmans, 1959.
17. Azam, Khawaja Muhammad : Panchayat System of Dacca, Calchutta, 1911.
18. Aziz, K. K (ed.) : Ameer Ali : His Life and Works, Lahore, 1968.
19. Bhattasali, N.K. : Catalogue of the Coins collected by Hakim Habibur Rahman Akhunzada of Dacca and presented to the Dacca Museum, Dacca, 1936.
20. Banerjee, Surendra Nath : A Nation in Making, London, Oxford University Press, 1925.
21. Birt, F.B. Bradely : Twelve Men of Bengal in the Nineteenth Century, Calcutta, 1910.
22. Bose, N.S.: The Indian Awakening and Bengal, Calcutta, F.K.L. Mokhopadyay, 1969.
23. Cassell : Biographical Dictionary, London and New York, N.P.D.
24. Caupos, J. J. :History of the Portuguese in Bengal, Calcutta, 1999.
25. Chand, Tara : Influence of Islam on Indian Culture, Allahabad, 1946.

Dhaka University Institutional Repository

26. Chandra, Bipan : Communalism in Modern India, Delhi, Vani Educational Book, 1984.
27. Chatterji, Sunil Kumar : Srerampore Missionaries and Christian Muslim Interaction in Bengal, Calcutta, 1981.
28. Choudhury, Roy, Majumdar and Datta: An Advanced History of India, Calcutta, 1953.
29. Chowdhury, Justice Badrul Haider: Evolution of the Supreme Court of Bangladesh, Dhaka, Dhaka University, 1990.
30. Dutta, R.C. : Economic History of India in the Victorian Age, Calcutta, 1906.
31. Elphinstone, Mountstuart : The History of India, Allahabad, 1966.
32. Frolov, I. (ed.) : Dictionary of Philosophy, Moscow, Progress Publishers, 1984.
33. Gahananda, Swami : Sri Ramakrishna and His Unique Message, London, 1970.
34. Guillaume, A. : Islam, 2nd ed., Penguine, 1956.
35. Gupta, J.C. Das : National Biography for India, vol.VI, Dacca, 1919.
36. Graham, G.F.L. : The Life and Works of Sir Syed Ahmad Khan, London, 1909.
37. Hai, Abdul : Nuzhatul Khawater, Vol. II, Hyderabad, 1947.
38. Hakima, Ahmad Mustafa Abu : History of Eastern Arabia, 1750-1800 : The Rise and Development of Bahrain and Kuwait, Beirut, 1965.

Dhaka University Institutional Repository

39. Habibullah, A.B.M. : The Foundation of Muslim Rule in India, Lahore, Sh. Muhammad Ashraf, 1945.

40. Hasan, Perween and Mufakharul Islam (ed): Essays in Memory of Momtazur Rahman Tarafdar, Dhaka, Centre for Advanced Research in the Humanities, Dhaka University, 1999.

41. Hardy, Peter : Muslims of British India, Cambridge, 1972.

42. Hasan, Saiyid Matlubul : Muhammad Ali Jinnah : A Political Study, Lahore, S.M. Ashraf, 1953.

43. Hunter, W.W. : The Indian Musalmans, London, 1871.

44. Hunter, W.W. : Annals of Rural Begnal, London, Smith, 1868.

45. Huq, Enamul (ed.) : Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents, Dacca, 1968.

46. Husain, Syed Sajjad (ed.) : East Pakistan: A Profile, Dacca, 1962.

47. Hussain, S. Abid : The Destiny of Indian Muslims, Bombay, 1965.

48. Ikram, S. M. : Modern Muslim India and the Birth of Pakistan, Lahore, S. M. Ashraf, 1965.

49. Islam, Dr. Sirajul : The Permanent Settlement in Bengal: A Study of Its Operation (1790-1819), Dacca, Bangla Academy, 1974.

50. Islam, Sirajul (ed): History of Bangladesh : 1704-1971, Vol. I, II & III, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1992.

Dhaka University Institutional Repository

51. Islam, Mustafa Nurul : Begnali Muslim Public Opinion as Relfected in the Bengali Press (1901-1930), Dacca, Bangla Academy, 1973.
52. Jack, J. C. : Bengal District Gazetteer, Bakerganj, Calcutta, 1948.
53. Jafar, Abu :Maulana Akram Khan: A Versatile Genius, Dhaka, 1984.
54. Karim, Abdul : Muhammadan Education in Bengal, Calcutta, 1900.
55. Karim, Abdul : Murshid Quli Khan and His Times, Dacca, 1963.
56. Karim, Abdul : Social History of the Muslims in Begnal (down to A.S. 1538), Dacca, Asiatic Society of Bengal, 1958.
57. Karim, Abul Khair Nazmul : The Modern Muslim Political Elite in Bengal, London, University of London, 1964.
58. Kaye, J. E. : A History of the Sepoy War in India (1857-58) Vol. I, London, 1877.
59. Khan, Muin ud-Din Ahmad : History of the Faraidi Movement, Karachi, 1965.
60. Khan, Muin ud-Din Ahmad : Titu Mir and His Followers, Dacca, 1980.
61. Khan, Bablur Rahman : Politics in Bengal: 1927-36, Dhaka, 1987.
62. Maitra, Jayanti: Muslim Politics in Begnal, Calcutta, 1984.

Dhaka University Institutional Repository

63. Majumdar, R.C. : The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857, Calcutta, 1957.

64. Majumder, R.C. : History of the Freedom Movement in India, Calcutta, F.K.L. Mokhopadyay, 1963.

65. Mallick, Azizur Rahman : British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1858), Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1961.

66. Mannan, Mohammad Siraj : Muslim Political Parties in Bengal: 1936-47, Dhaka, 1987.

67. Misra, B.B. : The Indian Middle Classes : Their Growth in Modern Times, London, Oxford University Press, 1961.

68. Momen, Humaira : Muslim Politics in Bengal: A Study of Krishak Praja Party and the Election of 1937, Dacca, Suny House, 1972.

69. Mujib, M. : The Indian Muslims, London, George Allen and Unwin, 1967.

70. Muller, F. Max : Rammohan to Ramakrishna, Calcutta, 1952.

71. Nizami, K.A. (ed.) : Politics and Society during the early Medieval Period, New Delhi, People Publishing House, 1974.

72. Pirzada, Syed Sharifuddin (ed.): Foundation of Pakistan: All India Muslim League Documents, 1906-1947, Vol. 1, Karachi, 1969.

73. Pirzada, Syed Sharifuddin : The Pakistan Resolution and the Historic Lahore Session, Karachi, 1968.

Dhaka University Institutional Repository

74. Poole, Stanley Lane : Aurangzeb and the Decay of the Mughal Empire, Bombay, 1930.
75. Rahim, Muhammad Abdur : Social and Cultural History of Begnal , Vol. I & II, Karachi, Karachi University, 1963.
76. Rahim, Muhammad Abdur : The Muslim Society and Politics in Bengal: 1757-1947, Dacca, Dacca University Press, 1978.
77. Rahman, Matiur : From Consultation to Confrontation: A Study of the Muslim League in British Indian Politics: 1906-1912, London, 1970.
78. Rasheeduzzaman, M : The Central Legislature in British India : 1921-1947, Dacca, Mullick Brothers, 1965.
79. Rubbee, Khondker Fuzli : The Origin of the Musalmans of Bengal, (Hakikat-I-Musalmani Bangala), Calcutta, 1895.
80. Shakir, Moin : Khilafat to Partition, 1919-1947, Delhi, 1970.
81. Sarkar, Sumit : The Swadeshi Movement in Bengal (1903-1908), New Delhi, 1973.
82. Sarkar, Sir Jadu Nath (ed.) : The History of Bengal, vol. II, Muslim period (1200-1757), Dacca, University of Dacca, August 1948.
83. Sastri, Sivnath : History of the Brahmo Samaj (1911-12), Calcutta, 1974.
84. Sen, Shila : Muslim Politics in Bengal: 1937-47, New Delhi, Impex India, 1976.

Dhaka University Institutional Repository

85. Sengupta, K.P. : The Christian Missionaries in Bengal, Calcutta, 1981.
86. Sinha, N. K. : The Economic History of Bengal, Vol. 1, Calcutta, 1961.
87. Seal, Anil : The Emergence of Indian Nationalism : Competition and Collaboration in Later Nineteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1968.
88. Taifoor, S. M. : Glimpses of old Dhaka, Dacca, 1956.
89. Tarachand : History of the Freedom Movement in India, Vol, III, Delhi, Ministry of Information and Broadcasting, 1967-1973.
90. Wallbank, T.W. (ed.) : The Partition of India : Causes and Responsibilities, Boston, 1966.
91. Wise, Dr. James : Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal, London, 1884.
92. Zaidi, A.M. : Evolution of Muslim Political Thought in India, Volume Five, The Demand for Pakistan, New Delhi, 1978.
93. The English Works of Raja Rammohan Roy, Allahabad, 1906.

c) **Journals and Periodicals:**

1. The Moslem Chronicle, 23 May 1896 (Supplementary).
2. The Mussalman, Calcutta, 18 June 1909.
3. The Mussalman, Calcutta, August 28, 1936.
4. The statesman, July 1929.
5. The Star of India, 7 & 8 April, 1946.
6. The Eastern Examiner, Chittagong, 1960.

Dhaka University Institutional Repository

7. The Eastern Examiner, Chittagong, Nov. 1, 1967.
8. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXIII, Part. II, No. 1, 1894.
9. Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol.XVI, No. 2, August, 1971.
10. Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, vol. 28, No. 2, Dhaka, December 1983.
11. Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, vol. 39, Dhaka, December 1994.
12. Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, vol. 40, Dhaka, December 1995.
13. Pumphlets of the United Indian Patriotic Association, Aligarh, 1888.

Dhaka University Institutional Repository

d) Reports, Proceedings etc. :

1. Report of the Proceedings of the first session of the Provincial Mahomedan Educational Conference, 1906.
2. Report of the proceedings of the fourth Provincial Mahomedan Educational Conference, 1911.
3. Report of the Moslem Education Advisory Committee, 1934.
4. Report of the Indian Constitutional Reforms, 1918, Ch.III.
5. Bengal Administration Report, 1924-25, Calcutta, 1926.
6. Report on the Administration of Bengal, 1905-1936, Calcutta, 1937.
7. Bengal Legislative Council Debates, Vol. II, 29th July-16th August, 1937.
8. Proceedings of the Pakistan History Conference, Karachi, 1951.
9. Proceedings of the Bengal Legislative Council, 1921-1926, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot.